



শ্রাশনাল থিয়েটারে এই সময় এক উল্লেখযোগ্য
বর্তন পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্মী প্রভৃতি স্থানে ধর্মদাস
এর অধিনায়কত্বে যে দল প্রেরিত হয়েছিল—তারা ফিরে
মঞ্চস্থলে প্রাপ্ত জিনিষ-পত্র ও অন্যান্য হিসাব-পত্র
ভুবনবাবুর সংগে ধর্মদাসবাবুর কিছুটা মনোমালিন্যের
হয়। এই মনোমালিন্য থেকে শেষ পর্যন্ত আগষ্ট
ল বিবোধ দেখা দেয়। ধর্মদাসবাবু গ্রেট ন্যাশনাল
থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং কয়েকজন শিল্পী নিয়ে
এরিয়ান (গ্রেট ন্যাশনাল) থিয়েটার নামে বেঙ্গল
থিয়েটারের রূপমঞ্চে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট অবতীর্ণ
হুসেনমোহন নিয়োগী স্বত্বাধিকারী হলেও ধর্মদাস-
বাবুর পক্ষে গ্রেট ন্যাশনালের সব কিছু তদারক
ধর্মদাসবাবুর নিকট থেকে তিনি এবার সমস্ত বুঝে
নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে
স্বত্বাধিকারিক ভাবে ইজারা দেন। এবার থিয়েটারের
নাম 'দি নিউ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'। কৃষ্ণধন
থিয়েটারে ম্যানেজার হন মহেন্দ্রনাথ বহু।
হাল বাবুর অধ্যক্ষতায় ৭ই আগষ্ট পদ্মিনী, ১৪ই
শরৎ-সরোজিনী, ২১শে আগষ্ট—নৌদর্পণ এবং
আগষ্ট—হুমারী দত্ত রচিত অপূর্ব সতী মঞ্চস্থ
২৮শে আগষ্ট—সতী কি কলংকিনী ও ভারত
এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর—ডাক্তার বাবু, ১১ই সেপ্টেম্বর
সীতা ও নৃত্য, ১৮ই সেপ্টেম্বর—পুরুবিজয়, ২৫শে
হুমারী দত্ত রচিত কনকপদ্ম মঞ্চস্থ হয়।
বাবু কয়েকমাস থিয়েটার চালিয়েই ঋণগ্রস্ত হয়ে
ছেড়ে দেন, তখন ভুবনমোহন বাবু পুনরায়
থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। এবং
শ্রাশনাল থিয়েটার নামেই পরিচালিত হতে থাকে।
বাবু ধর্মদাস বাবুর সংগে দি নিউ এরিয়ানে
ন করেছিলেন। তিনিও পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালে
থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক হলেন। এবার
র হলেন অমৃতলাল বহু। ৫ই ডিসেম্বর—
রচিত 'বৃজসংহার' অভিনীত হয়। ২৬শে
—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী'

মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়মাংশে :
মতি হর—লক্ষণ সিং,
অমৃতলাল—বিজয়, মহেন্দ্র
বহু—বর্ণধার, বিনোদিনী—সরোজিনী চরিত্রে অভিনয়
করেন। ৩১শে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত
'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'।
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী বেলেটির জমিদার ব্রজেন্দ্র
কুমার রায় রচিত 'প্রকৃত বন্ধু' অভিনীত হয়। ৭ই
ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হয় 'বিদ্যাহুম্বর'। ১৯শে ফেব্রুয়ারী
অভিনীত হয় 'গজদানন্দ' (গ্রহসন)। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের
'সরোজিনী' নাটকের সংগেই মঞ্চস্থ হয়। এই গজদানন্দ
গ্রহসন অভিনয় নিয়েই বাংলার নাট্যশালা ইতিহাসে
আর এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজ
সরকার থিয়েটার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন। ১৯শে
তারিখের অভিনয়ে মহেন্দ্র বহু—প্রমুখ, নগেন্দ্রনাথ—
গজদানন্দ, ক্ষেত্রাবণি—শিল্পী চরিত্রে অভিনয় করেন।
২৬শে ফেব্রুয়ারী হুমায়ুন চরিত্র, কর্ণাটকুমার অভিনীত
হয় ও উপেন্দ্রবাবু বক্তৃতা দেন।
১লা মার্চ সুরেন্দ্র বিনোদিনী ও পুলিশ অফ শিগ এ্যাও
সীপ অভিনীত হয়।
বাংলার নাট্যশালা প্রথম থেকেই নাটকের মধ্য দিয়ে
গণ-চেতনা বা জাতীয় চেতনায় সচেত ছিল। গ্রেট
শ্রাশনাল থিয়েটারে অভিনীত নাটকের মধ্যেও এই স্রোত-
ছিল অব্যাহত। গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত নৌদর্পণ,
ভারতমাতা, শরৎ-সরোজিনী, হীরক চূর্ণ, পুরুবিজয়,
সরোজিনী, গজদানন্দ প্রভৃতি নাটক ও গ্রহসন এই প্রমাণে
উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলির অভিনয় থেকে রাজশক্তি
নাট্যকালীনরূপকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টায় বইলেন। এবং
শেষ পর্যন্ত তা কার্যতঃ দেখা দিল। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ
দাস ছিলেন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীনাথ দাসের
পুত্র। উপেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি তদা-
নীন্তন বহু বিদ্যালয়, সংবাদ পত্র ও বহু জনহিতকর
প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয়
তাবধারায় অস্বাভাবিক রকমের পরিচালকও হলেন।

আমর যুক্তি পথে—

বাদলে পিকচারের বিবেচন

আর্থীহারা

পরিচালনা - সুকুমার দাসগুপ্ত
সঙ্গীত - হেমচন্দ্র মুখার্জী
কাহিনী - ফণী মজুমদার

প্রযোজ্যে

উত্তমকুমার • দ্বালা জিন্হা

শরৎকুমার • কাজরী গুহ
জহর রায় • তন্মাল লাহিড়ী
ও আরও অনেক



পরিবেশনা
জি.আর. পিকচার্স

৪৩, বঙ্গভাট্টা ট্রাট, কলিকাতা

তার নাটকগুলিও রাষ্ট্রশক্তি হ-
দেখেননি। তাই তারা একটা
উপায় উদ্ভাবনের কথা পূর্ব
ভাবছিলেন। আর একটা
থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ভব হোল
কার্যকরী পন্থা। এই ঘটনাটি
"প্রিন্স অফ ওয়েলস" বা যু-
ক্লপে এডওয়ার্ডের ভারত আ-
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর
তিনি ভারতে পদার্পণ করেন
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী
কলকাতায় আসেন। কলক-
এসে তাঁর ইচ্ছা হয় বা-
বারের আচার নিষ্ঠা
করতে। তখন লন্ডনবা-
বড়লাট। হাই-
জগদানন্দ মুখোপা-
সাহেবের কাউন্সিলের সদস্য হি-
তিনি সুব্রাহ্মকে তাঁর বহুলবা-
বাড়ীতে অস্থান জানাতে
হন। এবং এ বি-ষ-য়ে যথ-
আয়োজন করেন। সুব্রাহ্ম
জন অল্পচর ও ইংরেজ ম-
জগদানন্দবাবুর বাড়ী প-
করেন। সংগে সংগে
মঙ্গল শংখধ্বনি দ্বারা
অভিনন্দিত ক-র-ে-ন
করেন। সুব্রাহ্ম সংগীত-
না নিয়ে একাই অন্দরমহ-
করেন। এবং মেয়েদে-
কথাবার্তা বলেন। সুব্রা-
নন্দবাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রী
গায়ের গহনা দেখে বিস্ম-
এবং আপ্যায়ণে এতই মু-
বিদায় নেবার সময় বলেন,
গৃহে আর উইনস্টনস রাজা



য আমি কোন ব্যতিক্রম অনুভব করতে পারিনি।
নকার দিনে হিন্দুর অন্তঃপুরে বিজাতীয় ইংরেজকে
ন আপ্যায়ন মোটেই প্রশংসার ছিলনা—তারপর
ভীষতাবাদের স্বর চারিদিক থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠতে
করেছে। তাই সবাই এমন ছিঃ ছিঃ দিতে লাগলো
জগদানন্দবাবুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠলো।
পরিজন বর্গের পক্ষেও। হিন্দু পেট্রিয়ার্ট—অমৃতবাজার
কা ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রও বিচার দিলেন। কবি
চন্দ্র তার বাঙ্গালায় কবিতার লিখলেন—

“বেঁচে থাকো মুখুয্যার পো, খেলে ভালোচোটে
ভোমার খেলায় রাং জশো হয়,
গোবরে শালুক কোটে
বনে। বানে এক ভাড়াতে কলে বাজিমাং
শ্রামপু হুবা তেকো হলো কেয়াবাত কেয়াবাত।

ন্যাশনাল ১২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মক্কা করলেন
লানন্দ গ্রহসন। গ্রহসনটির রচয়িতা কে তা নিয়ে মতাস্বর
লেও এর বেশীর ভাগই গান রচনা করেন নটরু
গজ্ঞ।

ওলো খুরতে পারিনে আর, খঁরে গিয়েছে পা
ফন গায়ে পড়িস ঢলে ওলো স’রে বা
ত নিয়ে ব্যক্তি, চলতে কি পারি,
একটু খেয়ে চল
ওলো যেমে গিয়েছে গা।”
বা সমবেত ভাবে গীত হতো। ক্ষেত্রমণি এককভাবে
“আমি গিনী থাকতে
তাবনা কিরে বোকা ছেলে
অনেক স্বকৃতির কলে
আমার মতন গিনী মেলে।”

‘টব এগটি দৃষ্টির সামনে বেলবাবু গাইতেন—

(ওরে) জগ হতে চাও

গজাগরি খন।” ইত্যাদি।

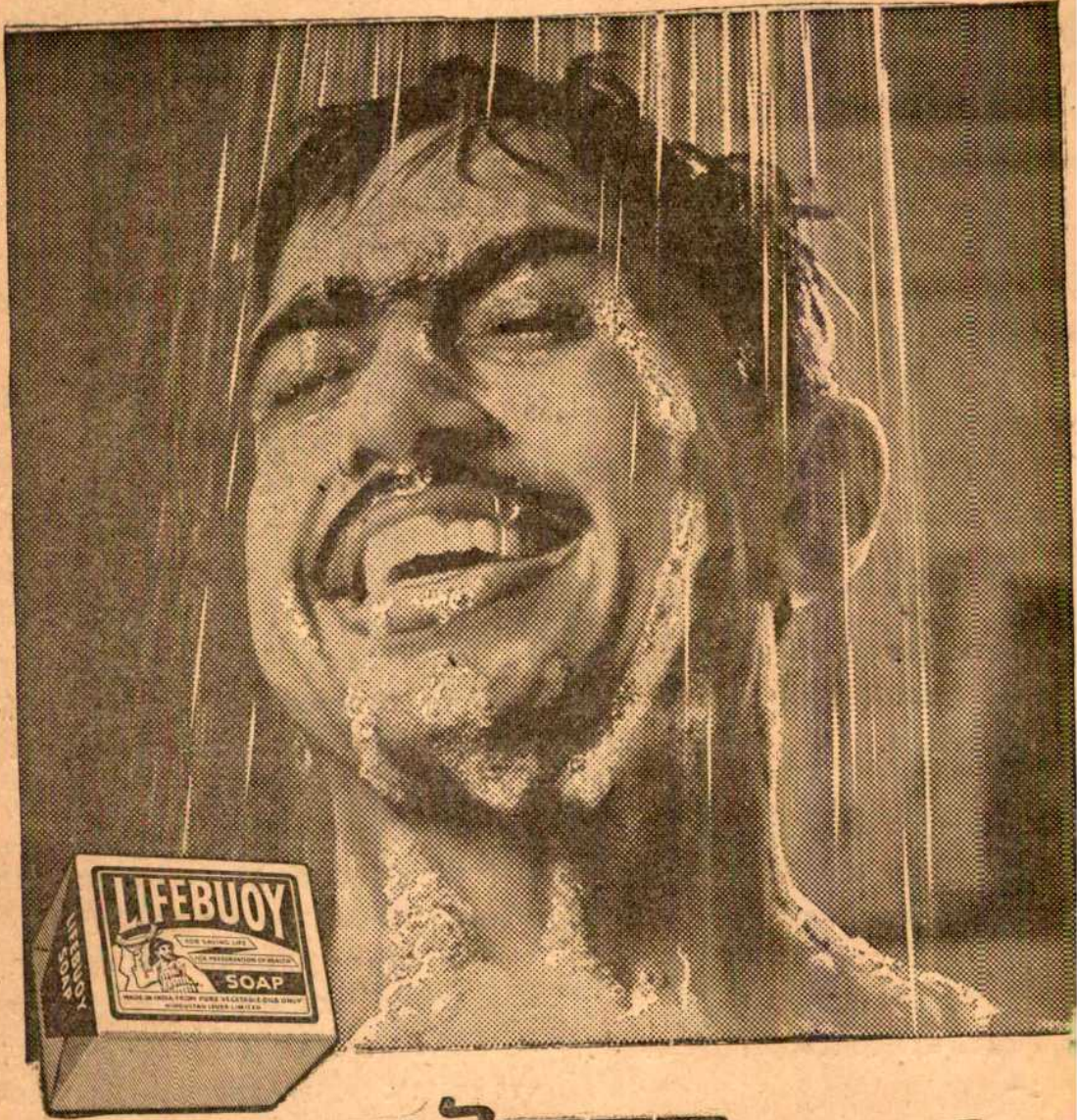
অ গ্রহস-বিষাট আশোড়ন সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে

প্রচারিত হতে থাকে যে,
বড়লাট জগদানন্দবাবুর
ওপর খুব বিরক্ত হয়েছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত “হুম্মান চরিত্র”, অভিনীত
হলো ২৬শে ফেব্রুয়ারী। তখন বাংলার ছোট লাট একটি
অর্ডিন্যান্স জারী করতে তৎপর হলেন। তদানীন্তন পুলিশ
সুপারিনটেন্ডেন্ট ল্যান্স সাহেব এবং পুলিশ কমিশনার
স্মার ফুয়ার্ট হগ প্রভৃতি ছোটলাটের সংগে মন্ত্রণায় রত
হলেন।

১লা মার্চ তারিখ উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত ‘স্বদেশ বিনোদিনী’
ও পুলিশ অফ পিগ এণ্ড সীপ অভিনীত হয়। শেষোক্ত
গ্রহসনটিকে গজদানন্দ গ্রহসনটির রূপান্তরই বলা যেতে পারে।
এতে ল্যাঘ এবং হগ সাহেবকেও বিক্রম করা হয়। ১লা
মার্চের অভিনয় বধন চলছিল, তখন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট
ল্যাঘ, ডেপুটি কমিশনার লেমবার্ট ও শ্রামপুহর খানার
ইন্সপেক্টর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে উপস্থিত হন এবং
ল্যাঘার্ট সাহেব অর্ডিন্যান্সটি গড়ে জারী করেন। গ্রহসনটির
অভিনয় বন্ধ হয়। কিন্তু স্বদেশ বিনোদিনীর অভিনয়
চলে এবং পূর্বোক্ত শিল্পীরা অভিনয় বন্ধের কিছুটা প্রতি-
শোধ এই নাটকের অভিনয়ের সময় গ্রহণ করেন।

নাটকে অমৃতলাল বসু ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিনয় সময়ে স্বদেশের
সহোদরা ভগ্নীকে প্রলোভিত করে বলেন, হুম্মান হামার
কাছে এস, উবু কি? আমি ত টাইগার না আছে—বিয়ার
না আছে বলতে বলতে হামি ত পিগ না আছে—সিগ
না আছে এই সংলাপও বলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ত খড়গ
হস্ত। পুলিশ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ জানানো
হয় এবং ৪ঠা মার্চ ‘সত্যি কি কলঙ্কিনী’ নাটকের অভিনয়
সময় উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, সুবনমোহন নিয়োগী,
মহেন্দ্র বসু, মতি সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস, রামরতন সান্যাল প্রভৃতি
কেনসের আদলতে চালান দেওয়া এবং অজ্ঞাততার অধু-
হাতে বিচার শুরু হয়। হাইকোর্টের প্রধান ইন্টারপ্রিটার মিঃ
ওয়েন, প্রধান অধ্যাপক স্ক্রামাচরণ সরকার’ পণ্ডিত বোলেজ



লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

সত্যিই, লাইফবয় মেখে গান করতে কি আরাম! শরীরটা তাজা আর
প্রসব্বরে রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধূলা ময়লা লাগবেই
লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার ফেনা ধূলা ময়লা রোগ বীজাণু
ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের যত্ন লাইফবয়ে।

গাভ্রণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ত প্রভৃতি সাক্ষাৎ
বক্তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ভক্তার বাহেজ-
, দ্বিজেননাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
এম, বঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তদানীন্তন গণ্যমান্য
সবাই এর বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু
ট স্কলের অভিমত অগ্রাহ্য করে নাটকটি অঙ্গীল
ভব্য করলেন এবং ৮ই মার্চ অঙ্গীল অভিনয়ীদের
পরে উপেক্ষনাথ দাস ও অন্তর্জাল বহুকে একমাস
শ্রম কারাদণ্ডের রায় দিলেন। বিচারের বিরুদ্ধে
করে উকিল গণেশচন্দ্র চন্দ্র হাইকোর্ট থেকে জামিনে
দেব মুক্ত করে আনেন। উমেশচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়
দের পক্ষে জামিনের সওয়াল করেন। হাইকোর্টের
সওয়াল করেন মনমোহন ঘোষ, পালিত ও ব্রাহ্মণ।
ফায় ও মার্কবার আদালতে পুনর্বিচার হয় এবং
বিনোদিনী' অঙ্গীল নয় বলে বিচারপতিদের রায়

দেন। ২০শে মার্চ এই
মা ম লা হয়। ফায়ার
সাহেবকে একজ্ঞ রাজ-



শক্তির কুবজবে পড়ে পদত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যেতে
হয়, যদিও এদেশীয়দের অনেকখানি প্রত্যাশী অর্জন
করেন। ২০শে মার্চ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হব্‌হাউস ইম্পিরিয়াল
কাউন্সিলে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি গণ্য করেন ও বিলটি
পাশ হয়। বিলটি অঙ্গমোদন করেন লর্ড লিটন। স্টার
রিচার্ড টেম্পলকে বিলটি পাশ করবার পক্ষে রাজা
নরেন্দ্রকুমার দেব যথেষ্ট সহায়তা করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'ড্রামেটিক পারফরম্যান্সেস কন্ট্রোল
বিল' বা অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ বিলটি পাশ হবার মধ্যে বাংলার
পেশাদার নাট্যশালার এক যুগের পরিসমাপ্তি হলো বলা
চলে এবং গ্রেট ড্রামাটাল থিয়েটার এই যুগে যে ঐতি-
হাসিক কর্মজীবনের পরিচয় দেয়—তা যুগযুগ ধরে ইতি-

অপ্সারোগে অভিনব

রূপ-চর্চায় বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনটি নূতন অবদান
আপনার সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলতর করিবে।



প্রিয়া স্নো

স্বক কোমল ও নিমল রাখে

প্রিয়া স্নেল্

অনবস্ত্র পুষ্পসার



উষ্মা

ফেস পাউডার

অভিজাত প্রসাধন রেণু

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা * বোম্বাই * কানপুর



হাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরে
লিখিত থাকবে।

মামলায় গ্রেট জাশনালের

স্বাক্ষরকারী জুবনমোহন বাবু প্রায় সর্বশাস্ত হয়ে পড়েন।
উপেন্দ্রনাথ দাস বিলেত যাত্রা করেন। অমৃতলাল অভিনেতা
হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা বেহারী চট্টোপাধ্যায়ের
সঙ্গে আশ্রয়মান যান। স্বকুমারী দত্ত থিয়েটার ছেড়ে
দেন। বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন।
অর্ধেক মৃত্যু দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। নগেন্দ্র নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় কস্তাঘরের বিবাহ দেবার জন্য
থিয়েটারের সংযোগ পরিত্যাগ করেন। এদিকে নতুন
আইনের জন্য সেরকম নাটকও অভিনয় করা সম্ভব ছিল না।
তবু ৪ঠা মার্চ সত্যি কি কলকিনী ও রাম নারায়ণ তর্করত্নের
উভয় সংকট, ১১ই মার্চ সরোজিনী, ১৮ই মার্চ আনন্দকানন,
১লা এপ্রিল পদ্মিনী, ৮ই এপ্রিল তারিণীচরণ পালের ভীম-

সিংহ, ৪ঠা নভেম্বর সত্যি কি কলকিনী, ১৮ই
সরোজিনী, ২৫শে নভেম্বর স্বরোজ বিনোদিনী এ
ডিসেম্বর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতিনাট্য প
হরণ ও ২০শে ডিসেম্বর অতুল মিত্রের আদর্শ সত্যি অ
হয়। এই সময় থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ থাকে।
১৮৭৭ সালের ১৩ই জাশয়ারী পারিজাত হরণের
তিনয় হয়। শেষ পর্যন্ত জুবনমোহন বাবু থিয়েটার
বারের জন্য লিজ দেন। এবার লীজ নিলেন স্বয়ং
চন্দ্র। গ্রেট জাশনালের সেই স্বাক্ষর যুগে তিনিই
প্রদীপের আলোক শিখা প্রজ্বল করে তুলতে
এলেন। বর্তমান ৬, বিভূষণ স্ট্রীটস্থিত মিনার্ভা রফ
আদি নাট্যসম্প্রদায় গ্রেট জাশনালের ইতিহাস এ
পরিসমাপ্তি করা হলো। পরবর্তী অধ্যায়—গিরিশ
অধ্যায়—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি লিজ নেন

—:—:—

চরমোৎসব

ঠা, নিশ্চয়ই। আপনার অলঙ্কারেও শিল্পের
চরমোৎসব থাকাত পার। হয়ত আপনি
জানেন না এমন জিনিস কোথায় পাওয়া
যায়। আমাদের এইখানেই পাবেন
সুদৃশ্য অলঙ্কারের বিচিত্র সম্ভার
এবং সবচেয়ে বাড়া কথা,
★ দামও জায়া।

গিণি ম্যানসন

ডিজিটাল প্রিন্টিং সিস্টেম মনিটরিং

প্রধান কার্যালয় : ২২৬, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯
গ্রাম : "গিণি ম্যানসন" ফোন : ৪৬-১৪৭২
শাখাসমূহ :
যহরবার বাজার, ভবানীপুর, কলিকাতা-২. ফোন : ৪৭-৩২৬২
১নং, হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-১৪২৫

বাংলা চলচ্চিত্র
শিল্পের ইতিহাস

★

কালীশ মুখোপাধ্যায়

ও

নিতাই সেনের

মুখ্য সম্পাদনার আত্মপ্রকাশ

প্রতীক্ষায়

প্রতিখণ্ড : পাঁচ টাকা

অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে নিশ্চিত
হউন।

রূপ-মঞ্চ প্রকাশক

৮১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

বাংলার নাটক ও নাট্যশালার প্রথম যুগ

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করেছেন রূপ-রক্ষা পত্রিকার অগ্রতম পৃষ্ঠপোষক

আয়ুর্বেদাচার্য

● ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি (সবাধ্যক লাবনা ঔষধালয়) ●

নাটক ও নাট্যশালা এবং নটনটীর অভিনয়-ধারার বিস্তৃত হয়ে আছে নাট্য সাহিত্য ও নাট্যাঙ্গের ইতিহাস। এই দিক দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে করতে হলে কালক্রমিক রীতিতে বিশ্লেষণ করতে হয়, তারিখ প্রকৃতি নিয়ে নাট্য-সাহিত্য এবং নাট্য-সংগঠন, রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে এবং সে সংগে প্রকৃত ঘটনাবলীর পটভূমিকার বাংলা দেশে নাট্য-শিল্পের বিস্তারের দাবাবাহিক বিকাশের ধারাটিকে করে আদর্শ ও রূপ-প্রসংগের উপর আলোকপাত হয়। বিষয়টি প্রকৃত প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এবং নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে ভাবে জড়িত। নাট্যশালার ইতিহাসকে নিয়ে এই সংগঠন, রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নয়—বস্তুত এর কথা ও কাহিনীকে নিয়েই সম্পূর্ণ—নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্য আন্দোলন বিকশিত হয়ে নাট্যসাহিত্য ও নাট্য-আন্দোলনের পরি-পাক এই জন্মই বলা যায় যে, নাট্যশালার ইতি-বল নাট্যমক তিত্তিক নয়—নাট্যশালার সংগে আছে নাটক ও নটনটী এবং নাট্য রসিক জন-। আবার নাটক ও নটনটীর পরিপূর্ণ বিকাশ পড়েই। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ক্রম-ইতিহাসে নটনটী এবং অপেশাদার শাহী ব্যক্তিগণের অবদান অপরিণীয়—নাট্য-শিল্পের বিস্তৃতির পথে ইহাদের উৎসাহ, প্রম-অনিষ্টা সর্বদা প্রাণশক্তি জুগিয়ে এসেছে। র সত্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নাটক, নাট্য-এবং নটনটীর একটা বিশেষ ভূমিকা এবং স্থান

ছিল। অতীতকালে রাজা মহারাজাদের সত্য নটনটী থাকতেন, নাটক অভিনয় হোত চিত্ত-বিনোদনের জন্য এবং জুলিল কাব্য ও সংগীত অংগ ভগ্নী সহকারে রূপ দেওয়া হোত। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের সুপ্রাচীন ইতিহাসে তরু-মুনির নাট্যশাস্ত্র এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নাট্যশাস্ত্রকারগণ অভিনয় বিদ্যাকে বিবর্ধিত করেছেন ও নটিকার অঙ্গীশনে বিরাট কর্মক্ষেত্রে। শিল্প এখানে মহিমাময় হয়েছে। ভারত-মুনির নাট্যশাস্ত্র এবং তার “লক্ষ্মী স্বংঘর” নাটক এখনো অনাবিকৃত—তবে সংস্কৃত সাহিত্যের তরুতমুনির নাট্যশাস্ত্র এবং নাটকের উল্লেখ থেকে একথাই মনে হয় যে, ভারতীয়



বাংলা ও বাঙ্গালার ঐতিহ্যদোস্ত নাট্যশ্র

ভারতের একমাত্র
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
—নাট্যশালা—

ষ্টার থিয়েটার

অল্পম বার
সময়িত ঘূর্ণায়
—রঙ্গমঞ্চ—

টেলিফোন :: ৫৫—১১৩২

সর্বাধুনিক সমাজ-সমস্যা মূলক নাট্যার্থ্য

মঞ্চ ও আলোক গচ্ছা

অনিল বসু

কাহিনী

সুবোধ ঘোষ

শ্রেয়সী

মঞ্চ
দুর্গা

● একমাত্র স্বত্বাধিকারী—সলিলকুমার মিত্র ●

★ নাট্যরূপ ও পরিচালনা—দেবনারায়ণ গুপ্ত ★

বর্তমান অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ! অভিনয় মাধুর্য—নাট্য-সম্পদ—মঞ্চ কৌশল

● পরিচালন নৈপুণ্যে সর্বশ্রেণীর নাট্যমোদীদের অভিনন্দন-ধন্য ●

শ্রেয়সী

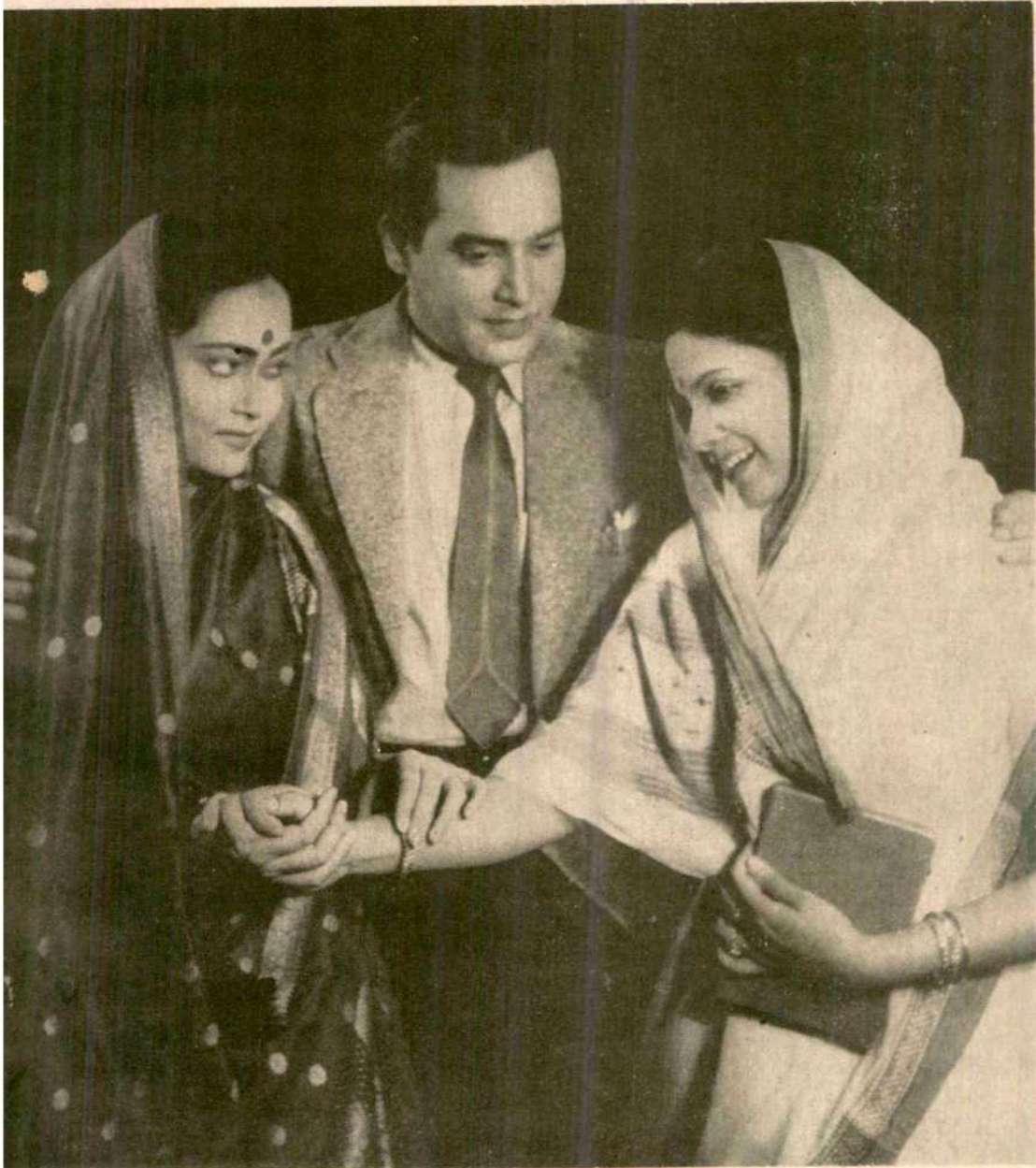
অভিনয়াংশে—নট সম্রাট ছবি বিশ্বাস :: শক্তিমান কমল মিত্র :: নাট্য সম্রাজ্ঞী সাবিত্রী চা
পাখ্যায় :: প্রিয়দর্শন বসন্ত চৌধুরী :: অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় :: শক্তিময়ী অপর্ণা দেবী :: রসনা
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় :: অল্পকুমার :: নবাগতা লিলি চক্রবর্তী :: শ্যাম লাহা :: শীলা পাল
প্রবীণ তুলসী চক্রবর্তী : বেলারাগী : পঞ্চানন ভট্টাচার্য : শিবেন : করুণ : ভারতী : শৈলবা
প্রিয়া : প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি আরো অনেকে ।

● সগোরবে চলিতেছে ●

● প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা ● বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা

—ষ্টার থিয়েটার—

॥ ৭৯ | ৩ | ৪, কণ্ঠয়ালাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ॥



বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের অবিস্মরণীয় নাট্য-সৃষ্টি “সেতু” নাটকের রূপ-সজ্জায় নাট্য-
দম্বাজ্ঞী তৃপ্তি মিত্র, শক্তিমান অসিতবরণ ও জয়শ্রী সেন। ২০শত রজনীর
অভিনয় অতিক্রান্ত করে ‘সেতু’ অপ্রতিহত গতিতে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে।



॥ “অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ধরে” :: কৃষ্ণচন্দ্র দে ॥ সমগ্র বাঙ্গালীর অন্তর আজ
আসামের শংসতায় শোকাচ্ছন্ন। ॥ রূপ-মঞ্চ * একবিংশতি বর্ষ * শারদীয়া * ১৩৬৭ ॥

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাটক, নাট্যশালা এবং নটনটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্য-সংস্কৃতি বিস্তারিত হয়ে পড়ে এবং সংস্কৃতে নাটক প্রণয়ন এবং পঠন পাঠন শুধু নয়, অভিনয়কলার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে।

ভারতের নাট্য-সাহিত্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে গতিশ্রোত হারিয়ে কেলে—হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির পরবর্তী যুগে দেখতে পাই মুসলমান শাসিত কালে কবি জয়দেব প্রসন্নমাধব রচনা করেন শ্রীরাম চরিত অবলম্বন করে এবং এরকম আরও বহু নাটক রচিত হয় নানাহানে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পরবর্তী কালে আঞ্চলিক সাহিত্যেও দেখতে পাই। সংস্কৃত নাটকের গৌরব যুগ কালিদাসের কালে। ভারতীয় চিন্তায় ও সংস্কৃতিতে কালিদাসের প্রভাব যুগ যুগ ধরে অবিস্মৃত হয়ে পড়েছে। পরবর্তী যুগের নাটকের মধ্যে তটনারায়ণের “বেণী সৎকার” অতি প্রাচীন গ্রন্থ। “পারিজাত মঞ্জরী” ১২২১ খৃষ্টাব্দের গৌড় দেশের মদন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নাট্যকাটি রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোখামা “বিদগ্ধ মাধব” ও “ললিত মাধব” রচনা করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গপ্রেরণায়। এই যুগের অন্যান্য নাটক হোল পরমানন্দ সেনের “চৈতন্য চন্দ্রোদয়” নাটক—রায় রামানন্দ প্রণীত “জগন্নাথ বজ্রত” এবং “সংগীত মাধব” রচনা করেন গোবিন্দ দাস। বৈষ্ণব চিন্তা ও সাহিত্যের অঙ্গপ্রেরণায় সংগে সংগে নাটক ও সংগীত নতুন প্রেরণায় সৃষ্টি হতে থাকে।

ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রথম বাংলা নাট্যকার। তিনি “চণ্ডী” নাটক প্রণয়ন করেন। “চৈতন্য মঙ্গল” এবং চৈতন্য ভাগবতে” জানা যায় যে, মহাপ্রভু স্বয়ং রাজাগানের অঙ্কন করতেন। শ্রীবাস আচার্যের গৃহে একদিন মহাপ্রভু “কৃষ্ণশালা” প্রকট করেন চৈতন্য-চরিতামৃতই দেখতে পাই। মহাপ্রভুর নাট্যপ্রীতির কথা স্মরণ করেই বৈষ্ণব গোখামিগণ সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচনা করেন এবং এই বৈষ্ণব নাট্য-আন্দোলন বৈষ্ণব সাধনাকে নাট্যাকারে বহুলাংশে রূপায়িত করে তোলে।

অভিনয় বিজ্ঞা ভারতে কখনো অবহেলিত হয় নি। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য ব্যতীত আঞ্চলিক ভাষায় রাজাগানের আসরে

অভিনয় করার বিচিত্র রূপ ফুটে উঠে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য,



পঠন পাঠন নয়—সংগীত ও পালা কীর্তন রূপে গীত হওয়ার দৃষ্টান্তও অতীতের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা ও পালাগানের আসরে অভিনয় কলা নানাতাবে বিকশিত হয়ে উঠে।

নাট্যকলার মৌলিক উপাদানের সংগে সংগতিপূর্ণ নাট্যকীর রূপের কল্পনা ও রূপায়ন এবং নট নটীর অভিনয় কলা-বিজ্ঞার বিকাশের সাধনায় ভারতবর্ষ কোন কালেই পশ্চাতে পড়েছিল না—এসত্য উদ্ঘাটিত দেখি ভারতীয় নাট্যকলার ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের অলংকারশাস্ত্র কেবল মৌলিকতা-দ্যোতক নয়—এই শাস্ত্রের মতে “নাটকং ধ্যাত বৃত্তং স্ত্রাং পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম” অর্থাৎ নাটক মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ উপসংহতি এই পঞ্চ সন্ধি, সমন্বিত হবে—বাণীর মধ্যেই ভারতীয় নাট্য-চিন্তার মৌলিক দৃষ্টি নিহিত রয়েছে। পরবর্তী কালে এই নাট্য-রীতিই অঙ্গপ্রাণীল আঞ্চলিক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে, সংস্কৃত নাট্য-রীতির ভিত্তিতে নাটক রচিত হতে থাকে।

প্রাচীন ভারতের নাটকের সংগে গ্রীক নাটকের পার্থক্য শুধু গঠনেই নয়—নাট্যকীর রূপমূর্তির কল্পনার ক্ষেত্রেও তাই বৈষম্য রয়েছে দেখতে পাই। প্রাচীণ ও প্রতীচ্যের এই পার্থক্য পরবর্তীকালে সমন্বয়ের পথ অঙ্গসরণ করে আধুনিক নাটক সৃষ্টি হয় ভারতে ইংরাজ শাসন কালে। এই ইতিহাসের সংগেই জড়িত আছে বাংলার নাটক, নাট্যশালা ও নটনটীর নব নাট্য-আন্দোলন। অতীতকে বিশ্বতির অতলে ডুবিয়ে আত্মবিসর্জন নয়—অতীত ও বর্তমানের সংযোগে আত্ম-বিবর্তনের ইতিহাস এই নবনাট্য-আন্দোলন।

কলিকাতার আদি ইতিহাসে দেখতে পাই—রূপ দেশবাসী হেরাসিম লেবেভেদের উদ্যোগে ভারতে প্রথম নাট্য-শালা—অবশ্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্থাপিত হয়। এই নাট্যশালায় বাঙ্গালী নটনটীর পাদপ্রদীপ জালিয়ে প্রথম বঙ্গভাষায় অঙ্গবাদিত ইংরাজী নাটকের বঙ্গীয় রূপ নাট্যা-কারে অভিনয় করেন। ১৭২৫ সনে এই থিয়েটার সংগঠিত



হয়। লেবেডেফ প্রযোজিত ইংরাজী নাটকের বাংলা অমুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কলিকাতায় এই নাট্যাশালা গড়ে উঠে ডোমার্টিলিতে। ১৭২৫ সনের শর দীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে বাংলা নাট্যাশালার পরবর্তী অধ্যায় শুরু করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। হিন্দু থিয়েটার প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যাশালা। এই থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় ঘটে নি—সংস্কৃত নাটক এবং সেক্সপীয়ার প্রণীত নাটকের অভিনয় চলে। ইংরাজী নাটকের অভিনয় সেকালে এখানে ওখানে চলত। খ্যাতনামা নটনটীরাও ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ইতিহাসে দেখতে পাই। এলিজাবেথীয় নাট্যরীতির কিছু কিছু শিক্ষা ইংলণ্ডের নটনটীদের আগমনের ফলে এদেশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে নাট্যকলার ইউরোপীয় চিন্তার সংগে ভারতীয় নাট্য-দর্শনের ভাবধারায় অমুপ্রাণীত নতুন নাট্য-চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। নাট্যাশালার যুগ শুরু হয় ১৮৩২—৩৩ সনে শ্রামবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু নিজ গৃহে অভিনয়ের নিয়মিত

ব্যবস্থা করেন এবং বাঙ্গালীর নাট্যাশালা প্রীতি এ সময় থেকে প্রসারিত হয়ে পড়তে থাকে। এদেশের নাট্যকলা এবং নাট্যাশাখার ইতিহাসে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় প্রথম থিয়েটারী রূপে এখানেই। “বিন্ধ্যাসুন্দর” তখনকার দিনের বাজা। শালার লোকপ্রিয় বিষয় বস্তু। নবীনচন্দ্র চন্দ্র থিয়েটারের মাধ্যমে এই নাটকটিকে থিয়েটারী কায়দায় টেলে সাজিয়ে নতুন রূপে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। বঙ্গীয় নাট্যাশালার আদি ইতিহাস থেকে বতদূর জানা যায়, তখন এই থিয়েটার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা নাট্যকলার উদ্যোগ পেশাদারী নাট্যাশালা এবং অভিনয় কলার সংগে পাশ্চাত্য রীতিকে মিলিয়ে একটা জাতীয় নাট্যাশালা গড়ার গৌরব তাই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং নবীনচন্দ্র বসুর। নাট্যকলার নব উন্মেষকাল এ যুগকেই বলা চলে—নাট্যাশালার এবং নাটকের উপর ইউরোপীয় প্রভাব এখানেই শুরু হয়। অবশ্য এই নবনাট্য-আন্দোলন সৃষ্টির যুগে আছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব বিনিময়ের বোগাযোগ এবং সেই সুযোগে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে নববিস্তার অভ্যাস প্রেরণা। —:::

বাংলার ও বঙ্গশিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃ পূজায় ও নিত্য প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি — শাড়ী — লংক্লথ

অপরিহার্য

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

মাসের মনে খ্যাতি অর্জন
করবার আকাংখা থাকা
আত্মবিক। কিন্তু নিজের অতি-
মাত্র অহংকারী খ্যাতিলাভের
অবশ্য ব্যক্তির যখন তাদের
অসংগত আকাংখা পূর্ণ করবার
জন্ত প্রমত্ত হয়, তখন তারা
অপরকে বিব্রত করতে লক্ষ্যবোধ
করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে
হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে।
আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে
এর দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে খুলনা
জেলায় আমি ওকালতি ব্যবসা

আরম্ভ করি। তখন আমি নাটক রচনার অভ্যাস
ক'রতাম। খুলনা সহরে "করোনেশন হল" নামে একটি
বিশাল মনোরম সাধারণ গৃহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
এই হলে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছিল, শুনেছি এখনও
আছে। এক সময় এই নাট্যমঞ্চে ৬৬জেনারেল তাঁর
রচিত "রাণাপ্রতাপ" নাটকের অভিনয়ে শক্ত সিংহের
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাট্যাচার্য ৬শিশিরকুমার
জনপ্রিয় অভিনেতা হুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নটগীতাট
ছবি বিশ্বাস প্রমুখ প্রখ্যাত অভিনেতাসমূহ এই রঙ্গমঞ্চে
অবতীর্ণ হয়ে-এর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

খুলনার আমার সমব্যবসায়ী বশখী সৌখীন অভিনেতা
স্বর্গতঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।
তিনি বিশ্বাবাস নামেই বেশী পরিচিত। আমার ওকালতি
ব্যবসার প্রথম অবস্থায় বিশ্বাবাস প্রদেয় হুর্গাদাস বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

হুর্গাদাসবাবু আমার কিছু কিছু রচনা পড়ে তার প্রশংসা
করতেন। তাঁরই আন্তরিক উৎসাহে আমার রচিত
"অধা অধিকার" নামক গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল।
এই নাটকখানি তিনি "পূজার দাবী" নাম দিয়ে রেকর্ড

বেয়াড়া সখ

নাট্যজগতকে কেন্দ্র করে বহুজনের বহু
বেয়াড়া সখ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নানা-
ভাবে। এখানে খুলনা করনেশনহলকে
কেন্দ্র করে এমনি কয়েকটি বেয়াড়া সখের
ঘটনা উপহার দিয়েছেন আমাদের আক্ষেয়
পাঠক আলোপূরের খ্যাতনামা আইনজ্ঞ

★ শ্রীবিপন্ন পালক বন্ধু ★

এম, এস, সি ; এল, এল, বি

করান। এই রেকর্ড নাট্যে
হুর্গাদাসবাবু স্বয়ং এবং মনো-
রঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত জহর
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী কানন
দেবী প্রমুখ নাট্যজগতের উচ্চ
শিখরে অধিষ্ঠিত বশখী
শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করায়
এবং সংগীত বিশারদ শ্রীযুক্ত
ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গানের
স্বর সংযোজনা করায় রেকর্ড-
শুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
নাট্য জগতের সংগে আমার
এই যৎসামান্য সখের থাকায়,
বিশেষতঃ হুর্গাদাস বাবু

সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে—নাট্যকার হবাব
হুর্গাদাস-পোষণকারী বহু ব্যক্তি আমাকে নানাভাবে বিব্রত
ক'রেছেন।

খুলনা করোনেশন হলে অবস্থিত রংগালয়ের নাম ছিল নাট্য-
মন্দির। যে সময়ের কথা বলছি—তখন এই রংগালয়ে
মৌখীন নাট্যসম্প্রদায় দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী নিয়ে
নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করত। এই সম্প্রদায়ের নেতা
ও নাট্য পরিচালক ছিলেন হান্তরসিক চিরপ্রস্তুত বিশ্বাবাস।
নাটক রচনায় তিনি আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ
দান ক'রতেন। তাঁর আগ্রহেই আমি নাট্য-মন্দিরের
সভ্য হয়েছিলাম।

বিশ্বাবাস নেতৃত্বে আমাদের নাট্য-সম্প্রদায় খুবই জনপ্রিয়তা
অর্জন করে এবং সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির সাগ্রহে দর্শনী
নিয়ে অভিনয় দেখতে আসতেন। সাধারণতঃ নবীন
উকিলেরা হাকিমদের এবং পসারওয়াল উকিলেরা ইনকাম-
ট্যাক্স অফিসারদের খাতির করে চলেন কারণ, তাঁদের
কোপদৃষ্টিতে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই
ওকালতির প্রথম অবস্থায় আমরা হাকিমদের খুব খাতির
করতাম।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



ঠাকুরমা ও পছন্দ: ঠাকুরমা কি আজকের লোক-
তার এতদিনের অভিজ্ঞতা! তিনিও খুশী হয়েছেন
লক্ষীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেবে। কি
ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।

লক্ষী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড়
কাচা যায় এবং লক্ষী এটাও দেখেছে যে হুতি, সাট,
বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য রকম
সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য-
করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে
দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার
পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আগনিও সানলাইট
সাবান ব্যবহার করুন না কেন?

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

একবার এক সাবজজবাবু খুলনায় বদলী হ'য়ে আসবার কিছুদিন পর নাট্য-মন্দিরে জুয়াটমীর রাজে আমার রচিত "কুফাটমীর" নাটিকার অভিনয় হয়। সাব জজবাবু এই অভিনয় দেখতে আসেন। তখনও তাঁর সংগে আদালতের বাইরে আমার পরিচয় হয়নি। সম্ভবতঃ এই অভিনয় দেখবার পর তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে বিজবাবু নাট্যমন্দিরের সর্বসর্বা এবং সেখানে আমারও যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি একথাও জেনেছিলেন যে, তৎকালের বশবী অভিনেতা দুর্গাদাসবাবুর সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। বোধ হয় এই সব কারণে তিনি আমাকে নানাভাবে বিব্রত ক'রেছিলেন। সেই কথাই ব'লছি।

অল্পদিনের মধ্যেই আদালতে প্রচার হ'য়ে গেল যে সাব জজবাবু খুব চতুৰ এবং খোসামুদপ্রিয় মানুষ। ইতিমধ্যেই কয়েকজন তরুণ উকিল তাঁর প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন।

"কুফাটমী" অভিনয়ের কয়েকদিন পরে আদালতে সাব জজবাবু পাশকামরায় আমার ও বিজবাবুর ডাক পড়ল। দু'জনেই জুনিয়ার উকিল। বাস্তবিকভাবে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখি—সাব জজবাবু তাঁর কয়েকজন প্রিয় উকিলদের নিয়ে গল্পে মগ্ন। আমাদের আপ্যায়ন ক'বে বসিয়ে দু'জনের সমস্ত পরিচয় নেবার পর সাবজজবাবু "কুফাটমী" অভিনয়ের প্রশংসা ক'রলেন এবং তারপর বেশ মুষ্টিমানার সুরে তাঁর লিখিত একখানি পৌরাণিক নাটক আমাদের রংগাঙ্গরে অভিনয় করাবার প্রস্তাব ক'রলেন। শুধু তাই নয়—তিনি আমাকে ব'ললেন—শুনেছি আপনার সংগে দুর্গাদাস বম্বেয়াপাধ্যায়ের খুব ষাতিয়। তাঁকে দিয়ে আমার বইটা ক'লকাতার টেজে প্রে করাবার ব্যবস্থা করুন। সংগে সংগে তিনি পাশের ড্রয়ার থেকে একখানি ছাপান বই বার ক'রে আমার হাতে দিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রচ্ছদপটে লেখা—"মুক্ত পারিজাত"।

সাবজজবাবুর আবদার শুনে আমি তো হতভম্ব। বিজবাবু আমার হাত থেকে বইটি নিয়ে সাবজজবাবুকে প্রদান ক'রলেন—এ বইটা কি বাজার জন্ত লেখা?

বিজবাবুর ষাড়াবিক তাবতগীতেও সকলের হাসি আসত। তাঁর প্রশ্নের ধরণ শুনে আমার ও উপস্থিত

উকিলবাবুদের হাসি চেপে রাখা কষ্ট হ'ল। বিজবাবু কিন্তু খুব গভীর। এ প্রশ্নে

সাবজজবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে উত্তর দিলেন—কি বলছেন মশাই? এ বই থিয়েটারের জন্তই লেখা। রেবতাদের কাহিনী—অম্বন কাননের সিন্—অঙ্গরীদের নাট—প্রে কি রকম জমাট হয় দেখবেন!

আমি ও বিজবাবু কিছুক্ষণ পরস্পর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বিজবাবু ব'ললেন—কিন্তু এ নাটক অভিনয় ক'রতে গেলে যে বহু টাকা ব্যয় হবে। আমাদের তো ও সব সিন্‌সিনারি নেই।

সাবজজবাবু একটু ক্রুদ্ধকিত ক'রে অনেকটা আদেশ দেবার ভঙ্গীতে ব'ললেন—নতুন সিনের দরকার কি? "কুফাটমী"তে যে সব সিন্‌সিনারি দেখলাম—তা দিয়েই চ'লবে। বইটা টেজ ক'রাবার ব্যবস্থা করে ফেলুন দেখি।

আর কেউ কথা বলবার আগে উপস্থিত উকিলদের মধ্যে একজন ব'ললেন—খুব টিকিট বিক্রী হবে—সাবজজবাবু বই দেখতে লোকে ছুটে আসবে।

বিজবাবুর চক্ষুগজ্জার বালাই ছিল না। তিনি উকিলবাবুকে ব'ললেন—আপনি তো কোনদিন আমাদের টিকিট কেনেন নি। এই বই দেখতে কিনবেন তো?

উপস্থিত উকিলবাবুবা সমস্তের জানালেন যে তাঁরা সবাই টিকিট কিনে সাবজজবাবুর বই প্রে দেখতে যাবেন।

এবার সাবজজবাবু আমাদের ব'ললেন—আপনারা দু'জনেই উকিল। ভাল করে বইখানা টেজ করিয়ে দিন। আমার দ্বারা আপনারদের অনেক সুবিধা হবে।

বিজবাবু সোৎসাহে ব'ললেন—কিন্তু আগে বইটা আমাদের মনের মত করে সাজিয়ে নিতে হবে, কিছু পরিবর্তনের দরকার হতে পারে।

সাবজজবাবু সোজায়ে উত্তর দিলেন—বেশ তো, যা যা দরকার ক'রে নেবেন। কিন্তু নাট্যকার বলে আমার নাম এ্যাডভারটাইজ্ করতে হবে।

বিজবাবু ব'ললেন—তা হবে। এই বিপন্নবাবু নাটক লখন্বে একজন পাকা লোক। উনিই বইখানা দরকার মত সাজিয়ে





ভুঁয়ে রিকাইট্ করবেন,
আর দরকাব হলে
আপনার সাহায্যও নেবেন।

এই কথার সংগে সংগে বিশ্বাবু আমার হাতে “মুক্ত
পারিজাত” তুলে দিয়ে সাবজজবাবুকে ব’ললেন—আমাদের
উপর আপনার নজর থাকে যেন।

সাবজজবাবু খোস মেজাজে উত্তর দিলেন—নিশ্চয়—নিশ্চয়।
আমরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সোজা উকিল লাইব্রেরীর
ছোট এক নিজ’ন কামরায় গিয়ে ব’সলাম। বিশ্বাবুর
ব্যবহারে তাঁর উপর আমার খুব রাগ হ’য়েছিল। কিন্তু
সাবজজবাবুর সামনে তা প্রকাশ করতে পারিনি, কারণ তাঁর
কোট্টে আমাকে কেসে ঝাঁড়াতে হত।

এবার বিশ্বাবুকে বললাম—আপনি এ কি কাণ্ড ক’রে
বসলেন? আপনার সব কাজে ছেলেমানুষী। যানমুনা

পেলাম তাতে ও বই কি রিকাইট্ ক’রে আমাদের টেজে
প্রে করা চ’লবে? আবার আবদার কত—দুর্গদাসবাবুকে
দিয়ে ক’লকাতার টেজে প্রে করাতে হবে।

সাবজজবাবুর ঘরে বসে বিশ্বাবু বইটার ছ’চার পাতা উল্টে
দেখেছিলেন। তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বইটা
টেনে তার এক আয়গা বার করে অভিনয়ের হুঁরে পড়তে
লাগলেন।

এখানে স্বর্গরাজ ইন্ড সেনাপতি কাভিককে বলছেন—
সেনাপতে, তুমি কণেক অপেক্ষা কর। আমি সাগরের
উত্তাল তরংগমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সৈন্তগণকে
আহ্বান করি।

সংগে সংগে হুঁজনে প্রাণ ভরে হেসে নিলাম। তারপর
বিশ্বাবু হঠাৎ গভীর হয়ে আমার হাতে বইখানা তুলে
দিয়ে ব’ললেন—বেশ হবে—এবার রিকাইট্ ক’রবার

পালা। একথা শুনে রাগে আমার
আপাদমস্তক জ’লে উঠল। আমি
বিশ্বাবুকে ব’ললাম—তামাসার কথা
নয়। এটা নাটক—না আর কিছু?
আপনি তো আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়ে
দিলেন। ঠিক কোট্টে আমার কাজ
থাকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে ছিলেন
যে এই বই টেজে নামান চ’লে না, তবুও
ওঁকে কথা দিলেন কেন? লাতের মধ্যে
ওঁর সংগে একটা বিবাদের সৃষ্টি হবে।
বিশ্বাবু তাঁর স্বাভাবিক হাস্যরসিকতার
সংগে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—
কোন চিন্তা নেই। প্রেও হবে না,
বিবাদও হবে না। উনি আর কত
দিনই বা এখানে থাকবেন? ওঁকে
আশায় আশায় তুলিয়ে রাখতে হবে।
বখনই তাগিদ দেবেন—তখনই বলতে
হবে—এমন হুম্মর প্রট্ কি সহজে
সাজান যায়? অনেক টাকা ব্যয় হবে।
খুব পরিশ্রমের সংগে সব টিক ঠাক না

বাবি রায় প্রযোজিত
পাথরভায়ে চিত্র প্রতিষ্ঠান(প্রা:) লিঃ এর প্রথম নিবেদন

সাবজজবাবু

কাহিনী
জ্যোতির্বিজ্ঞান বন্দী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
ভরুশেখ দত্ত
সঙ্গীত পরিচালনা
গোপেন হালদার

শ্রেষ্ঠাংশে
মঞ্জুলা • তপতী
কালী • নির্মল
তরুণ ও অমলক
সঙ্গীত
মন্দা • হেমন্ত
দ্রুত সঙ্গীতের মধ্যে



সম্পাদনা : সৌরেন গুপ্ত। চিত্রশিল্পী : গণেশ বসু।
শিল্প নির্দেশ : শচীন মুখার্জি। কল্পসজ্জা : রণজিৎ দত্ত।

করলে বইটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দেবী হ'চ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর গুঁর বদলী হবার সময় হ'লে ব'লতে হবে—তারি হুঃখিত—শেষ ক'রতে পারলাম না।

আমি বললাম—এতে লাভ কি ?

বিষবাবু চাপাগলার ব'ললেন—ভক্তলোক তাঁর প্রিয় উকিলদের রিসিভারি, কমিশানি দিয়ে অনেক টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন। আমাদেরও সেই সুবিধা ক'রে দিতে চাইছেন।

সেই রকম ইংগিতই তো পেলাম। এ সুযোগ ছাড়ি কেন ?

বিষবাবু সব তার আমার উপর দিয়ে স'রে প'ড়েছেন।

এখন আমার মহা বিপদ। সাবজজবাবু প্রায়ই আমাকে

ডেকে তাগিদ দিতে লাগলেন। সত্য কথা বলতে কি আমি

বইটার হুঁচার পাতা উন্টে দেখেছিলাম মাত্র। বিষবাবুর

উপদেশ মত আমি বাববার সাবজজবাবুকে খোক বাক্য

দিতে লাগলাম। এই ভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল,

কিন্তু আমাদের সাবজজবাবুর ষারা কোন সুবিধাই হল না।

এরপর সাবজজবাবু আমাকে নানা প্রকারে ভয় দেখিয়ে তাঁর

কাজ উদ্ধার করতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে

তিনি আমার সংগে অনেক অত্যাচার করতে লাগলেন।

একদিন তিনি এমন নীচতার পরিচয় দিলেন যা কোন

বিচারকের পক্ষে শোভা পায় না। একটি মোকদ্দমায় আমি

বাদীপক্ষে নিযুক্ত ছিলাম। শুনানির দিন তাঁর আদালতে

উপস্থিত হতে আমার মাত্র এক মিনিট দেবী হওয়ার তিনি

উকিলের অহুপস্থিতর অজুহাতে মোকদ্দমাটি খারিজ করে

দেন। এই বোধ হয় তাঁর আদালতে আমার শেষ উপস্থিতি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমি প'ড়লাম এক ইনকামট্যাক্স

অফিসারের কবলে। এই ভক্তলোক জাতিতে মুসলমান।

তিনি খুলনায় আসবার আগেই আমার নামে ইনকামট্যাক্স

খার্য হয়েছিল এবং তাঁর কাছে এই বিষয়ের জ্ঞান আমাকে

উপস্থিত হতে হয়েছিল। তখন তাঁর ব্যবহারে আমি খুবই

আনন্দ লাভ করেছিলাম।

এই ইনকামট্যাক্স অফিসার একদিন আমাদের নাট্যমন্দিরে

জানকী নাথ বহু রচিত "রঙিলা" নাটকের অভিনয় দেখতে

এসেছিলেন। তারপর দিন তাঁর অফিসে আমার ডাক

প'ড়ল। এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাঁর

কাছে হাজির হয়ে আলাপে বসতে পারলাম যে, তিনি খবর

পেয়েছিলেন আমি নাট্য মন্দিরের সংগে যুক্ত।

ভক্তলোক কটখরে আমাকে বললেন—আপনারা মুসলমানদের

মনে আঘাত দেবার জন্য

"রঙিলা" ই প্লে করেছেন।

মুসলমানদের দাড়ি তাদের

কাছে কত প্রিয়—তা আপনারা বুঝেও গেই দাড়ির অপমান

ক'রেছেন।

এতক্ষণে ভক্তলোকের অভিযোগের মর্ম বুঝলাম। "রঙিলা"

নাটকে এক মুসলমান নাহকের সংলাপে আছে—

—বৈচে থাক শালা দাড়ি।

এই ভূমিকার যিনি অবতীর্ণ

হতেন—তিনি সুন্দররূপসজ্জায় প্রকাণ্ড দাড়ি লাগিয়ে এমন

সুন্দরভাবে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করতেন যে—শ্রোতারা

মুগ্ধ হয়ে করতালি দিতেন। আমাদের অনেক সত্য ও

পৃষ্ঠপোষক মুসলমান ছিলেন এবং তাঁরাও "রঙিলা" নাটকের

অভিনয়ে আমাদের মতই মুগ্ধ হতেন। মনে করলাম এই

ভক্তলোকের মন অতি সংকীর্ণ।

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলাম যে আমরা সাম্প্রদা-

য়িকতার বাইরে। মুসলমানদের মনে আঘাত দেবার কোন

উদ্দেশ্যই আমাদের থাকতে পারে না।

তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে ব'ললেন—

—বৈচে থাক শালা দাড়ি—

বারবার এই কথাটি কি মুসলমানের মুখ দিয়ে বাব

না ক'রলে চ'লত না? যেমন শরতান ঐ বইয়ের লেখক

ডেমনি শরতান আপনারাও এ্যাটর্নি। জানকী নাথ বহু

ছিলেন অনামধত্ত নাট্যকার অপরেণশক্ত মুখোপাধ্যায়ের

অভয়ংগ বন্ধু এবং তাঁর রচিত অমূল্য নাটক "কর্ণাজুনের"

গানের স্বরকার। জানকীনাথের পরিবারের সংগে আমি

যদিষ্ট আত্মীয়তা স্নেহে আবদ্ধ। তাঁকে ঐ রকম বিশেষণে

ভূষিত করার প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম—এ বই বছরদিন

কলকাতায় প্লে হয়েছে। কারও মুখেতো এ রকম আপত্তি

শোনা যাইনি।

ভক্তলোক আর কোন কথা ব'ললেন না। আমি নমস্কার

জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এর কিছুদিন পর ঐ ইনকামট্যাক্স অফিসার আমাকে তাঁর

অফিসে যাবার জন্য অহরোধ জানালে আমি তাঁর সংগে

দেখা করলাম। এবার ভক্তলোক বেশ খোসমেজাজে

আমার হাতে একখানি পাতুলপি দিয়ে ব'ললেন—

আমি এই "কারবালা" নাটকটি লিখেছি। এটা আপনারা

থিয়েটারে প্লে করার ব্যবস্থা ক'রলে সন্তুষ্ট হব। পড়ে

দেখবেন "রঙিলা"র মত বাজে বই নয়।

আগেই ব'লোছি এঁদের কোণ দৃষ্টিতে পড়লে বিপদ আছে।

তাই বিনীত ছাত্রের মত নমস্কার জানিয়ে বইখানি নিয়ে

চেষ্টা ক'রব বলে বোরসে প'ড়লাম। এর কিছুদিন বাদে

ভক্তলোক বদলি হয়ে যান, আমিও রেহাই পাই।



৩পুজার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।
সব ইতিকথার পরের কথা "শহরের ইতিকথা"

কেমিরা ফিল্মস-এ
নিবেদন



উত্তম
হালা
অভিনীত

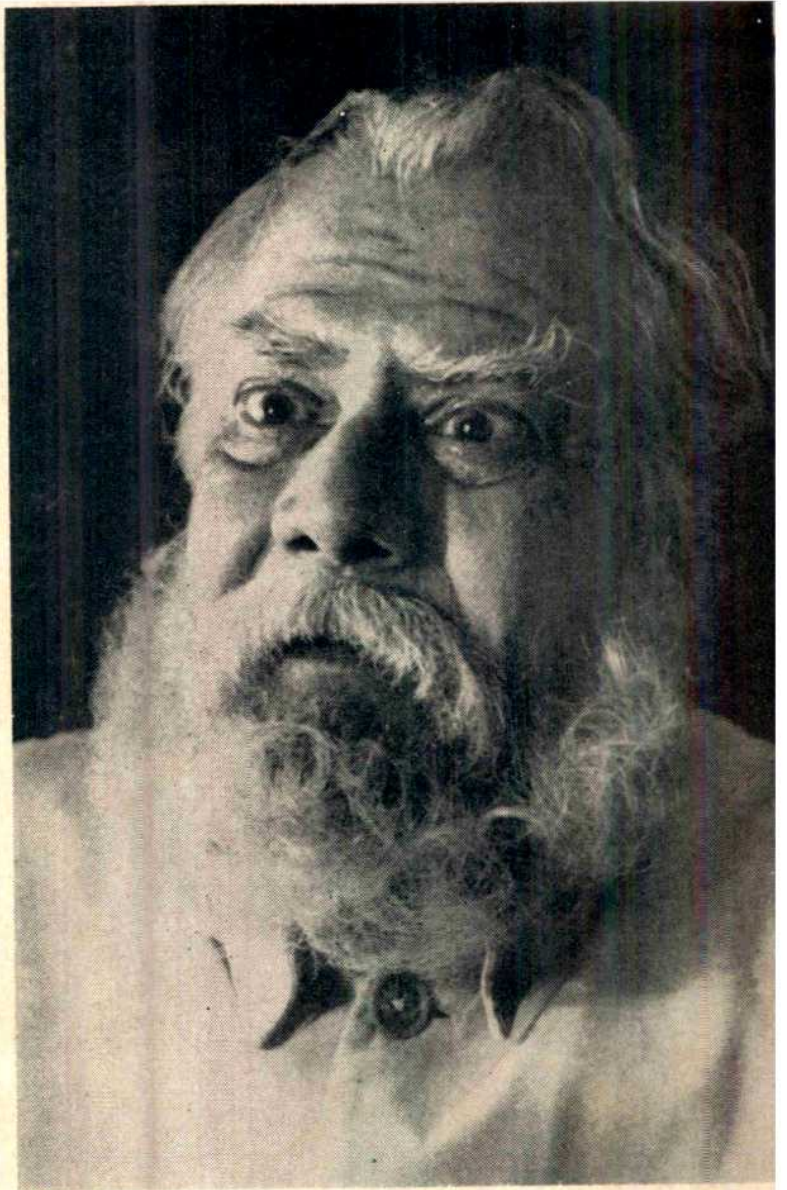
শহরের ইতিকথা

• পরিচালনা • বিশু দামগুপ্ত • সঙ্গীত • স্বপ্নীন চ্যাটার্জী •

পরবর্তী আকর্ষণ।

রাধা • পূর্ণ • প্রাচী

রূপ-সংক
একবিংশতি বর্ষ
শারদীয়া
১৩৩৭
০০০

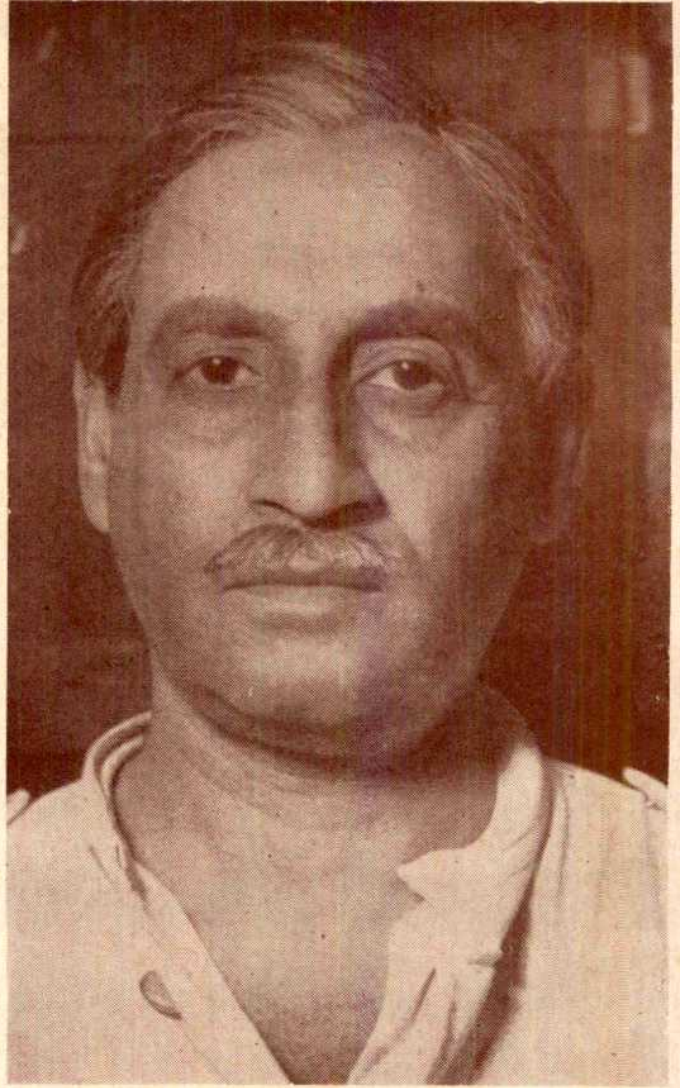


নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র : বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের অবি-
স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি “সেতু” নাটকের রূপ-সজ্জায়।
বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে ‘সেতু’ সরকার
ভ্রাতৃবর্গের এক উল্লেখযোগ্য অবদান! ———

শ্রীহাগীর লক্ষ বসু যন্ত্রিক

১২নং ৬৮ লিংটান স্কোয়ার,
কলিকাতা-১৩

ভা ১৩



গিরিশ থিয়েটারের সর্বপ্রথম নাট্য নিবেদন সলিল
সেন রচিত বিরাট ভাবধর্মী নাটক “ডাউন ট্রেনের”
তিনজন প্রতিভাধর অভিনেতা। উপরে বাদিকে :
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নীচে : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
ও ডাইনে রাধামোহন ভট্টাচার্য।

ছায়া ছবির পরিচয়-লিপি

ছায়া ছবির পরিচয়-লিপির রহস্তোদ্ঘাটন করেছেন ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরীর সর্বাধ্যক্ষ

রসায়নগারিক শৈলেন ঘোষাল

সবাকিছমে "টাইটেল" বা পরিচয়পত্রের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য নির্ধারকিছরের তুলনায় অনেক ক'মে গেছে। এখন চেষ্টা করা হয় কত কম সংখ্যা পরিচয়পত্র দেওয়া যায়। সংখ্যায় কম হ'লেও, এখন প্রায় সকলেরই দৃষ্টি গেছে ছবির সংগে "টাইটেলের" আকৃতি ও প্রকৃতির যোগসুত্র স্থাপনের চেষ্টা করা। অনেক ক্ষেত্রে ছবির "মুদ্র" ও বস্তব্য বিষয়ের সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিচয়পত্র দেখান হ'য়ে থাকে। ছোটো উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে (১) চালি চ্যাপলিনের "মডার্ন টাইমস্" বীরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তার "টাইটেল"। একটা বড় বড়ির ওপর দিয়ে "টাইটেল" চলছে,—৮টা বাজতে "২"মিনিট বাকি। "টাইটেল" শেষ হ'তেই ঢং করে ৮টা বাজলো, আর তার সংগে সংগে দেখান হ'ল একপাল তেঁড়া একজন লোক তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এর পরের "স্ট্র" একদল কারখানার লোক "ক্যাকটারীর" গেটের ভিতর ঠেলাঠেলি করে চুকছে।

(২) "গুড-আর্থ" ছবি চাষীদের জীবনী, তাদের প্রাণ হচ্ছে অগ্নি আর আকাশ, উর্বরজমি আর আকাশের জল, তাই টাইটেল বা পরিচয়পত্রে দেখতে পাই—ক্ষেতের ওপর দিয়ে তেলে চ'লে আকাশে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। এ ছাড়া "লাইট কমেডি" বা হালকা ধরনের হাসির গল্পে টাইটেল—সাদার ওপর কালো লেখা, আবার—"ক্লাইমস্" বা অপরাধমূলক ছবিতে কালোর ওপর সাদা লেখা সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, ছায়া-ছবির নির্মাতারা ছবির বস্তব্য বিষয়ের কিছুটা রূপ "টাইটেল" দেখিয়ে দর্শকদের বোঝাবার চেষ্টা করে থাকেন। এবার "টাইটেল" কেমন ক'রে তোলা হ'র

সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেওয়া হচ্ছে।

পজিটিভ—নেগেটিভ টাইটেল

নেগেটিভ-টাইটেল থেকে সাধারণতঃ প্রিন্ট করে পজিটিভ টাইটেল করা হয়। আবার প্রিন্টিং পদ্ধতিতে না গিয়ে সোজা ক্যামেরার মাধ্যমে পজিটিভ টাইটেল তোলা যায়। এব জে পজিটিভ কিংবা সাউণ্ড ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, আর ক্যামেরার ফিল্ম এমন ভাবে পরাতে হয়—যাতে ফিল্মের ইমালসানের দিকে এক্সপোজার না ঘেয়ে যেদিকে ইমালসান নেই সেইদিকে "এক্সপোজার" থাকে। এতে যদিও টাইটেলের সাদা ও কালোর জায়গার ফিল্মে কালো ও সাদা আসবে, তবুও পর্দায় কিছু টাইটেল সোজা হ'য়ে পড়বে। এই রকম ভাবে টাইটেল তোলার অনেক সময় দরকার হ'য়ে পড়ে। কিন্তু প্রায় সাধারণ ক্ষেত্রে "টাইটেল" "নেগেটিভ" করে তোলা হ'য়ে থাকে, আর নেগেটিভ ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এই নেগেটিভ টাইটেল ছবির মূল নেগেটিভ ফিল্মের শুরুতে জোড়া থাকে। পুরোছবির পজিটিভ কপির সংগে এর প্রিন্ট আমরা পর্দায় দেখতে পাই।

টাইটেল কার্ড

টাইটেল কার্ড,—যে লেখার ছবি ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়। টাইটেল দেখা কার্ডের ওপর কিংবা অল্প কাঁচের ওপর লেখা যেতে পারে। কার্ডের লেখার ছবি তুলতেও তাকে আলোকিত করতে সামনে থেকে আলো প্রয়োগ করতে হয়, কিন্তু কাঁচের ওপর লেখাকে আলোকিত করতে গেছন থেকে আগের-প্রয়োজন। কাঁচের-লেখার ছবি তোলার অনেক স্থিতি আছে, কিন্তু স্বাভাবিক এই



পছন্দের ব্যবহার খুব কম, তুলতে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।
 ছবিদের মধ্যে বলা যেতে কার্ডে কিংবা কাগজের ওপর লেখা ছ'রকমের হতে পারে।
 পারে, এতে খুব কম হাতে লেখা বা প্রিন্টিং প্রেসে। হাতে লেখায়, সাদা
 আলো লাগে, সাদা—কালোর ব্যবধান খুব ভাল পাওয়া কাগজের ওপর কাল কালি, আর কাল কাগজের ওপর
 বাহ, আর সব থেকে ছবিধে এই যে, এতে কখনও সাদা রং ব্যবহার করতে হয়। প্রিন্টিংএর ক্ষেত্রে, সাদা
 অক্ষরের চারিধার ঝাণসা হয় না, বা কার্ডের লেখায় ছবি কাগজের ওপর কাল কালির প্রিন্ট, আর কাল কাগজের

শুভমুক্তি আসন্ন !

স্মৃতিচুক

থাক

অধ্যাপক ডুমিকায় - অসিতবরণ - বিকাশ রায়
 ছবিবিদ্যাস অনিল চ্যাটার্জি ও স্যার ইন্ড্রজিৎ
 পরিচালনা - অ্যান্ড
 মুদ্রাঙ্কিত - রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 টাইপ - বিজয়দেব সিংহদাস - প্রিন্ট - অধ্যাপক জিতেন্দ্র

**রূপবাণী : অরুণা : ভারতী ও শহরতলীর
 অজান্ত চিত্রগৃহে**

ওপর এলুমিনিয়াম বা সাদা রং। এই এলুমিনিয়াম বা সাদা রংএর একরকম পাতা পাওয়া বাহ, যে পাতা গরম হ'লে যে কোন কাগজের ওপর আঠার মত ধরে যাবে। কাল কাগজের ওপর এই পাতা পেতে দিয়ে তার ওপর প্রিন্টিং প্রেসের খুব গরম করা অক্ষরের করমা চেপে ধরলে অক্ষরগুলির আয়গার এলুমিনিয়াম বা সাদা পাতা আঠার মত কাল কাগজের জুড়ে যাবে। এরপর গরম টাইপ তুলে নিয়ে কাগজ ঝেড়ে ফেললে দেখা যাবে, শুধু সাদা অক্ষরগুলি কাল কাগজে এটে গেছে আর সব আয়গার সাদা পাতা ক'রে পড়ে গেছে। কাল কাগজে সাদা লেখা, কটোগ্রাফিক পেপার দিয়ে হতে পারে। "একো" বা যে কোন কটোগ্রাফিক পেপারের ওপর কাল কালির প্রিন্ট করার পরে কটোগ্রাফিক পেপারকে আলো খাওয়ান হল। এখন এই পেপার ডেভেলপিং সলুইশনে ডেভেলপ করলে সমস্ত কাগজ কালো হয়ে যাবে কিন্তু কালো-কালির লেখার তলার আলো থাকে না ও ডেভেলপিং হবে না। এই কালো কালি—এমন জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে বা "বেনজিন" বা কোন সলুইশনে ধুয়ে যাবে। "বেনজিনে" ধুয়ে দেখা গেল কালো কালি উঠে গেল, এরপর

“হাইপো” সমুহসানে ধূরে নিলে দেখা যাবে কালোর ওপর সাদা লেখা।

ফটোগ্রাফিক পেপারের ওপর আর একটা সোজা উপায়ে কালোর ওপর সাদা লেখা করা যায়। প্রথমে, টিফ কাগজে বা যে কোন স্বচ্ছ কাগজের ওপর কালো লেখা ছেপে নিয়ে, তাকে ফটো পেপারের ওপর নেগেটিভ প্রিন্টের মত করে প্রিন্ট করা হয়। তা বলে কালো লেখাগুলি ফটোপেপারে একসংশোধার থাকে না। এখন এই পেপার ফটোপ্রিন্টের মত ডেভেলপ করলে দেখা যাবে কালোর ওপর সাদা লেখা। কনট্রাস্ট ও গ্রিসি পেপার ব্যবহার করলে খুব ভাল ‘টাইটেল’ হবে।

টাইটেল কার্ড-এর সাইজ (মাপ)—ক্যামেরার স্তব্ধের অঙ্কে টাইটেলের মাপ সব থেকে ছোট ধরলে ৫ ইঞ্চি X সাত ৬ ইঞ্চি ও বড়ের মাপ ৮ ইঞ্চি X ১০ ইঞ্চি। এটা টাইপ প্রিন্টের ক্ষেত্রে। হাতে লেখার ক্ষেত্রে এর মাপ বাড়তে হবে। টাইটেল কপি সওয়া ৬, সওয়া ৮ এই হিসাবে বড় করা হয়ে থাকে।

অক্ষরের চেহারা—ইংরাজী অক্ষরের অনেক রকম চেহারা দেখা যায়, যদিও খুব বেশী চলে “প্যাস্টেন” টাইপ। অক্ষরগুলির নাম যথাক্রমে, স্ক্রেনির, চেল্টেনহাম বোল্ড, রোম্যান, ক্লাস্টার ইটালিক, ভাশানাল ওল্ড টাইল, প্যাকার্ড, পোষ্টমোডার্ন ও বুকম্যান।

বাংলায় হাতে লেখার অনেক রকম অক্ষর দেখা যায় তার সব নাম এখানে দেওয়া নিম্নোক্ত। সাধারণতঃ একটা ছবিতে পরিচয়-পত্র আরম্ভ করে ছবির শেষ পর্যন্ত একই ধরনের টাইটেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

টাইটেল তৈয়ারী বস্ত্রপাতি—টাইটেল তুলতে মুখ্য দরকার দুটা জিনিষ—(১) ক্যামেরা (মোটর চালিত আর একটা জায়গায় শক্ত করে বসান থাকবে।)

(২) “ইজেল” কাঠের ফ্রেম, যে ফ্রেমের ওপর টাইটেল কার্ড বসান হবে। ফ্রেমের যে জায়গায় কার্ড বসবে সে জায়গাটা কার্ড সমেত যেন ওপর-নীচ, এখার-ওখার ইচ্ছামত সরান যায়, আর সমস্ত কাঠের ফ্রেমটা যেন ক্যামেরার দিকে এগিয়ে বা ক্যামেরা থেকে ধূরে সরানোর বন্দোবস্ত থাকে।

ক্যামেরা ও ইজেল হরকম ভাবে বসান যায়। (১)

ক্যামেরা ওপরে আর তার তলায় ইজেল—টিক এন্টার্জাবের মতন। (২) ক্যামেরার সামনে ইজেল—যেমন ভাবে স্থিরচিত্র তোলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ক্যামেরার সামনে “ইজেল” যেখা টাইটেল তোলা হয়ে থাকে।

সব থেকে ভাল “লেদবেল্ড”। ক্যামেরা ও ইজেলকে লেদমেনসিনে এমনভাবে বসান যায় যাতে ক্যামেরা এক জায়গায় থাকলে আর ইজেলকে দরকার মত ক্যামেরার দিকে এগিয়ে বা ক্যামেরার থেকে ধূরে নিয়ে বাওয়া যাবে। এখানে ইজেলটা এক জায়গায় বেঁধে ক্যামেরাকে এগিয়ে বা পিছিয়ে কাজ করাও চলতে পারে।

ক্যামেরা

টাইটেল তোলার ক্ষেত্রে যে ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে তার “মেকানিকাল” অবস্থা যেন খুব ভাল থাকে নয়ত পর্দায় টাইটেল কাগজে পাবে। মোটর চালিত হবে, আর কেত্-আউট, ফোক্স, ডিফল্ড, ফিল্মকে নীচের থেকে ওপরে কিংবা ওপর থেকে নীচে চালানার এইসব বন্দোবস্ত থাকা বিশেষ দরকার।

টাইটলে আলোর বন্দোবস্ত

সাদা-কালো টাইটেলের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রিক-মার্ক, মারকারি-তেপার ও ট্যাংগেটেন বাল্ব ব্যবহার করা হয়। রঙীন টাইটেলের ক্ষেত্রে শুধু আর্ক বার ট্যাংগেটেন বাল্ব ব্যবহার হয়ে থাকে। সাদা-কালো টাইটেলের ক্ষেত্রে “মারকারি-বাল্ব ব্যবহার করা সব থেকে ভাল। কারণ, এতে ল্যাম্পের উত্তাপ কম হয় আর টাইটেল কার্ডকে নিখুঁতভাবে আলোকিত করা খুব সহজ। “আর্ক ল্যাম্প”ও খুব ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এতে উত্তাপ একটু বেশী হয় আর কার্ডকে নিখুঁতভাবে আলোকিত করতে একটু সময় লাগে। “ট্যাংগেটেন ল্যাম্প” শুধু নেগেটিভ ফিল্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে—কারণ, পজিটিভ ফিল্মের ক্ষেত্রে এত বেশী আলোর প্রয়োজন যে অনেক সময় বেশী আলো

পি.কে.ফিল্মসের নিবেদন
আনন্দকিশোর মুখার্জির

বায়বাহার



প্রদীপ • মাল্য • জহর গগৈঃ • বেনুকা • জীবন •

• ভানু • জহর বায় • সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বল্লভ)

পরিচালনা

সংগীত

সম্পাদিত

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় • সলিল চৌধুরী



• মুক্তিলাভা ফিল্মজ

শহরের অভিজাততম চিত্রগৃহে
৩পুজার অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাবে

প্রয়োগ করেও দেখা যায় একস্পোজার কম হয়ে গেছে।

টাইটেল কার্ডকে সমান ও নিখুঁতভাবে আলোকিত করতে হলে কার্ডের দু'ধার থেকে দুটো আলো ফেলার দরকার। মারকারি তেপার ল্যাম্প দু'দিক থেকে দুটো ইউনিট, আর— টাইগস্টেন ল্যাম্প হলেও দুটো ইউনিট। একটা ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩ | ওটে করে রিস্ককটর সমেত ল্যাম্প দরকার হবে। স্বচ্ছ কাঁচের টাইটেল-এ পেছন থেকে “মারকারি তেপার” ল্যাম্পের চেহারা হওয়া উচিত ‘এম’ কিংবা ‘ইউ’-এর মত, আর ল্যাম্পের সামনে থাকবে একটা “ওপেল গ্লাস”, তা হলে নিখুঁত আলো পাওয়া যাবে।

একস্পোজার—ফিল্মের ওপর টাইটেলের একস্পোজার এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ ডেভেলপিং-সময়ের মধ্যে টাইটেল ডেভেলপ হয়। একস্পোজার কমান বা বাড়ান যায় ক্যামেরার “এপারচার” অথবা “স্পিড” কমিয়ে বা বাড়িয়ে। একই “এপারচারে” ক্যামেরার “স্পিড” বাড়িয়ে দিলে একস্পোজার কম হবে আবার “স্পিড” একই রেখে “এপারচার” ছোট করে দিলেও ওই একই কথা। সব থেকে ভাল টাইটেল হয়—যদি কিছুটা এপারচার ছোট আর “স্পিড”ও একটু কমিয়ে তোলা হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোন দৃশ্যের ওপর টাইটেল—কোন শিল্পীর আঁকা ছবি বা কোন দৃশ্যের স্থির চিত্র কিংবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চলন্ত ছবির ওপর দিয়ে টাইটেল দেখাতে হলে সাধারণতঃ নজর রাখা হয় যাতে দৃশ্য থেকে টাইটেল স্পষ্টতর থাকে। অর্থাৎ টাইটেলের পেছনের দৃশ্য এমন হবে—যাতে দর্শকদের টাইটেল পড়তে কোন কষ্ট হবে না অথচ দৃশ্যটাও তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন। দৃশ্যটা এমন চাপা থাকবে—যাতে দর্শকদের নজর দৃশ্যের ওপর না গিয়ে টাইটেলের ওপর থাকে।

কেমন করে তৈরী হয়

- (১) টাইটেল কার্ড লেখা হ'ল, সাধা কার্ডের ওপর কাল লেখা।
- (২) কার্ডকে পজিটিভ ফিল্মের ওপর ছবি তোলা হ'ল।
- (৩) দৃশ্যের নেগেটিভ ফিল্ম থেকে একটা “মাটির পজিটিভ”

তৈরী করা হ'ল।

(৪) একই “ডুপ্লিকেট নেগেটিভ” ফিল্মের ওপর

প্রথমে (৩) নং অল্পস্বত দৃশ্যের পজিটিভ ফিল্ম দিয়ে প্রিন্ট করে ডাকে তখন ডেভেলপ না করে, নেগেটিভ ফিল্মটা ঘুরিয়ে সোজা ক'রে, আবার তার ওপর (২) নং অল্পস্বত কার্ডের পজিটিভ এ তোলা ছবি দিয়ে প্রিন্ট ও ডেভেলপ করলে তাতে দেখা যাবে—দৃশ্যের ওপর টাইটেলের নেগেটিভ চেহারা। এবার এর প্রিন্ট এ আমরা পাই দৃশ্যের ও টাইটেলের পজিটিভ রূপ।

টাইটেলের পেছনের দৃশ্য যদি স্থির হয় তাহলে ক্যামেরার মাধ্যমে একই নেগেটিভ ফিল্মের ওপর দৃশ্য ও টাইটেল দু'বার পৃথকভাবে একস্পোজার দিয়ে তোলা যায়। এখানে দৃশ্য ও টাইটেলের একস্পোজার কমিয়ে বা বাড়িয়ে ঠিক করে নিতে হবে, যাতে দুটোর সমতা ঠিক থাকে। ত্রিটিং কিংবা ক্যামেরা যে কোনও পদ্ধতিতে দৃশ্যের ওপর টাইটেল দেখাতে হলে, সাধারণ নিয়ম এই যে ফিল্মের ওপর দৃশ্যের একস্পোজার আগে দিতে হবে, তারপর টাইটেল।

বিলিফ টাইটেল—অনেক সময় টাইটেলের অক্ষরগুলি স্পষ্টতর করার জন্তে সমস্ত অক্ষরগুলির ধারেধারে গাঢ় রংএর “সেড” দেওয়া হয়। ঠিক মনে হবে যেন প্রত্যেক অক্ষরের একই দিকে ও একইভাবে তাদের হাওয়া পড়ছে। যে রংএর “সেড” দেওয়া হয় সেটা কাল বা কাগজএর রং থেকে গাঢ় হ'য়ে থাকে।

ফুল বা ক্রিপার টাইটেল

সাধারণতঃ টাইটেলের লিখিত বিষয় খুব বেশী হ'লে, যা কার্ডের তেতর সমস্ত বিষয় লেখার অস্থবিধা, সে সব ক্ষেত্রে ফুল বা ক্রিপার পদ্ধতিতে টাইটেল তোলা হয়। পর্দায় টাইটেল দেখলে, দেখা যাবে, টাইটেলের প্রত্যেকটা লাইন এক এক করে পর্দার নীচে থেকে আবির্ভাব হয়ে পর্দার ওপরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দেখতে খুব ভাল হয়, যদি টাইটেলের প্রত্যেকটা লাইনের পর্দায় আবির্ভাব ও অস্তধানের সময় একটু ফেডইন ও ফেড-আউট করে দেওয়া



যায়। ক্যামেরার ওপর ও নীচে টাইটেল ফটোগ্রাফ করার সময় "ভিগনেট" দেওয়া থাকলে ওই রকম একেই পাওয়া যাবে। এই রকমের টাইটেল তুলতে গেলে, টাইটেল লিখতে হয় একটা লম্বা কাগজের ওপর, সেই টাইটেল লেখা কাগজ একটা বড় কাঠের ড্রামে জড়ান থাকে। ক্যামেরার ছবি তোলায় সময় এই ড্রামটাকে আন্তে আন্তে নীচে থেকে ওপর দিকে ঘোরাতে প্রত্যেকটা লাইন ক্যামেরার নীচে থেকে ওপর দিকে চলতে থাকবে ও ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে। ড্রাম যাতে একই 'স্পিডে' ঘোরে—সে অঙ্কে যাতে না ঘুরিয়ে ইলেকট্রিক মোটরে ঘোরাই ভাল। মোটরের স্পিড বেশী, তাই ড্রামের স্পিড কমায় অঙ্কে ব্যবহার করা হয় ছোট থেকে বড় "পুলি"র সমন্বয়।

ছবির ওপর বিদেশীয় ভাষার টাইটেল প্রয়োগ-পদ্ধতি

ভারতীয় ভাষার ছবি বিদেশে আনকাল অনেক যাচ্ছে এবং সেখানে দেখানো হচ্ছে। ছবির মূল বিষয়বস্তু যাতে

বিদেশীয় ভাষাভাষীরা বুঝতে পারেন, তার অঙ্কে সমগ্র ছবির ওপর, অতি প্রয়োজনীয় আমাদের ভাষার, সেই দেশীয় ভাষার রূপান্তরিত টাইটেল প্রয়োগ করা হয়। এই সকল বিদেশীয় ভাষার টাইটেল ছবির যতটা সম্ভব নিম্নভাগে ছাপা হয়ে থাকে। বিদেশে ছবির তৈরী প্রিন্টের ওপর টাইটেল বসানোর জু'এক রকমের পদ্ধতি আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রিন্ট করার আগে পুরো ছবির টাইটেল তুলে এবং তাকে সাউন্ড নেগেটিভের সাথে এডিট করে নেওয়া হয়। তারপর প্রিন্টিং মেশিনে পিকচার নেগেটিভের পেছনে টাইটেলের নেগেটিভ আর এই ছোটো নেগেটিভের ওপর পতিতিত ফিল্ম চাপিয়ে প্রিন্ট করা হয়। এরপর প্রিন্ট করা ফিল্ম, ডেভেলপ করলে দেখা যাবে ছবির ওপর টাইটেল। সমগ্র ছবির প্রয়োজনীয় ভাষার সাথে সাথে বিদেশী ভাষার টাইটেলগুলি দেখান হয়।

টাইটেল একেকটু

টাইটেলকে নানারকম ভাবে দেখাতে হ'লে, অশটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিন ব্যবহার করা হয়। অশটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিনে অনেক রকমের টাইটেল ও মূল ছবির ট্রিক্সটস্

সত্যিই চ'ড়ে আনাম...



সাইকেল

মডেল :

- সুপার ডিয়ার
- রোডস্টার
- সানিট
- হোচিবের জয়

ইণ্ডিয়া সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা

করে নেওয়া যায়। এই অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিন সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল। অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিন ছাড়াও কতকগুলি সোজা ও সাধারণ ট্রিক্ ক্যামেরা ও সাধারণ প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে করে নেওয়া যায়। যেমন :—

ওয়াইপস

একটা টাইটেলকে ওপর থেকে, নীচে থেকে বা যে কোন পাশ থেকে, মুছে ফেলে পরবর্তী টাইটেলের আবির্ভাব। টাইটলে “ওয়াইপ” ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে ছবির বিষয় বস্তু ক্ষত ঘটনাপূর্ণ, যেখানে প্রতিটি টাইটেল কার্ড এ প্রচুর লেখা থাকে অথচ “ফল” ব্যবহার করা হচ্ছে না, যেখানে ছোটো টাইটেল পর পর তাড়াতাড়ি দেখাতে হচ্ছে, কিংবা যেখানে টাইটেল পরবর্তী দৃষ্ট মিশে যাচ্ছে। টাইটেল ওয়াইপ নেগেটিভ তোলার সময় ক্যামেরার কিংবা অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিনে ডুপ্লিকেট নেগেটিভের ওপর তোলা যায়। যে কোন পদ্ধতিই হোক ক্যামেরার সামনে একটা “ম্যাটি-বক্স” লাগান হয়। এই বক্সের ভেতর “পার্টি-সানস্” আছে—বেগুন ইচ্ছা মত চারিধারে সরান যায়।

টাইটেল ফেডইন ও ফেড আউট

ফেডইন—অন্ধকার পর্দা থেকে আন্তে আন্তে টাইটেল অংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। P 36,184
ফেড-আউট—টাইটেল পর্দায় ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এগুলি ক্যামেরার করা হয়ে থাকে, অবশ্য যে ক্যামেরার টাইটেলের প্রতিটি ফ্রেমের অবস্-পোজার সমান ভাবে কমান বা বাড়ানর বন্দোবস্ত আছে। ক্যামেরার একস্-পোজার কমান বা বাড়ান যায় তিনটি উপায়ে যথা—(১) সাটার ঘুরিয়ে, (২) লেন্স ও টাইটেল কার্ডের মাঝখানে অপটিক্যাল ওয়েজ দিয়ে (৩) ভাষাকর্মটি ঘুরিয়ে। এর মধ্যে (১) নং প্রণালীই সব থেকে ভাল ও বেশী ব্যবহৃত হয়।

ল্যাপডিজলভ

যে কোন টাইটেলের শেষের কিছু অংশের ওপর পরবর্তী টাইটেলের প্রথম অংশের কিছুটা মিশ্রণের নাম “ল্যাপ-ডিজলভ” টাইটেল। টাইটেল থেকে ছাব ও হতে পারে।



এটা পর্দায় দেখাবে যেন একটা টাইটেল-এর অদৃষ্ট হবার ওপর দিয়ে অদৃষ্ট

টাইটেল বা ছবির ক্রমশঃ অবির্ভাব হচ্ছে। ল্যাপডিজলভ বা ডিজলভ টাইটেল, টাইটেল তুলবার ক্যামেরায় তোলা যায়, কিন্তু টাইটেল থেকে ছবিতে কিংবা চলন্ত ছবির ওপর টাইটেল ও তার ডিজলভ অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিনে কবরার দরকার হয়। টাইটেল যেখান থেকে ফেড-আউট করা হ'ল, কিম্বা সেইখানে পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে পরের টাইটেল বা ছবি ফেড-ইন করলে ডিজলভ পাওয়া যায়।

এনিমেশান টাইটেল

বেশীর ভাগ টাইটেল “ট্রিক্” “কার্টুন” ছবি তোলা প্রণালী নেওয়া হয়ে থাকে কিংবা অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে এমন ভাবে করা যায়—যার দ্বারা সব “ট্রিক্” অতি সহজ উপায়ে তৈরী হতে পারে। অপটিক্যাল প্রিন্টিং মেশিন ছাড়াও অনেক “ট্রিক্” ক্যামেরা টাইটেল বোর্ডের সাহায্যে করা যায়। যেমন “ডুম” “টাইটেল”—পর্দায় মনে হবে যেন টাইটেল দূর থেকে কাছে (ছোট থেকে বড়) কিংবা কাছে থেকে দূরে (বড় থেকে ছোট) আসছে বা যাচ্ছে। ক্যামেরার সামনে টাইটেল বোর্ডের ওপর টাইটেল কার্ড রেখে ক্যামেরার দেখা হ'ল—অক্ষরগুলি যতটা ছোট দেখান দরকার ততটা দেখাচ্ছে কিনা, দরকার হ'লে বোর্ডটাকে ক্যামেরা থেকে এগিয়ে বা পেছিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। এরপর টাইটেল সমেত বোর্ডকে ক্যামেরার সামনে এনে দেথতে হবে টাইটেল যতটা পর্দায় বড় দেখান দরকার—ততটা দেখাচ্ছে কিনা। ক্যামেরা থেকে বোর্ডের এই ছুটি দূরত্ব দাগ দিয়ে রাখা হ'ল। এখন হিগাব করে দেখা দরকার টাইটেলের ছোট থেকে বড় হয়ে আসাতে কতগুলি ছবির ফ্রেম কিম্বা ওপর প্রয়োজন। আমাদের জানা আছে ১৬ ফ্রেমে এক ছুট, ধরা থাক বাদ দু'ছুটে দেখলে ভাল হয়—তা হলে ৩২টি ফ্রেমের ভেতর ছোট থেকে বড় অবস্থায় টাইটেল শেষ হবে। এইবারে বোর্ডের দুটি দূরত্ব দাগ কে ৩২ ভাগে ভাগ করতে হবে।



এই প্রত্যেক ভাগের দাগে
বোর্ডে রেখে ৬ ক্যামে-
রার লেন্স ফোকাস করে

৩২টা ফ্রেমের একসপোজার এক করে দিতে হবে। তা হ'লে
দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বারেরই লেন্সের ফোকাস ঠিক করে
নিতে হবেই। টাইটেল ক্যামেরাতেও প্রত্যেক ফ্রেম যাতে
এক এক করে একসপোজার দেওয়া যায় তার বন্দোবস্ত
থাকে। কাছে থেকে দূরে দেখাতে হ'লে, শুধু বোর্ডকে
ক্যামেরার সামনে থেকে দূরে নিলেই হবে। টাইটেলের
“জুম” এফেক্ট কোন স্থিরচিত্রের ওপর দেখাতে হ'লে সোজা
উপায় হচ্ছে এই—সবুজ কাঁচের ওপর টাইটেল লেখা
আর তার পেছনে স্থির চিত্রের ছবি। এখন টাইটেল
ক্যামেরার সামনে বা দূরে সরিয়ে ছবি তুললে পর্দায়
দেখা যাবে টাইটেল ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে
ছোট হচ্ছে কিন্তু স্থির চিত্র একই অবস্থায় আছে।

স্পেল আউট

পর্দায় টাইটেলের প্রত্যেক অক্ষর পৃথক পৃথক করে দেখানর
নাম “স্পেল আউট” টাইটেল। তিনটি উপায়ে করা যায়।

যথা :—

- (১) প্রত্যেক অক্ষরের জন্য এক একটা আলাদা কার্ড
যাতে অক্ষরগুলি তাদের নিজনিজ ঘরে থাকে।
 - (২) যে টাইটেল বোর্ড এ প্রত্যেক অক্ষর সরান বা
যোগ করার বন্দোবস্ত আছে।
 - (৩) টাইটেল বোর্ডের লেখাগুলি প্রত্যেকটি অক্ষর কাল
পর্দায় ঢেকে এক এক করে খুলে যাওয়া।
- উপরোক্ত যে কোন পদ্ধতিতে দরকার হবে টাইটেল
ক্যামেরা যাতে একটীর পর একটা ফ্রেম আলাদা
একসপোজার দিয়ে ছবি তোলা যায়। প্রত্যেক ফ্রেমের
একই একসপোজার হওয়া চাই। এক একটা অক্ষরের
জন্তে ৪ থেকে ৬ ফ্রেমের প্রয়োজন। প্রত্যেক ফ্রেমের
আলাদা করে ছবি তোলার ইংরাজী নাম “ওয়ান-টার্ণ-
ওয়ান-শিকচার”। এই পদ্ধতিতে বহু রকমের “ট্রিক”
করা যায়। যেমন টাইটেলের শেষের লাইনটা পরে এসে
যোগ হল, জিজ্ঞাসার ছিঁ, সাদা ভূই ক্রমশ পরপর
এসে একজায়গায় দাঁড়াল—এ রকমের বহু ট্রিক দেখান
যায়। এর পরেরবারে অপটিক্যাল প্রিন্ট সহজে হলার
ইচ্ছে রইল।



ভীষ চন্দ্র নাগ

ভীষ চন্দ্র নাগ

৬-৮ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, ফোন-৩৪-৪৪৬৫
৮ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬



গিরিশ থিয়েটার

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬.০ টায় আর প্রতি
রবিবার ও ছুটির দিন সকাল
১০.০ টায়

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ
নিয়মিত অভিনয়
করছেন—

■ এক ■

বহু দিন আগের কথা—

আসমানীর জন্ম ইতিহাস কাহারও জানা নাই—সেদিনের সেই ছোট্ট বোবা ভিখারী মেয়েটি যেদিন যৌবন সমাগমে কল্লনাভীত স্তন্দরী হইয়া উঠিল—সেদিন বহু লোক পঞ্চাচারী ভিক্ষারতা এই মেয়েটির প্রসারিত হাত দুইটি স্পর্শ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত।

নহরের পুলের উপর যে কয়জন খজ্র ভিখারী বসিয়া বসিয়া অদৃষ্টকে বিচার দিত—তাহাদের মাঝে আসমানী অপক্লপ মহিমায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আশাতীত অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত। আসমানী কিন্তু সেই অর্ধ নিজের জন্ত সম্পূর্ণ ব্যয় করিত না, সন্ধ্যা সমাগমে প্রতিটি ভিখারীর হাতে কিছু কিছু জিয়া দিয়া দূরে সরিয়া পড়িত।

প্রকাশ্য দিবালোকে ঐলব বিরক্ত দেহ ভিখারীদের সংস্পর্শে থাকিতে সে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহাদের লালসাদীপ্ত চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য চারবাগ স্টেশনের স্তরক পথের মাঝখানে সে রাত্রিটা কাটাইয়া দিত। এটাই যৌবনের ধর্ম, যৌবন বৃদ্ধিতে পারে কলুষিত মনের পংকিল অভিযুক্তি। বাক-শক্তিহীন আসমানীও নিজের যৌবন সম্বন্ধে সচেতন ছিল। অবশ্য স্টেশনের সেই স্তরক পথের নির্জন পরিবেশেও বহু পদাভিকের কামাক্ত বাহুগল ঘুমন্ত আসমানীকে বেটন করিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু চীৎকার করিতে না পারিলেও আসমানীর তীক্ষ্ণ দন্তপংক্তির তীব্রতম দংশনের বিষজ্বালায় তাহাদের লালসাদীপ্ত মুখগুলি অব্যক্ত বেদনায় ভয়াবহ হইয়া উঠিত। তাহারা বলিত—আসমানী পাগল।

■ দুই ■

দিল্লী মহানগরীর কোন এক বর্ধিত পরিবারের স্তন্দরন যুবক নিশীথ মুখার্জী কার্যব্যপদেশে একদিন লখনউ আসিয়া-

সম্রম

আগামী দিনের বাংলা সাহিত্য জগতকে নতুন রং-এ রাঙ্গিয়ে নিতে রূপ-মঞ্চের মধ্য দিয়ে যে নবীন প্রতিভা কঠোর সাধনায় মগ্ন, বর্তমান গল্পটি উপহার দিয়েছেন সেই—

॥ স্মৃত চক্রবর্তী ॥

সমসাময়িক ধনী পরিবারের একমাত্র কুমারী স্তন্দরী বিদ্যুৎ কল্লার সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। নিশীথ কোন হোটেলে গেল না, স্টেশনের একখানা রিটারারিং রুম আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য ভাড়া করিল—সংগে ছিল তার নিজস্ব চাপরাশি হরিধন। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিশীথ যখন ক্লান্তপদে প্রান্ত মনে রিটারারিং রুমে ফিরিয়া আসিল—তখন রাত প্রায় আটটা। হরিধন চায়ের সংগে নানা রকম ফলমূল আর মিষ্টি সামনে রাখিয়া দিল।

নিশীথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কিরে লখনউ কেমন লাগছে—”

হরিধন জবাব দিল—“বাইরে না বেরুলে কি করে বলব, তবে স্টেশনটা ভারী স্তন্দর—”

নিশীথ বলিল—“কাল চলে যাব—আমি সকালে বেড়িয়ে গেলে তুইও সহরটা ঘুরে আসিস—”

হরিধন সভয়ে জবাব দিল—“না, ছজুর, আমি কোথাও যাব না—যদি হারিয়ে যাই, বিদেশে বিভ্রুয়ে আপনি বিপদে পড়বেন—”

“দুই পাগল, হারিয়ে যাবি কেন—এখানকার টাঙ্কাওয়াল-গুলো খুব ভদ্র, এদের বললেই ওরা সব দেখিয়ে গুনিয়ে আবার ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে—”

হরিধন আর কোন জবাব দিল না।

চা খাওয়া শেষ হইলে নিশীথ খুব ভাল করিয়া স্নান করিয়া লইল। তারপর গারে একটা দামী সিকের ড্রেসিং



গাউন চড়াইয়া ইজি-
চেয়ারে হেলান দিয়া
একটা বিলাতি ম্যাগা-

“পছন্দ অপছন্দের আমার কোন বালাই নেই, একটু পরে
তাকে নিয়ে আসিস, কত টাকা নেবে—”
“আপনি যা দেবেন।”

জিনের পাতা উন্টাইতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে হরিধন সোডার বোতল কাঁচের গ্লাস
ছোট ছোট বরফের টুকরো আর এক বোতল দামী
হুইস্কি রাখিয়া গেল।

নিশীথ খুশী হইয়া বলিল—“তুই কিছুই ভুলিস না দেখছি,
কিন্তু এখানে লুসিও নেই, রোজিও নেই। তার কোন
ব্যবস্থা করেছিল—”

হরিধন সলজ্জ হাসিয়া জবাব দিল—“করেছি হজুর, কিন্তু
আপনার পছন্দ হবে কিনা জানিনা।”

নিশীথ ব্যস্ত হইয়া বলিল—“যা, যা তুই তাকে নিয়ে আয়।
হরিধন চলিয়া গেলে নিশীথ এক পেগ হুইস্কি গেলাসে
ঢালিয়া সিপ করিতে লাগিল। তিন পেগ যখন শেষ হইল,
তখন তার নেশা ধরিয়া গিয়াছে। সে বারবার দরজার
দিকে তাকাইতে লাগিল—চোখে মুখে বিরক্তির ভাব—
একটু পরে দরজা ঠেলিয়া যাহাকে লইয়া হরিধন ঘরে ঢুকিল
তাহাকে দেখিয়া নিশীথ মুখার্জীর নেশা ছুটিয়া গেল—
সে বিরক্ত হইয়া হরিধনকে বলিল—“এ কাকে ঘরে নিয়ে
এলিবে হতভাগা—যা—এখনি, কিরিয়ে নিয়ে যা—”

হরিধন সাহস করিয়া বলিল—“ভাল
করে চেয়ে দেখুন হজুর—এত বয়স পর্যন্ত
কত সাহেবের খিদমৎ করেছি—কিন্তু
আজ পর্যন্ত এত সন্মরী মেয়ে চোখে
পড়েনি—”

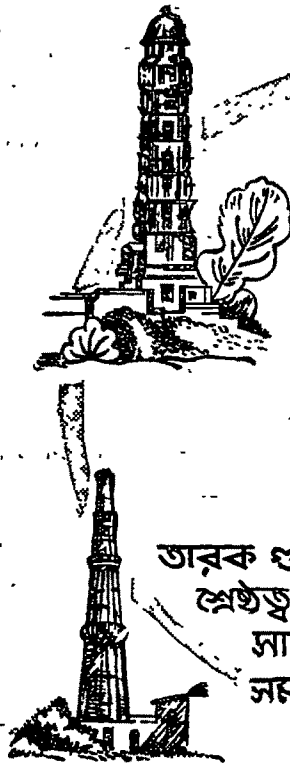
হরিধন এই বিদেশে কাহাকেও খুঁজিয়া
না পাইয়া আসমানীকেই ধরিয়া
আনিয়াছিল—

আসমানী বোবা-বিশ্বয়ে হতভম্বের
মত পাড়াইয়াছিল—পরনের শতচ্ছিন্ন
গাঞ্জবাস ভেদ করিয়া তার রক্ততপ্ত
অংগের অত্যাঙ্গল মন্থণতা যে কোন
পুরুষের মনে বিজয়ের সৃষ্টি করে—
মনে হইল আসমানী তিথারিণী নথ—
বাদশাহী আমলের কুড়িয়ে পাওয়া এক
রূপসী বেগম—মাখাময় ঝাঁকরা ঝাঁকরা
বিপর্যস্ত—রুদ্ধ চুলের রাশি—স্বপ্নাশ্রুত
জাতি দুটিতে শিশুহীনত বিশ্বয়—তরল
পানীয়ের জারবরসে পরিপূর্ণ ঢুলু ঢুলু
নয়ন দুটি বিফারিত করিয়া আসমানীর
দিকে তাকাইল নিশীথ মুখার্জী—
তারপর জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার

যুগ যুগ ধরে.....

যুগ যুগ ধরে ভারতের
শিল্প ও স্থাপত্যকলা মুষ্টি
কোরেছে সকলের কৌতুহল
ও বিস্ময়। সারা পৃথিবীতে
স্বীকৃত হয়েছে এর
নৈপুণ্য ও নতুনত্ব।

তারক গুপ্তের জর্দাও
শ্রেষ্ঠত্ব ও অডিনবত্তে
সারা ভারতে
সমাদৃত হয়েছে!




তারকগুপ্তের জর্দা কলিকাতা-৪

নাম কি—”

হরিধন বলিল—“ও কথা বলতে পারে না হজুর—বোবা—”
নিশীথ বিরক্ত হইয়া বলিল—“তুই বাইরে গিয়ে বসে থাক—
যতক্ষণ না ডাকি ততক্ষণ ভেতরে আসবি না—”

হরিধন বাহির হইয়া গেল—নিশীথ স্টকেস খুলিয়া একসেট
সিঙ্কের স্লিপিং স্টুট বাহির করিল—তারপর আসমানীর হাত
ধরিয়া বাথরুমে লইয়া গেল—আসমানী আপত্তি করিল না—
দংশন করিল না—যন্ত্র চালিতের মত নিশীথ মুখার্জীর
অনুসরণ করিল। বাথরুমে আসমানীকে সে ইংগিতে স্নান
করিয়া সেই স্লিপিং স্টুট পরিতে বলিয়া বাইরে আসিয়া
আর এক পেগ হইলি গেলাসে ঢালিয়া পুরোটাই গিলিয়া
ফেলিল—মিনিট পনের পরে আসমানী বাহির হইয়া আসিল
—পরনে তার ঢোলা ঢোলা পায়জামা আর কোর্ট—
নিশীথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর
আসমানীকে চেয়ারখানায় বসাইল—টেবিল হইতে চিরুণী
লইয়া তার রুক্ষ অগোছাল চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিল—
আসমানী নড়িল না—নিশ্চল পাথরের মত বসিয়া রহিল।
চুল আঁচড়ান শেষ হইলে টেবিল হইতে সেক্টর শিশিটা
লইয়া পুরোটাই আসমানীর সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিল—তারপর
তার হাত ধরিয়া নিশীথ দরজা খুলিয়া তাকে চলিয়া বাইরে
ইংগিত করিল—এইবার আসমানী বৈকিয়া বসিল—সে
দরজা সজোরে বন্ধ করিয়া সবগে মাথা নাড়িয়া বুঝাইতে
চেষ্টা করিল—যে সে বাইবে না—নিশীথ তাহাকে টাকা দিল
—ভাল ভাল খাবার দিল—আসমানী টাকাও লইল না—
খাবারও খাইল না। শুধু পরম আগ্রহে নিশীথ মুখার্জীর
হাতে নিজের স্বকোমল হাতখানি বুলাইতে লাগিল—এই
মুক মেয়েটির কোন কথাই নিশীথ বুঝিতে পারিল না—সে
ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল—আসমানীও তাহার কোলে
মাথা রাখিয়া নীচে বসিল—সেদিন চারবাগ স্টেশনের নিত্যক
রিটার্নিং রুমে একটি বাকশক্তিহীন মেয়েকে লইয়া নিশীথ
মুখার্জী বিব্রত হইয়াছিল একথা সত্য—কিন্তু যখন আসমানী
তার কোলে মাথা রাখিয়া অব্যক্ত বেদনার অভিমানে
ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিশীথ মুখার্জী বুঝিতে
পারে নাই—অপ্রত্যাশিত এ অশ্রু সঞ্চিত কারণ।

কত মেয়ে তাহার জীবনে

আসিয়াছে, টাকার বিনি-
ময়ে বিলাইয়া দিয়াছে

তাহাদের যৌবন। কিন্তু এই মুক ভিখারী মেয়েটি টাকা
চাহে নাই—তাহার উল্লসিত যৌবনকে ভোগের বস্তু
হিসেবেও নিশীথ মুখার্জীর নিকট তুলিয়া ধরে নাই।
শুধু ধনীর ছলান নিশীথ মুখার্জীর কোমল হৃদয়ের
অনাবিল পরশের অমূল্য সম্পদ বুকে রাখিয়া ফুলিয়া
কাঁদিয়াছে। এ যেন এক দুর্লভ অমৃতভূতি।
আসমানীর সামিথে যেন এক মোহময় স্বপ্ন। রাত একটা
বাজিয়া গেল। হরিধন ঘুমাইতে ছিল দরজার পাশে।
আসমানী বাহির হইয়া আসিল তৃপ্তির আনন্দে। কেহ
জানিল না—কাহাকেও সে কিছু বলিতে পারিবে না—এ
অনাশ্বাসিত তৃপ্তির স্বধবির বিবৃতি।

হরিধন উঠিয়া নিশীথকে জিজ্ঞাসা করিল—“খাবার গরম
করে দেবো হজুর।”

নিদ্রাঙ্গল আলস্তে নিশীথ মুখার্জী জবাব দিল—“নারে—আজ
আর কিছুই খাব না।”

তারপর নিজের ক্রান্ত দেহখানাকে এলাইয়া দিল
নয়ম বিছানায়।

। শ্রুতি ।

বছর দুই পরে—

নিশীথ মুখার্জীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জী বন্দনা স্কন্দরী,
কিছুদী, আধুনিকা। অর্থবান পিতার একমাত্র কন্যা। অর্থ-
বান স্বস্তরের একমাত্র পুত্রবধূ—তাই সে চির চঞ্চলা।
স্বস্তরের একখানা সাদা রং-এর ডবল গাড়ী, বাপের দেওয়া
একখানা স্পোর্টস কার, নিশীথের নিজস্ব একখানা ডি-
স্কোটো। বন্দনা খুব ভাল গাড়ী চালায়—গ্রাম অফিসের
পব নিশীথকে নিজের গাড়ী করিয়া লইয়া আসে।
দুইভার আছে—সে মানস মুখার্জীর গাড়ী চালায়। সেদিন
নিশীথ যখন অফিস হইতে বাড়ী আসিল—চঞ্চলা হরিণীর
মত উচ্ছল হাসিতে ঘর ভরাইয়া তুলিয়া বন্দনা বলিল—
“স্বথবর আছে, আমার কলেজের এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছে

কামিনীকম—ভি. অভয়গুপ্ত
'নাথো দি হাহানী' হবিছে—

সোনার মেয়ের
হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে...



সোনার মেয়ের হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে, শিউলী পাখে কোকিল
ডাকে, মনমাতালো করে... নাচিলে রূপের
বসের মধুর নাচছে অনেক দূরে !
লাগাময়ী চিত্রতারকা-কামিনী কমরের চোখে মূগ্ধ
আজ মধুর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমার
উল্লাসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কোনই বা হবেনা,
লাগবে কোমল পুরন যে আমি প্রতিদিনই
পেয়েছি' —কামিনীকম জানান তাঁর রূপ
লাগনের গোপন রহস্যটি।



আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,
সৌন্দর্য সাবান
হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

লখনউএ, যেতে বলেছে—চলনা ঘুরে আসি।”
 নিশীথ কি যেন চিন্তা করিল। কোন জবাব দিলনা।
 বন্দনা ভিজ্ঞাসা করিল—“কি হোল, জবাব দিচ্ছ না কেন?
 দিন পনেরর ছুটি নাও; চল ঘুরে আসি। আমরা
 হোটেলেরেই না হয় থাকব, এত করে লিখেছে—”
 নিশীথ নিকংসাহ ভাবে জবাব দিল—“এখন ছুটি পাওয়া
 সম্ভব নয়।”
 বন্দনা মুখ কালো করিয়া বলিল—“সম্ভব নয় কেন, ছুটিত
 তুমি নাওনা, লক্ষীটি চল না—”
 স্ত্রীকে নিশীথ অসম্ভব ভালবাসে। তার কোন আবদার
 সে অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু লখনউ যাইবার নামে কেন
 যে শংকিত হয়—বন্দনা বুঝিতে পাবে না। আরও দুই-
 বার লখনউ বেড়াইতে যাইবার জন্ত সে পীড়াপীড়ি
 করিয়াছিল, কিন্তু নিশীথ রাজি হয় নাই। আজ তাহার
 অভিমান হইল। সে একটা চেয়ারে নিরতিশয় অভিমানে
 মুখখানা ষথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল।

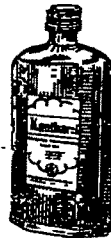
নিশীথ বুঝিতে পারিয়া
 হাসিয়া বলিল—“আচ্ছা
 ষাব, কিন্তু এখন নয়
 তারও মাস দুই পরে।”
 এক মুহূর্তে বন্দনার অভিমান ফুৎকাবে উড়িয়া গেল।
 সে আনন্দে নিশীথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—
 “এইত লক্ষী ছেলের মত কথা বললে। আমার বন্ধুটির নাম
 পার্বতী ব্যানার্জী। তার স্বামী স্ববীর, ব্যানার্জী বড় সব-
 বারী অফিসার। পার্বতী তোমায় দেখলে খুবই খুশী
 হবে—বিয়ের সময় সে থাকতে পাবেনি বলে কত
 দুঃখ করেছে।”
 নিশীথ কপট-গাম্ভীর্যে বলিল—“আমায় কিন্তু একটু আলগে
 বেখো। স্বন্দরী মেয়ে দেখলে আমার আবার জ্ঞান
 থাকে না। একটুতেই প্রেম নিবেদন করে বসি। তার
 ওপর আমার বিশ্বাস—আমার প্রেমকে কেউ অবহেলা
 করতে পারে না।”



ক্লিওপেট্রা ও কেতকী



ক্লিওপেট্রার ঘন চিকণ কেশগুলোর মূলে ছিল
 অলিভ অয়েলের নিত্য ব্যবহার। একালের
 কেতকীও-জ্ঞানেন যে, কেশবর্ধনে সহায়ক বলে
 হরিদিত অলিভ অয়েল এবং অন্ত্যস্ত
 উত্তম তৈলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ক্যাল-
 কেমিকোর ক্যান্ডারল
 কেশতৈল কেশবর্ধনে
 অপরিহার্য।



ক্যান্ডারল

অলিভ অয়েল সংমিশ্রণে প্রস্তুত
 একমাত্র সুগন্ধি ক্যান্ডারাইডিন কেশ তৈল
 দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯।





বন্দনা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কেন?”

“আমার চেয়ে স্বপুরুষ

আজও আমার চোখে পড়েনি বলে।”

বন্দনা হাসিতে হাসিতে বলিল—“তাই নাকি, কিন্তু পার্বতীর স্বামীও খুব স্বপুরুষ।”

নিশীথ আরও গভীর হইয়া বলিল—“তাহলেও বিপদ আরও বেশী। সেখানে গিয়ে আর কাজ নেই।”

“কেন—”

“ভূমি যদি পার্বতীর স্বামীর প্রেমে পড়ে যাও, তাহলে আমার গিয়ে হবে বল।”

বন্দনা হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—“না—গো—না তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আমার রুচি হবেনা।”

॥ চার ॥

তিন মাস পরে—

অফিসের কাজে নিশীথ মুখাজিকে লখনউ আসিতে হইল। বন্দনা ছাড়িল না, সেও সংগে আসিল। আর আসিল হরিধন। দুইদিনের জন্ত নিশীথ আস্তানা লইল রিটার্নিং রুমে। বন্দনার ইচ্ছা ছিল পার্বতীদের বাড়ী যাইবার জন্ত, নিশীথ কিন্তু কিছুতেই গেল না।

বেলা দশটার সময় বন্দনা চলিয়া গেল পার্বতীদের বাড়ী। নিশীথ গেল অফিসে। হবিধন ঘর পাহাড়ায় নিযুক্ত রহিল। অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া গেল। বেলা তিনটার সময় সে ফিরিয়া আসিল ষ্টেশনে।

রিটার্নিং রুমের একেবারে কাছাকাছি আসিতেই সে দেখিল—সম্মুখে আসমানী দাঁড়াইয়া আছে। কোলে তাহার দুই বছরের একটি শিশু। কন্দর্পকাস্তি নিশীথের মুখের আদোল বসান। নিশীথ আতকাইয়া উঠিল।

আসমানী তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। স্তম্ভ বিম্বিত স্কন্ধ সে দৃষ্টি। সে একবার চাহিল কোলের সেই শিশুর দিকে আর একবার নিশীথের দিকে, তারপর উদগত অভিমানে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া ছিল নিশীথ মুখার্জি। চোখ দু’টি তার ঐ শিশুর মুখের ওপর নিবদ্ধ। আশ্চর্য সাদৃশ্য। কিন্তু এই কি তার প্রথম সম্মানের পরিণাম! একবার ইচ্ছা হইল আসমানীর কোল হইতে ঐ শিশুকে কাড়িয়া লইয়া পালাইয়া যার। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে সেটা কি করিয়া সম্ভব! আত্মসম্মম বোধ, আভিজাত্য বোধ, বংশমর্যাদা—সব এক সংগে কোলাহল করিয়া উঠিল। আসমানী কাঁদিতেছিল। ধীরে ধীরে লোক জমা হইতে লাগিল। নিশীথের লজ্জা করিতে লাগিল।

হঠাৎ কাহার স্পর্শে তাহার সম্মুখে ফিরিয়া আসিল। দেখিল—তাহাকে স্পর্শ করিয়া বন্দনা দাঁড়াইয়া আছে।

সে বলিল—“এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, চল পার্বতী আর তার স্বামী ঘরে বসে আছে।”

আসমানী বন্দনাকে দেখিতে পাইল। তাহার চোখ দু’টি অকস্মাৎ বাধিনীর মত জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সেই শিশুকোলে আগাইয়া আসিল। বন্দনার একেবারে কাছে আসিয়া ঘূর্ণার সংগে তার সর্ব অংগে এক গাল খুঁ দিয়া দৃষ্ট ভংগীতে চলিয়া গেল। যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারা কলরব করিয়া উঠিল—

বন্দনা রাগে কাঁপিতে লাগিল।

নিশীথ ধীরে ধীরে বলিল—“চল, ঘরে চল। কাপড়টা বদলে নিলেই হবে। মেয়েটা পাগল। তার উপর রাগ করে কোন লাভ নেই।”

—ঃ সমাপ্ত ::—

SONOROUS

Dealers in MURPHY & H. M. V. RADIOS
CASH OR EASY INSTALMENTS

DECCA

MGM

208, RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA-29

কালসিটে

দীর্ঘ একশ বছর রত্ন-
সন্ধানীর নিরলস-সাধনায়
বাংলার শিল্প জগতের জন্ম
নতুন নতুন মহামূল্য রত্ন-



শেখরীত

সম্ভার উদ্ধার করেই রূপ-মঞ্চ ক্ষান্ত হয়নি—রূপ-মঞ্চের সন্ধানী-দৃষ্টি বাংলার বৃহত্তর সাহিত্যজগতেও রয়েছে নিবদ্ধ। দীর্ঘ একশ বছরের মধ্যে সাহিত্য জগতের নব নব প্রতিভা আবিষ্কারেও রূপ-মঞ্চ হয়েছে সার্থক। কিন্তু স্বামী কালিকানন্দ অবধূতের আবিষ্কারে রূপ-মঞ্চ শুধু তার সন্ধানী-দৃষ্টির সার্থকতার পরিচয়ই দেয়নি—বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই বিস্ময়কর প্রতিভার আলোকের স্পর্শে রূপ-মঞ্চ হয়েছে প্রদীপ্ত—হয়েছে গৌরবান্বিত। রূপ-মঞ্চের এই গৌরবদীপ্ত আবিষ্কার—বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা অবধূতের সর্বাধুনিক, সর্ববৃহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি ‘শার্শী’ মধ্য দিয়ে রূপ-মঞ্চ নতুন গৌরবের দাবী রাখে।

॥ এক ॥

হাত ধারে কাটে, নয় ভারে কাটে।

যার ধার নেই ভার নেই, এমন জিনিষের আঘাতে শুধু খেঁতলে যায়। কাটে না, রক্তপাত হয় না, কালসিটে পড়ে—জামড়া খেয়ে থাকে। কেটে কুটে রক্তপাত হওয়া অনেক ভাল, যন্ত্রণা ভোগটা সংগে সংগে শেষ হয়। কিন্তু খেঁতলে গিয়ে কালসিটে পড়লে ভোগান্তির একশেষ, দিনের পর দিন টাটিয়ে আড়ষ্ট হোয়ে থাকে। কিছুতে আর—খেঁতলাবার কথাটা ভুলতে দেয় না।

আচমকা হাত খেঁতলাবার যতগুলো ফাঁদ আছে ছুনিয়ায়, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয় রেলগাড়ীর জানালার শার্শী। অতি নিরীহ-দর্শন যন্ত্রটি। যখন খোলা থাকে জানালা, তখন শার্শী মোটেই দেখা যায় না, লুকনো থাকে জানালার মাথার ফ্রেমের ভেতর। জানালার পাশে খাঁজের মধ্যে আছে ছোট্ট একটি লোহার ছিটকিনী, সেই ছিটকিনীর ওপর ভর করে দিবি লুকিয়ে থাকে। জানালা বন্ধ করার দরকার হোলে সাবধানে সেই ছিটকিনিকে সরিয়ে দিলেই শার্শী নেমে আসে। সেই সময়, যখন নামছে শার্শীখানা, তখন যদি কারো হাত থাকে জানালার ফ্রেমের ওপর, তাহলেই বিপত্তি। কাটবে না, রক্ত বেরবে না, কিন্তু খেঁতলে গিয়ে এমন অবস্থা হবে যে, সে হাত দিয়ে অনেক কাল কোনও কিছু ধরা ছোঁওয়া যাবে না।

দি ইষ্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেন্টস্—রাজা শ্রীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

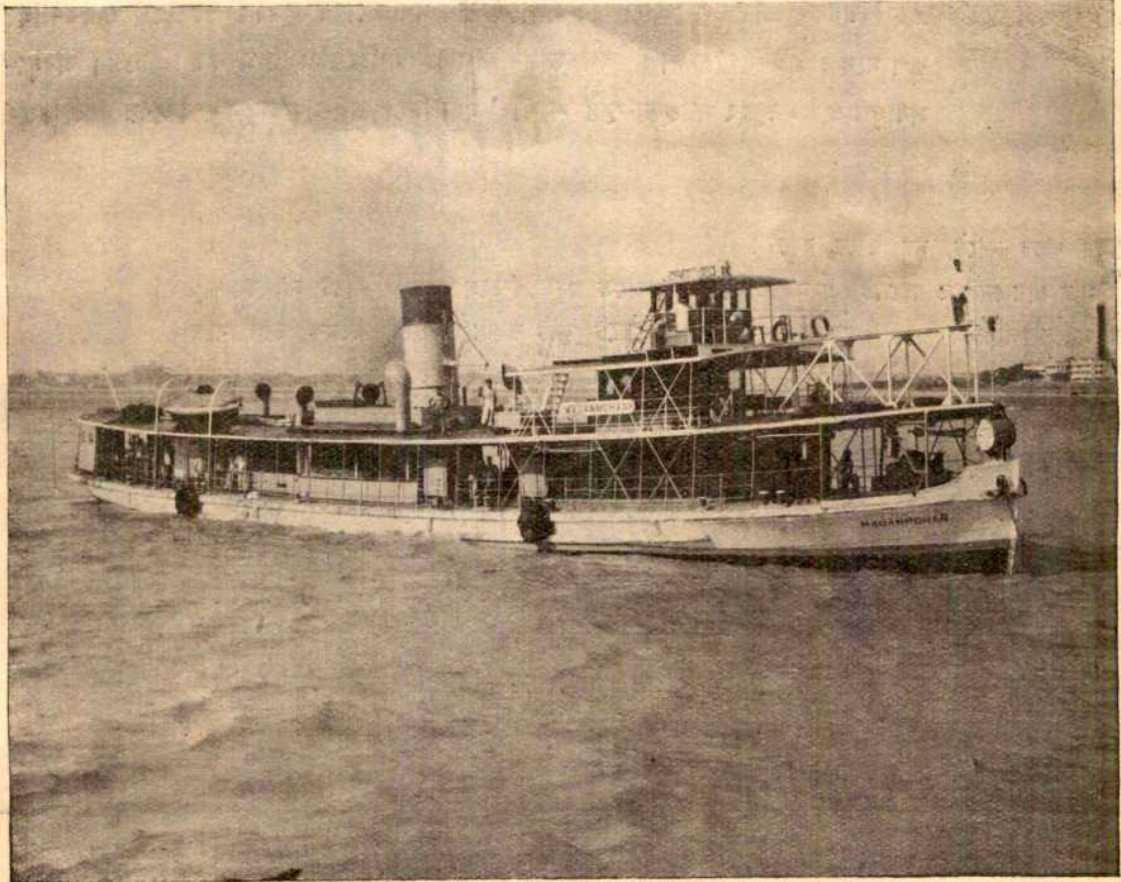
হেড্ অফিস : -৮-নং শোভাবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫৫-১১৩৮ ও ৫৬-১০১৯

ইহা ভারতীয় আভ্যন্তরীণ জলজান প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীনাথ রায়, রাজা জানকীনাথ রায় এবং রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর কর্তৃক ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসাবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সহায়ভূতিশীল ব্যবসায়ী মহাজনবৃন্দের অস্বরোধে ইহা সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান রূপে ভারতে সমিতিভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর জলযান সংখ্যা—ষ্টীমার ১৪ খানা, ফ্লাট ২৮ খানা, বার্জ বোট ৫২ খানা ও পল্টুন ২ খানা। এই সকল জলযান কলিকাতা হইতে পূর্ব বাঙলা ও আসামে বিবিধ পণ্যদ্রব্য এবং ঐ সকল অঞ্চল হইতে কলিকাতায় প্রধানতঃ পাট বহন কার্কে নিযুক্ত আছে।

এতদ্ব্যতীত “ইষ্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস” নামে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর নিজস্ব একটি ষ্টীমার, ফ্লাট, বার্জ, বোট নির্মাণ ও মেরামত কারখানা আছে। এই কারখানায় কোম্পানীর নিজস্ব কার্খ ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে ও অস্থাত্ত প্রতিষ্ঠানের জলযান নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্খও সাদরে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা আপনাদের সহযোগিতা ও সহায়ভূতি প্রার্থনা করি।





তা'বলে রেলগাড়ীর জানালার শাশীকে শ্রেফ একটা হাত
খোঁতলাবার কল বললে অস্ত্রায় বলা হবে। ঐ শাশীর
কল্যাণে রোদ, জল, ইঞ্জিনের কল্লার কবল থেকে নিস্তার
পাওয়া যায়, আবার সেই সংগে বাইরের অত্যাশ্চর্য জগত-
টাকেও ছুঁচোখ ভরে দেখা যায়। রেল চাপে শত শত
মাইল ছুটে চলেছি, কিন্তু ছুঁদিবের অচেনা জগতটাকে
একবারে দেখতে পাচ্ছি না, এ যন্ত্রণা বোধ হয় খোঁতলাবার
যন্ত্রণার চেয়ে ঢের বেশী। গাড়ীতে উঠে বসবার জায়গায়
না বসে মাঝার ওপব ঝুলন্ত পাটখানায টান টান হোয়ে
শুষে ধারা গমনাগমন করেন, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা।
তাঁদের যাওয়াটা হচ্ছে, একান্তই পৌছাবার গরজে যাওয়া।
তাঁরা জানেন, যো-সো করে ঠিক ঠিকানায়—পৌছে গেলেই
হোল। বাস্তু তোরঙ্গ বোড়ারুড়ির মধ্যে পুরে যথাস্থানে
যথাসময়ে পৌছে দিলেও তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু
রেলগাড়ী চড়াটা কি নিভাস্তই শুধু পৌছাবার প্রয়োজনেই
চড়া! কোথাও না কোথাও পৌছাবার টানেই মানুষে রেল
চড়ে, এটাও যেমন খাটি সত্যি কথা, তেমনি আর একটি খাটি
সত্যি কথা হোল, রেল-গাড়ীতে চড়েই লোকে দো-টানায়
পড়ে যায়। গাড়ীতে বসে শাশীর ভেতর থেকে বাইরে নজর
ফেললেই দেখে, গাড়ীখানা ছুটছে যেদিকে, ছুনিয়াখানা ছুটছে
তার বিপরীত দিকে। এই যে দো-টানায় পড়া, এইটুকু হোল
রেলগাড়ী চাপে কোথাও যাওয়ার আসল আরাগ। ছুঁদিবের
টানেব ফলে অনেকটা বেসামাল হোয়ে পড়তে হয়। সজাগ
অবস্থায় বেসামাল না হোয়ে, ঘুগিয়ে বেহুঁশ অবস্থায় ধারা
ছুঁগাসের পথ ছুঁষটায় পার হন, তাঁরা ছুঁশিয়ার লোক,
মানতেই হবে। কিন্তু রেল চড়াটা তাঁদের সার্থক হয় না।
রেলগাড়ীর শাশীর ভেতর দিয়ে তাজ্জব ছুনিয়া দেখা যায়,
সে দেখাটা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন।

একটি মেঘে, মেয়ে না বলে বউ বলাই ঠিক হবে। বউটি
বেশ অগোছাল অবস্থায় বসেছিল। গাড়ীর একেবারে
শেষ দিকে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বেকির ওপর পা শুটিয়ে
বসেছিল বউটি। বসার ধরণটাই তার যেন আধো-স্বপ্নমত,

আধো-জাগন্ত গোছের।
পেছন দিকে ঘাড়ের ওপর
খসে পড়েছে ঘোমটাটা,
কপালে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শুখনো সিঁদুর-মাখা অনেক-
গুলো অবাধ্য চুল। বুকেব আঁচলও ঠিক জায়গায় ঠিক-
মত নেই। একখানি হাত আলতো ভাবে পড়ে রয়েছে
কেনের ওপব, আর একখানি হাত রয়েছে জানালার
কাঁচের গায়ে। কাঁচের ভেতর থেকে বাইরের ছুটন্ত
জগতটাকে ছুঁচোখ দিয়ে যেন গিলছিল সে। গাড়ীব মধ্যে
কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে এতটুকু খেয়াল ছিল না
তার। অবস্থাটা যে বেশ বে-আবক গোছের হোয়ে
উঠেছিল, তা মানতেই হবে। কিন্তু গাড়ীর ভেতরেব
একটি প্রাণীরও ফুরসত ছিল না বউটির দিকে নজর দেবার।
কারণ অস্ত্রদিকে দরজার ওধারে চলছিল তাসের আসর।
সামনাসামনি ছুঁখানা বেকিতে বসে একখানা চাঁদরের চার
খুঁট টেনে ধরেছিল চারজন। সেই চাঁদরের ওপর পডছিল
তস। চাঁদর ঘিরে গাড়ী স্বর্গ মানুষ চড়া স্বরে ইাকা-
ইাকি করছিল। তাসের বিবির খিদমত খাটতে খাটতে
জ্যাস্ত বিবিটির কথা ভুলেই গিবেছিল সকলে। শুধু
একটি মানুষ জ্যাস্ত অজ্যাস্ত কোনও বিবির পরোয়া না
করে বেপরোয়া ভাবে নাক ডাকাচ্ছিলেন। বউটি যে ধারে
বসেছিল, তার বিপরীত দিকের বেকি জুড়ে চাঁদর মুড়ি
দিয়ে পড়েছিল ইয়া এক লাশ। গাড়ীর ষড়-ষড়ানি তলিয়ে
দিয়ে মাঝে মাঝে অভূত এক জাতের গভীর গর্জন উঠছিল
সেই চাঁদরের ভিতর থেকে। সংগে সংগে চাঁদরখানা
উঠানামা করছিল তাল মিলিয়ে। মাঝের বেকিতে একটি
বিছানা পাতা ছিল, বিছানার শেষ দিকে ছিল ছোট একটি
চামড়ার স্টকেশ। বিছানায় কেউ ছিল না। ধীর থাকবার
কথা, তিনি ওধারে তাসের আড্ডায় নো-ট্রাম্ব ইকছিলেন।
একলা, যাকে বলে নিরঙ্ক একলা, বসেছিল বউটি। শাশীর
ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে বসেছিল।
বউটি যেন বেশ দো-টানায় পড়ে গিবেছিল। হাল ছেড়ে
দেওয়ার মত একটা ভাব ফুটে উঠেছিল ওর চোখের
চাউনীতে। যা হবার তা হোয়ে-টোষে গেলে যেমন একটা



থমথমে নিশ্চিন্ততা জমে উঠে চোখে, তে মনি একটা ঘোলাটে ছায়ায় আচ্ছন্ন হোয়েছিল ওর চোখের দৃষ্টি। চোখের কোলে বেশ একটু কালির ছোপ ধরেছিল, চোখের পাতা দু'খানিও যেন খুব ভারী হোয়ে উঠেছিল। ছোট্ট কপালখানিতে পরপর কয়েকটা কৌচ পড়েছিল, জোড়া ভুক দুটির মাঝখানে ছোট্ট একটু ত্রিকোণ চিহ্ন তৈরী হোয়েছিল। খুব শুখনো ঠোঁট দু'খানি মিশেছিল বেশ শক্তভাবে, ঠোঁটের তলায় খুতনির ওপর ছোট্ট একটু টোল পড়েছিল। গাল দুটিও শুখনো দেখাচ্ছিল। মোটের ওপর মুখখানিতে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, যা দেখলে একটু মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। বড্ড বেশী ধকল সহিতে হোয়েছে যেন ওকে। তা' মুখের অবস্থা যেমনই হোক, সাজ সজ্জায় মানিয়েছিল ওকে চমৎকার। গাঢ় বেগুনী রঙের কাপড় জামা, কানে, গলায়, হাতে চকচকে নতুন গয়না, কাপড়ের গায়ে বড় বড় সোনালী নকশাগুলো, সবই বেশ মিশ খেয়ে ছিল ওর গড়নের সংগে। নিটোল গোল হাত দু'খানির কনুয়ের ওপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, খুবই ফিকে গোছের কমলা রঙের মৃণ চামড়া অনেকটা দেখা যাচ্ছিল গলার নিচে। উৎকট সাদা রকমের চামড়া নয়, চামড়ার ভেতর থেকে কেমন যেন ঠাণ্ডা আভা ফুটে বেরচ্ছিল। জামা, কাপড় গয়নায় সাজানো ছোট্ট একটা প্রতিমা যেন, এতটুকু নড়াচড়া নেই, জানলার কাঁচের গায়ে মুখখানি প্রায় ঠেকিয়ে বসে আছে। কাটা কিন্তু কেমন আলুথালু গোছের, কেমন যেন একটু কল্প ভাব ঘিরেছিল প্রতিমাখানিকে। বিসর্জন হোয়ে যাওয়া প্রতিমার মত, এইটুকু বললেই ঠিক বলা হবে।

বলাটা ঠিক হোলেও ব্যাপার কিন্তু বড়ই বিসদৃশ গোছের হোয়ে উঠেছিল। অতগুলো মানুষের মধ্যে কারও নজর ছিল না বউটির দিকে। এমন সাজ পোষাক পরা এমন রূপ এক কোণায় পড়ে রইল মনমরা হোয়ে, আর এধারে সবাই মেতে রইল এক প্যাকেট রঙচঙে তাস নিয়ে, এটা যেন কেমন খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল।

খাপছাড়া ব্যাপারটা হঠাৎ তয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করল। কি একটা মারপ্যাচ ঘটে গেল তাসের লড়াইতে, সব ক'জন তাহুড়ে এক সংগে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল। সেই প্রলম্ব কাণ্ডের ভিতর থেকে হঠাৎ এক প্যাকেট তাস ছিটকে উঠল ওপর দিকে, গাড়ীর ছাতে ঠোকর খেয়ে দিক পালটে এসে পড়ল চাঁদর ঢাকা লাসটির সব থেকে উঁচু জায়গায়। পড়ে ধীবে হুহু তালে তালে ওপর নীচে দোল খেতে লাগল। একজন তাহুড়ের নজর পড়ে গেল সেইদিকে, সংগে সংগে তার মুখখানা ছুঁচলো হয়ে উঠলো। তাসের প্যাকেটের অদ্ভুত নাগরদোলায় চড়া দেখে মুখ চোখের অবস্থাও অদ্ভুত হোবে উঠল তার। ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে সাপের মত করে উঠল সে— “এই—ইস্—” তৎক্ষণাৎ সবাই একদম চুপ, এক সংগে ফিরে তাকাল লাসটির দিকে সবাই। তারপর নিঃশব্দে এসে ঘিরে দাঁড়াল সেই বেশীটা। দুইবুদ্ধি আর চাপা উত্তেজনায় চকচক করছে সকলের চোখ। একজন একটা সিগারেটের টিন রাখল তাসের প্যাকেটটির পাশে। সিগারেটের টিনও মহা আরামে ওপর নিচে দোল খেতে লাগল। তখন একজন রাখল একখানা বই, তারপর যে বা পেল হাতের কাছে, আলতো ভাবে চাপাতে লাগল ভুঁড়ির ওপর। শেষে যখন আর জায়গা রইল না, তখন সম্ভরণে সব জিনিষ আবার তুলে নেওয়া হোল। এবার একজন রাখলে ছোট একটা চামড়ার হুটকেস, হুটকেসের ওপর আর এক হুটকেস, তার ওপর আর একটা। গোটা পাঁচেক চাপাবার পরেও দোলন বন্ধ হোল না। তখন একজন একটা ছোট টিনের বাস্ক এনে চড়িয়ে দিলে পাঁচটা হুটকেসের ওপরে। ফলে টাল সামলাতে পারল না বাস্ক গুলো, ছড়মুড় করে পড়ল নীচে। সেই শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন সেই বিপরীত লাস। বসেই হস্তদস্ত হষে তাঁর বেটপ পাঞ্জাবীর সব কটা পকেট হাতড়াতে লাগলেন। তার পরেই এক আকাশ ফাটা আতর্নাদ, দু'চোখ কপালে তুলে ‘আকাশ-পাতাল’ হা করে ভিরমি যাওয়ার মত অবস্থা। একে মোটা মানুষ, তার ওপর পঞ্চাশের কোঠা পার হোয়েছেন। এক ধাক্কায় এমনি সসেমিরে হাল



হোয়ে উঠল তাঁর, যে চালাকি করা মাথায় উঠে-গেল সকলেব। নেহাৎ বেকুব বনে গেল সবাই, হতভম্ব হোয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতো লাগল। প্রকাণ্ড টাকটা এক হাতে চেপে ধরে বিপুল পরিধির ভদ্রলোকটি তখন হাউমাউ শব্দে কান্না জুড়ে দিলেন।

যেখানে তাস খেলা চলছিল, সেখানে তখনও একটি মাত্র প্রাণী। চুপ করে বসেছিল। মজা দেখছিল সে। মজাটা মারাত্মক মূর্তি ধারণ করল দেখে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে হোল তাকে। পরশে গরদের পাঞ্জাবী, জড়ি পেড়ে ধুতি হাতের আঙ্গুলে গোটা তিনেক আংটি, কবজিতে হলদে স্নাতোর বাঁধা এক গোছা শুখনো ছুঁবা, দস্তুরমত লম্বা চণ্ডা বোল আনা একটি পুরুষ মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে একগোছা-কৌকড়ানো চুল ঠেলে তুলে দিল নিজের কপালের ওপর থেকে। তারপর এগিয়ে আসতে আসতে গমগমে গলায় জিজ্ঞাসা করল—“হোল কি হাবুদা? চৈচিয়ে মরছ কেন খোঁকসের মত?”

জবাব মিলল না, হাবুদা আবার হাতড়াতে শুরু করলেন তাঁর পকেটগুলো। পকেট-হাতড়ানো শেষ করে নিজের বিছানাটা তুলে ঝেড়ে ঝুড়ে টেনে ফেলে দিলেন এক ধারে। সেই ফাঁকে যে যার ব্যাগ স্টেকেস সরিয়ে ফেললে। মুখ চুপ হোষে গেছে প্রত্যেকের, বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হোষে এসে এ কি ফ্যাসাদ রে বাবা!

ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ! বরের ধমকাধমকির চোটে শেষ-পর্যন্ত হাবুদা প্রকাশ কবলেন রহস্তটা। তাঁর পকেট মারা গেছে। একটা হাতে-বোনা স্নাতোর থলি ছিল পকেটে। তার মধ্যে ছিল সামান্য কিছু টাকা পয়সা। সেটা এমন কিছু লাখ পঞ্চাশের ধাক্কা নয়। কিন্তু আরও এমন কিছু ছিল, যা হাবুদার কাছে সত্যিই অমূল্য পদার্থ। ভরি দেড়েক গুজনের টাউস একটি সোনার আংটি ছিল থলেতে। আংটিটি ভরানক পয়মস্ত। ওটি নাকি হাবুদার ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ বাবহার করেছেন। সদা সর্বদা সেটি হাবুদার ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে জলজল করত, এটা সকলেই লক্ষ্য করেছে। সেদিন সকালে ভোজনের সময় হাত থেকে খুলে থলিতে ভরেছিলেন হাবুদা, ষ্টেশনে আসবার তাড়া-

তাড়িতে হাতে দিতে ভুলে গেছেন। গাড়ীতে উঠেই শুরু-ভোজনের ফলে

ঘুগিয়ে পড়েছিলেন। স্নাতরাং হাবুদার দোষ কোথা। দোষটা তা'হলে কার! অতগুলি ভদ্র সন্তানের মান ইজ্জত বাঁচাতে হোলে দোষটা কার, তা নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। সেই পরামর্শই করলো সকলে, নিজেদের মুখ রক্ষার জন্তে—প্রত্যেকের বাস বিছানা জামা কাপড় খানা-তল্লাস করার মতলব ঠিক হোল। বর বেচারী সজোরে প্রতিবাদ করল। ও সমস্ত ছেলেমি চলতেই পারে না, হাবুদা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে কাকেও সন্দেহ করছেন না। বরযাত্রীর প্রতিবাদ শুনল না, জিনিষটা যখন খোঁজা গেছে তখন খোঁজাখুঁজি করতেই হবে। কে একজন প্রস্তাব করল, সর্বাত্মে গাড়ীটাই একবার ভাল করে খুঁজে দেখা যাক। রিজার্ভ করা গাড়ী, বাইরের কেউ ওঠেনি গাড়ীতে। যাবে কোথায় জিনিষটা। যদি সেই থলে নিয়ে গাড়ীতে উঠে থাকেন হাবুদা, তা'হলে সেটা নিশ্চয়ই আছে গাড়ীর মধ্যে। পাখা নেই ত' সেই থলের যে, জানলা গলে হাওয়ায় ভেসে চলে যাবে।

শুরু হোয়ে গেল গাড়ী খোঁজা। প্রত্যেক বেক্সির তলা থেকে মানপত্র টেনে বার করে টর্চের আলো ফেলে দেখা হোতে লাগল। যে বেক্সিতে বউটি বসে আছে, তাব তলায় বাস পেটরা বাসন-কোসনের থলে ঝোড়া ঝুড়িতে বোঝাই। বিয়ের পাওয়া যাবতীয় জিনিস রয়েছে সেখানে। অন্য সব বেক্সির তলা খোঁজা শেষ হোলে বউটিব বেক্সির তলা দেখতে এল একজন। বেশ মিষ্টি করে বললে বউটিকে—“এবার আপনার পালা বৌদি, আপনাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না। আগে দেখা যাক আপনার বেক্সির তলাটা।” বলতে বলতে নীচু হোয়ে জিনিষপত্র সব টেনে বার করতে লাগল।

এতক্ষণ একটি লোকও বউটির সংগে একটি কথা বলেনি। হাবুদার বিপত্তি দেখে তারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ভরানক কাণ্ড কিনা, বরযাত্রীর জিনিষ হারালে ত' সোজা ব্যাপার নয়! হয়ত গুণাকার দিতে হবে সেই আংটির



দাম, তাতেও হয়ত
ব্যাপারটা চুকবে না।
সবাই মনে করবে নতুন
বউএর পর ভাল নয়, বিষের পর দিনই এক গোছা টাকা
গচ্ছা দিতে হোল। কি হবে না হবে ভাবতে ভাবতে সে
কাপড় চোপড় সামলে নেমে দাঁড়াল। বরও ততক্ষণে চলে
এসেছে এখারে। জনান্তিকে বলার মত করে বললে
সে—“তুমি আবার নামতে গেলে কেন? টানাটানি করছে
জিনিষ পত্র, চোটফোট লাগুক এবার একটা। যত সব
মাথা খারাপের দল ত। মিছিমিছি হৈ চৈ করে ম’ল।”
বলতে বলতে বর নিজেও নিচু হয়ে একটা তোরঙ্গকে
টেনে বার করে সামনের বেঞ্চিতে বিছানার ওপর তুলল।
আর একজন তখন নীচু হয়ে কি একটা টেনে বার
করার চেষ্টা করছে। সেই অবস্থাতেই সে চোঁচিয়ে উঠল—
“কি ও! ওটা কি!”
বলার সংগে সংগে বর আবার নীচু হয়ে পড়ল। তারপরই
একটা চাপা হুংকার শোনা গেল। পরমুহূর্তে সামান্য
একটু ধস্তাধস্তির শব্দ হোল বেকির নীচে। তারপর উঠে
দাঁড়াল বর। সবিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে রইল বরের দিকে।
এক মুঠো চুল ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাল বর একটি
জীবকে। রিজার্ভ করা কামরাব মধ্যে ঐ প্রাণীটির
উপস্থিতি সত্যই কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

চমকে যাবার ধাক্কাটা সামলাতে সমর্থ লাগল।
শিকারটিকে মুঠোয় পেয়ে তাড়াছড়ো করারও প্রয়োজন
ছিল না।
ইতিমধ্যে গাড়ীর গতি কমে এল। মাইল খানেক লম্বা
একটা বালির নদী পার হবার জন্তে গাড়ীখানা একদম
থেমে গেল পুলের এপারে। আধ মিনিট পরেই আবার
ছাড়ল। খুব জোরে দম ফেলতে ফেলতে উঠতে লাগল
পুলের ওপর। তারপর ঘটা-ঘড়-ঘটাস্ শুরু হোল। পুলের
ওপর গাড়ী উঠলে গক-গম্ভীর বাজনা বাজতে থাকে।
আকাশের আলো কমে আসছে তখন। ভেতরের আলো-

গুলো জলে উঠেছে। বোটি যেদিকে বসেছিল সেটা
পশ্চিম দিক। শাশীর ভেতর দিঘে সিঁহুরে আলো এসে
পড়েছে বোটের গায়ে। বেগুনী জামা কাপড়, সোনার
গয়না সিঁথির সিঁহুর সমস্তই লালে লাল হয়ে উঠেছে
অন্তগামী আলোর আভাষ। যেন আগুন জলে উঠেছে
বউটির চারিদিকে, যেন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে আছে।
জ্যাস্ত মাস্থমে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে অপলক নয়নে
তাকিয়ে থাকতে পারে কিনা, কে বলতে পারে! থাকতে
পারলেও—তখন তার চোখের দৃষ্টিতে কি ফুটে বেরষ,
তাই বা কে জানে! বউটির চোখের চাউনি তখন এমনই
হোয়ে উঠেছে যে, সেদিকে তাকালেও বুক কেঁপে ওঠে।
বসে পড়েছে আবার সে বেকির ওপর, বসে হুঁহাত দিয়ে
আঁকড়ে ধরেছে বেকির কিনারা। ঘোমটা নেই, লম্বা
বেগী লোটাচ্ছে পিঠে। সবই যেন জলে উঠেছে, জামা
কাপড় চুল—সব। কানের লম্বা চুল দুটোকে মনে হচ্ছে,
দুটো আগুনের ফুলকি। বউটি ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছে গাড়ীর ওধারে।

সেখানে তখন ধীরে স্বস্তে বুঝিয়ে স্বাধিয়ে চোরটার মুখ থেকে
আসল কথাটা বার করবার চেষ্টা চলছে। কে সে?
কোথা থেকে কেমন করে ঐ গাড়ীতে চেপেছে? হাবুদার
টাকার থলিটা কোথায় সরিয়েছে? নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে
নিজের দলের লোকের হাতে, নিশ্চয়ই আরো কু-নতলব
ছিল মাথাষ। নতুন বউ যে বেঞ্চিতে—সেই বেকির
তলাতেই আশ্রয় নেবার মানে, সবাই ঘুমলে বউটিকে
নিকেশ করে গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দেওয়া। কিংবা
অনেক রাত্রে গাড়ীর দরজা ভেতর থেকে খুলে দিয়ে নিজের
লোকদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে সবায়ের গলায় ছুঁবি দেওয়া।
কি মতলব ছিল? সত্যিকারের সর্বনাশটা কতদূর পর্যন্ত
গড়াবার অভিসন্ধি ছিল?

অভিসন্ধিব সন্ধান পাবার জন্তে—যথেষ্ট মোলায়েম ভাবে
চেষ্টা চলেছে তখন। গাড়ী পুল পার হলো। আরম্ভ
হোল হুঁপাশে উচু মাটির টিলা আর জঙ্গল। দিনের
আলোচুক একেবারে মুছে গেল। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে
গেল বউটি। গাড়ীর ভেতরের আলোও তার মুখে পড়ছে



না তখন। কোণের সংগে মিশে গিয়ে কাঠ হয়ে বসে
রইল সে। মুখখানি যেন ইচ্ছা করেই অন্ধকারে
লুকিয়ে ফেলল।

ওধারে উত্তরোত্তর উত্তেজনা বেড়ে উঠেছে। চোরের মূণ
কিছুতে খুলছে না।

ইঁকার দিয়ে উঠলেন—হাতি মার্কি হাবুদা—“দাঁও ধোলাই
হারামজাদাকে, অত খোশামুদির দরকারটা কি?”

সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল বর। বিবাক্ত গলায় বলল—
“না, গায়ে হাত দিওনা। দাঁড়াও যা করার আমি করছি।”

বলতে বলতে ধরলে চোরের ডান হাতের কজ্জিটা। এক
টানে নিয়ে এল তাকে জানালার ধারে। বউটি বসেছিল
যে বেকিতে, সেই বেকির এধারটা খালি ছিল। সেখানে
বসাল চোরকে। বসিয়ে তার হাতখানা মুচড়ে পেছন
দিকে নিয়ে জানলার ওপর চেপে ধরলে। তারপর নিজের
বাঁ হাত দিয়ে শাশীর নীচের ছোট্ট খিলটা ভেতর দিকে
ঠেলে দিয়ে ঝট করে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিলে।
দড়াম করে পড়ল শাশীখানা চোরের হাতের ওপর।

সংগে সংগে আবার ঠেলে তুললে শাশীটিকে ওপর দিকে,
দিয়েই ছেঁদ দিল। এইভাবে একবার ছুঁবার তিনবার,
বার পাঁচ ছব তোলা আর ছাড়া হোল। এত তাড়াতাড়ি,
এমন হুশিয়ারে সম্পন্ন করলে কর্মটি যে, সবাই আড়ষ্ট হয়ে
তাকিয়ে রইলো। টু শব্দটি করার ফুরসত হোল না
কারও। গাড়ীর জানালার শাশীকে যে অমন একটা
সর্বান্বনব কাজে ব্যবহার করা যায়—এ কি কেউ কখনও
ভেবে দেখেছে।

টু শব্দ চোরটিও করলে না।

অর্থাৎ কি না, সে নিজেই প্রমাণ করে ছাড়ল যে, সে
একটি ঝাঁক চোর। কথায় বলে, মার ত’ মার, একেবারে
চোরের মর। তা’ চোব যখন সে, তখন চোরের মার
খেবেও মূণ টিপে রইল। ঘাড়টা আব তুলতে পারলে
না, খুঁতনিটা ঠেকে রইল বুকের সংগে। অনেক লম্বা
চুলগুলো দিয়ে মুখটা ঢাকা রইল।

জানালার ওপর থেকে
চোরের হাত টেনে নিয়ে
সেখানা তুলে ধরে বন্ধুদের

দেখাল বর। “দেখ—কি অবস্থা হয়েছে হাতের, এ হাত
দিয়ে বাছাধনকে জীবনে আব করে খেতে হবে না।”
দেখে সবাই সন্তুষ্ট হোল কি হোলনা বোঝাই গেল না।
বন্ধুবা একেবারে নির্বাক নিম্পন্দ হয়ে গেছে তখন।
শুধু হাবুদার রাগটা তখনও পড়েনি।

তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার সামনে। হঠাৎ কি পেচাল
হোল তার, দরজাটা টেনে খুলে ফেললেন। পাশেই
দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে চোরটা। পপ করে
ধরলেন তার চুলের মুঠি, এক হেঁচকায় নিয়ে গেলেন
তাকে দরজার সামনে। সংগে সংগে সজোবে মাঝলেন
এক ধাক্কা। চোরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বাধা দেবাব
জন্তু হা করবারও অবকাশ হোল না তারও। ওভাবে
জ্যান্ত মানুষকে যে ছুঁতস্ত গাড়ী থেকে কেলে দেওয়া যায়—
এ কারও ধারণাতেও ছিলনা।

গাড়ীটা ছুঁতেই লাগল।

গাড়ীর মধ্যে এক প্রাণী একটুও নড়ল না। হাবুদা শুধু
চোরের বাপস্তি চোদপুকষাস্ত করতে লাগলেন। বর
বেচারা নিজের বিছানার ওপর বসে পড়ে চোখ বুজে
ছুঁহাতে নিজের কান দুটো ঢেকে রাখল। এক ঘেয়ে
আওলাজ করতে কবতে গাড়ীটা ছুঁতেই লাগল।

ফুঁতিটাই গেল মাটি হয়েছে।

বিয়ের ফুঁতি, বরষাজী হোবে আসার ফুঁতি, সব একেবারে
জল হয়ে গেল। এখন ভালষ ভালষ সব পৌঁছতে
পারলে হুঁষ যেখানকার মানুষ সেখানে। চোখের ওপর
খুন হয়ে গেল একটা মানুষ, এতে কার না মেজাজ
বিগড়ায়। মানুষ মানে, একেবারে ছেলেমানুষ। বরষাজী-
দেব অনেকের বয়েস চোরের বয়েসের সমান। চোরকে



দেখতেও নেহাত ছোট-
লোকের মত নয়। বরং
বেশ ভদ্রশরের ছেলে

বলেই মনে হয়। নেহাত বিপাকে পড়ে চোরেদের দলে
চুকেছে বোধ হয় বেচার। হয়ত স্বযোগ পেলে জীবনে
দাঁড়িয়ে যেতে পারত। সব শেষ হয়ে গেল। একে
ডান হাতের আঙ্গুলকটা ছেঁচে দেওয়া হয়েছিল, তার
ওপর ঐভাবে চলন্ত গাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া
হোলো। ও বেচার। কি আর বাঁচবে!

সকলের মনেই একটা কথা তোলপাড় করতে লাগলো,
ছোকরাটা বোধ হয় মরেই গেল। ক্রমে চাপা গলায়
পরামর্শ শুরু হোল বরযাত্রীদের ওধারে। যদি ছোকরা
রক্ষা পায়, যদি পুলিশের কাছে এজাহার দেয়! যদি
পুলিশ অনুসন্ধান করে বার করে—কোন গাড়ী থেকে
কারা ওকে ফেলে দিয়েছে! আইন জানা একজন বর-
যাত্রী পরামর্শ দিল, সামনের স্টেশনে গাড়ী থামলে গার্ড
আর পুলিশকে জানিয়ে আসা উচিত যে একটা চোর
কোনও ক্রমে চুকে পড়েছিল রিজার্ভ করা গাড়ীতে।
হাবুদার থলি ছিনিয়ে নিয়ে চলন্ত গাড়ী থেকে চম্পট
দিয়েছে। পরামর্শটা সকলের কানে ভাল শোনাল না।
একজন বলল, গাড়ী থামবার পরে—ঐ সংবাদ দিতে
গেলে আরও ফ্যাসাদে পড়তে হবে। পুলিশ জিজ্ঞাসা
করবে, তৎক্ষণাৎ চেন টেনে গাড়ী থামান হয়নি কেন।
অকাটা যুক্তি, কথাটা মানতে হোল সকলকে। তারপর
নানা দিক বিবেচনা করে ঠিক হোল, কিছুই করা হবে
না। একদম মুখ বুজে থাকতে হবে। যা হবার তা,
ত' হোয়েই গেছে, এখন পুলিশ হাঙ্গামায় পড়ে নাস্তা-
নাবুদ হওয়ার কোন সার্বকতা নেই।

ইতিমধ্যে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল হাবুদার।
আধ খান কাপড়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলে কানে পৈতে
জড়াতে জড়াতে তিনি বাথরুমে চললেন। তখন নজরে
পড়ল একজন বরযাত্রীর, আংটিটা হাবুদার কানের
গোড়ায় পৈতের সংগে ঝুলছে। সংগে সংগে চীৎকার
করে উঠল সে। তেতে উঠল অনেকে, খামাকা তবে

একটা ছোকরাকে ওভাবে মারা হোল কেন। তারপর
সেই স্বতোয় বোনা থলিটাও বার হোল হাবুদার এক
হাত লম্বা জুতোর ভেতব থেকে। হাবুদা মোটেই
অপ্রস্তুত হোলেন না। তাঁর যুক্তিও ফেলবার নয়।
তিনি বললেন, তাঁর আংটি থলি চুরি যাবনি বটে—
কিন্তু মস্তবড় একটা বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করেছে।
কে বলতে পারে—কি মতলব ছিল সে হারামজাদার
পেটে। নতুন বো, অত সব সোনার গয়না রয়েছে
গায়ে। অর্ধেক রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে হয়ত চুরি
দিত' বৌটার গলায়। হয়ত দরজা খুলে দিয়ে নিজের
দলেব লোকদের গাড়ীর মধ্যে ঢোকাত। কিছা—
ঘুম পাড়াবার জন্য কড়া জাতের গ্যাস আনত ওর দলের
লোকে। তারপর একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিখে যেত।
সত্যিই কি না হতে পারত!

চলন্ত রেলগাড়ীতে কত রকমের চুরি রাহাজানি ত'
হামেশা হচ্ছেই। সেই সমস্ব গল্পই উঠে পড়ল। রেল
গাড়ীর চুরি ডাকাতি সম্বন্ধে যে যা শুনেছে বা পড়েছে,
সব বলা কওয়া হোতে লাগল। সবাই বক্তা, শ্রোতা
যে কে, ঠিক বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে হাবুদা দু'
বোতল মহা মৃতসজীবনী বার করে ফেললেন। বর-
যাত্রীদের জন্যই ও বস্তু সংগে এনেছিলেন তিনি।
হঠাৎ যদি কারও শরীর খারাপ হয় বা পেট দমসম
মেরে ওঠে, তখন কাজে লাগবে। হাবুদার পূর্বপুরুষ
একজন মস্তবড় বৈদ্য ছিলেন। তিনিই ও জিনিষ
উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই থেকে ওই মৃতসজীবনী হাবুদার
বংশাবলী পান করে আসছেন। কি উপারে কোন
মাল মশলা সহযোগে ওই অমৃত বানানো হয়, তা'
হাবুদার বংশ ছাড়া বাইরের কারও জ্ঞানার উপায় নেই।

মৃতসজীবনী সেবনের পর ফুটি আবার কিরে এল।
বৌক্ষণ কিন্তু ফুটিটা সজাগ থাকতে পারল না। প্রচুর
পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ছিল সংগে, কনের বাড়ী থেকে দিয়ে
দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো বেরলো। সদগতি হোল
সেগুলোর মৃতসজীবনীর সংগে। বর বউ দু'জনের এক
জনও কিছু মুখে দিলনা। মাথা ধরেছে বলে বর চাঁদর



মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল, উঠলই না। বউটি এক ভাবে কোণের সংগে গিশে অঙ্ককারে মুখ লুকিয়ে বসে রইল। ডেকেও সাড়া পাওয়া গেলনা তার। খুব বেশী অস্থিরোদ্বিগ্ন কেউ করল না তাকে। সবাই পর, সবাই বরষাজী। বউটির একমাত্র আপনার লোক হোল বর। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করে নিয়ে চলেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনার লোক। সেই আপনার লোকের ত' মাথা ধরেছে।

সময়ের মধ্যে অল্প পরিচয়, খুবই নিবিড় ধরণের পরিচয়, সব শেষ হোয়ে গিয়েছিল। ভয়ানক রকম তাড়াতাড়িই শেষ হোয়ে গিয়েছিল সব কিছু। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন রকমের একটা বেদনাবোধ, কেমন যেন একটা জ্বালা ধরে গিয়েছিল তার দেহ মনে। সে জ্বালাটা স্বপ্নেরও নয়—দুঃস্বপ্নের নয়, অনেকটা যেন নেশার মত। নেশা কাকে বলে, তাও জানত বোটি। বিয়ের আগে একবার বিজয়া দশমীর দিন খানিক সিদ্ধি বাটা খেয়েছিল এক বাম্ববীর বাড়ীতে গিয়ে। তারপর বাড়ী ফিরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল পাছে কেউ ধরে ফেলে। পরদিন সকালে উঠে বুঝতে পেরেছিল—নেশা কাকে বলে। নেশার ঘোরে তখনও তার মাথা বিম্বিত করছিল।

মাথা ধরা আর মাথা ঘোরার মধ্যে তফাত অনেক। মাথা ধরেছে বলে বর একটি বড়ি খেয়ে আবার চাঁদর মুড়ি দিল। মৃতসঞ্জীবনীর সংগে ভাল ভাল খাবার পেটে যাওয়ার ফলে বরষাজীদের মাথা ঘুবতে লাগল। বেশীক্ষণ তারা আর জেগে থাকতে পারল না। গাড়ী থামল একটা বড় ষ্টেশনে। কয়েক খিলি পান আর জর্দা নেওয়া হোল। তারপর দরজা ছুটো ভাল করে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে সকলে শুয়ে পড়ল। হাবুদা আবার মূল্যবান একটি মতন দিলেন। গাড়ীর আলো-গুলোর ওপর খবরের কাগজ জড়িয়ে দিতে বললেন। আলোটা একটু কম থাকলে ঘুমটা বেশ জমেবে। তাই করা হোল। তখন গাড়ীর মধ্যে রহস্যময় একটা আলো-আধারি গোছের হোয়ে উঠল। বনবন করে ঘুরতে লাগল চারখানা পাখা। সবায়ের ঘুম বেশ জমে উঠল। রাতের সংগে পাশা দিয়ে—অঙ্ককারের বুক চিরে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটেতেই লাগল গাড়ী সামনের দিকে। পেছন দিকে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে চলল বোটের মন। মাথা তার ধরলও না, ঘুরলও না। মাথার পেছনটা সে ঠেসে রইল গাড়ীর কোণায়। আর খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মত চোখেব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল—সামনের বেক্সির ওপর চাঁদর মুড়ি দিয়ে শোওয়া একমাত্র আপনার জনটিকে।

মন তার ছুটে গিয়ে পৌঁছল সেই ছোট্ট ঘরটিতে, যে ঘরে ঠিক আগেব রাতের শেষ দিকে থাকতে হয়েছিল ঐ লোকটির সংগে। সামান্য একটু সময়, বোধ হয়—ঘণ্টা দুইও ছিল না তখন রাত শেষ হবার। সেইটুকু

সেই রকমই একটা নেশায় ধরেছিল তাকে। সেই নেশাব মধ্যে কত কি হোয়ে গেল তাড়াতাড়ি। বিশেষ রকমের পরিচয় হোয়ে গেল স্বামীটির সংগে। ঐ যে চাঁদব ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মাছঘটি। ঐ চাঁদরের তলায় সিঁদুর গেঞ্জি, গরদের পাঞ্জাবী, জরি পাড় ধুতি, ধুতির তলায় ছোট্ট সাদা জাকিয়া, ঐ সব বাদ দিলে যা থাকে, তাও সে জানে। বেশ ভাল করে জানে। খুব কস' বুক, বেশ চওড়া বুকুর ছাতি, চমৎকার হাতের গড়ন। আর কি জোর হাত দু'খানায়!

হঠাৎ বউটির বুকুর ভেতর কেমন তোলপাড় করে উঠল।

উঃ কি জোর ঐ হাত দু'খানায়!

জোর করে সে চোখের পাতা টিপে রইল। তবু স্পষ্ট দেখতে লাগল সব কিছু। কেমন করে অনায়াসে সেই চোরটার চুলের মুঠি ধরে টেনে বার করলে বেক্সির নিচে থেকে। কেমন অবহেলায় ডান হাতে তার কজ্জিটা ধরে হাতখানা চেপে ধরলে জানলার তলায়—আর কেমন সহজে বা হাত দিয়ে বারবার জানলার শাশীখানা ওপর দিকে তুললে আর ফেললে। চোরটা কিছুই করতে পারল না—এতটুকু বাধা পর্যন্ত দিতে পারল না।

সে নিজেও পারেনি। অনায়াসে দু'হাতে তাকে তুলে



ফেলেছিল বৃকের কাছে।
নিরে গিয়ে শু ই রে ছিল
খাটের ওপর। তখন ঠিক

ঐ চোরটারই মত অবস্থা হয়েছিল তার। এক হাতে
বিছানাব সংগে চেপে ধবে আর এক হাতে জামা কাপড়
সব অনায়াসে খুলে ফেলেছিল। সেও একটা বাধা দিতে
পারেনি, এমন কাষদাঘ ধরেছিল তাকে। তা' ছাড়া
কেমন যেন একটা নেশার মতই হোয়ে উঠেছিল তখন।
বাধা দেবার চেষ্টাও তেমন করতে পারেনি।

অপবিসীম জোর হাত দু'খানায়। হৃদাস্ত জোর বৃকেও।
চেষ্টা করলেই বা কি ফল হোত!

বউটির বৃকে একদম জোর নেই। বৃকটা ভয়ানক টিপ-
টিপ করতে লাগল তার। কেমন যেন দম আটকে
আসতে লাগল।

আগের রাতেও দম আটকে এসেছিল ঐ লোকটির
বৃকের চাপে। আরও জোরে চাপ দিলে হয়ত সে
মরেই যেত।

ঐ লোকটি ইচ্ছে করলে চাপের চোটে অনায়াসে তাকে
মেরেও ফেলতে পারে দম বন্ধ করে। খুব সহজেই
পারে। টু শব্দটি করার, এতটুকু বাধা দেওয়ার সামর্থ্য
হবে না তার। যেমন ঐ চোর ছোকরাটার হোল না।

বাধা দিলেই বা ফল হোত কতটুকু!

বাধা দিতে গেলে সবকটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই
চোরের ঘাড়ে। সব ক'জনে মারত এক সংগে। হাত-
খানা ধোঁতলে দিয়েছে, মুখ টিপে সঙ্ক করেছে। সব
ক'জনে এক সংগে হাত-পা ধরে মোচড়াতে থাকলে কি সঙ্ক
করতে পাবত! কিংবা সবাই যদি তার গায়ের চামড়া চিমটে
ধরে টানাটানি কবত! কিংবা যদি গলা টিপে ধরত!

বউটি হঠাৎ ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো
পেছনের দিকে মোচড়াতে লাগল। অসঙ্ক যন্ত্রণা, ভবু
ছাড়লে না। দাঁতে দাঁতে চেপে আরও জোরে ঠেলতে
লাগল আঙ্গুলগুলোকে পেছন দিকে। একটু পরেই ছেড়ে

দিতে হোল আঙ্গুল। আরও জোরে নিজের হাতে
নিজের আঙ্গুল মোচড়ান সম্ভব নয়। আঙ্গুল ছেড়ে দিয়ে
হাঁপাতে লাগল।

হঠাৎ তার নজর পড়ে গেল পাশেব কাঁচখানার ওপর।
তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসে তুললে ঠেলে কাঁচখানাকে খানিকটা।
তুলে ছেড়ে দিল। বেশ আশ্রয় করে পড়ল সেখানা।
কয়েক মুহূর্ত তাবিষে রইল কাঁচখানার দিকে। তারপর
উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলে। নিয়ে
আবার শাশীটা ওপর দিকে তুলতে গেল বাঁ হাত
দিয়ে। পারলে না, বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো মোচড়াবার
ফলে আড়ষ্ট হোয়ে গেছে। তিনটি আঙ্গুলের মাথা কাঁচের
তলার কাঠের খাঁজে আটকে শাশী তুলতে হয়। বাঁ
হাতের আঙ্গুল তিনটি গেছে, অতএব ডান হাতের
আঙ্গুলের মাথা কাজে লাগল। কাঁচখানা অর্ধেকের ওপর
তুলে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো তলায় পেতে ডান হাত
টেনে নিল। পরমুহূর্তেই—তার পায়ে নখ থেকে মাথার
চুল পর্যন্ত অসাড় হোয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল সেই ভাবে। সামনে হুবে পড়ে
ধরধর করে কাঁপতে লাগল। শেষে আবার ডান হাতের
আঙ্গুলের মাথা দিয়ে একটুখানি তুললে কাঁচখানা, বাঁ
হাতখানা বহু চেষ্টায় টেনে নিলে। নিয়ে বসে পড়ল
কোণায়। তখন আর কোন বেদনা বোধ নেই। মনে
হোল, ডুবে যাচ্ছে সে। ভয়ঙ্কর অন্ধকার একটা গর্তের
মধ্যে ক্রমেই নেমে যাচ্ছে।

অল্প একটু সময় বইল সেই ঘোরটা। তাবপর শুরু হোল
যন্ত্রণা। বৃক, মাথা, পিঠের শিরদাঁড়া, সবই যেন ফেটে
যাবার মত অবস্থা। গামছা নিংড়াবার মত পাকিয়ে
পাকিয়ে নিংড়াচ্ছে—যেন কেউ তার দেহটা। আড়ষ্ট
বাঁ হাতের কজ্জিটা ডান হাতে টিপে ধরে কোনও রকমে
স্থির হোয়ে বসে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। অসম্ভব
চেষ্টা, কোমরের উপর থেকে—মাথা পর্যন্ত মুচড়ে উঠতে
লাগল। চোখ টিপে থাকাব চেষ্টা করল প্রাণপণে। তাও

সম্ভব নয়, প্রাণটাই যেন বেরিয়ে আসতে চায় চোখ ফেটে।

কাছেই আবার চোখ চেয়ে তাকাতে হোল।

প্রথমেই নজর পড়ল সামনের বেকির ওপর চাঁদর মুড়ি দেওয়া মাল্‌ঘটির দিকে। একটুখানি সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ভয়ংকর একটা আতংকে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর।

হাতের যন্ত্রণাটাও যেন উবে গেল। চাঁদরের তলায় যে ঘুমচ্ছে, তার একদম আবরণ হীন মুর্তিটা স্পষ্ট সে দেখতে লাগল। অদ্ভুত একটা গন্ধও যেন সে পেল নাকে, কড়া চামড়ার গন্ধ। পুরুষ মাল্‌ঘষের চামড়ার গন্ধ বোধহয় ঐ রকমই হয়। গা শুনিয়ে উঠল তার, তলপেটের কাছটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠল। এক ঝলক বমি উঠে এল মুখের মধ্যে।

সামলাতে পারলে না, নীচু হোয়ে সেটা ফেললে। ক্রমাগতই বমি উঠে আসতে লাগল। উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই তখন আর। পাশে ঝুঁকে নিঃশব্দে বমি করতে লাগল। অনেকক্ষণ বমি করে সোজা হোয়ে বসল আবার যখন, তখন আর দম নিতে পারছে না। অনেক কষ্টে যখন বুকের চাপটা কমাতে পারল, তখন ঘটল আর এক বিপত্তি। নিজের দেহটা তখন চোখের ওপর ভাসতে লাগল। জামা কাপড় ছাড়া নিজের দেহটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে। দেখল, নিজের সর্বশরীর যেন কালো হোয়ে গেছে। যেন ভয়ানক একটা দুর্গন্ধ বেরচ্ছে তার শরীরের ভেতর থেকে। একবার একটা পঁচা কুকুর পড়েছিল তাদের বাড়ীর পাশে। গন্ধের চোটে বাড়ীর কেউ জল গিলতে পারেনি—যতক্ষণ না সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ধাক্করে। কতকটা যেন সেই জ্বাতের গন্ধ পেল সে নিজের শরীরের ভেতর থেকে।

গন্ধটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্তু—অস্থির হোয়ে উঠল। তখন খেয়াল হোল, কোলের ওপরের পড়েছে খানিক বমি। ইস, এখন কপড়খানা বদলানো যায় কেমন করে।

অন্ত জামা কাপড় সমস্ত তোরঙ্গের ভেতর। তোরঙ্গটা রয়েছে বেকির তলায়। এখন সেটা বার করাই বা যায় কেমন করে! সেটা নিয়ে টানাটানি করতে গেলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে সকলের। হাতের যা অবস্থা, তাতে বিপুল

তোরঙ্গ টেনে বারই বা করবে কেমন করে!

না, বমিমাখা জামা কাপড়

পরেই বসে থাকতে হবে। কাপড় বদলাবার কোনও উপায় নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা চামড়ার স্ট্রটেকসের কথা। স্ট্রটেকসটা রয়েছে বরের পায়ের কাছে। সেটা বরের। আগের দিন রাতে সেটা একবার খোলা হোয়েছিল—ওদের শোবার ঘরে। এক শিশি এসেল বার করে নিয়ে ঢেলেছিল লোকটা বিছানায়। তখন সে আড় চোখে দেখেছিল স্ট্রটেকসে কি আছে। আমনা, চিকনি, দাডি কামাবার জিনিষ পত্র আর খান কয়েক কাপড় জামা। অদ্ভুত একখানা ধূতি সে নিশ্চয়ই দেখেছিল। কিন্তু স্ট্রটেকসটা কি খোলা আছে। নিচু হোয়ে ডান হাত বাড়িয়ে চাপ দিল স্ট্রটেকসের চাবি লাগাবার কলে। খুট করে একটু আওয়াজ হোল। চাবি দেওয়া ছিলনা, ওপর দিকে উঠে গেল তলার ঢাকনিটা।

তখন নিঃশব্দে তুলল স্ট্রটেকসের ডালাটা। এক হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগল। মিলল একখানা ধোয়া ধূতি। সেখানা নিয়ে সাবধানে গিয়ে ঢুকল কল ঘরে। কল ঘরটা আবার ওধারে। কলঘরের পাশেই হাবুদা নাক ডাকাচ্ছেন।

রেলের কামরায়—কলঘরের জন্তে যেটুকু স্থান বরাদ্দ করা হয়—তাতে একটা মাল্‌ঘষের ঘোরা ফেরাই মুদ্রিল। একখানা হাত এগন একেজো হোয়ে গেছে যে, কাপড়ের সংগে ঠেকাবার উপায় নেই। তার ওপর ছুটন্ত গাড়ী, স্থির হোয়ে দাঁড়াতে গেলে টলে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায় এটুকু জায়গার মধ্যে এক হাতে টেনেটুনে পরণের কাপড়খানা খুলে ফেললে বউটি। জামাটাও খুললে। ভেতরের ছোট পাতলা কাপড়ের জামাটা রইল। তারপর বহু কষ্টে ধুতিখানার পাট খুলে পরল। জামা কাপড় পড়ে রইল সেখানেই। হোক দামী, হোক নতুন, সেদিকে





নন্দর দেবার মত মনের
অবস্থা নয় তখন তার।
সেই জামা কাপড়ের ওপর

দাঁড়িয়েই ডান হাতে কল টিপে বাঁ হাতখানা কলের মুখে
ধরে রইল।

এতক্ষণ পরে হু হু করে জল পড়তে লাগল ছুঁচোখ দিয়ে।
কলের জলের সংগে—চোখের জল পাল্লা দেবার চেষ্টা
করতে লাগল। ঠাণ্ডা হোতে লাগল বউটির হাতের
জ্বালা। মনের জ্বালা ঠাণ্ডা হবার সংগে সংগে মনে
পড়ে গেল সেই ছোড়াটার কথা। গাড়ী থেকে পড়বার
সংগে সংগে হয়ত মরে গেছে সে। এতক্ষণে হয়ত
বাঘে শেয়ালে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে তাকে। রেল লাইনের
কাছে কি বাঘ শেয়ালরা আসে! হয়ত কেউই তাকে
খাবে না। আটকে থাকবে একটা ঝোপের মধ্যে।
দিনের বেলায় যে ট্রেন যাবে, সেই ট্রেনের লোক
দেখতে পেয়ে গাড়ী থামবে। দেহটা তুলে নিয়ে যাবে।

ওধারে ওর বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই
পুলিশে জানিয়ে দিয়েছে। পুলিশে ঠিকই বার করে
ফেলবে, রেল লাইনের ধারে পাওয়া গেছে তার দেহটা।
তখন মিলিয়ে দেখবে কোন তারিখে পাওয়া গেছে।
মিলিয়ে বার করবে কোন গাড়ী থেকে পড়েছে ও।
ব্যস, তারপর জানাজানি হবার বাকী থাকবে না কিছুই।
স্পষ্ট সকলেই সব ব্যাপার জেনে ফেলবে। আজ হোক,
কাল হোক, দশদিন পরেই হোক, জানাজানিটা হবেই।
অমুক দিন অমুক মেয়ের বিয়ে হোয়েছিল। পরদিন অমুক
গাড়ীতে মেয়ে স্বস্তুরবাড়ী যাচ্ছিল। সেই গাড়ী থেকেই
পড়েছে ছেলেরা রেল লাইনের ধারে। স্বতরাং—

স্বতরাং, তারপরেরটুকু ভাবতে গিয়েই চোখের সামনে
স্পষ্ট ভেসে উঠল—খুব চওড়া, খুব ফর্সা বুক একখানা,
অদ্ভুত স্বন্দর দু'খানা হাত। ভয়ানক জোর হাত দু'খানায়।
ভয়ানক জোর মাংসঘটার গায়েও। কেমন অনায়াসে
ছোড়াটার চুলের মুঠি ধরে বার করলে বেক্সির নিচে থেকে।
কেমন সহজে একখানা হাত খেঁতলে দিলে।

লোকটা এখন ঘুমচ্ছে। আবার জেগে উঠবে। যখন

ইচ্ছে তখন যেমন ভাবে খুশী বউটির গারে হাত দেবার
অধিকার ত' পেয়েছেই। ইচ্ছে করলে চাপের চোটে
দম বন্ধ করে মেরে ফেলতেও পারে।

আর কলের মুখে হাত রেখে থাকতে পারল না বৌটি।

দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলে কেউ উঠেছে কি না।
না, কেউ ওঠেনি। তখন এক হাতে কাপড় জামা
গুটিয়ে নিয়ে সাবধানে কলঘর থেকে বেড়িয়ে এল।

বেরিয়ে আসতেই তার খেয়াল হোল, গাড়ীটা দাঁড়িয়ে
রয়েছে। কখন দাঁড়িয়েছে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, মোটেই
টের পায়নি। হাবুদার বেক্সিখানার পাশ দিয়ে এসে
গাড়ীর দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে তবে তাকে নিজের
বেক্সিতে পৌছতে হবে। দু'টো দরজার মাঝখানে পৌছে
সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দু'পাশে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে,
কেউ জেগে আছে কিনা। কেউ জেগে নাই দেখে পা
টিপে টিপে এক ধারের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।
জামা কাপড় দু'টোকে পারের কাছে ফেলে পা দিয়ে
বেক্সির তলায় ঠেলে দিলে।

তারপর খুব সাবধানে নিঃশ্বাস বন্ধ করে একে একে ওপর
নীচের ছিটকিনি খুলে ফেললে। খুলে দরজা খোলবার
হাতলটা ঘোরাতে গেল। সহজ নয়, অতটা জোর ডান
হাতে নেই। তবু করতে লাগল চেষ্টা, বাঁ হাত ত'
আর কাজে লাগাতে পারে না। এক হাত দিয়েই
চেষ্টা করতে লাগল। বার কতক টানাটানি করার পর
একটু ঘুরল হাতলটা। তখন একধারে হেলে পড়ে
প্রাণপণে মারলে এক হেঁচকা। ফল ফলল, হাতলটা
ঘুরে যাবার সংগে সংগে দরজা একটু ফাঁক হোল। এক
ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল এসে তার মুখে চোখে।
ঠিক সেই সময়—সামান্য একটু শিটির আওয়াজ শোনা
গেল ইঞ্জিনের। তারপরই সামান্য একটু হেঁচকা টান
দিয়ে গাড়ীটা নড়ে উঠল।

আর সময় নেই। পেছ ফিরে তাকাবারও আর সময়

নেই। দরজাটা আর একটু ফাঁক করলে বোটি। ফাঁকটুকু দিখে পাতলা দেহখানি বার করে নিলে। ডান হাত খানি ভাগ্যে ভাল ছিল। একহাতেই দরজার পাশের লোহাটা ধবে দেহখানি ঝুলিয়ে দিলে। তারপর দিলে ছেড়ে লোহাটা। ক্রমেই বাড়ছে তখন গাড়ীর দৌড়। দৌড়েব জোর বাড়িয়ে গাড়ীখানা উধাও হোয়ে গেল।

॥ দুই ॥

হাত-পা খেঁতলে গেলে সময় লাগে চোঁটটা সামলাতে, যা শুকতে, টনটনানি করতে বেশ সময় লাগে। তবে সেরে যায়, বেশ কিছুদিন পরে বেগালুম মিলিয়েও যায়। ভাল কবে সেবে গেলে আর বোঝাই যায়না কোথায় লেগেছিল চোঁট, কতখানি মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছিল। হয়ত একটু দাগ থাকে, সামান্য একটু কালচে দাগ। অনেক ক্ষেত্রে তাও থাকে না। মুখেও ওপর বসন্তের গুটিব দাগই যখন মিলিয়ে যায়, তখন হাত খেঁতলাবার দাগ চিরকাল থাকবে কেন। কিন্তু মন যদি একবার খেঁতলায়—মনেও ওপর কখনও খুব ভারী জিনিষেব যা পড়ে—তাইলেই মুশকিল। মনটা একেবারে দরকচা মেয়ে যায়। দরকচা-মরা মন বড় সাংঘাতিক জিনিষ। বিছুতে লোমড়ায় না—মোচড়ায় না, তাতে না, গলে না। খাঁটি ইপ্পাতে গড়া ভোঁতা খাঁড়ার মত হোয়ে ওঠে তখন মনটা। সেই মনের আঘাতে ধারে না কার্টলেও ভারে কেটে ছুঁতাগ করা যায়।

বাবু বক্রবাহন ঝা এমন একটি মনের অধিকারী ছিলেন, যা খাঁটি ইপ্পাতে তৈরী। সে মনে ধার ছিল না, অসম্ভব ভার ছিল। অসম্ভব জ্বাতের সব কর্ম সমাধান করতেন তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ভারী ভোঁতা মনের সাহায্যে। কাজটা যতই কঠিন হোত, তিনি তার চেয়ে কঠিন হস্তে মারতেন কোপ। ভারের চোঁটে কাজ কেটে খানখান হোয়ে যেত।

বাবু বক্রবাহন ঝা বেঘোড়া গোছের উঁচু খেপা ঘোড়া পুষতে ভালবাসতেন। যে ঘোড়ায় কন্ট্রিনকালে কেউ

জিন কষতে পাড়ত না, সে ঘোড়া বক্রবাহন বাবুর কাছে নিয়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ তিনি সেটি কিনে ফেলতেন। কিনে জিন ছড়াই লাকিয়ে চডতেন তাব পিঠে। তাবপর চষা জমিব ওপর দিখে ঘোড়া সহ অদৃশ্য হোতেন। ঘণ্টা কতক পরে ফিরতেন যখন ঘোড়া নিয়ে, তখন ঘোড়া হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে- ব্যাপারটা। তারপর সেই ঘোড়ার পিঠে একটা পাঁচ বছরের মেয়েও অনাধাসে চডতে পারত।

শুধু ঘোড়া কেন, সব ব্যাপারেই ঐ রকম। রাজনীতি তিনি কখনও করতেন না। তাঁর মতে, রাজনীতি হোল এমন একদল মানুষের কাজ, যারা ঠুঁটো জগন্নাথ। হাত দিয়ে কিছুই করতে পারে না, মুখ দিয়ে জগৎ জয় করে। সেই রাজনীতিব মধ্য দিয়ে নেমে পডতে বাধ্য হোলেন তিনি সেশার। ভোঁটের সময় এমন একজন লোক দাঁড়াল—বক্রবাহনেব এলাকা থেকে—যার পিতাকে বক্রবাহন এলাকা চাবকে ছিলেন একটা মেবে মানুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে। চাবুক খাওয়া পিতা ছেলেটিকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লেখা পড়া শিখে দেশ নেতাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার জমেছিল ছেলের। বক্রবাহন দেখলেন, ব্যাপারটা সুবিধের হেনো। নির্বাচিত হোলে লোকটা হয়ত তাঁর সঙ্গেও বেগোড়পনা করতে পারে। সেই লোকটার বিরুদ্ধে জন দুই পেশাদার রাজনীতিক দাঁড়াল। তাদের কর্ম নয়—দেননেতাদের আত্মতাজন পাত্রটিকে হটাঁবার। অতএব বক্রবাহনকে নামতে হোল। দুম করে তিনি বিজের নাটা দিখে কেললেন। তারপর ভোঁট জেতার পালা। ঘুঁটিয়ে জল ঘোলা করবার পাত্র নন তিনি। বক্রতা দিলেন না, অপর পক্ষকে গালাগালি দিলেন না। এমন কি ভোঁটটি কাকে দিতে হবে, তাও কউকে বললেন না। শেষ সবকটি ভোঁট টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। ভোঁটদাতারা ভোঁট দিতে গিয়ে ভোঁটপত্রখানি নিয়ে বাস্লে না ফেলে বক্রবাহনের কর্মচারীর হাতে দিয়ে মূল্য নিয়ে চলে গেল। তখন সব কথানি ভেটপত্র





বঙ্গবাহনের নামে ভোট
বাক্সে ফেলে দেওয়া হোল।
হাঙ্গামা চুকে গেল।

বঙ্গবাহনের কর্মের ধারাই ঐ রকমের। সোজা ব্যাপারে
কখনও তিনিষ্ট ঘোরাণো পথে পরিচালিত করতেন না।
সব রকমের কর্ম সুসম্পন্ন করতে টাকা লাগে, এই ছিল
তার দৃঢ় বিশ্বাস। টাকার জন্তে—মস্ত বড় খামার করে-
ছিলেন তিনি। ধান, গম, সরষে, হাঁস, মোষ, মুরগি
সব তাঁর খামারে ফলত। বিশ্বস্ত টাকার যত্নপাতি
আনিয়ে ছিলেন খামারের জন্তে। ঔর এলাকায়—কারও
ঘরে খাবার জিনিষের অভাব ছিল না। ঐ খামার
করতে যত টাকা লেগেছিল, সব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন
রেল লাইন থেকে। রেল লাইনের ওপর মাল গাড়ী
চলে। মাল গাড়ীতে মাল থাকে, এ ত' জানা কথা।
যাসে এক আখানা মাল গাড়ীকে লাইন থেকে নামিয়ে
ফেলে রাতারাতি যদি মাল খালাস করে নেওয়া যায়—
আর সে মাল যথোপযুক্ত স্থানে পচার করার পাকা
ব্যবস্থা থাকে, তা' হলে কি পরিমাণ মুনাফা দাঁড়ায়
বঙ্গবাহন হিসেব কষে বার করেছিলেন। সে হিসেবে
কোথাও এতটুকু মারপ্যাচ ছিল না। দেখতে দেখতে
বঙ্গবাহন বাবুর খামার দেশ বিখ্যাত হোয়ে উঠল।
তারপর নামলেন ভোটে, জিতলেন ভোট এবং দস্তুরমত
একজন নাম করা লোক হোয়ে দাঁড়ালেন। লোকে
তাঁর নাম করে বলাবলি করত, বঙ্গবাহন বাবুর যত মন
আর কটা মানুষের আছে। দেশজন্তু মানুষের খাওয়া পরার
ব্যবস্থা যিনি করতে পারেন, তিনি কি সহজ মানুষ নাকি!
সত্যি বঙ্গবাহন বাবু সহজ মানুষ নন। সহজ মানুষ নন বলেই
কখনও তিনি সহজভাবে কারোর সংগে মিশতেন না। সভা
যেতেন না, অভিনন্দন নিতেন না, প্রস্তাব পাশ করাতেন
না। যা করা প্রয়োজন, নিজেই করে শেষ করতেন।
সেই রকম একটা কাজের কাজ করার দক্ষ গোটী কতক
রেল লাইন আলগা করে রেখেছিলেন তিনি সেদিন
রাজে। কথা ছিল, সেই সময় একখানা মালগাড়ী যাবে।
কোথায় কি গুলট পালট হোয়ে গেল। মাল গাড়ীর বদলে

হু হু শব্দে আসতে লাগল একখানা এক্সপ্রেস। রেলের
গেটম্যান বাবুলালের কাঁধে হাত দিয়ে একটা কোপের
আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবাহন বাবু। ব্যাপার
দেখেই বাবুলালকে বললেন, রেল লাইন ধরে ছুটে।
একজন শাংরেদকে বললেন, একটা মশাল ধরিয়ে দিতে।
জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে গেটম্যান ছুটল। এক্সপ্রেস
ঝুপ ঠিক আয়গায়। বহু লোক রক্ষা পেল।

যথা সময়ে গেটম্যান যথোপযুক্ত পুরস্কার পাবে রেল
পরিচালকদের কাছ থেকে। বঙ্গবাহন বাবু কিন্তু পুরস্কার
পেয়ে গেলেন সে দিন রাজেই। লাইনের নাট বন্ট
টাইট হবার পরে যে মুহূর্তে আবার এক্সপ্রেস চলতে
শুরু করলো, সেই মুহূর্তে পুরস্কারটি খসে পড়ল গাড়ীর
গা থেকে। অল্প কেউ লক্ষ্য করল না, বঙ্গবাহন বাবুর
কিন্তু নজর এড়াল না। আগেই তিনি সরে পড়তে
আদেশ দিয়েছিলেন শাংরেদদের। একটু দূরে একটা
উঁচু টিলার ওপর অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল একটা
মিসমিসে কালো ঘোড়া। তার পিঠে বঙ্গবাহন নিশ্চল
হোয়ে বসে গাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অতগুলো
মানুষের প্রাণ রক্ষা হওয়ার দক্ষ খানিকটা নিশ্চিন্ত
হোয়েছিলেন তিনি। তিনি ত' প্রাণের কারবার করেন
না, তাঁর প্রয়োজন মাল। তা' হতভাগা মালগাড়ীটা
যখন বেইমানি করল, তখন শুচ্ছেরখানেক প্রাণ নষ্ট করে
তাঁর লাভ হোত কতটুকু! এই সমস্তই হিসেব করছিলেন
বঙ্গবাহন বাবু। এমন সময় স্পষ্ট দেখলেন, একটা জিনিষ
গাড়ীর গা থেকে খসে পড়ল। গাড়ীটা চলে গেল। ঘোড়ার
পিঠে চড়ে বঙ্গবাহন বাবু সোজা নেমে গেলেন লাইনের
ধারের খাদের মধ্যে। তারপর গাড়ী থেকে খসে পড়া
জিনিষটিকে ঘোড়ার ওপর তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

রাজি শেষ হবার আগেই বঙ্গবাহন বাবু কিরলেন,
দাড়ি কামালেন। দাড়ি কামিয়ে তাঁর এলাকার মধ্যে
কোথাও কিছু গুণ্ডগোল হোল কিনা—খোঁজ নিতে বেরলেন।



তারপর যখন জানতে পারলেন, এক্সপ্রেস ট্রেনখানা কি ভাবে রক্ষা পেয়েছে গের্টম্যানের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের জন্তে, তখন ছুটলেন গের্টম্যানের ছবি তুলতে। ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলেন সংবাদপত্রে। একটা সভার ব্যবস্থাও করলেন। মহত্বমা হাকিম সাহেবকে সভাপতি হবার জন্ত রাজী করিয়ে এলেন। সভায় গের্টম্যানকে তার সংকল্পের জন্তে অভিনন্দন দেওয়া হবে। দেশের মানুষ বুদ্ধক, সামান্য মাইনের এক গের্টম্যানের কর্তব্যজ্ঞান কত বড়। দেশের মানুষে জাহক, বাবু বক্রবাহন ঝা কতখানি নরদ দিয়ে গরীবের ব্যাপার বিবেচনা করেন। দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বাঁচাতে গেলে এই সব উল্লেখযোগ্য সংবাদ সকলের জানা দরকার। জানতে পারলে তবে ত' সাধাবণ মানুষে প্রেরণা পাবে—সংকাজ করার। তবে ত' মানুষ শিখবে কি ভাবে সমাজে বাস করতে হয়।

অতঃপর চারিদিক রক্ষা করে—বক্রবাহন বাবু আবার বাড়ী ফিরলেন। সমাজে বাস করতে হোলে সব দিক সামলাতে হবে বৈকি। যে পুরস্কারটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তিনি রাজ্যে, সেটিকে সঠিকভাবে সামলাতে হবে। কাকে বকে না টের পায—কি এনেছেন বক্রবাহন রেল লাইনের ধার থেকে কুড়িয়ে। জানবার উপায়ও নেই কারণ কিছু, বক্রবাহনের অন্দর মহলের সংবাদ হালকা বস্ত্র নয় যে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

তবু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ সাবধানের মার নেই। বক্রবাহন বাবু বাড়ী ফিরে সোজা অস্ত্রপুরে প্রবেশ করলেন। বক্রবাহন বাবুর অস্ত্রপুর বড় অদ্ভুত স্থান, অস্ত্রপুরে জীলোকের প্রবেশ নিষেধ। অস্ত্রপুরের স্ত্রীতা ভদানক কড়া। মাত্র গুটি পাঁচেক পুরুষ বাস করে সেখানে। তারা ছাড়া একমাত্র বক্রবাহন সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। আর কারণ প্রবেশের অধিকার নেই।

অস্ত্রপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর বয়স নব্বুই পার হয়েছে। লোকটার মুখের গায়ের চামড়া এমন ভাবে কুঁকড়ে গেছে যে মানুষের চামড়া বলে মনেই হয় না। মনে হয়, শুকনো একখানা কুমিরের চামড়া ঢাকা দিয়ে অদ্ভুত

একটা জীব চলা ফেরা করছে।

বক্রবাহন গিয়ে দাঁড়ালেন

সেই লোকটার পাশে। তার কানের সংগে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, “হংসরাজ, সংবাদ কি?” দারভাঙ্গা জেলার দেহাতী ভাষায় কথা বললেন বক্রবাহন। হংসরাজ চোখ দুটো একটু ফাঁক করে মাথা নাড়তে লাগল। বক্রবাহন আবার তার কানের সংগে মুখ ঠেকিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন—“ছ’স ফিরেছে।”

হংসরাজ যথাপূর্ব মাথা নাড়তে লাগল।

তখন বক্রবাহন সেই ভাবে ফিসফিস করে হংসরাজকে আদেশ করলেন তাকে আনবার জন্তে।

হংসরাজ নামল খাটিয়ার ওপর থেকে। বাঁশের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে ঠক ঠক আওয়াজ তুলে চলে গেল। বেশ নোজা ভাবেই হাঁটতে পারে লোকটি, তবে হাত-পাগুলো ভদানক কাঁপে।

বুড়ো মানুষটি চলে যাবার পর আরও দু’জন অস্ত্রপুর-বাসীর আবির্ভাব ঘটল। দু’জনকেই প্রায় এক রকম দেখতে, বেঁটে বেঁটে দুটো জ্যাজ্ঞ গাছের গুঁড়ি। শুধু গা, হাঁটুর ওপর তোলা কাপড় পরা, কোমর বাঁধা, দুটি যশমর্ক এসে দাঁড়াল বক্রবাহন বাবুর হুঁপাশে। তাদের একজনের হাতে রয়েছে একটা কাঁসার বাটি, বাটিতে একবাটি সরষের তেল। নিশ্চয় বক্রবাহন তাঁর পিরাণ ধুতি চাঁদর খুলে তাদের হাতে দিয়ে দিলেন। ধুতির তলায় ছিল ছোট একটি আঙ্গুর। সেটি মাত্র রইল অংগে। একখানা চোঁকি টেনে নিয়ে বসলেন তিনি তেল মাখতে। যশমর্ক দু’জন দু’দিক থেকে তাঁর দুটো হাত নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে প্রবল বিক্রমে তৈল মর্দন শুরু করলে।

তৈল মর্দন কর্মটি কিন্তু নিশ্চয়ই সমাধা হবার কর্ম নয়। একটু পরেই মর্দনকারীদের গলা থেকে ইয়াক হোক—



নানা হুঁকারের আওয়াজ
বেরুতে লাগল। তার
সঙ্গে চটাপট চর ধান্ধড়ের

শব্দও যোগ হোল। হাত ছেড়ে দিয়ে তারা তখন বজ্রবাহনের
পিঠের ওপর গিষে পড়েছে। এমন সময় ফিরে এল হংসরাজ।
এবং তার পেছনে এসে দাঁড়াল আর একটি প্রাণী।
সব পাড় একখানি ধুতি পরা, রুম্ম চুল শুকনো মুখ
প্রাণীটির চোখে মুখে একটা নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া।
ধুতি পরা থাকলেও বোঝা যায়, সে পুরুষ নয়। পুরুষ
হোলে ওর চোখের চাউনিতে অতখানি অসহায়তা
নিশ্চয়ই ফুটে উঠতো না। অদ্ভুতভাবে সে তাকিয়ে
রইল বজ্রবাহনের দিকে। তেল মাথাবার জন্তে অমন
ভয়ানক অত্যাচার যে কারও শরীরের ওপর করা যায়,
তা' চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। স্তম্ভিত
হোয়ে সে তাকিয়ে রইল।

বজ্রবাহন সদ্য কঠে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন—“এস।
এখন একটু ভাল বোধ করছ বোধ হয়। কিন্তু তোমার
খুব কষ্ট হবে যে এ বাড়ীতে থাকতে। এখানে ত'
জীলোক কেউ থাকেনা। তাই বলছিলাম কি, চল আজ
বিকেলের গাড়ীতেই তোমাকে তোমার বাবা-মা, তোমার
স্বামীর কাছে পৌঁছে দি।”

কোনও জবাব পেল না বজ্রবাহন। জবাব না পেয়ে তিনি
মুখ তুললেন। তাঁর ঘাড়ের ওপর রক্ষা দেওয়া চলছিল তখন,
রক্ষা থামাবার জন্তে ইসারা করে তিনি মুখ তুললেন।
মুখ তুলেই ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে গেলেন। এ কি? ওরকম
অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠল কেন ওর চোখে!

বজ্রবাহন দেখতে পেলেন, নিবিড় কালো চোখের তারা দু'টি
হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছে। চোখ দু'টো বড় হয়নি, কোঁচ-
কায়নি। যেমন ছিল, ঠিক তেমনিই আছে। শুধু চোখের
তারা দু'টি থেকে খুব তীব্র জ্যোতি ঠিকরে বেরছে। কয়েক
মুহূর্ত সেই জ্যোতির দিকে তাকিয়ে রইলেন বজ্রবাহন।
তারপর খুবই হালকা গলায় বলতে লাগলেন—“বেশ,
বেশ। কোথাও তোমায় যেতে হবেনা। কেউ জানতে
পারবেনা কোথায় তুমি আছ। তবে বাড়ীতে থাকতে

তোমার কষ্ট হবে। যেবে ছেলে কেউ নেই কিনা।
আচ্ছা, এখন ত' থাক। স্নান করগে, হংসরাজ তোমায়
ধুতি দেবে, গামছা দেবে। নতুন ধুতি গামছা, কেউ
পারেনি। আর, এখন একদম ভয় কোর না। মেয়ে
ছেলের মনে নানা রকম খারাপ ভাবনা আসে। ও
সমস্ত মন থেকে তাড়িয়ে দেবে। নব্বত তোমার মনের
ভাবনাই অন্ত লোকের মনে ঢুকে পড়ে তোমার সর্বনাশ
ঘটাবে। ব্যাস, কিছুই তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করব না।
কিছুই আমার জানবার নেই। পরের ব্যাপার নিয়ে
আমি মাথা ঘামাই না। তোমার চোখ দেখে বুঝতে
পারলাম, আপনার লোকের কাছে ফিরে যেতে চাও
না তুমি। বেশ ত', খুব ভাল কথা। এখন মনে জোর
নিয়ে ভাল ভাবে থাকগে। স্নান কর, খাওয়া দাওয়া
কর। বিকেলে খুব বড় সাধুর কাছে তোমায় নিয়ে যাব।
তাঁর কাছে তোমায় রেখে আসব। সেখানে তুমি শান্তিতে
থাকতে পারবে।”

ধীরে স্বস্থে গুছিয়ে বললেন কথাগুলি বজ্রবাহন। চুপ করে
শুনল সব মেয়েটি। তারপর যেমন ভাবে এসেছিল তেমনি
ভাবে ধীরে ধীরে হংসরাজের পেছন পেছন চলে গেল।

বাবু বজ্রবাহন বা স্নান আহার শেষ করলেন। তাঁর
আহারের সংগে ভাত, ডাল লুচি, কটির সম্পর্ক নেই।
দই, চিড়ে, ছাতু, কলা, গুড়—আর কিছু শুকনো মেওয়া।
ব্যস, আর কিছু নয়। জলের বদলে এক লোটা দুধ
পান করলেন। আহার শেষ হবার সংগে সংগে সেদিনকার
চিঠি পত্র সব দেখতে বসলেন। সকাল থেকে চিঠি পত্র
পড়ে আছে। খামারের কান্ডকর্মও দেখা হয়নি, বহু কাজ
বাকী। জরুরী চিঠি পত্র কিছু থাকলে তখনই জবাব
দিতে হবে। নয়ত সেদিনের ডাকে যাবে না।

একখানা চিঠি খুলতে পড়তে এক এক মিনিটের বেশী
লাগল না। সংগে সংগে অনেক চিঠির কোণায় সংক্ষেপে
তাঁর অভিমত লিখে দিলেন। ঐ লেখা দেখে তাঁর

অফিসের কর্মচারী জবাব দেবে। খান বতক চিঠি পড়া আর অভিমত লেখা—খুবই তাড়াতাড়ি হোয়ে গেল। তারপর একখানি বেশ মোটা গোছের খাম পড়ল হাতে। খাম খুলে ভেতরের কাগজ পত্রগুলো বার করে পড়তে শুরু করলেন বক্রবাহন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখের ভাব বদলাতে লাগল। পড়া শেষ হবার আগেই উঠ পড়লেন তিনি, চিঠিখানা হাতে নিয়ে অগ্রমনস্ক ভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গোটা দুই দালান, খন তিনেক ঘর পার হোয়ে গিয়ে ঢুকলেন একখানি ছোট ঘরে। তখনও তাঁর নজর সেই চিঠির ওপর—চিঠি ছাড়া অল্প দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই।

ঘরে ঢুকেও চিঠির ওপর থেকে নজর তুললেন না বক্রবাহন বাবু। কতকটা আত্মগত ভাবে বলতে লাগলেন—“শোন, একটা কথা বলি তোমায়। এখনই বেরতে হবে আমাকে। পাঁচ সাত দিন লাগবে ফিরতে। অতদিন কি একলা থাকতে পাববে তুমি?”

কথাটা বলে ফেলেই—বক্রবাহন বাবুর খেয়াল হোল, একটু ভুল হোয়েছে। ভুলটুকু শোধরাবার জন্তে চোখ তুলে তাকালেন। যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন কথাগুলো, তার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হোয়ে গেলেন।

একি! নাওয়া খাওয়া হয়নি নাকি। এক ভাবে সেই এক কাপড় পরে বসে রয়েছ কেন এখনও! চুপ করে তাকিয়ে বইলেন একটু সময় বক্রবাহন বাবু, তারপর এগিয়ে গিয়ে একেবারে পাশে দাঁড়ালেন। বক্রবাহনের গলার স্বর বর্কশ নম্র, তবে ভয়ানক ভারী। সেই ভারী স্বরকে যতদূর সম্ভব হালকা কবে বলতে লাগলেন—“এখনও জ্ঞান করনি! নাওয়া খাওয়া না করে বসে থাকলে চলবে কি করে? বাঁচতে হবে ত’। আমি কি তোমায় জোর কবে ধরে এনেছি? মনে করেছে বোধ হয়—আমার কোন কুমতলব আছে। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন। এখনও সময় আছে—এখনও তোমায় পৌঁছে দিতে পারি তোমার আত্মীয় স্বজনদের কাছে। পৌঁছে দিবে আমার কাজে আমি চলে যাব।”

চুপ করলেন বক্রবাহন বাবু। কিছু একটা জবাব পাবার

আশাতেই বোধ হয় একটু সময় চুপ করে বইলেন।

কে জবাব দেবে! জবাব

বে দেবে, সে মুখ তুলল না। যেমন ভাবে বসেছিল বসে বইল।

বক্রবাহন তখন চিঠিগুচ্ছ তাঁর ডান হাতখানি বাঁধলেন সেই নতমুখীর রুক্ষ চুলের ওপর। রেখে হালকা ভাবেই বলতে লাগলেন—“ভুল করছ তুমি। ভুল করে অনর্থক নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কেউ তোমার গাড়ী থেকে ফেলে দেয়নি। তুমি নিজেকে গাড়ী দরজা খুলে নিচে পড়লে। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম তোমার উদ্দেশ্য। এখন বুঝতে পাবছি, যাদেব হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্তে প্রাণেব মারা ত্যাগ করে অন্ধকার বাজে জঙ্গলের ভেতর গাড়ী থেকে নেগেছিলে, তাদের হাতে আর পড়তে চাওনা। এ ত’ খুব ভাল কথা। এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই বোঝবার। কিন্তু পালিয়ে এসে আবার নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? এখন আর মন খারাপ করার কি আছে? একটা চিন্তা অবশ্য হয়ই। কোথায় এলাম, কার হাতে পড়লাম, এবার কপালে কি ঘটবে, এ সব ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। এ সমস্ত ভাবনা নেয়ে খেয়ে হুস্থ হোয়েও করা যায়। আর আমাকে দ্বিজ্ঞাসা করতে পার, যদি কিছু দ্বিজ্ঞাসা করার থাকে। না হয় আমিই বলছি, এখন তোমার কি করা উচিত। তোমাব চেয়ে আমি অনেক বড় বয়সে, আর তোমাকে আমিই তুলে এনেছি। তুলে না আনলে এতক্ষণে হয়ত তোমায় হায়নার ছিঁড়ে খেত। তা’ আমাব পরামর্শ ত’ তোমার শোনা উচিত।”

আবার থামলেন বক্রবাহন বাবু। হাতখানা কিছু মাথার ওপর থেকে নামালেন না। ইঠাং তার খেয়াল হোল, মাথার উপর রাখা হাতখানা—কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু নজর করে দেখবার পর বুঝতে পাবলেন, তাঁর হাত কাঁপার কারণটি। নিচেব ছোট্ট শরীরটাই কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওই জাতের অবকদ্ধ কাহ্ন আর বোধ হয় কখনও দেখেননি তিনি। সবিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ





তাকিয়ে রইলেন। মনে হোতে লাগল তাঁর—
কান্নার চাপে শরীরটাই
বুঝি ফেটে আঁধ ফাটা হয়ে যাবে। শেষে আর থাকতে
পারলেন না, মাথাটা বেশ জোরে নাড়তে লাগলেন।
সংগে সংগে তাঁর গলার স্বরও চড়ল। চড়া গলায় বলতে
লাগলেন—“দেখ, কান্না আমি সহ করতে পারি না।
কান্না সহ করতে পারিনা বলেই এ দুনিয়ায় আমার আপন
জন কেউ নেই। যারা ছিল, তারা আমায় ছেড়ে গেছে।
আমি কিন্তু একটুও কাঁদিনি। এই ঠিক তোমার মতই
একটা মেয়ে ছিল আমার। শেষ পর্বস্ত সেও গেল—আমি
কাঁদিনি। মেয়েটার নাম ছিল কস্তুরী, কস্তুরী কপূরের
মত উবে গেল।”

উবে গেল—কথাটি উচ্চারণ করার সংগে সংগে বজ্রবাহন
স্বয়ংই যেন উবে গেলেন। এমন ভাবে ‘হঠাৎ বন্ধ হোল
তাঁর গলা যে, মুখ তুলতে বাধ্য হোল মেয়েটি। মুখ
তুলে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি
উঠে একখানা হাত ধরে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে
বলতে লাগল—“কি . হোল? হোল কি আপনার?”
অনেকক্ষণ ধরে আটকানো দমটা ছাড়লেন বজ্রবাহন বাবু।
তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—“না, কিছুই হয়নি। হবে
কি আমার! হ্যাঁ, কি যেন বলতে এসেছিলাম তোমায়!
ওই যা, তোমার নামও ত’ এখনও জিজ্ঞাসা করছি হয়নি!
কি নাম তোমার? কি বলে তোমায় ডাকব?”

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি জবাব দিল—“কস্তুরী,
কস্তুরী বলেই ডাকবেন আমায়।”

স্তব্ধ হোয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বজ্রবাহন বাবু।
তারপর হাতখানা তুলে কস্তুরীর মাথার ওপর রেখে
বিড়বিড় করে বললেন—“স্নান করে তাড়াতাড়ি কিছু
খেয়ে নাও। অবিশ্বাস কোর না, ভয় পেও না, আবার
পালিয়ে যেও না। সেধে ফিরে এসেছ যখন আমার
কাছে, তখন মন ধারাপ করার কি আছে? সময় বড়
বেশী নেই, সব বন্দোবস্ত করে আমায় বেরতে হবে।
একটু আগে তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একলা থাকতে

ভয় করবে কিনা। কি ভুলই করেছিলাম। কস্তুরী কি
কাউকে ভয় করতে পারে? ভয় কাকে বলে, কস্তুরী
যে জানেই না। ভয় কি বস্তু জানলে কি একলা
পালাতে পারে?”

বলতে বলতে বজ্রবাহন বাবু পেছন ফিরলেন। ঘর থেকে
বেরবার আগে বলে গেলেন—“হংসরাজকে বিশ্বাস করবে।
ওর কথা শুনবে। যা দরকার ওর কাছ থেকে চেয়ে
নেবে। লোকটা কিন্তু কানে শুনতে পায় না। কানের
কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে একটু শুনতে পায়।
হংসরাজকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

॥ ভ্রম ॥

বাবু বজ্রবাহন বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। খুবই
জরুরী কাজ ছিল তাঁর কোথাও। পাঁচ সাত দিন লাগবে
তাঁর ফিরতে। সেই কথাই জানাতে গিয়েছিলেন তিনি।
জানাতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, একলা থাকতে
মেয়েটির ভয় করবে কিনা। যখন বুঝতে পারলেন,
ভয় করার কোনও কারণ নেই। কারণ, ভয় কাকে
বলে জানেই না কস্তুরী। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে
চলে গেলেন। তবে চলে যাবার আগে হয়ত কস্তুরীর
সংগে আর একটিবার দেখা করা তাঁর উচিত ছিল।
কিন্তু অনেক উচিত কর্মই অনেক সময়—সময়ভাবে সমাপন
করা যায় না। বজ্রবাহন বাবুও পারলেন না। কর্মচারী-
দের সংগে কাজ বর্মের কথা বলতে বলতে—সময়টুকু
খরচ হয়ে গেল। আড়াই ক্রোশ দূরে রেল স্টেশন,
গাড়ী ফেল করার ভবে বাবু বজ্রবাহন বা তাঁর সবচেয়ে
জরুরী গোড়ার পিঠে চড়ে সোজা মাঠ ঘাট টপকে
ছুটলেন। আগেই তাঁর জিনিষ পত্র স্টেশনে পাঠিয়ে
দেওয়া হয়েছিল। রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তটিও তিনি
নষ্ট হতে দিলেন না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটি তাঁর
সবচেয়ে বিশ্বাসী কর্মচারীর কানে শেষবার বলে গেলেন।
অতঃপর আর কোনও গোলমাল হোলনা। বজ্রবাহন

বাবুর উপদেশ মত কাজ কর্ম ঠিকঠাক চলতে লাগল। হুঁজন দেহাতী জীলোক নিযুক্ত হোল তৎক্ষণাৎ বক্রবাহন বাবুর অন্তরমহলে। তারা, বক্রবাহন কত্কা কস্তুরীর সেবা করবে। বিলকুল ব্যবস্থা পালটে গেল কয়েক ঘণ্টার ভেতর। পুরুষ বলতে একমাত্র হংসরাজ রইল অন্দরে। বাকী ক'জনকে সরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে অত্র কাজে নিযুক্ত করা হোল। রাশি রাশি শাড়ি আর ব্লাউসের কাপড় অন্দরে গিয়ে ঢুকল। মেয়েদের ব্যবহার্জ জিনিষ পত্র বক্রবাহনের অন্তরমহলে একটিও ছিল না। পাঁচ ক্রোশ দূরের সহর থেকে সবই এসে গেল সন্ধ্যার আগে। জমা দিয়ে দেওয়া হেল সেগুলো হংসরাজের হেপাজতে। কোনও দিকে কোনও অহুষ্ঠানের এতটুকু ক্রটি রইল না।

সন্ধ্যার আগেই বক্রবাহন কত্কা কস্তুরীকে ষথাযোগ্য সম্মানের সহিত আনিয়া দেওয়া হোল, মালিক জরুরী কাজে অত্র রওয়ানা হোয়ে গেছেন। ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে। কিন্তু সে জ্ঞাত কোনও চিন্তা নেই। মালিকের অস্থপস্থিতিতে মালিক কত্কার ঘাতে কোনও অহুবিধা না হয়—এ জ্ঞাত এক পাল কর্মচারী হামেহাল প্রস্তুত হোয়ে রয়েছে।

প্রস্তুত হোয়ে রইল সবাই, শুধু কস্তুরীই নিজেকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করতে পারল না। প্রান্তির বিশাল আয়োজন দেখে সে আরও অপ্রস্তুত হোয়ে পড়ল। সম্ভবও নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজের অতীতটাকে ধুয়ে বুঁছে সাফ করে কস্তুরীতে পরিণত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা! পারে বটে মেয়েরা—নতুন জীবনের সংগে টপ করে নিজেরের খাপ খাওরাতে। বিয়ের পর খুন্সর বাড়ী গিয়ে রাতারাতি খুন্সর বাড়ীর সামগ্রীতে পরিণত হোতে মেয়েরাই পারে। জন্ম থেকে বিশ বাইশ বছর কাটিয়ে যায় যেখানে, সেখানের সব কিছুই বেমালুম ভুলে যায়। হাজার ভুললেও তবু কিছু বাকী থাকে। যেটুকু বাকী থাকে—সেটুকুই বোখা হয় আসল বস্তু। আসল বস্তুটুকুর জালা বড় ভয়ানক জালা। সেটুকু মনের মধ্যে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পুড়তে থাকে।

কস্তুরীর মনও কস্তুরী ধূপের মত আশু আশু পুড়তে লাগল।



সে ধূপের সৌরভ নেবার মাহু বক্রবাহনের অন্তঃপুরে ছিল না। কিন্তু

স্বামীর বাড়ীতে থাকে। তাই নতুন স্বামীঘর কবতে গিয়ে যেটুকু ধুঁইয়ে ওঠে গন—সেটুকু সার্থক হয়। বিশেষ একটি মাহুয থাকে সেখানে, লুকিয়ে সান্ধনা দেবার। সে সান্ধনা মুখের সান্ধনা নয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সে সান্ধনার নাগাল পায় না। সে অত্র জিনিষ। হৃদয় দিয়ে হৃদয় নেওয়ার সান্ধনা সেটা। ব্যাকরণের সূত্রে যে সে সান্ধনার ব্যাখ্যা মেলা ভার।

বেচারী কস্তুরী। জীবন তরীখানি তার ভিড়তে চলেছিল যে ঘাটে, সে ঘাটে না ভিড়ে—আর এক ঘাটে এসে ভিড়ল। নতুন স্বামীর এখানেও অপেক্ষা করছিল তার জ্ঞাত, নতুন স্বামীর বতায় হাবুডুবু খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠল সে। সেখানে শব্দ হাতে একজন তার হাত ধরে থাকত, এখানে আঁকড়ে ধরার মত এক গাছি খড়কুটোও নেই। শুধু উপচার, বেঁচে থাকবার জ্ঞাত এত রকমের সামগ্রী প্রয়োজন হয়, তাও বেচারী জানত না। উপচার, উপচারেব ওপর উপচার। উপচারের উপদ্রবে দম বন্ধ হবার উপক্রম হোল। মানা করলেও মানে না, দ্বিগুণ উৎসাহে আরও নতুন উপচার পাঠাতে থাকে। নেপথ্যে বসে কারা যে এই উপদ্রব চালাতে লাগল, তাও সে জ্ঞানতে পারল না।

সব চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র ত' সেইটেই। এবাড়ীতে কোনও কিছুর অভাব নেই, অভাব শুধু একটা মাহুযেব। যে মাহুযটির সংগে কথা বলা যায়, যাকে হুঁকথ জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাওয়া যায়।

যে হুঁজন দেহাতী জীলোক কাজ কর্ম করে—তাদের মুখ যেন সেলাই করা। কথাবার্তা ত' বলেই না, কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করলে কাঁদকাঁদ মুখ করে সামনে থেকে সরে যায়। আর হংসরাজ ত' কিছু শুনতেই পার না। যা শোনে, যেটুকু শোনে—তার জবাবে শুধু মাথা নড়তে থাকে। আর নাম একেবারে নির্জন কারাবাস। এ অবস্থায় মাহুয বাঁচে কেমন করে!



বাঁচে, সহজে কেউ মরে
না বলেই বেঁচে থাকে।
কল্পরীও বেঁচে রইল—

কি মরে রইল, তা' সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না।
আগে সে কে ছিল, তার আসল নামটা কি, কাদের
ঘরে জন্মেছিল সে, কোথায় বড় হয়েছিল, কতদূর
লেখাপড়া শিখেছিল—এই সমস্ত ভাবনা, চিন্তাগুলো যদি
উবে যেত তার মন থেকে, তা'হলে খুব সহজ হোত
বেঁচে থাকার। যেমন সহজে সেই মেয়েটি মরে গেল
আর কল্পরী জন্মাল, তেমনি অনায়াসে যদি সেই মেয়ে-
টিকে একবারে ভুলে যেতে পারত কল্পরী, তা'হলে
বাঁচাটা সত্যিই বেশ নিরীক্ষার হোত। কিন্তু সেই
আগের মেয়েটি কল্পরীকে ছাড়ল না। সেই মেয়েটির
খোঁতলানো বাঁ হাতের অঙ্গুলকটা কিন্তু কল্পরীর হাতেই
রয়ে গেল। ব্যথা টনটনানি রইল না, দাগটাও প্রায়
মিলিয়ে এল। কিন্তু ভয়টা রইল। আব্দুল খোঁতলাবার
ভয় নয়—আব্দুল খোঁতলাবার যাতনা কেমন তা' জানা
হোয়ে ছিল। সে যাতনার চেয়ে অনেক সাংঘাতিক
ধরণের যাতনা, বোধ হয় দম বন্ধ হোয়ে মরবার। দম
বন্ধ হোয়ে মরবার ভয়ে অজস্র উপচারের মাঝখানে
আলগোছে হোয়ে বেঁচে রইল কল্পরী। বেঁচে থেকে দম
বন্ধ হোয়ে মরবার যাতনা সহ করতে লাগল।

কত সহজেই না সে এড়াতে পারত এই ভাবে বেঁচে

থাকাটা। গাড়ীটা থেমেছিল, থেমেছিল বলেই—তার
সাহস হোয়েছিল নামবার। তার চেয়ে ঢের ভাল হোত,
যদি সে বাঁপ দিতে পারত ছুটন্ত গাড়ী থেকে। ভয়ানক
জোরে যখন ছুটছিল গাড়ীখানা—তখন যদি বাঁপিয়ে
পড়ত দরজা খুলে, তা'হলে হাড়গোড় চূর্ণ হোয়ে যেত।
এমন ভাবে তালগোল পাকিয়ে যেত দেহটা যে, কেউ
আর চিনতেই পারত না। সে ছোঁড়াটারও হয়ত সেই
অবস্থা হোয়েছে। যে ভাবে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে
দেওয়া হোল ছুটন্ত গাড়ী থেকে, তাতে কি আর তার
দেহ আস্ত থাকা সম্ভব! শেয়াল শকুনে যদি না খেয়েও
থাকে, তা'হলেও সেই হাড়গোড় চামড়া মাংসের ডেনাটা
কে চিনতে পারবে! কে মরেছে না কে মরেছে।
অমন কত লোক রেল লাইনের ধারে মরে পড়ে থাকে।
ক'টারই বা খোঁজ হয়!

কেউ কখনও তার খোঁজ পাবে না। খোঁজ না পেলেও
বেলেকারীটা কিছু কম হবে না। দু'য়ে দু'য়ে যোগ দিয়ে
চার হয়, এ হিসেব কে না জানে। তেমনি হিসেব করে
সবাই সব কিছু বার করে ফেলবে। হিসেবটা খুব
সহজ। যেদিন পরিমল উধাও হোল, তার আগের দিন
স্বজাতার বিয়ে হোয়েছিল। এই গেল দুই। তারপর
দুই হোল, গাড়ী থেকে স্বজাতা উধাও হোয়ে গেল, বেল
লাইনের ধারে কোথাও স্বজাতার মৃত দেহ পাওয়া গেল
না। এই দুই আর দুই যোগ দিলে হবে চার। চার

অর্থে পরিমল আর স্বজাতার চার-
খানা পা। সবাই স্পষ্ট তখন দেখতে
পাবে, স্বজাতা আর পরিমলের
চারখানা পা পাশাপাশি চলছে।
অর্থাৎ স্বজাতাকে নিয়ে পরিমল
পালিয়ে গেল।

ইস! কি বিদ্রী কেলেকারী! কি
ভয়ানক কুচ্ছিক কথা! একটা হাড়
হতচ্ছাড়া বখাটে ছোঁড়া, যার ছায়া
মাড়াতোও ঘেঁরায় মরে যেত স্বজাতা,
সেই হতভাগীর নামের সংগে চিপ-



ভারতের 'পতাকা মার্কা'

সারিষার তেল

ফোন ৩৫-২৭৭৪ ব্যবহারে ত্রুটি দেখুন

ভারত অয়েল মিল

কালের জন্তে স্বজাতার নামটা জড়িয়ে রইল। মরে গিয়েও স্বজাতা এই কেলেকারির হাত থেকে রেহাই পেল না।

বেঁচে থাকলেই কি রেহাই পেত!

অসম্ভব, তিছুতেই রেহাই পেত না। যদি সে সোজা গিয়ে পৌঁহত স্বামীর ঘরে—তা'হলেও লোকে বার করে ফেলত আসল ব্যাপারটা। বিয়ের পর যেদিন স্বজাতা শব্দর বাড়ী গেল, সেদিনই কেন ঐ ছোঁড়া পরিমল উধাও হেল! ঐ চোখাড়ে ছেলের দাদামশাইটি আরও চোখাড়। বুড়ো হোষে মরতে চলল, তবু পাড়ার রকে বসে চ্যাংড়াদের সংগে চ্যাংড়ামি করে। সেই বুড়ো তার নাতির জন্তে ভোলপাড় করে ছাড়ত। বড় বড় লোক সব বুড়োর হাতের মুঠোয়। তাদের ধরে পুলিশ লাগিয়ে ঠিক বার করত, কোথায় গেছে নাতি। পুলিশ ঠিক জানতে পারত, কোন গাড়ীতে উঠেছিল শ্রীমান। তার-পর ঐ গাড়ী যে লাইন দিয়ে গেছে, সেই লাইনের ধারে পাওয়া যেত গরাদা। কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, এটা হয়ত জানাজানি হোতনা। বাকীটুকু সবই জানাজানি হোয়ে যেত। তখন টিটিকার পড়ে যেত চারিদিকে—অমুক যুবকটি অমুক মেয়ের প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। তখন সেই বুড়ো দাদামশাই পাড়ার বখাটে-গুলোকে জুটিয়ে নাতির জন্তে শোক সভা করে ছাড়ত। প্রেমের জন্তে আত্মহত্যা করল, কতবড় কাজ করল নাতি, তা' শোক সভা করবে না! মুখপোড়া বুড়ো কদায় কদায় পাড়ার ছোঁড়াদের লেলিয়ে দিয়ে সভা জেকে বসে। আহুরে নাতির গরাদা কি সে এমনিই ছেড়ে দিত!

ছেড়ে দিতনা কেউই।

কিছুতেই ছেড়ে দিত না।

কেন ঐ ছোঁড়া বেকির নিচে লুকিয়ে ছিল! নিশ্চয়ই কুমতলব ছিল কেনের মনে! অর্ধেক রাতে স্বযোগ মত ঐ ছোঁড়ার সংগে ভাগবার মতলব ছিল নিশ্চয়ই।

অতএব এ পক্ষও ছেড়ে দিত না।

কেন ছাড়বে? ছাড়বার মাহুষ নাকি ওরা! কি জোর

সেই চণ্ডা বুকে। কি জোর সেই ভয়ঙ্কর হাত হু'খানায়। সেই হাত দিয়ে

বুকের সংগে জড়িয়ে ধরে চাপ দিতে থাকলেই সব কাজ শেষ হোত। কিছুই অসম্ভব নয় ঐ মাহুষের পক্ষ। জ্যাস্ত একটা লোককে চুলের মুঠি ধরে টেনে বার করে—একখানা হাত ছেঁচে দিলে। একটুও রাগল না, টেচামেটি করল না, গালাগাল দিল না। ঠাণ্ডা মেজাজে—ধীরে মৃদে হাতখানা ছেঁচতে লাগল। তার সাংঘাতিক বুদ্ধি! গাড়ীর জানলার তলার হাত ছেঁচা যায়, এ আবার কে কবে শুনেছে! নিশ্চয়ই ঐ ভাবে আরও অনেকের হাত ছেঁচে দিয়েছে আগে। কাজেই কোনও ভাবনা চিন্তা না করে—যা করার তা' করে ফেলল।

উ, ঐ মাহুষ কি না করতে পারে! কিছু ন করে এমনিই ছেড়ে দিত!

বুকের চাপ দিতে দিতে দম বন্ধ করে মেরেই ফেলত স্বজাতাকে, তা'হলেই বা স্বজাতা ওর কি করতে পারত! টুঁশকটি করতে পারত না। বুকের তলায় পড়ে ছটফটও ববতে পারত না। মরে কাঠ হোয়ে যেত শুধু।

অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে সত্যিই কস্তুরীর দম বন্ধ হোয়ে আসত। প্রায়ই এটা ঘটত প্রথম রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে। বেশ তন্দ্রা এসেছে, চোখ দু'টি আর মেলে থাকা যাচ্ছে না, হাত পাগুলো একদম অসাড় হোয়ে এল। হঠাৎ মনে হোল, নিশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। তখন আর হাত পা নাড়ার শক্তি নেই, মাথাটা একটু ঘোরাবারও সামর্থ্য নেই, সমস্ত শরীরটাই কেমন যেন অসম্ভব রকম ভারী হোয়ে উঠেছে। যেন খুব ভারী কোনও জিনিষের তলায় চাপা পড়েছে সে। আগ্রাণ চেষ্টা করছে চাপার তলা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্তে, কিছুতেই একটু নড়তে চড়তে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করার পরে কোনও রকমে একখানা হাত বা পা নাড়তে পারল একটু, সংগে সংগে তন্দ্রাটা ছুটে গেল।



তখন বুকে আটকানো
দমটা ফেলে বাঁচল।

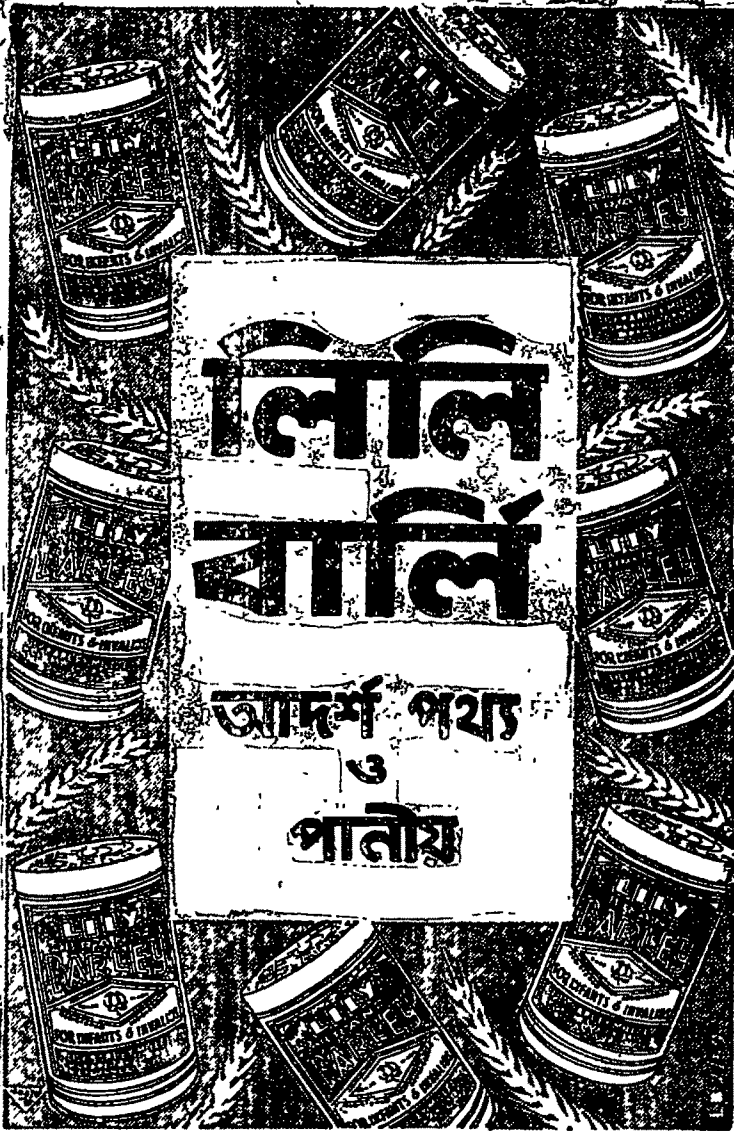
এই দম আটকানো

ব্যাপারটা প্রায় প্রতি রাত্রেই ঘটতে লাগল। তারপর
সে বিছানায় শোয়াই ছেড়ে দিলে। অন্ধকার ঘরে ভুতের
মত ঘুরে বেরিয়ে রাত কাবার করতে লাগল।

ঘরখানাও যেন ভুতুড়ে ঘর। অনেক উচুতে চাল, রাছোর
বাঁশ বাখারি পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সাজিয়ে তার ওপর
খড় চাপানো হয়েছে। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে ওপর
দিকে তাকালে মনে হয়, মস্ত একটা বাঁশের তৈরী নৌকাকে
যেন উপর করে চাপা দেওয়া হয়েছে। দেওয়াল সব
ইটের তৈরী, পেছায় রকমের মোটা। দরজা জানালা-

গুলোও সব পেছায় রকমের বড় বড়।
আর কি ভারী ভারী কপাট! দরজা
বন্ধ করার সময়—কপাট ঠেলতেই
প্রাণ বেরবার উপক্রম হয়।

মস্ত ঘর, মস্ত বড় বড় দরজা, জানালা,
খাট, টেবিল, আলমারি। সবই মস্ত
মস্ত ব্যাপার। এ বাড়ীর কস্তুরীও
নিশ্চয়ই মস্ত একটা কিছু ছিল। সেই
কস্তুরীর নামের খোলস গায়ে পরে ছোট
একটু স্বজাতার—না ছিল শাস্তি না
ছিল স্বস্তি। সদা সর্বক্ষণ কেমন যেন
আড়ষ্ট হয়ে থাকত। রাতেও নিতাই
নেই, সারারাত জেগে ভুতুড়ে ঘর
হাটতে হাটতে তাকে মুগ্ধ করতে
হোত, সে কস্তুরী। অনবরত জপ
করতে হোত, কস্তুরী কস্তুরী বস্তুরী।
স্বজাতা নেই, স্বজাতা মরেছে। মরে
নি, হতভাগা জুলফি লম্বা ঘোড়ার মত
খুঁটি ওয়ালা হ্যাংলা পরিমল, যে
স্বজাতার বাঁ পায়ের কড়ে আঁকুল
ছোঁবারও যোগ্য নয়, সেই পরিমলের
সঙ্গে এক সংগে গলায় দড়ি দেবার
জন্তে পালিয়েছে। গলায় দড়ি দেবার
জন্তে নয়ত কি? আর কোন কাজে
লাগত সেই ছোঁড়া? পৃথিবীতে কোন
কাজের যোগ্যতা আছে ওদের? সকান
বিকেল লম্বা প্যান্ট পরে সড় সেজে
দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তার ধারে। কখন



লিলি ব্যালি মিলস প্রাইভেট লি. কলিকাতা

কলেজের বাসটা যাবে, তখন হয় একটু শিটি মারবে ব
হিন্দী ফিল্মের নোংরা গান জুড়ে দিয়ে বাঁদরের মত
অঙ্কভঙ্গি করবে। এই ত' ছিল ওদের পেশা। ঐ কান্ড
ছাড়া আর কি করবার ওর যোগ্যতা ছিল?

মনে পড়লেই রাগে ব্রহ্মরক্ষু ফেটে যেতে চায়। উনি এনে
লুকিয়ে ছিলেন বেক্সির তলায়। ইস, আগে কেন তে
জানতে পারে নি! একটু আগে জানতে পারলে প
থেকে চটি খুলে চটাচট ওর হুঁগালে কষিয়ে দিত
বেশ হোষেছে মরেছে, বেশ করেছে হাত খেঁতলে দিচ্ছে
হাতখানা ন! খেঁতলে মুখখানা খেঁতলে দিনেই আরও
ভাল হোত। ওরে আমার আহ্লাদের থোকা রে! কেন
এসেছিলি মরতে? কি উদ্দেশ্য ছিল তোর?

রাত জেগে অন্ধকার ঘরে ঘুবেতে ঘুরতে কস্তুরী জিজ্ঞাস,
করত স্বজাতাকে, কেন সেই ছোড়া পরিমল তোমার
বেক্সির তলায় লুকিয়ে ছিল? কেন?

কে দিতে পারে জবাব? কি যে উদ্দেশ্য ছিল তার মনে,
কেউ তা' জানেনা। চুরি করাই ছিল বোধ হয় উদ্দেশ্য।
হয়ত অনেক রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে স্বজাতার গলায়
ছুরি দিয়ে গণনা গাঁটি খুলে নিয়ে চুপি চুপি সে গাড়ী
থেকে নেবে যেত। হয়ত কোনও ভাকাত দলের সংশ্লে
সম্পর্ক ছিল। তাদের দরজা খুলে দিয়ে গাড়ীর ভেতর
টোকা বার জন্তে—নিজে

ওভাবে লুকিয়ে ছিল। হয়ত
আরও খানাও মতলব ছিল
মাথায। হুরি চামারি কিছুই
না করে—স্বজাতার বরের
বুকে বসিয়ে দিত ছোরা।
স্বজাতা রাতারাতি বিধবা
হোষে বাড়ী ফিরত। তাতে
অল্প কোন লাভ হোক না
হোক, গাঁবের জালা খানিকটা
জুড়ত। যে অপমান করেছিল

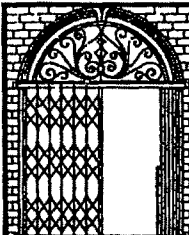
তাকে স্বজাতা, তার
প্রতিশোধ নেওয়া হোত।
অপমান বলে অপমান!

স্বযোগ পেয়ে একেবারে বাড়ীতে চুকেছিল। কত বড়
আশ্চর্য! তাকে তাকে ছিল, যেই দেখলে বাড়ীব সবাই
বেরিয়ে গেল ঠাকুর তলায় পূজো দিতে, রইল খালি
স্বজাতা আর তার ছোট ভাই স্বগথ, অমনি সাহস বেড়ে
গেল। স্বগথটা আবার গেল রঙ খেলতে, অমনি স্বভুৎ
করে চুকে পড়ল বাড়ীতে। জানে কি না, কেলেক-বিব
ভয়ে স্বজাতা চাঁচামিটি করতে পারবে না। দেখেই ত'
শিস্তি জলে উঠল স্বজাতাব। দাঁতে দাঁতে চেপে জিজ্ঞাসা
করলে—“কি চাও?”

লক্ষাবতী লতার মত হয়ে পড়ল একেবারে। আর সে
কি মিউমিউ আওজ গলার! যেন ভিজে বেড়ালটি।
জবাব হোল—“একটু রঙ দিতে এসেছি।”

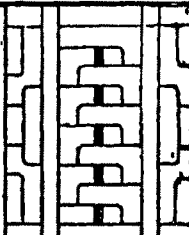
তৎক্ষণাৎ স্বজাতা বা পাখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল—“তা'হলে
দাও, পায়ে দাও।”

অমনি বসে পড়ল মাটিতে। পকেট থেকে ঠোঙা বার
করে সত্যা সত্যিই রঙ দিতে এল পায়ে। আর সহ্য
হোলনা স্বজাতার। সজোরে চালিয়ে দিল বা পাখানা।
ব্যস, একেবারে ব্যাঙের মত চিপটাং। আর এক মুহূর্ত
দাঁড়ায়নি সেখানে স্বজাতা। ছুটে পালিয়েছিল সেখান
থেকে। কখন কি ভাবে বীরপুঙ্খ বেরিয়ে গিয়েছিল,



ফোন-২৪-৪২৬০

কোলাপসিবল গেট, রট আয়রণ গেট,
প্ল্যাটেড গেট, প্লাস ফ্রেম, গ্রীল, ব্রেলিং
ইয়ান সিঁড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়।



হিন্দুস্থান কোলাপসিবল গেট কোং প্রাইভেট লি

৫, বাহুবাম অড্রুং লেন (অফ নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট)
কলিকাতা - ১২



তাও সে দেখেনি। তার পর থেকে আর কখনও চোখ তুলে তা কা বার সাহস হয়নি স্বজাতার দিকে। লাথির চোটে ঝোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হোষে গিয়েছিল।

লাথি খেয়ে চূপ করে থাকতে পারে। আঁতুল খেঁতলে দিলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয় না। মাহুঘটা পাথর ছিল নাকি! পাথরের শরীর না হোলে ও ভাবে মুখ বুজে থাকতে পারে কেউ!

চূপ করে মুখ টিপে চলে গেল রসাতলে, তবু স্বভাব বদলাল না। আর একবার যদি কখনও দেখা হয়,

তা'হলে কি করবে স্বজাতা! যা করবে তা' মনের মধ্যেই আছে। চটাচট চট্টর, বাড়ি লাগাবে ছ'গালে আর জিজ্ঞাসা করবে, কেন—কেন—কেন? কেন ওভাবে মরতে এসেছিলি। কেন নুকিয়ে পড়েছিলি বেকির তলায়—? ঘেমা পিস্তি বলতে কি কোনও পদার্থ নেই শরীরে?

রাগের চোটে আরও জোবে জোরে পা কেলে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে স্বজাতা। ঘুরে ঘুরে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্লাস্তিতে মুচড়ে আসে পা ছ'খানা—ততক্ষণ থামে না। তারপর এসে বিছানায় বসে পড়ে। তারপর কখন যে চূলে পড়ে ঘুমের কোলে, তা' টেরই পায় না।

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষকদের শারদীয় অভিনন্দন জানাই!

শ্রেষ্ঠ ঔষধ



সবার মুখে এক কথা
এস, জি, সরকারের গহনা



এস, জি, সরকার কোম্পানী
ডুপ্লোজ

ফোন
৩৪-২৪৫৩

১২৫ বি. মহাভারত স্ট্রীট • কলিকাতা-১২
শাখা-১৬৭ বি. মহাভারত স্ট্রীট • কলি-১২

যুম যখন ভাঙে তখন সে কস্তুরী। কস্তুরীর মাথায় তেল দেবার জন্তে— দরজার সামনেই একটা কি দাঁড়িয়ে আছে। কস্তুরীর জন্তে বালতি বালতি জল ইদারা থেকে তুলে মন্ত বড় টব ভরতি করে রাখা হয়েছে। কস্তুরীর জন্তে গরম দুধ, ক্ষীরের বরফ এখনই এসে হাজির হবে। কত কি না লাগে কস্তুরীর। কেমন দেখতে ছিল কে জানে! যদি একখানা ফটো থাকত ত' দেখা যেত। আছেও নিশ্চয়ই ফটো। এত আদরের মেয়ে ছিল যখন, তখন কি আর দশ বিশখানা ফটো তোলা হয়নি। নিশ্চয়ই কোটো আছে কোথাও। কিন্তু চাওয়া যায় কার কাছে? এমন একটা লোক নেই, যাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যায়। শুধু খাও, পর, আর ঘুমাও। ভাগ্যে কস্তুরী মরতে পেরেছ, খুব সম্ভব এই ভাবে খেতে খেতে পরতে পরতে আর ঘুমতে ঘুমতেই বেচারী মরেছে। মরতেই

হবে যে, এ ভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে !

বাঁচতে না পারলেও, যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ কস্তুরী হোয়েই বেঁচে থাকতে হবে। স্ফূর্তা মরছে, কস্তুরী বেঁচে আছে। কস্তুরীকে মেরে স্ফূর্তাকে বাঁচাতে গেলে অনর্থের আর কিছু বাকী থাকবে না। কোথাও লুকতে পারবে না স্ফূর্তা। পড়তেই হবে আবার তাদের হাতে। তখন বুকের আর হাতে চাপে দম বন্ধ হোয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল, ঢের ভাল এই ভাবে বেঁচে থাকা। এখন সে কস্তুরী, একদম আসল কস্তুরী। কোন কিছুর অভাব নেই তার। যেটুকু অস্ববিধা হচ্ছে—তাও থাকবে না। কস্তুরীর বাবা কিরে এলেই সব গোলমাল চুকে যাবে। কস্তুরীর বাবাকে বলে কস্তুরী অনেক দূরে বেড়াতে চলে যাবে। কস্তুরীর বাবাকে সংগে নিয়েই কস্তুরী বেড়াতে যাবে। হয় হিমালয়ে, নয়ত সমুদ্রের ধারে—অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে। কস্তুরীর বাবা নিশ্চয়ই কস্তুরীর আবদার রাখবেন। কিন্তু ফিরছেন না কেন তিনি এখনও ? দেখতে দেখতে মাস কাবার হতে চলল, পাঁচ সাত দিনের জন্তে গিয়ে এত দিন দেবী করার মানে কি !

কোন কিছুরই মানে খুঁজে পাবার উপায় নেই। মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবারও সময় পেলেন না বাবা। যাবার সময় মেয়ের সংগে দেখা করারই সময় হোল না ! ইস্—এর নাম মেয়ের ওপর টান ! এমনই কাজ পড়ে গেছে যে—মেয়েকে ছেড়ে এক মাস কোথায় কাটিয়ে দিচ্ছেন। কস্তুরী কি আর সাথে মরছে। থাকবার ভেতর শুধু বাপই ছিল বেচারার, সেই বাপ এমন ব্যবহার করলে কোন মেয়ে বাঁচতে পারে !

কস্তুরীর ব্যথা-বেদনা অভিমান, কস্তুরীর অভাব অভিযোগ আবদার—কস্তুরীর মত করে বুকের মধ্যে ঠেলে উঠত। তাতেও কেমন যেন আটকে যেত গলার ভেতরটা। তারপর হঠাৎ যেত কস্তুরী তলিয়ে। নিঃশব্দ ছুপুয়ে—হু হু করে ঝড় বইত মাঠে। ঝড়ের সংগে রাশি রাশি

শুকনো মাটি উড়ত।

বিবেরা জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেত, তবু যথেষ্ট আলো আসত ঘরে। মস্ত উঁচু দেওয়ালের মাথায় খড়ে চালের নীচে ফাঁক ছিল আলো হাওয়া আসার। অদ্ভুত রহস্যময় হোয়ে উঠত তখন ঘরের তলাটা। ওপরে আলো নীচে অন্ধকার। সেই আলো-আঁধারির মাঝে আবিভূত হোতেন বাবা। কস্তুরীর বাবা বজ্রবাহন ঝা নয়, স্ফূর্তার বাবা নীহাররঞ্জন বাবু। বেঁটে খাটো সামান্য মানুষটি খুবই চুপি চুপি এসে দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে ভয়ানক কল্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন মেয়ের দিকে। ঠোঁট নেড়ে একটি কথাও বলতেন না।

কথ তিনি বলতেনই না সহজে—। ছোট্ট স্ফূর্তার ছোট্ট বাবা নীহাররঞ্জন বাবু বিনা প্রয়োজনে কখনও ঠোঁট আলগা করতেন না। সেরকম ধাতের মনুষ্যই নন তিনি। কলেজে গিয়ে ক্লাশে চুকে মুখ খুলতেন। তখন সেই থেকে যা বার হোত, ছাত্রেরা হা করে গিলত। সাহিত্য পড়তেন নীহাররঞ্জন বাবু। এমন ভাবে পড়াতেন, এত সংক্ষেপে এত রকমের হৃদয় দিতেন তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের যে, কান পেতে শুনেই অনেকের কাজের কাজ হোয়ে যেত। ছাত্ররা ভালবাসত তাঁকে। নির্বাক নিরহঙ্কার মানুষটিকে কোনও ছাত্র কখনও অবহেলা করত না।

স্ত্রী ছেলে মেয়েরাও করত না। কখনও তিনি ধমকানি পর্যন্ত দেননি কোনও ছেলে মেয়েকে। কোনও আদেশ কোনও উপদেশ কখনও দেননি কাকেও। তবু তাঁর ছেলে মেয়েরা কেউ নষ্ট হোয়ে যায় নি। ছুটুমি যে কেউ করত না, তা' নয়—। ছুটুমি করত, কিন্তু ইতরামি করত না। ইতরামি করতে কারও প্রবৃত্তিও হোত না। বাবা যে অধ্যাপক, বাবা কত জানেন, কত মানুষ শ্রদ্ধা করে বাবাকে। কি করে ইতরামি করা যায়—অমন বাপের ছেলে মেয়ে হোয়ে। আর অস্ত্রায় কালেও তা' কি হু বলবেন না বাবা। মাথা হেঁট করে থাকবেন শুধু। যেন ছেলে মেয়ের কাজের জন্তে তিনিই দায়ী—ছেলে মেয়ের জন্তে যেন তিনি লক্ষ্য মাথা তুলতে পারছেন না।





ঠিক সেই রকম ভাবে মুখ
নীচু করে দাঁড়িয়ে
থাকতেন নীহার রঞ্জন
বাবু। যখন মুখ তুলতেন, তখন ছুটি চোখে ফুটে উঠত
নিদারুণ অসহায়তা। মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন
মুখ টিপে। মেয়ে পাগল হোয়ে উঠত।

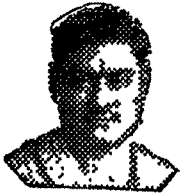
তারপর এক সময় গুমরে গুমরে কান্না জুড়ে দিত মেয়ে।
বারবার বলতে থাকত—“মরে গেছি বাবা। একদম মরে
গেছি আমি। আমার কথা ভুলে যাও! পাছে তোমার

নামে কালি লাগে—তাই আমি মরে গেছি। আমার কথা
ভুলে যাও বাবা, অমনভাবে আর মুখ হেঁট করে খেঁক না।”
হৃপ্ত গড়িয়ে যেত। বাইরের রোদ ঠাণ্ডা হোয়ে আসত।
ঝিয়েরা এসে আবার দরজা জানালা খুলে দিত। তখন
সন্ধ্যার জগ্রে নিজেকে তৈরী করতে হোত। আবার
রাত্রি আসছে।

রাতের পর রাত পার হোয়ে গেল, দিনগুলো তার সংগে

আলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মিক ও জ্যোতিষবিদ

জ্যোতিষসম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্শব, রাজজ্যোতিষ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),
নিখিলভারত কলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কানীছ বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী
সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও
কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-অস্ত্রাদি
তাত্ত্বিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক
অশান্তি ও ভাঙার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তার
তথা ভারতের বাহিরে, যথা ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান,
মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীজন তাঁহার আলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার
করিয়াছেন। (প্রশংসাপত্রসহ বিদ্যুৎ দ্বিবার ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।)



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি ভল্লোক্ত অত্যশ্চর্য কবচ

১. **ধনক কবচ**—ধারণে স্বল্পমূল্যে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (ভল্লোক্ত)। মূল্য সাধারণ—৭৫/০,
শক্তিশালী বৃহৎ—২২৫/০, মহাশক্তিশালী ও সফর ফলদায়ক—১২৫৫/০ (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লব্ধীর কুপালাভের
জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। ২. **সুস্বপ্ন কবচ**—স্বপ্নশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষার ফল ২৫/০, বৃহৎ—
৩৮৫/০। ৩. **মোহিনী (বশীকরণ) কবচ**—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয়। মূল্য—১১৫/০,
বৃহৎ—৩৪৫/০, মহাশক্তিশালী—৩৮৫৫/০। ৪. **বর্গলাভ কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সম্বলিত ও
সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। মূল্য ২৫/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৫/০, মহাশক্তিশালী—১৮৫৫/০
(আমাদের এই কবচে ভাঙা মামলায় জয়ী হইয়াছেন)। ৫. **জুজিৎ কবচ**—সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জ্বরোগ আরোগ্য,
বংশরক্ষা, কৃত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষার অস্ত্র। মূল্য—৭৫/০, বৃহৎ শক্তিশালী—১৩৫/০, মহাশক্তিশালী—৬৩৫/০
তিঃ শিঃ করা হয় না।

জ্যোতিষসম্রাট মহোদয় প্রণীত “জন্ম মাস ব্রহ্মস্প” —কোন মাসে জন্ম হইলে কিরূপ ভাগ্য, বাহ্য, বিবাহ, কর্ম, বন্ধু, মনের
গতি, স্বভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। মূল্য-৩৫/০, বিবাহ ব্রহ্মস্প ২৫/০, খনন বচন ২৫/০, জ্যোতিষশিক্ষা ৩৫/০

(স্থাপিত ১২০৭ খৃঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোলমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)
হেড অফিস ও পণ্ডিতজীর নিজবাটী। ৫০২, ধর্মতলা স্ট্রীট “জ্যোতিষসম্রাট ভবন” (প্রবেশ পথ—ওয়েলসলী স্ট্রীট) কলি-১৩।
সাক্ষাতের সময় : বৈকাল ৩টা—৭টা। ফোন : ২৪—৪০৬৫। শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালীমন্দির এবং ব্রাহ্ম ১০৫ থ্রে স্ট্রীট,
“বসন্ত নিবাস” কলি: ৫, ফোন : ৫৫—৩৬৮৫। সময় প্রাতে ৩টা—১১টা। সেন্ট্রাল ব্রাহ্ম অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩। লণ্ডন অফিস—মিঃ এম এ কার্টিস, ৭এ, ওয়েস্টওয়ে, রেনিস পার্ক, লণ্ডন।



ফাউ হিসেব পালাল। ক্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল কস্তুরী। বাবু বজ্রবাহন বা ফিরলেন না। কোথায় আছেন, কবে পর্বন্ত ফিরবেন, এটুকু সংবাদ মেয়ের কাছে পাঠাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন না।

হংসরাজের কানের সংগে মুখ ঠেকিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করেও কোনও জবাব পাওয়া যায় না। সে শুধু ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে

বজ্রবাহনের অন্তঃপুরের সংবাদ হালকা সংবাদ নয়, যে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। বজ্রবাহনের অন্তঃপুরের শুচিতা ঠুনকো শুচিতা নয় যে বাইরের সংবাদ অন্তরে ঢুকে অন্তরের শুচিতা নষ্ট করবে। দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে বদ্ধ হোয়ে রইল কস্তুরী, ধুইয়ে ধুইয়ে পুড়তে লাগল ধূপের মত। কারও কাছে সে ধূপের সৌরভ পৌছল না।

খোঁতানানো হাতখানা একদম সেরে গেল। চিহ্ন পর্বন্ত মিলিয়ে গেল আঙ্গুলের মাথা থেকে। সেই আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে—মনটা একেবারে দরকচা মেরে গেল। হুখ রইল না, হুখ রইল না, আশা আকাংখা—স্বপ্ন দেখা কিছুই রইল না জীবনে। শুধু বেঁচে থাক, অপরিণত উপকরণের স্থপের ওপর অর্থহীন অবাস্তব বেঁচে থাকা, কি নিদারুণ শাস্তি! কিন্তু উপায়ও নেই কোনও দিকে, কস্তুরীর মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। পালাতে গেলে যে কেউ বাবা দেবে, তা' নয়। পাহাড়া দিচ্ছে না কেউ কোনও দিবে। বারণও করবে না বেরতে গেলে। বজ্রবাহন কতটা কস্তুরী সত্যিই ত' আর বন্দি নী নয় বাপের অন্তঃপুরে। যখন ইচ্ছে তখন খামারে ঘুরে আসতে পারে। গোটা পঁচ ছয় লোক লাঠি ধারে করে পেছন পেছন ঘুরবে এই যা যজ্ঞপা। একদিন বেরিয়েও ছিল কস্তুরী। অন্তর থেকে বের হওয়া যায় কিনা, পরীক্ষা করার জন্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্তরের দরজায়। তৎক্ষণাৎ সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারিদিকে। ছোটোছুটি করতে লাগল বহু মাহুখ। সংবাদ পেয়ে মোটর বাইক চেপে এসে পড়লেন বজ্রবাহনের

এক হোমরা চোমরা কর্ম-চারী। বাইক বাইরে রেখে সসজ্জমে এসে দাঁড়া-

লেন মনিব কস্তুর সাগনে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কে করলেন। ওপর দিকে মুখ না তুলে বিশুদ্ধ হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদূর যাবার বাসনা আছে। কোনদিকে যেতে চান মনিব কস্তা। জিপে যাবেন না অজ্ঞ গাড়ীতে যাবেন। মাঠে মাঠে ঘুরতে গেলে কিন্তু জিপে যাওয়াই ভাল।

বজ্রবাহন কস্তা যথোচিত মর্যাদার সংগে জবাব দিয়েছিলেন। না তিনি হেঁটেই যাবেন। শুধু একটু ঘুরবেন এখার ওধাবে, গাড়ী লাগবে না।

অতএব চলল গঙ্গা দেড়েক লোক লাঠি ঘাড়ে করে পিছু পিছু। কিন্তু কোন দিকে যাবে কস্তুরী। কিছুই চেনে না যে, কিছুই জানে না। কস্তুরীর কিন্তু সবই চেনা জানা উচিত। তাই কাউকে কিছু—জিজ্ঞাসাও করতে পারেনা। মাথা উচু করে সোজা চলল সে বাদিকের রাস্তাটা ধরে। মনে ভরসা ছিল, সোজা পথ কিছুতেই গুলিয়ে যাবে না। আবার ঠিক ফিরতে পারবে নীড়ে।

সোজা পথটা গিয়ে থামল একটা নদীতে। নদী হোল বালির নদী। কোথাও একফোটা জল নেই। দু'মাসখ সমান উচু ঘাসের ঝোঁপ এখানে ওখানে গুম মেরে বসে রয়েছে। বেষীক্ষণ ছিল না সেদিন নদীর ধারে। তাড়া-তাড়ি ফিরেছিল। পরীক্ষা করার বাসনা ছিল, সত্যিই সে বন্দি নী কি না। পরীক্ষা করা হোয়ে গেল। আবার নীড়ের টানে নীড়ে ফিরে এল।

নিশ্চিন্ত নীড়, নিরুপদ্রব নীড়, নীড়টুকু যদি আবার খোয়া যায়, তখন কি হবে। দরকচা পড়া মনে একটি মাত্র ছুশ্চিন্তাই মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, তখন কি হবে? তখন কি হবে? যদিও কখনও ঘোচে এই নীড়ে আশ্রয়, তখন কি হবে?

দূব, তাই কি কখনও হোতে পারে।

কস্তুরী সে, একদম আসল কস্তুরী। কে তাড়াচ্ছে কস্তুরীকে কস্তুরীর বাবা বাবু বজ্রবাহনের বাড়ী থেকে? কে তাকে তাড়াতে পারে?



॥ চার ॥

তাড়াতে কেউই পারে না,
তবে ঝড়ে নীড় উড়িয়ে

নিষে যেতে পারে। ঝড় কখন কোন দিক থেকে আসতে পারে, কেউ তা বলতে পারে না। ঝড়ের মর্জি মত ঝড় ওঠে, মৌকা মাফিক গাছ ওপড়ায়। ঘর ভাঙ্গে, নদীতে নৌকা ডোবায়। ফলে কত জীব যে নিরাশ্রয় হয়, কে তার হিসেব রাখে। তাই ঝড়ের নামেই বুক কাঁপে। তবে একবার যারা ঝড়ের মুখে পড়ে বুনো হোয়ে যায়—তারা আর তেমন কেয়ার করে না। আহুক ঝড়, ভাঙুক ঘর, উড়ুক নীড়, কিবা আসে যায় তাতে। আবার ভাসব, আবার উড়ব, আবার কোনও নতুন স্থানে আশ্রয় পাব। ঝড়ের মুখে এঁটো পাতের শামিল হোয়ে ওঠে তারা। ঝড় আসবার আগেই আঁস্তাকুড় ছেড়ে উড়তে থাকে, এক আঁস্তাকুড় ছেড়ে আর এক আঁস্তাকুড়ে আশ্রয় নেয়।

ঝড় এল।

পাহাড় প্রমাণ ধুলোর তাড়া খেয়ে মস্ত একখানা মটর গাড়ী এসে থামল একদিন বঙ্গবাহন বাবুর কাছারি বাড়ীর সামনে। স্বর্ঘ্য সবে মাত্র উঠেছে তখন, কাছারি বাড়ীতে কর্মচারীরা কেউ আসেনি। কাছারির সামনে

কুস্তির আখড়ায়—দরোয়ানরা মাটি মেখে ডন বৈঠক মারছে। গাড়ীখানা দাঁড়াবার পরে বেশ কিছুক্ষণ অদৃশ্য হোয়ে রইল। ধুলোর পাহাড়টা গড়িয়ে গেল গাড়ীর ওপর দিয়ে। তারপর একে একে গাড়ীর আরোহারা গাড়ী থেকে নামলেন। সব হৃদ্ধ আটজন, আট জনের মধ্যে দু'জন জেনানা, বাকী সবাই মর্দানা। জেনানা দু'জন ভয়ঙ্কর রকম মেমসাহেব, মর্দানারা সব ঝোড়োকাক সাহেব, মেম-সাহেবদের মুখ, চোখ, নাক, হাত, পা নানা রঙে রঙীন। যেন দু'টো প্রমাণ সাইজের পুতুলকে রাস্তা দিয়ে মুড়ে পুতুলের কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করা হোয়েছে। সাহেব লোকদের মুখ, মাথা, সাজ পোষাক দেখলে মনে হয়, দু'চার রোজ ধরে কোথাও লড়াই করছিলেন তাঁরা। দাড়ি কামানো নেই, প্যাণ্ট জামা সব ধুলোয় ধূসরিত, মাথায় কতদিন তেল জল চিরুণির ছোঁয়া পড়েনি কে জানে। সাহেব, মেম সাহেবরা নামলেন। তারপর তাঁদের জিনিষপত্র নামতে লাগল। সেও এক ইলাহী কাণ্ড। তাক্সব বলতে হয়, লাটবহরের বাহার দেখে। বহুত কিসিমের বাস্ক পেটরা কল কল্লা সব নামতে লাগল। একখানা গাড়ীতে অতগুলি মাছ্য আর ঐ পরিমাণ মাল নিয়ে কি করে ওরা এলেন—তাও এক তাক্সব ব্যাপার।

ডন বৈঠক ছেড়ে দরোয়ানরা তাক্সব বনে গিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিবাহ উপহারে ও নিমিত্ত প্রয়োজনীয়
আধুনিক ডিজাইনের গিলি মোমের আলফারের
বিশেষ প্রতিভা

এইচ এল দত্ত এন্ড সন্স
বিখ্যাত হস্তশিল্পী ও মণিকার
৭২ নি আশুতোষ মুখার্জী রোড
৬ নারী পুর • কলিকাতা-২৫

টেলিফোন : ৪৭-৪০২১

বঙ্গবন্ধু
টুং-পেই
উজ্জ্বল শুভ্র দাঁত ও
সুন্দর মাড়ির জন্য
বঙ্গবন্ধু (প্রা) লি:
কলিকাতা-৬৭
ফোন-৫৬-৮২৩৩

হঠাৎ এক সাহেবের নজর পড়ল দরোয়ানদের দিকে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কাঁধে ঝোলানো চামড়ার বাজটা বাগিয়ে ধরলেন। ব্যাপার দেখে দরোয়ানরা গেল ঘাবড়ে। লাঠিসোঁটা হাতে নেই, চাপরাস চাপকান চড়ানো নেই, শুধু লেংটি রয়েছে অংগে। ঐ অবস্থায় সাহেবদের সংগে লড়াই করা যায় কিনা, এই দুর্ভাবনায় বেচারারা বড়ই বিব্রত হোয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে কর্ম শেষ করে গলার বাজ গলায় ঝুলিয়ে ফেললেন সাহেব। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরোয়ানদের সামনে আকর্ষণ বিস্তৃত হাসি হেসে আহেলী হিন্দিতে জানালেন, ফোটো খুবই পহেলা নম্বরের হবে। অমন পালোয়ানী ফোটো নাকি সহজে কোথাও মেলেনা। ফোটোগুলিকে সাহেব তাঁর সিনেমার মধ্যে লাগিয়ে দেবেন।

সিনেমা জিনিষটা দরোয়ানরা জানত। আজকের হুনিয়ায় কেই বা না জানে ও জিনিষ। স্বতরাং তাদের বুঝতে কষ্ট হোল না যে, সাহেবরা সিনেমার ছবি তুলতে এসেছেন। সিনেমার ছবি তোলাটা এমন কিছু খুন-খারাপির কাজ নয়। বরং ব্যাপারটার মধ্যে বহুত মজা আছে। মজা দেখতে কে না চায়। তাড়াতাড়ি তারা লেংটি ছেড়ে উর্দি উড়িয়ে সাহেবদের খুচরো খিদমতে লেগে গেল।

দেখতে দেখতে জমতে লাগল মানুষ। খামারে যারা কাজ করতেন এল, তারা খামারে না ঢুকে তামাসা দেখতে লেগে গেল। ভিড়ের মাঝখান থেকে জেনানা ছুঁজনকে সবানো দরকার। সেই পরামর্শই করতে গেলেন সাহেবরা দরোয়ানদের সংগে। কোথাও কারও বাড়ীতে মেয়ে ছুঁটিকে কিছুক্ষণের জন্তে রাখা যায় কিনা, খোঁজ নিতে গেলেন। ওদের জ্ঞান করতে হবে, কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে, একটু বিশ্রামও করা চাই। সারারাত মোটরে এন্ডে একটু ঠাণ্ডা না হোতে পারলে ওরা কাজ করতে পারবে না। মেয়ে মানুষ ত', আর কত ধকল সহাবে ওদের শরীরে।

দরোয়ানরা তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে ফেলল। নিশ্চয়ই যাবে,

আলবর্ত মেমসাহেবদের ভাল জামগায় রাখা যাবে। খামারের কাছে রয়েছেন খোদ মালিকের কত্তা। একলা থাকেন তিনি মালিকের অন্দরমহলে। সেখানে নিয়ে গেলেই হবে। বড় ভাল মাহুষ তিনি, বহুত খুবসুরত, বহুত লেখাপড়া জানা মেয়ে। মালিক মেয়েকে একদম সেই ছেলেবেলা থেকে দূরে কোন সাহেব লোকদের স্কুলে রেখে লেখা পড়া শিখিয়েছেন। কিছুদিন আগে আনিয়ে নিয়েছেন এখানে। বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। কখনও কারও সংগে ছজ্জত বকাবকি করেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি রাশিকৃত গুণগান করল তারা মালিক কত্তার। করে সিনেমাওয়ালাদের নিশ্চিন্ত করে দিল। তাঁরা বুঝলেন, অল্প বয়সী লেখা পড়া জানা একটি মেয়ে যখন রয়েছে—তখন আর ভাবনা কোথায়। নিশ্চয়ই তাঁদের অভিনেত্রী ছুঁজনকে মেয়েটি যত্ন আদর করবে।

মুন্সিল বাঘল খবর দেওয়া নিয়ে। কে যাবে মালিক কত্তাকে সংবাদটা জানাতে। বাবু বক্রবাহন ঝার অন্দরমহলে বাইরের সংবাদ চালান দেবার সাহস কার আছে। দরোয়ানদের মুখের অবস্থা দেখে—কিছুটা জাঁচ পেলেন সিনেমাওয়াল সাহেবরা। তখন তাঁরা অভিনেত্রী ছুঁজনের শরণাপন্ন হোলেন। ওরাই যাক অন্দরমহলের ভেতর। মালিক কত্তা ত' আর বাঘ সিংগি নন যে, সামনে গেলেই ঝপ করে মুখে পুরে ফেলবেন। গিয়ে দেখেই আহুক ব্যাপারটা। এত বড় খামারের মালিক যিনি, তাঁকে যখন পাওয়া গেল না, তখন তাঁর কত্তাকেই দেখে আহুক। বরাতে থাকলে যথোচিত আদর অভ্যর্থনাও জুটে যেতে পারে সকলের ভাগ্যে।

অগত্যা তাদেরই যেতে হোল। অন্দরমহলের দরজা পর্বস্ত পৌছে দিয়ে গেল দরোয়ানরা। একটা ঝিকে ডেকে তার জিম্মায় দিয়ে এল মেয়ে ছুঁটিকে। বলে এল, মালিক কত্তার সংগে দেখা করিয়ে দাও। জেনানা যখন, তখন ভেতরে নিয়ে গেলে কোনও কসুর হবে না।





বাড় উঠল।
অনেক দিন পরে ছুটি
সমবয়সী মেয়েকে কাছে
পেয়ে বুকের মধ্যে বাড় উঠল। কি স্থখী ওরা! কি স্বাধীন
ওরা! কি আনন্দে আছে ওরা! আর কত কি যে
জানি ওরা ছুনিয়ার! হাসি গান গল্প যেন উথলে উঠছে
ওদের চোখ মুখ সর্বাঙ্গ থেকে। - ছুখ ব্যাপারটা কেমন,
ব্যথা বেদনা কাকে বলে, তা' বোধ হয় জানেই না।
পাখীর মত সারা বাড়ীতে উড়ে বেড়াতে লাগল। ছু'
মিনিটের মধ্যে বক্রবাহন কত্তা কস্তুরীর তয়ানক তারি
খোলসটাকে টেনে ছিড়ে কালাকাল করে ফেললে তারা।
ছুটে বেড়াতে লাগল কস্তুরীও, মহামূল্য সম্পদ হাতে
পেলে যেমন দিশেহারা হোয়ে পড়ে মাছুয়ে, তেমনি
অবস্থা হোজে উঠল তার। কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে,
কোথায় শোয়াবে, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।
বৃদ্ধ হংসরাজকে তখনই যেতে হোল কাছারিতে।

কর্মচারীদের বলে আসতে হবে, কারও যেন কোনও
অস্থবিধে না হয়। যারা এসেছেন, তাঁদের থাকা খাওয়ার
এবং কাজ কর্মের সর্ব ব্যবস্থা করে দেওয়া চাই। মালিক
নেই, মালিক কত্তা ত' আছেন। কাজেই ভাবনা কিসের!
ভাবনা আর কাকেও কিছু করতে হোল না।
সিনেমাওয়ালারা আশ্রয় পেলেন। কাছারি বাড়ীর ওধারে
বক্রবাহন বাবুর গেট হাউস। অত্যাধুনিক কায়দায়
স্বসজ্জিত কাঠের দোতলা। সেখানে তাঁদের তোলা
হোল। যান্ত্রিক চাষ আবাদে মধ্যে ছবি তুলবেন তাঁরা।
ছবির গল্পে যান্ত্রিক চাষ আবাদ চুকিয়ে দিয়েছেন গল্প
লেখক। তাই তাঁরা বহু কষ্ট করে—সেই স্বদূর কলকাতা
থেকে মাল পত্র লোকজন নিয়ে উপস্থিত হোয়েছেন।
তাঁদের আশা আশাতিরিক্ত ভাবে পূর্ণ হোল। বাবু
বক্রবাহন-বাবুর কত্তা অন্তর থেকে হুকুম পাঠালেন, যে
ভাবে খুশি, যেমন খুশি ছবি তুলতে পারবে। ছবি
তোলায় অন্তে দরকার হোলে খামারের যন্ত্রপাতি সব

**উৎকৃষ্ট
বিস্কুট
বাজার দরে**

লিলি
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

কাজে লগাতে হবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, ছবি যখন তোলা হবে তখন স্বয়ং মালিক কত্থা সেখানে সমুপস্থিত থাকবেন।

তোড়জোড় স্বরু হোল ছবি তোলাবার। চড়চড়ে রন্ধুরে ছবি তুলতে হবে। খোলা আকাশের তলায় ছবি নিতে গেলে রন্ধুর চাই।

রন্ধুর কিন্তু মুখ বেকিয়ে বসল। ঘণ্টা কতক পরেই আকাশের উত্তর পূর্ব কোণায় দেখা গেল গোল মত একটা কালো চাকতি—। চাকতিখানা ক্রমেই বড় হোতে লাগল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে সিনেমাওয়ালারা যখন মাঠে নামলেন, তখন আর এতটুকু ফাঁক নেই আকাশে। নানা আকারের নানা মাপের কালো কালো চাকতিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। সূর্যদেব ঢাকা পড়লেন চাকতির আড়ালে। তারপর শৌ শৌ গৌ গৌ ডাক শুরু হোল সেই বালির নদীর ওপারে। যন্ত্রপাতি সামলাবার জন্তে লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল।

ঝড় উঠল।

পরিচালক ঋগ্বেদ দীক্ষিত নতুন আইডিয়া পেয়ে গেলেন হঠাৎ। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ক্যামেরাম্যানকে এলোপাতাড়ি ক্যামেরা চালাতে নির্দেশ দিলেন। মাহুষ জন ছুটেছে, বড় বড় যন্ত্রপাতিগুলো ছড়মুড় করে পালাচ্ছে—ওলট-পালট, হুটোপাটি চলেছে চারিদিকে। একদম স্বাভাবিক দৃশ্য। উঠে গেল সবই। কিন্তুের গায়ে ছাপ উঠে গেল, মস্ত বড় থামারে ঝড়ের দিনে কি কাণ্ড হয়। গরু ষোড়া মোষ উঠল, ছাগল ভেড়া হাতি উঠল, মাহুষ উঠল, মেয়ে মাহুষ উঠল। ঝুড়ি কোদাল গাঁইতি লাঙ্গল, কোনও কিছু উঠতে বাকী রইল না। প্রকাণ্ড থামারের মধ্যে যে যেখানে কাজ করছিল, সবাই আপন আপন যন্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে গেল ক্যামেরার সামনে দিয়ে। ছুটো হাতি কাটাগাছ সরাচ্ছিল নদীর পারে। গরু ছাগল ষোড়া ভেড়া চরছিল মাঠে। ঝড়ের জন্তে সবাইকে ভাড়িয়ে নিয়ে আসা হোল। পরিচালক ঋগ্বেদ দীক্ষিত এত

বড় দৃশ্য কল্পনা করেননি।

বরাত জোরে জুটে গেল

সব ক্যামেরার মুখে, তুলে

ফেললেন। তুলে আশাতিরিক্ত তুষ্ট হোলেন।

চিত্রনাট্যে ছিল, অভিনেতা অভিনেত্রীদের থামারের কাছে লাগিয়ে ছবি নিতে হবে। সে মতলব ত্যাগ করলেন পরিচালক সাহেব। যা হোয়েছে যথেষ্ট হোয়েছে। এর পর স্টুডিওতে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় তুলে তার সংগে ঝড়ের দৃশ্য জুড়লেই চলবে। গল্পটা একটু পালটাবে। তা হোক, তাতে আরও দোরদার হবে ঘটনা সংস্থাপনে। অতএব গোটাও তল্লিতল্লা। ঝড় থামলেই রওনা হতে হবে। কি দরকার থামাখা একটা রাত এই তেপান্তরের মাঠে কাটিয়ে।

তল্লি গোটানো শুরু হোল।

ঝড় থামল।

তোরে ধুলো উড়িয়ে ধারা এসেছিলেন, সন্ধ্যার পরে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। পেছনে ফেলে রেখে গেলেন, ভাঙা গাছ, ভাঙা ডালপালা, ভাঙা নীড়। কত নীড় হারা পাখী সে রাত্রে থামারের ভেতর ভাঙা বৃকের বাতনায় আছার পাছার খেতে লাগল, সিনেমা যন্ত্রে সে ছবি কিন্তু ধরা পড়ল না।

ঝড় থেমে গেল।

ঝড় থামার পরে যা অবশিষ্ট রইল, তার নাম অবসাদ। একটা রাতও মেয়ে দু'টি রইল না কাছে। রইল না, কারণ থাকতে পেলনা। ওদের কিন্তু থাকবার বাসনা ছিল। ওরা নাকি ছুটি পেলে বাঁচে। মুখে রঙ মাখার হাত থেকে ছুটি, অনর্থক হাসিহাসি মুখ করে বেঁচে থাকার হাত থেকে ছুটি। স্বাধীনতা ওদের আছে, না খুশি করার স্বাধীনতা আছে। তবে একটি ব্যাপারে ওরা স্বাধীন নয়। সেটি হোল, ওদের সদা সন্তুষ্ট হোয়ে থাকতে হবে। মনের মধ্যে যাই হোক না কেন, মূন্সের হাসি কিন্তু বজায় রাখা চাই। সদা সর্বদা দেখাতে হবে



ওদের চেয়ে কেউ সুখী
নয় জিভুবনে। ওই হাসি
মুখই ওদের মূলধন, ওটুকু

খোয়ালে ওদের আর কানাকড়ি মূল্য থাকবে না।

নিজদের মূল্য বজায় রাখার জন্তে ওরা হাসে। আর
হাসির মূল্য দিতে গিয়ে ওরা ওদের নিজদের খোয়ায়।
অতি অল্প সময় ওরা ছিল। তার মধ্যে ওদের মনের
ভেতরটা দেখতে পেয়েছিল কস্তুরী। হুঁজনে খুলেছিল
ওদের মনের কপাট। বলেছিল—“বেশ আছ ভাই তুমি।
আহা, আমরা যদি তোমার মত থাকতে পেতাম।”
আশ্চর্য হোয়ে কস্তুরী জিজ্ঞেস করেছিল—“এখানে! এই
ভূতের বাড়ীতে আমার মত শেখী হোয়ে ভূতের পুরী
পাহারা দিতে চাও তোমরা। কেন, কি অভাব আছে
তোমাদের জীবনে?”

হুঁজনের মধ্যে যেটি অল্পবয়সী, সে জবাব দিয়েছিল—
“ভূতের বাড়ী পাহারা দেওয়ার চেয়ে ভূত তাড়িয়ে বেড়ানো
যে আরও শক্ত কাজ ভাই। তাও আবার মুখের হাসি
বজায় রেখে ভূত তাড়াতে হবে। গালাগালি দিয়ে ভূত
ভাগানোও চলবে না।”

জবাবটা হেঁয়ালির মত মনে হোয়েছিল কস্তুরীর। মেয়েটির
নামও হেঁয়ালি। নাম জিজ্ঞাসা করাতে জবাব দিয়েছিল—
“কোন নাম? আটপোরে? না শোষাকী?”
কস্তুরী ঐতমত খেয়ে বলেছিল—“যে নামে সবাই ডাকে
তোমাকে, সেই নামটি বলনা।”

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলেছিল—“সেই যে মস্ত নাম।
সেই নাম তুমিও শুনেছ নিশ্চয়। প্রহেলিকা পাল। প্রহেলিকা

পালের নাম শোননি এর আগে!”

হা, শুনেছে। সবাই শুনেছে প্রহেলিকা পালের নাম।
সকলেই দেখেছে তার ছবি। দর্শকদের চোখের জলে
নাকের জলে এক করে ছেড়ে দেয় প্রহেলিকা পাল।
প্রহেলিকার ছবি দেখতে যাওয়া মানে কেঁদে চোখ রাঙা
করে ফিরে আসা। এই ত’ সেবার, ‘মানস মরালী’
ছবিতে—হাসপাতালে মরা ছেলে জন্মাবার পরে এমন
কাঁদাই কেঁদেছিল প্রহেলিকা যে, একটি লোকও পকেট
থেকে ক্রমাল বার না করে পারেনি। সেই প্রহেলিকা
এত হাসতে পারে! এত হাসতে পারে!

ক্রুঁচকে তাকিয়ে ছিল কস্তুরী প্রহেলিকার দিকে।
তাকিয়ে ভাবছিল, সেই কান্না কি করে এই হাসির
আড়ালে লুকিয়ে আছে। প্রহেলিকার জীবনে কোনটা
সত্যি! হাসিটা না কান্নাটা!

বুঝতে পেরেছিল প্রহেলিকা ওর মনের ভাষা। বুঝতে
পেরে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল—ওরই গায়ের ওপর।
হাসির ঝাপটায় অস্থির হোয়ে উঠেছিল কস্তুরী। প্রহেলিকা
বলেছিল—“কান্নাটাই আসল জিনিষ ভাই। দরকারের
সময় খুব দামী কান্না কাঁদতে পারি বলেই আমি
প্রহেলিকা। তাই সিনেমাওয়ালারা আমার দরজায় হাত
দেখ। এই কান্না যেদিন শুকিয়ে যাবে, সেদিন আমাকেও
শুকিয়ে মরতে হবে। নেংটি ইটুরটাও আমার পানে
ফিরে তাকাবে না।”

কস্তুরী জানত না কান্নার এত দাম। কস্তুরীর জীবনেও
কান্না কম জমেনি। তবে কি সেও কান্নাকে মূলধন
করে ওদের মত হাসির হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জীবন
কাটাতে পারবে।

না, তাও বোধ হয় সম্ভব নয়। প্রহেলিকার
চেয়ে বয়সে যে মেয়েটি বড়, সে বুঝিয়ে
বলেছিল কস্তুরীকে, কান্নাকে মূলধন করে
জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তবে যদি ভুলে
যাওয়া যায় যে বেঁচে আছি, তা’ হোলে
সবই সম্ভব। বলেছিল সেই বড় মেয়েটি,
ভুলতে হবে। নিজে যে বেঁচে আছি একে-

ডি.রতন ঐ কোং

ফটোগ্রাফার্স

২২১, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিঃ ৬

ফাটা

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বারে ভুলে যেতে হবে। বৈচে আছি, এই বোধটুকু
বজায় থাকলে এত হাসা যায় না, এত কাঁদা যায় না,
এত মাহুষের মন কেড়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্ব
সংসারের সব কটি লোকের জন্তে বৈচে থাকে অভিনেত্রী,
নিজের জন্তে বাঁচে না। নিজের গলা টিপে মেরে না
ফেলতে পারলে অভিনেত্রী হওয়া সম্ভব নয়।

নিজেকে নিজে মেরে ফেলতে হবে।

স্বজ্ঞাতা কি মরেছে! স্বজ্ঞাতা কি হারিয়ে গেছে!
স্বজ্ঞাতা কি সত্যি কস্তুরী হয়েছে গেছে! না, যায় নি।
তা' যদি হোত—তা' হোলে কস্তুরী হাসতে পারত।
হাসি মুখে বৈচে থাকার মত বৈচে থাকতে পারত
কস্তুরী। কোন অভাবটা হচ্ছে কস্তুরীর? দুখটা কিসের?
বাড়ী ঘর দরজা, খাওয়া পরা শোওয়া, হুকুম তামিল
করার জন্তে এক গুটি মাহুষ, এততেও কেন হাসি

ফোটেনা কস্তুরীর মুখে?

কেন কস্তুরী ভুলতে

পারেনা স্বজ্ঞাতাকে? এই

নিশ্চিন্ততার নীড় ত্যাগ করে কোন দুখে কস্তুরী
পালাতে চায়?

হাজার রকমের হাজারখানা—‘কেন’ হাতুড়ির বা দিতে
থাকে কস্তুরীর বুকের মধ্যে। ভিজ়ে মাটির সোঁদা গন্ধ

ভেসে আসে ঘরের মধ্যে। গন্ধটা কেমন যেন কাঁদ
কাঁদ গন্ধ। ঐ গন্ধ নিঃশ্বাসের সংগে ঢোকে বুকে, মনটা

ভয়ানক রকম নরম হোয়ে যায়। বড্ড বেশী মনে পড়ে
একটা রাতের স্মৃতি। বড্ড বেশী অসহায় মনে হয়

নিজেকে। এমন একটা ইচ্ছে জাগে ভেতরে, যেটার
কথা টের পেলেই বড্ড বেশী লজ্জা করে। তবু

এড়ানো যায়, হুকুড়ে গুঠে ছোট্ট দেহখানি
হোতে থাকে। ধরা পড়ে যায় দুখানা খুব

হাতের মধ্যে, একখানা কসাঁ চণ্ডা বুকের ওপর মিশে যায়।

হাতের কাছে ক্যাপস্টান

মজুত রাখুন!



যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন—

সবসময়ে হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন।

ধূমপানে এমন আনন্দ আর

কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর

ভ্রামন্য নৈর্ভ

বি ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

৫৮৭/৬৮৭



তখন আর কিছুতেই রেহাই পাওয়া যায় না অদ্ভুত একটা অল্পভূতির হাত থেকে। একটা বালিশ বৃকের সংগে আঁকড়ে ধরে অন্ধকারের কান্না কান্দতে থাকে কস্তুরী। বাইরে ভিজে আকাশ, ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি সবই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দতে থাকে কস্তুরীর কান্নার সংগে হ্রস্ব মিলিয়ে।

তারপর অবসাদ।

অবরুদ্ধ আকৃতির নির্মম নিষ্পেষণে এতটুকু রস অবশিষ্ট থাকে না দেহে মনে কোথাও। অন্ধকারটা যেন নিবিড় কালো একখানা আন্তরণ, ভয়ানক ভারি পুরু একখানা কালো রঙের গালিচা যেন। গালিচার তলায় পড়ে পালস নেবার জন্তে হাঁকুপাঁকু করে মরতে হয়।

যত কিছুতে ফুরতে চায় না। নেই আঁকড়া পালসের বৃকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারপর চলে দিনের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ। জগদ্বল প্রমাণ অবকাশের জাঁতায় ফেলে পিষতে থাকে দিন। কস্তুরী আর তখন কস্তুরী থাকে না, সাক্ষাৎ কাল সাপিনীর মত—নিজের গায়েই নিজে ছোবল মারতে চায়।

পর্দার গায়ে ঝড় উঠল।

চমৎকার, একদম যার নাম পিলে চমকানো গোছের চমৎকার। আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে ঝড় ছুটছে, বিদ্যুত চমকচ্ছে, গাছপালার ঘাড় মটকচ্ছে। তার মধ্যে ছুটছে মাহুঘ, ছুটছে গরু ঘোড়া ছাগল হাতি। বড় বড় কলেব লাক্সল, মস্ত বড় শুঁড়গুলা মাটি বাটার কল, প্রকাণ্ড চেহারার খাল কাটার যন্ত্র, সব ছড়মুড় করে এগিয়ে চলেছে। খামারের ছবি যার নাম, খামারের আকাশ বাতাস মাটি মাহুঘ, বিলকুল ধরা পড়ে গেছে ক্যামেরায়। যান্ত্রিক চাষ আবাদ যে কি ধরণের মচ্ছব কাণ্ড, তা' গবচন্দ্র গবার মগজ্ঞেও সাঁ করে সোঁ দিয়ে যাবে। পরিচালক দীক্ষিত কাঁধ চাপড়ে দিলেন ক্যামেরায়ান চৌধুরীর। তারপর বসলেন অন্তঃসহকর্মীদের নিয়ে পরামর্শ করতে। এবার কি করতে হবে, ঐ ঝড়ের দৃষ্টটাকে কতগুলো টুকরো করে কোথায় কোথায় জুড়তে হবে।

চিহ্ননাট্য কোথায় কি ভাবে পালটাতে হবে। নায়ক নায়িকাকে দিয়ে কি করাতে হবে, কি বলাতে হবে। চলতে লাগল মগজ্ঞ মোচড়ানো। দলস্থল সকলে বেইঁস হোয়ে—সাস্পেন্স বজায় রাখবার জন্তে সিটিউরেশনের সংগে সীকোয়েন্স মেলাতে লাগলেন।

৷ পাঁচ ৷

পরিচালক ঋগ্বেদ দীক্ষিত দিনের বৃকের ওপর দাঁড়িয়ে পা দিয়ে দলে দলে দিনের মুখ থেকে রক্ত বার করে ছাড়েন। তাঁর কাছে হতভাগা দিনের একটি মাত্র মূল্যই আছে। কতটা রক্ত দিনের মুখ থেকে বার করা যায়, তাব ওপর দিনের সার্থকতা নির্ভর করে। কোনও অজুহাতে কোনও দিনকেই তিনি ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেন না। রাত কাবার হবার সংগে সংগে পৌছে গেলেন তিনি স্বস্থানে। পৌছেই টুটি টিপে ধরলেন দিনের। ছাপাও ছবি, এখনই দেখতে হবে, কি তুলে আনা হোল। দেখতে হবে, কতটুকু তার কাজে লাগবে।

সুতরাং দিনটি পালাবার পূর্বেই ছবি দেখতে বসলেন পরিচালক দীক্ষিত। সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে বসল। সাদা

সীকোয়েন্স বাঁকা পথ ধরল।

পরিচালক দীক্ষিতের দেড় ডজন সহকর্মীদের মধ্যে একজন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। ঝড়ের ছবি দেখতে দেখতে সে বেচারাব বৃকের ভেতর ঝড় উঠে পড়েছে। ক্যামেরার চক্ষুকে আর যমের চক্ষুকে নাকি ফাঁকি দেওয়া যায় না। স্পষ্ট সে দেখেছে—একবার নদ্র, বারবার দেখেছে সেই ঝড়ের মধ্যে একজনকে। কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা, এলো চুল উড়ছে, ঝড়ের ঝাপটায় ছোট্ট দেহখানিকেই বুঝি বা উড়িয়ে নিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা মাটির টিলার ওপর। চতুর্দিক দিয়ে মাহুঘ যন্ত্র পশু ছুটছে। সে কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় তাকে টলাতে পারছে না। চোয়ালের হাড় অঙ্গ



একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। আঁচল কোমরের সংগে জড়িয়ে ডান হাতে টেনে ধরে আছে। বাঁ হাতখানা মাথার ওপর, চুলগুলো পাছে মুখের ওপর এসে পড়ে, তাই চেপে ধরে আছে বাঁ হাতে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে তুলছে দেহখানি, শাড়ী লেপটে গেছে শরীরের সংগে। শরীরের সবকটি রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে শাড়ীর ওপর। তবু সে নড়ছে না, পালাবার চেষ্টাও করছে না। ঠিক এক জায়গায় এক ভাবে দাঁড়িয়ে ঝড়ের ঝাপটা খাচ্ছে।

কে ও।

ও কে, ভাবতে ভাবতে পরিচালকের সহকারী পৌছলেন সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে। একটি জরুরী তার পাঠালেন কানপুরে, তারপর চললেন শ্রীমতী প্রহেলিকা পালের সংগে সাক্ষাৎ করতে। প্রহেলিকা গিয়েছিল সেই থামারে, নিশ্চয়ই সে লক্ষ করেছে তাকে। আলাপ পরিচয়ও নিশ্চয়ই হয়েছে। অন্ততঃ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সেই মুহূর্তে, যেখানে বাড়ালী নিতান্ত দুর্লভ, সেখানে এমন একটি বাড়ালী মেয়ে এল কোথা থেকে, এ সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া নেহাতই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে খুব বেশী খুঁটিয়ে জানতে চায়। সুতরাং প্রহেলিকা হয়ত অনেক কথা বলতে পারবে তার সম্বন্ধে। না পারলেও ক্ষতি নেই, প্রহেলিকার বাড়ী গিয়ে খানিকটা সময় কাটাবার তা' সুযোগ মিলল। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। সেই রাজ্জেই সুযোগের সম্ভাবহার করতে সহকারী সাহেব প্রহেলিকার দরজায় হানা দিলেন।

প্রহেলিকা বাড়ীতেই ছিল। একজন সহকারীর জন্তে যতটুকু বরাদ্দ, ঠিক ততটুকু হাসি মুখে মেখে, ঠিক ততটুকু সময় নষ্ট করার জন্তে প্রস্তুত হয়েছে দেখা দিল।

“এই যে, আশ্রম সুশাস্ত বাবু। তারপর খপর কি বলুন।”

সুশাস্তবাবু সাবধান হোলেন প্রথম দিকেই। দু’হাত জোঁর করে বললেন—“দেখুন, আমি জানি, আপনি দু’মিনিটের বেশী আমার সংগে কথা বলবেন না। ফিল্ম লাইনে আছি, তেমন একজন কেউ-বিটু হোয়ে উঠিনি এখনও, আপনার সংগে দেখা করতে চাওয়াই আমার

পক্ষে গুটীতা। আপনি কত বড় তাও জানি।

কিন্তু কি কবব, ভয়ানক

বিপদে পড়ে গেছি। তাই—”

প্রহেলিকা হাসল। কেমন যেন অনেকটা অপেশানাবী করুণ স্বর ছিল সুশাস্ত বাবুর কথা বলার ঢঙে, তাই প্রহেলিকা একটু টিলে করলে নিজের চালচলন। বললে—“ভাল কাজ করেননি। বিপদে পড়েও আমায় মত লোকের কাছে আসা উচিত হয়নি।”

সুশাস্ত বাবুর অবস্থা আরও করুণ হোয়ে উঠল। মরিয়া হোয়ে বলে উঠলেন—“আপনার চেয়ে আমি বোধ হয় বরসে ছোট্টই হব। আপনি অন্ততঃ আজকে আমাকে আপনি বাবু, এসব বলবেন না। আমার এক বন্ধু ভয়ানক মুন্সিলে পড়েছে। তাই এসেছি আপনার কাছে।”

“বন্ধুর বিপদ।” আশ্চর্য হোয়ে গেল প্রহেলিকা। “বন্ধুর বিপদের জন্তে এমন ধারা ব্যাকুল হোয়েছ তুমি। এ সবও আজকাল আছে নাকি! বন্ধুর বিপদে কেউ এতখানি বেসামাল হয়! আচ্ছা তাই, বোস তুমি। এস, বসে পড়া যাক। বসে বসে শুনি, তোমার বন্ধুটি আবাব কি জাতের বিপদে পড়লেন।”

সুশাস্ত বাবু, বাবু বাদ দিয়ে শুধু সুশাস্ত বসে পড়ল একখানা চেয়ারে। সামনে বসল প্রহেলিকা। তারপর অতি অল্প কথার সুশাস্ত জানাল তার বন্ধুর বিপদের কথা। বন্ধুটি একজন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। কানপুরে কোন মিলে চাকরি করে। কিছুদিন আগে বিয়ে করতে এসেছিল কলকাতায়। বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরছিল। বউটি গাড়ী থেকে উধাও হোয়ে গেছে। সেই বউকে, নিশ্চয়ই সেই বউকেই দেখেছে সুশাস্ত ঝড়ের ছবিতে, যে ঝড়ের ছবি—আউটডোর থেকে তুলে এনেছেন পরিচালক দীক্ষিত। তাই ছুটে এসেছে সুশাস্ত প্রহেলিকার কাছে।

প্রহেলিকা অপলক নয়নে তাকিয়ে ছিল সুশাস্তের মুখের ওপর। কপাল কুঁচকে কতকটা বেশ অগ্রমনস্ক হোয়ে ভিজ্ঞাসা করলে—“ঝড়ের ছবিতে সেই বউ উঠে গেছে! কি করছিল সে ঝড়ের ছবিতে!”



স্বশাস্ত বললে—“করছিল না কিছুই, ছোট্ট একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিল।

বেশ চওড়া পাড় শাড়ী পরা একটি মেয়ে, বাড়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাবার দাখিল করেছিল তাকে। প্রাণপণে দাঁড়িয়েছিল টিলার মাথায়, আর ঝাপটা খাচ্ছিল। যেন পণ করে দাঁড়িয়েছিল কিছুতেই এক ইঞ্চি নড়বে না।”

প্রহেলিকা আরও একটু ঝুঁকে পড়ল সামনে। প্রায় ফিসফিস করে বলল—“কিন্তু সেই মেয়েটাই যে তোমার বন্ধুর বউ, তার ঠিক কি। ভুলও ত’ হোতে পারে তোমার। নতুন বউ সে, বিয়ের দিনই বা তুমি দেখেছ তাকে।”

যথেষ্ট জোর দিয়ে স্বশাস্ত বলল, ভুল তার হোতেই পারে না। এই মেয়ে দেখার সময় স্বশাস্ত গিয়েছিল। বিয়ের আগে চার পাঁচবার তাকে যেতে হয়েছিল মেয়ের বাড়ীতে। বন্ধু থাকে কানপুরে, তার মা কাঁকা সবই কানপুরে থাকেন। কলকাতায় থাকে স্বশাস্ত, স্বশাস্তকেই এক রকম ঘটক হোতে হয়েছিল এই বিয়েতে। মেয়েটির মুখখানিতে অদ্ভুত একটা বিশেষত্ব আছে। মুখখানা দেখতে মন্দ না হোলেও চোয়ালের হাড় অল্প একটু উঁচু। দেখলেই মনে হয় ভয়ানক জেদী মেয়ে। আর

নাকের ঠিক ওপরে ভুরু দুটোর মাঝখানে বেশ কৌচ পড়ে। ছবিতেও এই বিশেষত্ব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্বশাস্তর ভুল হয়নি, অত কাঁচা নম্বর তার নয়।

সোজা হোয়ে পিঠ টান করে বসল প্রহেলিকা। অল্প একটু সময় বুজে রইল চোখ দুটি। তারপর চোখ মেলে বললে—“ঠিক, ঠিকই মিশে যাচ্ছে বটে। কিন্তু—”

হঠাৎ থেমে গেল প্রহেলিকা, স্বশাস্ত প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অল্প একটু সময় পরে প্রহেলিকা বলল—“সেই বউটির বাপ-মা. কলকাতাতেই আছে ত’? তাদের নাম ঠিকানাটা দিতে পার আমায়?” নিশ্চয়ই দিতে পারে স্বশাস্ত। তৎক্ষণাৎ সে নীহাররঞ্জন বাবুর বাড়ীর ঠিকানা লিখে দিল।

প্রহেলিকা বলল—“তা’ হলে কাল একবার এস ভাই বিকেলের দিকে। আমার যেন মনে হচ্ছে, সেই মেয়েই হবে। এস তুমি কাল, এলে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলব।” অগত্যা উঠতে হোল স্বশাস্তকে। বিদায় নেবার আগে বলে গেল—“পুরুষোত্তমকেও টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। ওটা পেলেই বোধ হয় সে এসে পড়বে। আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে কিন্ত। বউটা উধাও হওয়ার ফলে যে অবস্থা হোয়েছে পুরুষোত্তমের, যদি দেখেন। বেচারার জীবনটাই গোলায় যেতে বসেছে।”

Senco Jewellers

নিম্ন ও অভিজাত স্মারকজিন্স

এনাকো ডুয়েলার্স প্রাইভেট লি:

কলিকাতা-৬, ৩০১, ব্রহ্মচাটার স্ট্রীট • কলিকাতা-৬
বম্বে-৬, ৩০১, ব্রহ্মচাটার স্ট্রীট • কলিকাতা-৬

এতক্ষণ পরে খিলখিল করে হেসে উঠল প্রহেলিকা, সিনেমার খুব নাম করা অভিনেত্রীর নাম করা হাসি হেসে উঠল। তারপর চোখ বাঁকা করে বাঁকা সুরে বলল—“ওরে বাব্বা! এক রাস্তার বউয়ের জন্তই এত! আগে থাকতে প্রেম ফ্রেম ছিল বোধ হয়।”

গভীর গলায় স্বশাস্ত বলল—“আজ্ঞে না, বিয়ের আগে ওদের মধ্যে দেখা শোনাই হয়নি কখনও। আমার বন্ধু সে ধাতের মাহুই নয়। ব্যাপারটা অল্প রকম দাঁড়িয়ে গেছে কিনা, বিয়ের পর দিনই বউটা উধাও হোয়ে গেল, সে-বেচার।



মুখ দেখাতে পারছে না কোথাও। নিজের ভাগ্যটাকেই এজ্ঞে দায়ী করে—শুন্ম হোয়ে আছে। চকরি বাকরি ছেড়ে গিয়ে হয়ত নিজেকে পালাবে একদিন।”

প্রহেলিকা গম্ভীর হোষে গেল। বলল—“পুরুষোত্তম কি না। অতটা উত্তম পুরুষ ভাল নয়। আচ্ছা তাই, কাল এস একবার।”

সেই রাজিটা প্রহেলিকার জীবনে বড়ই প্রহেলিকাময় হোয়ে কটিল। ভয়ানক যেন একা একা মনে হোতে লাগল নিজেকে। অনেক দূরে সেই খামার বাড়ীতে সেই মেঘেটি—যেমন একা বেঁচে রয়েছে, কতকটা বেন ঠিক তেমনি ভাবেই বেঁচে আছে প্রহেলিকা। অভিজাত পাড়ার মধ্যে মস্ত বড় বাড়ী তার, গণ্ডা গণ্ডা চাকর চাকরাণীতে গিসগিস করছে বাড়ী। ভয়ানক নামজাদা মানুষরা প্রায়ই আসেন তার বাড়ীতে। আলাপ আলোচনা গান বাজনা খাওয়া দাওয়ার পর বিদায় হন। উঁচু জাতের সমাজের উঁচু ধরনের আদব কায়দা মাফিক সকলেই তার বন্ধু, সকলেই তার গুণের সমজ্ঞার, সকলেই তাকে শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান অকপটে ঢেলে দেন বিশেষ রকমের কায়দায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন সকলে যে, প্রহেলিকা নামের অভিনেত্রীটিকে কেউ ছোট করে দেখেন না, নিজেকেই সমাজের একজন বলেই জ্ঞান করেন। এ সমস্তই অতি সত্যি কথা। হুতরাং প্রহেলিকা অনেক পেয়েছে, অনেক উঁচুতে উঠেছে, অভিযোগ করার কোনও দিকে কোনও কারণ তার থাকতেই পারেনা। তবু সে একা, অতি মর্মান্তিক ভাবে একা। সেই খামার বাড়ীর একান্ত একাকিনী মেয়েটির মত একা। গা হুমহুম করতে লাগল প্রহেলিকার। বিছানায় শুয়ে থাকা অসম্ভব হোয়ে উঠল। আলো জ্বালালো সে বেড্ হুইচ টিপে, বিছানা থেকে নেমে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিনে এল। কিছুতেই কিছু হোল না। ভূতে পেয়ে বসল যেন তাকে, নিঃসঙ্গ ভূত। ভূতের মত সে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল।

পায়চারী করতে করতে কখন যে পৌছে গেল অনেক দূরের খামার বাড়ীর সেই মেঘেটির ঘরে, তা’ নিজেকে খেয়াল করতে পারল না। কি ভয়ানক উঁচু আর কি প্রকাণ্ড বড় ঘরখানা! ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। অত বড় ঘর, ঘরের একধারে এক খাট, গোটা কতক পেছায় পেছায় আলমারি আর একখানা দুর্জয় গোছের টেবিল, সব মিসমিসে কালো রংএর। মস্ত একটা কেরোসীনের আলো বসান আছে টেবিলের মাঝখানে। তাতে বোধ হয় সেই ঘরের শত ভাগের এক ভাগও আলো হয় না। দিনের বেলাতেই ঘরখানা কেমন ভারী ভারী ঠেকেছিল। সেই মেয়েটিকে সেই ঘরে ভয়ানক রকম ছোট আর বেমানান বলে মনে হচ্ছিল। কি নিদারুণ অসহায় হতভাগী। বলেছিল—“আমার মত পেত্নী হোয়ে এই ভূতের বাড়ী পাহরা দিতে চাও তোমরা! কেন, কিসের অভাব তোমাদের?”

না, অভাব কিছুই নেই। প্রহেলিকা আবার নিভিয়ে দিলে আলো।

নিভিয়ে দিয়ে আলোর অভাবটা অহুতব করতে চাইল বোধ হয়। না, সে উপায়ও নেই তার বাড়ীতে। সহরের বুকে অভিজাত পাড়ায় নীরন্ধু অন্ধকারের স্থান নেই। ঘরের আলো নিভালেও বাইরের আলো যথেষ্ট এসে ঘরে ঢোকে। আলো জ্বলে সেই মেয়েটির জীবনের অন্ধকাব হয়ত ঘুচতে পারে, আলো নিভলেও প্রহেলিকার জীবনে আধারের আশ্বাদ কিছুতে মিলবে না।

তবু, তবু সে একা। আলোর রাজ্যে আলোর মত একা সে। সেই একাকীত্বের গ্রাস থেকে মুক্তি নেই।

দুর্দান্ত অভিনেত্রী প্রহেলিকা পাল পাক খেতে লাগল নিজের শোবার ঘরের মধ্যে, আর আলোর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্তে মনে মনে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

এই আলো অল্প মূল্যে আমদানী হয়নি প্রহেলিকার জীবনে। জীবনে যখন প্রহেলিকা বলতে কিছুই ছিল না, তখন আঁধার ছিল। আঁধার ছিল বলে আলো জ্বালাবার



প্রয়োজন হোয় পড়েছিল।

আলো এল অনেক সাধ্য।

সাধনায়, আঁধার ঘুচল।

অনেক জালায় জলে-তারপর আর আলো বিদেয় হোল না। জীবনটা প্রহেলিকায় হোয়ে গেল।

তখন সেই আঁধারের মাঝে নিজেকে চেনা যেত, নিজেকে খুঁজে পাওয়া যেত। এখন এই আলোর আলো জীবনে নিজেকে চেনাও যায় না, খুঁজে পাওয়াও সম্ভব না। একদম ভূতের মত অবস্থা, আঁকার বলতে কিছুই নেই। কিছুতেই কোথাও এতটুকু ছায়া পড়ে না। শাইনে ঝায়ে সামনে পেছনে উপরে নীচে অসংখ্য চোখ ধাঁধানো আলোর চোখ রাঙানো জালা। ছায়াবিহীন জীবনে জুড়বার উপায় কোথায়।

চোখ বুজে পাক খেতে লাগল প্রহেলিকা আর মনে মনে বোঝাতে লাগল সেই ধামার বাড়ীর মেয়েটিকে। কি যেন বেশ নামটি তার! বেশ কড়া গন্ধ নামটিতে। কস্তুরী—বেশ নামটি। ভয়ানক বড় লোক বাপের ভয়ানক দামী মেয়ে কস্তুরী। স্বশাস্ত বসে গেল—স্বজাতা। এটিও বেশ নাম। বাপ ছাপোষা মাহুদ, কলেজে পড়ায়। মেয়ের নাম কস্তুরী রাখতে সাহস পাবে কি করে। স্বজাতা কিন্তু কস্তুরী হোয়ে যাবে। বেশি দিন কস্তুরী মেখে বেঁচে থাকলে

কিছুতে আর কস্তুরীর গন্ধ ছুটবে না তার গা থেকে। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে প্রহেলিকাকে। করতেই হবে। কেন করতে হবে? কেন সে এই বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যাবে? কেন সে জড়াতে বাছে নিজেকে কস্তুরীর জীবনের সংগে? কেন—?

সব কেনর কি আর জবাব দেওয়া যায়।

অসম্ভব।

মাধুরী বলে একটা ছোট মেয়ে ছিল এক সময়। ভাল করে হাসত জানত না, ভাল করে কাঁদতে জানত না, ভাল করে কিছু ভাবতেও জানত না। সেই মেয়েটা কোথায় এখন? কেউ কি তার খোঁজ দিতে পারবে? না-কেউ জবাব দিতে পারবে, কেন মেয়েটা হারিয়ে গেল? অসম্ভব।

একমাত্র জবাব—মাধুরী মরে গেল। দু' দু'বার মল মাধুরী। প্রহেলিকা জানে, মাধুরী কি ভাবে মল। মাধুরীর মৃত্যু যন্ত্রণাটা এখনও সে নিজের শরীরের মধ্যে বেশ অহুতব করতে পারে। কতকাল আগে প্রথমবার মরে মাধুরী! হিসাব করতে থাকে প্রহেলিকা, চোখ বুজে দু'হাতের আঙ্গুলের সব কটা দাগ গুণতে থাকে। ডান হাতের চারটে আঙ্গুলের ষোলটা দাগ গোঁণা হোলে বা হাতের আঙ্গুল শুরু হয়—সতেরো, আঠারো, উনিশ, কুড়ি, একশ,

বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশ। ধামতে হয় আঠাশ পর্যন্ত পৌছেই। ব্যস—এ আঠাশই হোল। ঠিক আঠাশ বছর আগে প্রথমবার মরে মাধুরী, দ্বিতীয়বার মরে তার চার বছর পরে। দু' দু'বার সেই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ—উঃ—! দু'হাতে নিজের তলপেটটা টিপে ধরে অনেকটা হুয়ে পড়ে প্রহেলিকা। ভয়ানক লাল হোয়ে ওঠে মুখখানা। সেই ভাবে সামনে হুয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যায় আয়নার সামনে। এক হাত পেটের ওপর থেকে সরিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা

ফোন: ৩৪-২৮৭৩

আধুনিকতার
গঠন মৌলিক
বৈশিষ্ট্য
দৃষ্টিভঙ্গি

সেনাকো ডুমেলারী হাউস

১৭০/২-বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
(বঙ্গবাজারের কাছে)



জালে। তারপর কষি খুলে তলপেটের কাপড়টা নামায়। ফাঁস আলগা করে সায়রাটাও নামায় ধানিক। নামিয়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে তলপেটের মাঝখানে কি যেন অল্পভব কবার চেষ্টা করে। আয়নায় তলপেটের প্রতিবিম্ব পড়ে। সংগে সংগে শিউরে উঠে, একটা আঙ্গুল নাড়ির ঠিক তলার ছুঁইষে আস্তে আস্তে সোজা নিচের দিকে নিয়ে যায়— দাগটা পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখনও, দাগটা কিছুতে মেলায় নি! সেলাই হয়ছিল কিনা। হুঁ হুঁ-বার সেলাই হয়েছিল। সেলাইয়ের জায়গাটা বেশ যেন শক্ত হোয়ে আছে।

প্রহেলিকা পাল নিরুত্তর রাত্রে তার শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন হারিয়ে যায়—। একবার আঠাশ বছর আগে আর একবার চব্বিশ বছর আগে হুঁ হুঁ-বার যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছিল মাধুরী,—সেই যন্ত্রণায় প্রহেলিকাব দেহের সব কটা নাড়ী মোচড়াতে থাকে। যেন শরীরের মধ্যে বসে কে বা কারা তার নাড়ীগুলো ধরে টেনে টেনে ছিঁড়তে থাকে। চির-যৌবনা অভিনেত্রী প্রহেলিকা, কখনও যে ঝুড়ি বাইশ বছরের বেশী বয়সের নারিকার অংশে অভিনয় করে না। সে হঠাৎ চুয়াল্লিশ বছরের প্রোচা হোয়ে পড়ে। চোখে মুখে কপালে গালে কেমন যেন একটা কালো ছোপ ফুটে ওঠে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় আয়নার ভেতর, দেখে চুয়াল্লিশ বছরের মাধুরীকে। তাড়াতাড়ি সায়র দড়িতে ফাঁস দিয়ে কোমরের কষি গুঁজে আরও নিবিষ্ট চিন্তে দেখতে থাকে নিজের মুখানা। হুঁহাতের চেটো দিয়ে হুঁগাল ধরে অনেক রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মুখটা। না—বিশেষ কোনও গোলমাল হয়নি এখনও। রাত্রে এতটুকু রঙ পড়েনি মুখের ওপর। তবু দেখাচ্ছে ঠিক বিশ বাইশ বছরের কাঁচা মুখ। বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের পোড়-খাওয়া মুখের ছায়া পড়েনি ত' আয়নায়! না নিশ্চয়ই পড়েনি।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হল প্রহেলিকা পাল। আয়নার সমনে থেকে নরে গিয়ে আবার দাঁড়াল খাটের পাশে। আর এক জাতের আর একটা যন্ত্রণা শুরু হোবে গেছে ইতি-মধ্যে। এবার আর পেটের নাড়ীতে মোচড় পড়ে না, মোচড় পড়ে বুকের মধ্যে। কিসের জন্তে সেই মোচড়,

তাও ঠিক বুঝতে পারে না। খাস বন্ধ হোয়ে আসে। তারপর সব ভুলে যায়। শুধু একটি মাত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন হোয়ে যায় যন। স্তব্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশের পানে। অনেক দুবে গোটা চার পাঁচ তাবা মিটমিট করে জ্বলছে। তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—কোথা গেল তারা হুঁজন! মবে গেছে! মরে গিয়েছিল বলেই মায়ের পেট কেটে তাদের বার করতে হোয়েছিল।

কেন ম'ল! মায়ের পেট কেটে তাদের বার করতে হোল, তবু তাদের বাঁচানো গেল না কেন? একটাকেও বাঁচানো গেল না। একটাও যদিও আজ বেঁচে থাকত!

কাগজগুলার কাছে স্নহমাময়ী নাম দিয়েছে, বে স্নহমা দীর্ঘ বিশ বছরেরও ওপর লক্ষ কোটি চোখের তারার আশ্রন ধরিয়ে আসছে, বোবা কামনার বোবা বুভুক্ষণ সেই স্নহমা হঠাৎ একেবারে ভিন্ন রূপ ধারণ করলে। প্রহেলিকার মধ্যে কোথাও এতটুকু প্রহেলিকা রইল না। প্রহেলিকাব হাসি রইল না, প্রহেলিকার কান্নাও রইল না। প্রহেলিকার মান অভিমান প্রেম বিরহ কিছুই রইল না। রইল না তার নাম স্নহমা নয়—মাধুরী। স্নহমার রূপ থাকা চাই, শ্রী থাকা চাই। মাধুরীতে স্নহমার প্রয়োজনই নেই। মাধুরী যে চোখে দেখার জিনিষ নয়। রাগ, ঘেব, দুঃখ বার স্পর্শ পাষ না তার নাম মাধুরী। ও বস্তু জন্মায় তেতরে, ফুটে ওঠে ওপরে। আজ কুংসিং যাকে দেখতে, দেখলে চোখ কড়কড় করে, এমন মাহুঘের মধ্যেও যখন মাধুরী জন্মায়,—তখন তার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওই বস্তু সব সময় সব মাহুঘের মধ্যে বজায় থাকতে পারে না। মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায়, ভুলে গিয়ে অপার্থিব একটা চেতনার মধ্যে তলিয়ে যায়, তখন তার চতুর্দিকে গড়ে ওঠে মাধুরীর মণ্ডল। সেটা একটা আলোর মত ব্যাপার। নিজের জগতে ফিরে এলেই আবার উবে যায়।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। মাঝখানবার প্রান তিরিশটা বছর বেমালুম গায়েব হোয়ে গেল। কিসেব স্বপ্নে



যে বিত্তোর হোয়ে রইল?
কে বলতে পারে।

অভিজাত পাড়াতো

খোকার কান্না শোনা যায়। নিরুপম রাতে দু'খেকে ভেসে
এল খোকার কান্না! কোনও প্রতিবেশীর ঘরে অর্ধেক
রাত্রে জেগে উঠেছে খোকা, মায়ের বুকে মুখ দেবে বলে
কাদছে। হুঁহাতে চেপে ধরলে মাধুরী নিজের বুকেটা,
তারপর বিছানার ওপর উগুড় হোয়ে পড়ল। বিশ্বব্রজাও
জোড়া প্রহেলিকা ভক্তরা তখন হয়ত নিজেন্দের শয্যায়
শুয়ে স্বপ্নমাগীর স্বপ্নে বিভোর হোয়ে রইল। স্বপ্নেও
কেউ কল্পনা করতে পারল না, হঠাৎ প্রহেলিকা মরে
গেল। মরা প্রহেলিকার তেতর স্বপ্ন নিল একটি নিষ্পাপ
মেয়ে, যার দিকে তাকালে চিস্তের মধ্যে কোনও বিজ্ঞোভই
আলোড়ন তোলে না।

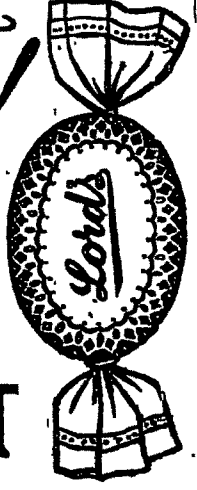
কতক্ষণ এইভাবে কাটত, কে বলতে পারে। হঠাৎ হুড়
মুড়িয়ে উঠে কল মাধুরী। ঝড়ের বেগে একটা হাল্লা ছুটে
আসছে। হাল্লাটা ঝড়ের বেগেই ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ীর

সামনে দিয়ে। অভিজাত ঘরের ছেলেরা ক্লাব থেকে
ফিরছেন বোধ হয়। ক্লাবের জল পেটে পড়ার দক্ষ ছুঁত
ট্যান্ডীর ওপর সমস্ত গান জুড়েছেন। অর্ধেক রাতের
পর ঐ অবস্থায় বাড়ী করেন বলেই ওরা অভিজাত।
রাতার পুলিশও ওদের দেখে সসঙ্কমে কপালে হাত
ঠেকায়। ছুটে গেল মাধুরীর মাধুর্য। এক মুহূর্তের
মধ্যে খাট ছেড়ে নেমে দাঁড়াল প্রহেলিকা। স্বপ্ন দেখা
প্রহেলিকার পোষায় না। স্বপ্ন দেখাকে প্রশ্ন দিলে জীবন
থেকে বাইশ চব্বিশটা বছর মুছে ফেলে বেঁচে থাকা সম্ভব
হোত না। যে মাধুরী সেই মাধুরীই থাকতে হোত
চিরকাল। না, তাও সম্ভব হোত না। মাধুরী বুড়ো
হোত, মাধুরীর বয়েস আজ চুয়াল্লিশ বছর পেরবার উপক্রম
করত। তখন হয়ত সেই মাধুরীও এই অভিজাত পাড়ায়
স্থান পেত। তবে সেটা অসম্ভব। সকালে বিকালে
এই পাড়ার কারও বাড়ীতে—কলতলায় বসে বাসন মাখতে
হোত। ঐ যে অভিজাত ছেলেরা ট্যান্ডী চেপে অর্ধেক
রাতে সাগোরবে ঘরে ফিরছে, ওরা তখন মাধুরীর মাধুর্য



মোনার স্বপ্ন!

লডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ডন্ড মনোহর
লক্সে মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে
ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।



লডের

লডেজম ও টকি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

বোঝবার জন্তে মরিয়া হোয়ে উঠত না। কিন্তু এই মুহূর্তে অর্ধেক রাতে ঐ মস্ত অবস্থাতেও যদি ওরা শোনে প্রহেলিকা দেবী ওদের স্মরণ করেছেন, তাহলে এখনই ওদের নেশা ছুটে যাবে। হস্তদস্ত হোয়ে ছুটে আসবে ওরা এই বাড়ীতে, কারণ এটা মাধুরীর বাড়ী নয়। অনন্তকাল যার বয়েস বাইশ থেকে এক চুলও নড়ে না তার বাড়ী। প্রহেলিকার বাড়ী। প্রহেলিকা দেবী যে ওদেরই সমাজের মানুষ। একদম ওদের সগোত্রও বলা চলে। সবই প্রহেলিকা, সবটুকুই হেয়ালি। সে দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল, যে দিন সেই মাধুরী-হেয়ালি স্তনে হেয়ালির লোভে পড়ে পথে নেমেছিল। তৎক্ষণাৎ তাকে কিনে নিয়েছিল খরিদ্বারে। কিনে নিয়ে সেই মাধুরীকে কেটে কুটে রান্না করে এমন পদার্থে পরিণত করলে, যার মধ্যে টক ঝাল মিষ্টি রইল বথেষ্ট পরিমাণে। রইল না শুধু মাধুরীর মাধুরীত্ব। এইটুকু স্মৃতিরে এমন এক ব্যঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেল মাধুরী, যার নাম করলেই সকলের ক্ষিতে লাল ঝরে। লালায় ভেজা জ্বজ্ববে জীবন নিয়ে যে বেঁচে রয়েছে, সে মাধুরী নয়। কোন মতেই মাধুরী নয় সে। সে প্রহেলিকা, যার আদি নেই, অন্ত নেই, আছে

শুধু চোখ ঝলসানো বর্তমানটা। বর্তমান বর্তমানই থাকবে প্রহেলিকার। কোনও দিন কোনও কালে অতীত হবে না।

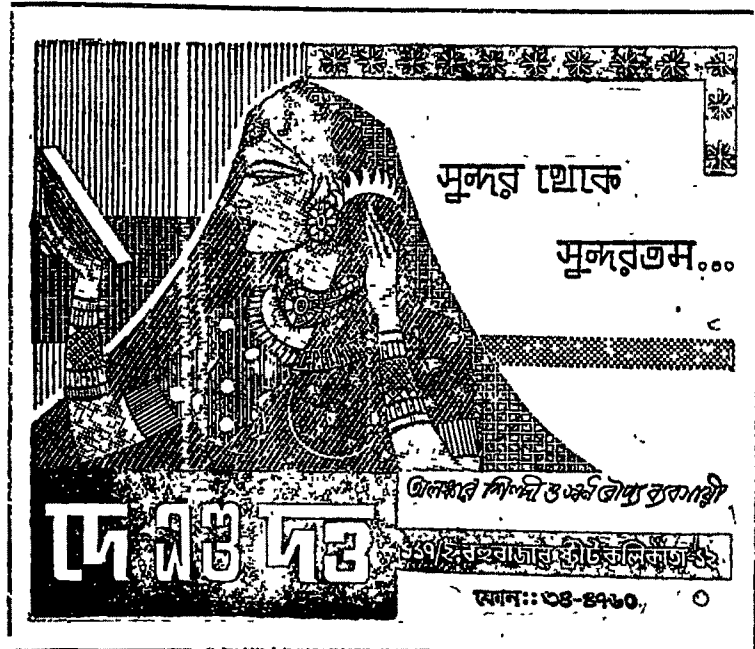
ঘুরে দাঁড়াল প্রহেলিকা পাল। হঠাৎ বাঁ পা খানা তুলে লাথি মারল মেঝের ওপর। তারপর একটার পর একটা সব কটা আলো জ্বাললো ঘরের। একটা লুকনো ঘড়ি খুব মিঠে স্বরে জানিয়ে দিল রাত আর নেই।

আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল প্রহেলিকা। জলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল খানিক আয়নার দিকে। তারপর ডান হাতের তর্জনীটা উঁচু করে জলন্ত কণ্ঠে হুকুম করলে—“না কিছুতেই এবার ছেড়ে দেবে না তুমি। জানলে

প্রহেলিকা হৃদয়ী, কিছুতেই একটা হৃজাতাকে কস্তরী বনতে দেবে না।

আর একটা হেয়ালি ঘটতে চলেছে, বাধা দিতে হবে এটাকে। ভোঁতা করে দিতে হবে এই হেয়ালির মুখ। তা' যদি 'পার, তা' হলেও মাধুরীর প্রহেলিকা বনবার কিছুটা প্রতিশোধ নিতে পারবে।

উপায় ঠাওরাতে বসল ঠাণ্ডা হোয়ে প্রহেলিকা। ঠাওরাতে গিয়ে দেখল, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়াটা কোনও কাজের হবে না। সর্বাগ্রে ভাল করে জানা উচিত, হৃজাতা মেয়েটির স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল। বিষের আগে কেমন ছিল সে, বাপ মা আত্মীয়স্বজনরা তাকে কেমন নজরে দেখত, এই বিষয়ে তার অমত ছিল কিনা, এ সমস্ত জানা প্রয়োজন। হৃজাতাকে ভাল করে বুঝতে হোলে যাওয়া দরকার হৃজাতার বাপের বাড়ীতে। এই জন্তেই ঠিকানা নিয়েছিল সে। ঠিকানা ত' রয়েছেই, কিন্তু যাচ্ছে কে? যেতে গেলে তাবেই যেতে হয়। অথ কাউকে পাঠালে সে কি করতে





কি করে আসবে। এই
ব্যাপারটা অপর কাকেও
বলাই যে সম্ভব নয়—।

বললেই কৈফিয়ত দিতে হবে নানারকম। কেন তুমি জড়ান
নিজেকে এই নোংরা ব্যাপারে? তোমার কি স্বার্থ আছে
বল? কৈফিয়ত দেবার সত্যিই কি নেই। কাজে কাজেই
তাকে যেতে হবে স্বজ্ঞাতাদের বাড়ী। কিন্তু যাওয়াটা কি
সম্ভব হবে তার পক্ষে!

পাড়ার মধ্যে ঢুকে স্বজ্ঞাতার বাবা নীহাররঞ্জন বাবুর বাড়ীটা
খুঁজে বার করতে হবে, কিন্তু কাকেও জিজ্ঞাসা করা চলবে
না। যদি জানাজানি হোয়ে পড়ে, প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী
প্রহেলিকা পাড়ার মধ্যে ঢুকেছেন, তাহলে হাড় মাংস নিয়ে
আস্ত ফিরে আসার উপায় থাকবে না। পুলিশের সাহায্য
ছাড়া প্রকাশ্য ভাবে কোথাও-যাওয়া সম্ভব নয় প্রহেলিকার।
ক্যানাটিক ক্যানরা বাঁপিয়ে এসে পড়বে চতুর্দিক থেকে।

একবার যদি ঘিরে ফেলতে পারে তারা, তাহলে আর রক্ষে
নেই। সেই জন্তে আগে থেকে সাবধান হয় পুলিশ, ক্যানদের
তফাৎ করে রাখে। নীহাররঞ্জন বাবুর বাড়ীতে যাবার জন্ত
কোনও ব্যবস্থাই করা চলবে না। একলা যেতে হবে কলেজের
ছাত্রী সেজে। প্রফেসরের বাড়ী ছাত্রী যাচ্ছে খুবই
স্বাভাবিক ব্যাপার। যেতে হবে এমন সময়, যখন স্বজ্ঞাতার

বাবা বাড়ীতে থাকেন না। স্বজ্ঞাতার মা থাকলেই চলবে।
যতটুকু জানার তিনিই জানাতে পারবেন। কিন্তু এবড়
সাহসটা করা কি উচিত হবে!

আলবত হবে। করতেই হবে সাহস, তবু পেয়ে শিহিয়ে
পড়া চলবে না। নিজেকে চোখ রাঙিয়ে উঠল প্রহেলিকা।
তারপর তৈরী হোতে লাগল যাবার জন্তে।

ঘসে মেজে তুলে ফেললে মুখ চোখ গায়ের রঙ। পেছন
দিকে টেনে জড়িয়ে ফেললে চুলগুলো। হাতে গলায় কোথাও
কোন গয়না রাখল না। ইঞ্চি দেড়েক চওড়া কালো পাড়
সাদা মিলের কাপড় আর সাদা জামা পরলে। খান দুই
খাতা আর খান তিনেক মোটা মোটা বই খুঁজে বার করলে।
বইগুলোর ওপর খবরের কাগজের মলাট দিলে। কেউ খুলে
দেখলে সর্বনাশ, কলেজের ছাত্রীর হাতে ওই সব বই থাকার
ফলটা কেমন দাঁড়াতে পারে, ভাবতে গিয়ে মনে মনে খুব
খানিক হেসে নিল।

সব ব্যবস্থা শেষ করতে প্রায় দশটা বাজল। তখন নিজের
গাড়ীর ড্রাইভারকে ডেকে মতলবটা বললে তার কাছে।
লোকটি খুবই বিশ্বাসী, সেই প্রথম গাড়ী কেনার সময়
থেকে আছে প্রহেলিকার কাছে। স্বপ্নানক নাগ করা মেয়ে-
মনিবের গাড়ী চালাতে চালাতে রঙবেরঙের মাহুফ দেখা
অভ্যাস হোয়ে গেছে তার। মনিবের—নানা জাতের খাম-

খেয়াল তাকে ররদাস্ত করতে হয়।
ফলে তার নিজের সংসারে টানটানি
নামক ব্যাধিটা নেই। ছেলে মেয়েরা
স্কুল কলেজে পড়ছে, সে খরচাও মনিব
চালায়। তাকেও মনিবের মন বুঝে
চলতে হয়।

ড্রাইভারকে ডেকে প্রহেলিকা বেশ করে
বুঝিয়ে দিলে, কেমন ভাবে কোথায় কি
করতে হবে। নীহাররঞ্জন বাবুর বাড়ীর
নম্বর আর রাস্তার নাম, লিখে দিলে
তাকে। দিয়ে বললে—“মুনসী, একটা
ট্যাক্সী নিয়ে এখনই চলে যাও এই
পাড়ায়। ট্যাক্সী ড্রায়ারস্কে ছেড়ে দিয়ে



বাগা ও থিয়েটারের
ড্রেস ও
স্টেজ
বি. দাস এণ্ড কোং

একমাত্র সূত্রাধিকারী: শ্রী রত্নী দে
৩৬ নং ব্র্যাক্স রোড, কলিকাতা-১
ফোন - ২২ - ৬৫০২



চুকবে পাড়ার মধ্যে। কাউকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবে না, শুধু এই নখরের বাড়ীখানা চিনে আসবে। খবরদার, কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে, কেন তুমি ঘুরছ পাড়ার মধ্যে। বাড়ীখানা চিনে আসলে আমি বেরব।^১ ঠাঁয় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সী নেব, তুমিও যাবে আমার সংগে। ওখানে পৌঁছবার আগেই ঠাঁয় রাস্তায় ট্যাক্সী ছেড়ে দেব। তখন তুমি এগিয়ে যাবে, আমি যাব তোমার পেছন পেছন। কিন্তু মনে থাকে যেন, তুমি আমার চেন না, আমিও তোমায় চিনি না। সেই বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় একখানা কাগজ পড়ে যাবে তোমার হাত থেকে। নিচু হোয়ে সেখানা তুলে নিয়ে সোজা চল যাবে তুমি। অতীত দিগে ঘুরে এসে যেখানে ট্যাক্সী ছেড়ে দেব আমরা, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কেমন, বুঝলে ব্যাপারটা?”

মুনসী ঘাড় নাড়ল এবং আর একটি বাক্য ব্যয় না করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। জানত সে বাক্য ব্যয় করা অনর্থক। খেয়াল যখন উঠেছে মনিবের, তখন কাগজটা ঘটবেই। এভাবে মনিবকে নিয়ে যাওয়া যে কতখানি অগ্রাধিকার হচ্ছে, তা সে ভাল করেই জানত। জানলেও কোন উপায় ছিল না। কথা বাড়তে গেলে উলটো উৎপত্তি হবার ভয়। মনিবটি তখন মুনসীকে সংগে না নিয়েই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবেন।

ঘটানাক্ষণের মধ্যে মুনসী ফিবে এল। বাড়ী সে চিনে এসেছে, সিঁড়ির রঙের দোতলা বাড়ী—ডানদিকে পড়বে। বাড়ীর সামনে রক আছে।

অতঃপর একটি কলেজের মেয়ে খানকতক বই খার্তা বুকে চেপে ধরে—মাথা নীচু করে বেরল প্রহেলিকার বাড়ী থেকে। বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল। একখানা খবরের কাগজ বগলে নিয়ে মুনসীও চলল পিছু পিছু। বড় রাস্তায় একখানা ট্যাক্সী ধরে হুঁজনে উঠে বসল।

নীহাররঞ্জন বাবুর স্ত্রী একলাই ছিলেন বাড়ীতে। স্বামী ছেলে মেয়ে সবাই স্কুল কলেজে বেবিরে গেছে। স্বজাতার এই বাস্তবীটিকে তিনি ঠিক চিনতে পারলেন না। তবে

মেয়েটির চালচলন দেখে তিনি খুবই নরম হোয়ে পড়লেন। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রশ্নাম করে ভ্রমরক কুণ্ঠিত ভাবে এইটুকুই শুধু বলতে পারল মেয়েটি—“মাসীমা, আমি স্বজাতার বন্ধু। আপনাকে দেখতে এলাম।” বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল একবারে। স্বজাতার মা লক্ষ্য করে দেখলেন, টপটপ করে জল পড়ছে মেয়েটির হুঁচোখ থেকে। নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না চাপবার চেষ্টা কবছে প্রাণপণে। বন্ধুব পালিয়ে যাওয়াটা কতখানি বেজোরে মেয়েটির বুকে তা’ আর বুঝতে বাকী রইল না স্বজাতার মায়ের। তিনিও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। বুকেব ওপর পাশা চাপা দিয়ে য়র সংসার করছিলেন তিনি। সত্যি-কারেব চোখের জল ফেলছে একজন তাঁর মেয়েব জন্তে, দেখে তাঁরও হুঁচোখে বজা নাগল। তারপর আর কোনও কিছুই করতে হোল না প্রহেলিকাকে। তাকে সাহসনা দেবার জন্তে মন খুলে সব কিছুই বলে ফেললেন স্বজাতার মা। বলে নিজের দুঃখের বোঝাটা খানিক হাল্কা করলেন। ঘটনা খানেক পরে আবার যখন ট্যাক্সীতে উঠে বসল সেই কলেজের ছাত্রীটি, তখন তার চোখ মুখ জলজল করছে। এত সহজে সিদ্ধিলাভ হবে, আশা করতে পারেনি সে। পাড়ার নতুনরা রাস্তায় ওঁত পেতে ছিল না। বেলা এগাবটা বারটার সময় সাধারণত তারা থাকেও না। মেয়েদের স্কুল কলেজে যাওয়াব সময়টা পার হোয়ে গেলে যে বার আড্ডায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। স্বজাতার মাকে গলিয়ে ফেলা একটুও শক্ত কাজ নয় প্রহেলিকার পক্ষে, এটা ত’ সে জেনেই গিয়েছিল। কথায় কথায়—চোখের জল ফেলাটা কি শুধু শুধুই সে অভ্যাস করেছে! অতঃপরেই থাকলে হয়ত অতটা সহজ হোত না কার্যোদ্ধার করা। আরও খানিক চোখের জল, আরও কিছু মিথ্যা কথা খবচা করতে হোত। কিছুই করতে হোল না।

নিজে থেকেই স্বজাতার মা গঁড়গড় করে সব বলে ফেললেন! মেয়ে নাকি তাঁর বাকে বলে মাটির পুতুল, তাই ছিল। সাত চড়েও মুখ ফুটে রা কাড়তে জানত না। জামায়ের



মত জামাইও ছুটিয়ে-
ছিলেন তিনি, রূপে, গুণে,
বিজ্ঞেয় হীরের টুকরো
ছেলে। কি হুগে কিসের জন্তে যে হতভাগী সব ছেড়ে
পালিয়ে গেল, তা মোটেই বোঝাই গেল না।
পালিয়ে গেছে স্বজাতা, এ হোতেই পারে না। হয়ত
কোনও বিপদাপদ—

একান্ত অপরাধীর মত বিপদাপদের কথাটা বলতে গেল
স্বজাতার বন্ধু। মা কথাটা শেষ করতেই দিলেন না।
বললেন—“বিপদাপদ হোলে ত’ বাঁচতাম মা। সে মরে
গেছে সুনলেও যে মুখ তুলে পাঁচ জনের সামনে বেরতে
পারি। কোন বিপদই হয়নি তার। বেনারসী জামা কাপড়
পরে গিয়েছিল। তাই পরেই বসেছিল গাড়ীতে। সেই
কাপড় জামা রেখে জামায়ের একখানা ধুতি পরে নেমে
গেছে গাড়ী থেকে। সে সময় অর্ধেক রাত, জামাই বর-
যাত্রীরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ টের পায় নি।

পাছে কেউ টের পায়, এই ভয়ে নিজের বাঁকটা খোলে
নি। সেটা ছিল বেকির তলায়, টানাটানি করতে গেলে
হয়ত কারো ঘুম ভেঙে যেত। জামায়ের পায়ের কাছে ছিল
জামায়ের স্টকেশ। তার ভেতর ছিল জামায়ের কয়েকটা
জামা কাপড়। তাই থেকে একখানা ধুতি নিয়ে বেনারসী
ছেড়ে বেকির তলায় গুজে রেখে গেছে। অনেক বুদ্ধি
খরচা করে খুব সাবধানে পালাবার ব্যবস্থা করেছে সে।
বিপদাপদের কথা উঠতেই পারে না।”

আরও সন্দেহের কথা হোল, কাপড় জামা শুধু কেলেরে রেখে
গেছে স্বজাতা, গয়না-গাঁটি সব নিয়ে গেছে সংগে। নিশ্চয়ই
কোনও সড় ছিল কারও সংগে, ঠিক জামায়ের ঠিক সময়
সে নামিয়ে নিয়ে গেছে, ঐ রকম বেনারসী পরা দেখলে
অনেকের সন্দেহ হোতে পারে, এই জন্তেই গুলো বদলে
গেছে। পুলিশেও সন্দেহ করছে তাই, সবাই সন্দেহ করছে।
কিন্তু কার সংগে যে গেল, তা’ কিছুতেই আন্দাজ করা
যাচ্ছে না। কখনও কোন লোকের সংগে মিশতেও দেখেন

“জবম অবধি হয় রূপ বেহারলু”

বয়স বা তিরপিত ভেল—”

—বিভাগতি

হুগে হুগে সোন্দর্যের এই ই

শাখত স্বীকৃতি

আভরণ আর আবরণীতে সজ্জিতা হলেও
পুছোর সমস্ত আনন্দের বিকাশ আপনাতঃ
মুখে—আপনার সুবর্ণানিকে অবিস্মরণীয়,
অনিশ্চয়ত্বের ও সুবর্ণা সুস্বাদিত রাখে
বোরোলীন।



বো রোলীন

জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৩

নি মেয়েকে। পাড়ার একটা হতভাগা বখাটে ছোকরাও উধাও হোয়েছিল স্বজাতার বিয়ের পরদিন। লোকে বলা-বলি করছিল, তার সংগেই পালিয়েছে স্বজাতা। সে ছেলেটার মাথায় ছিট আছে। অনেকবার সে মারধোর খেয়েছে মেয়েদের পেছনে লাগবার দক্ষণ। তা' সে ছোকরাও ফিরে এসেছে হাড়গোড় ভেংগে। কোথায় কি মতলবে গিয়েছিল, মারধোর খেয়ে মরেছে। কোথায় গিয়েছিল, তাও বলে না কিছুতে। বলবাব মত অবস্থাও নেই তার, মরণাপন্ন হোয়ে পড়ে আছে বিছানায়। তবু যা হোক, ফিরে এসে একটা উপকার করেছে সে। স্বজাতা যে তার সংগে পালায়নি, এটা প্রমাণ করেছে। নয়ত স্বজাতার বাপ-মাকে গলায় দড়ি দিতে হোত বা বিষ খেতে হোত। ঐ রকম একটা হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতের সংগে মেয়ে পালিয়েছে, এটা প্রমাণ হোলে কিছুতেই আর বেঁচে থেকে মুখ দেখানো যেত না কাউকে। ঐ ছোড়া বা ওর মলের কোনও ছোড়ার পানে পাড়ার কোনও মেয়ে মুখ তুলে তাকায়ও না। ওর সংগে স্বজাতার নামটা জড়িয়ে যা তা বলাবলি করতে লাগল তখন মাহুয়ে, তখন সেটা স্বজাতার বাপ-মার পক্ষে কাটা ঘায়ে হুনের ছিটে তুল্য হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাক, ছোড়াটা ফিরে এসে সেই জলুনির হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই দিয়েছে।

এই ছোড়াটি আবার কে?

ট্যান্ডীতে বসে বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রহেলিকার মনে খচখচ করে বিধতে লাগল একটি প্রশ্ন। কে সেই হতভাগা ছোড়াটা? স্বজাতার বিয়ের পর দিন সে উধাও হোয়েছিল। হাড়গোড় ভেংগে ফিরে এসেছে। তা' ভালই করেছে। কিন্তু কে সেই মস্তানটি? এর আসল

পরিচয়টা একটু পেলে হোত।

ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে

পৌছল প্রহেলিকা পাল। মিনিট দশেকের মধ্যে রঙ করে ফেললে নিজেকে। রঙ করে আসল প্রহেলিকা হোয়ে দাঁড়াল।

২ ছয়

অনেক দূরে বাবু বঙ্গবাহন ঝাড়ের খামারে তাঁর অন্দর-মহলের মধ্যে আসল প্রহেলিকা ঘনিরে উঠেছে ইতিমধ্যে। হঠাৎ বঙ্গবাহন কণ্ঠা কস্তুরী দেবীর নামে রেজেপ্তি করা চিঠি এসে গেল একখানি। চিঠিখানি খামারের অকিস থেকে কস্তুরীর কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়া হোল। না পাঠাবার কোনও কারণ নেই। অন্দরমহলে চিঠি ঢুকতে পাবে না, এমন কিছু আদেশ দিয়ে যাননি মনিব। তা' ছাড়া চিঠি তা' আসতেই পারে। শিক্ষিতা মনিব কণ্ঠার কাছে চিঠি না আসাই অস্বাভাবিক ব্যাপার। বঙ্গবাহন বাবুর কর্মচারীদের মধ্যে অতিরিক্ত রকম বিশ্বাসী হ'একজনই মাত্র জানেন, হঠাৎ ঐ কণ্ঠাটিকে কোথা থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন মনিব। জানলেও তাঁর হাবভাবেও কখনও এমন কিছু প্রকাশ করেন না, যাতে অল্প কারও মনে অল্প রকম কিছু সন্দেহ হয়। সকলেই জানে, কোথায় কোন ইংরেজী স্কুলে মেম সাহেবের সংগে লেখা পড়া শিখেছিল মনিবের কণ্ঠা। স্ত্রী বিষয়োগের পরে বড়ই মুশকিলে পড়েছিলেন বাবু বঙ্গবাহন ঝা ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে। মেম সাহেবদের স্কুলে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হোয়েছিলেন মেয়েটিকে। সেখানেই মেয়ে পড়াশুনা করছিল। পড়াশুনা শেষ হোতে বাপের কাছে চলে এসেছে। কর্মচারীদের বিশ্বাস করতেও আটকায়নি কণ্ঠাটা। সকলেই শুনেছিল, মনিবের এক মাত্র একটি কণ্ঠা আছে। কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, তা' কেউ জানত না। মনিব সম্বন্ধে বেশী জানবার কারও সাহসও ছিল না। বাবু বঙ্গবাহন ঝা নামটির মধ্যেই এমন একটা থমথমে ভাব

এ, টি, ও ই এও কোং

—মেটাল মার্চেন্টস্—

৬৮-ই, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-৪।

(ফোন : ৩৩-৫৮৬৫, ৩৩-৫৮৬৬)

১ গ্রাম : ডেঙ্গালস)

স্বাধীনতার সাক্ষর ঘোষণা!
 জেনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লি:
 পরিবেশিত আগামী
 কয়েকটি অসাধারণ চিত্র!

* জয়ন্তা পিকচার্স বিবেচিত

স্বরলিপি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: অসিত সেন
 সংগীত: হেমন্ত ঘোষাপাধ্যায়
 জে. সুপ্রিয়া চৌধুরী, জোমিন চট্টোপাধ্যায়
 অনিল চ্যাটার্জী

* সিনেআর্ট প্রোডাকশন্স বিবেচিত
 নন্দকেশ বসু

সাত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: রাজেন তরফদার
 সংগীত: সালিল চৌধুরী
 জে. রুমাদেবী, জনেশ মুখার্জী
 নিরঞ্জন রায়

* চিত্রকল্প বিবেচিত
 শ্রদ্ধিক কুমার ঘটক পরিচালিত

কোমল গাঙ্গার

জে. সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী
 ওলফগ্যাং অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
 সংগীত: জ্যোতির্বিজ্ঞ মৈত্র

* মৃণাল সেন প্রোডাকশন্স-এর

মুদ্রাশ

জে. জোমিন চট্টোপাধ্যায়
 চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: মৃণাল সেন

* সালিল কলা চর্চা-এর
 দ্বিতীয় বিবেচন

নূতন প্রভাত

জে. প্রদীপ কুমার, অজীম কুমার
 বিপ্লব গুপ্ত, কুমারী নাজ
 প্রাণ ও জ্যোতির্মোহন
 প্রযোজনা ও পরিচালনা
 অরবিন্দ সেন
 সংগীত: এন. দত্ত

এন. বি. ফিল্মস্-এর

মেনাদিদি

জে. তানুজা, কেসী মোহরা
 পরিচালনা: হরীকেশ মুখার্জী
 সংগীত: সঞ্জিব চৌধুরী

ছিল যে, ফালতু উৎসবের ফালতু ফলতেই পেত না কারও মনে। শুকতর কাজের মাহুষ মনিব। কাজ করবার জন্ত বেছে বেছে কর্মচারী রেখেছেন। কাজ হচ্ছে, এমন কাজই হচ্ছে যে, সারা দেশ গর্ব করে বাবু বজ্রবাহন বা নায়াটি নিয়ে। গর্ব না করবে কে। যে কাজের দক্ষ দেশের মাহুষ পেট পুরে খেতে পায়, যে কাজের ফলে মাহুষের ঘর থেকে রোগ ব্যাধি পালর, সেই কাজই ত' আসল কাজ। সেই কাজ যিনি করেন, তাঁর সম্বন্ধে বাজে উৎসাহ কখনও গজাতে পারে না মাহুষের মনে। গজালেও রক্ষে নেই। বাবু বজ্রবাহন ঝায়ে মন ধারে কাটে না ভাবে কাটে, তা' সনাই জানে। সেই হুদীস্ত ভারী মনের চোট সঙ্করবে কে! সুতরাং বাবু বজ্রবাহন ঝায়ে অহুপস্থিতিতেও তাঁর লগ্না পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল বাপের অন্দর মহলে। হঠাৎ সেই নিশ্চিন্ততার নীড়ে শিকারী বাজের নজর পড়ল। পৌছিল একখানা রেজেষ্ট্রি করা চিঠি। চিঠিখানি খুলতে গিয়ে হাত কঁপে উঠল বজ্রবাহন কল্ল কস্তুরীর। তারপরই সে ভয়ানক উত্তেজিত হোষে উঠল। হোষেছে, এতদিন পরে মিলেছে সুযোগ। আসল কস্তুরীর পরিচয় জানবার। কস্তুরীকে যে চিঠি দিয়েছে, নিশ্চয়ই সে কস্তুরীকে ভাল করে জানে। এর সংগে চিঠি লেখালেখি করলেই আসল কস্তুরীর পরিচয়টা পাওয়া যাবে। দেখা যাক, কি আছে চিঠিতে। চিঠি দেখতে দেখতে চক্ষু কপালে ওঠার দাখিল হোল। সাত পাতা জোড়া মর্মস্পর্শী মার্জনা ভিক্ষা। তার সংগে ফোড়ন দেওয়া হোষেছে কিছু কিছু জীয়া কলাপের জল জ্যাস্ত বর্ণনা, বা পড়তে গেলে কান, গাল লাল হাযে ওঠেই। কবে কোথায় কি ভাবে মিলন হোষেছিল, সেই মিলনের স্মৃতিটুকু কেমন সার্থক ভাবে বেঁচে রয়েছে মনের মধ্যে, তাই প্রমাণ করার চেষ্টা হোষেছে চিঠিতে। এবং তার সংগে সবিশেষ জোরের সংগে বলা হোষেছে, সে স্মৃতি মুছবার নয়, মুছবে না। মুছবে না বলেই নারিকা অদৃশ্য হবার পর নায়ক বিবাগী হোষে দেশে দেশে ঘুরে বেগিয়েছে এতদিন। তারপর কোনও ক্রমে যখন সংবাদ পেল, নারিকাটি তার বাপের বাড়ীতে লুকিয়ে বসে আছে তখন

প্রাণের মায়ী পরিত্যাগ করে ছুটে এসেছে। কিন্তু বাবু বজ্রবাহনের অন্দর মহলের ধারে কাছে ঘেঁষবার ত' উপায় নেই। তাই নায়ক পোষ্ট অফিসের শরণাপন্ন হোষেছে। চিঠিখানি পোষ্ট অফিসের মারফত যাচ্ছে বটে, জবাব কিন্তু পোষ্ট অফিসের মারফত দিতে হবে না। জবাবের জন্ত নায়ক স্বয়ং এসে বসে আছে ডাকবাংলোয়। জবাব মোটে চায়ই না নায়ক, একটিবার মাত্র দূর থেকে চোখের দেখা দেখতে চায় তার হৃদয়বল্লভাকে। দেখাটুকু পেলেই বুঝবে যে, সে মার্জনা পেয়েছে। তাহলেই তার প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। আর এতটুকু কিছু আশা কববার নেই তার। থাকতেই পারে না কিছু আশা করার। যে অপরাধ সে করেছে, তারপর আর কিই বা আশা করার থাকতে পারে। চিঠিখানি লেখা হোষেছে বাঙলা ভাষায়। বাঙলার সংগে



চার স্পীডের ব্যাটারী ও কারেন্টে রেবর্ড
বাজাবার যন্ত্র স্থলভে শীঘ্র পাবেন।

স্বরধ্বনি মিউজিক ফটো ফোন



অজস্র বিহারী বাত
মিশেল দেওয়া হয়েছে।
নীচে নাম লেখা রয়েছে

সরযুপ্রসাদ। শুধু সরযুপ্রসাদ নয়, চির বিরহী চির হতভাগ্য,
চির অপরাধী সরযুপ্রসাদ। তিন তিনটে চির সংযুক্ত
সরযুপ্রসাদের দুর্দান্ত মর্মব্যথা চিঠিখানির প্রতিটি ছত্রে
যেন লেপটে রয়েছে। চিঠিখানি পড়ার কলে ভয়ানক
হাসি পেয়ে গেল কস্তুরী। অনেকদিন পরে সে নিজের
কথা ভুলে গিয়ে একলা ঘরে প্রাণ ভরে হেসে নিল খানিকটা।
হাসতে হাসতে একবার ঐষর্ষ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল
চিঠিখানা। তার জীবনে প্রেমের চিঠি পড়ার সুযোগ
এই প্রথম ঘটল। প্রেমের চিঠি পড়তে গেলে বিষম হাসি
হাসতে হয়, এটা সে জানত না। হাসতে হাসতে পেটে
খিল ধরবার উপক্রম হোল তার। শুয়ে গড়াতে লাগল
চিঠিখানা হাতে নিয়েই। বাবা রে বাবা, এই চিঠি পড়তে
কলে সত্যিকারের কস্তুরী না জানি কি করত!



সত্যিকারের কস্তুরীর কথা মনে ওঠায় হাসি বন্ধ হোল।
সংগে সংগে চিঠির কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে বিছানার
ওপর। এ কি করছে সে! অপরের চিঠি খুলে পড়ছে কেন?
অপরের চিঠি খুলে পড়াটা কতখানি অশ্রদ্ধা, তা কি সে
জানেন না?

সত্যের তাকিয়ে রইল চিঠিখানার দিকে, হাসি টাসি সব উবে
গেল। ছোট্ট কপালখানির ওপর অনেকগুলো কোঁচ পড়ল,
দুই ভুল্লর মাঝখানে ছোট্ট একটু ত্রিকোণ তৈরী হোল।
গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল সত্যিকারের কস্তুরীর
কথা। সত্যিকারের কস্তুরী তা'হলে কোথায় গেল।

সরযুপ্রসাদের চিঠিতে রয়েছে, বছরের পর বছর সে না খেয়ে
না ঘুমিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বছরের পর বছর,
মানে ক' বছর! ক' বছর আগে—পালিয়েছে কস্তুরী?
কি এমন অপরাধ করেছিল সরযুপ্রসাদ, যার দণ্ড কস্তুরীকে
পালাতে হোল? সরযুপ্রসাদের সংগে কি বিয়ে হয়েছিল
কস্তুরীর? মনে ও' হয় না যে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে
করা বউয়ের সংগে লেকে, ময়দানে, সিনেমায়, বনে বাদাড়ে
কেন দেখা করতে যেত স্বামী? চিঠিতে রয়েছে, বছ
চেঁটার—বছ তকলিক করে সামান্য ছ' দশ রাত ওরা মিলে
ছিল কোন হোটেলের ঘরে। সেই ঘরের বর্ণনা, সেই
রাতের সৌন্দর্য, সেই মিলনের খুঁটিনাটি হিসেবপত্র সবই
রয়েছে চিঠিতে। কিন্তু এ কি স্বামী স্ত্রীর মিলন! এত
রকমের বাধা বিঘ্নই বা কেন পার হোতে হোত কস্তুরীকে
সরযুর কাছে পৌঁছবার অন্তে! আর কলকাতার তখন
থাকতই বা কোথায় কস্তুরী! না, চিঠি পড়ে মাথামুণ্ড কিছুই
বোঝা গেল না। কস্তুরীর ব্যাপারটা আরও যেন ঘুলিয়ে
গেল। মোটের এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, সরযুপ্রসাদ কস্তুরীর
বাবাকে বিষম ভয় করে। স্পষ্টই লিখেছে, বাবা নেই
জেনেই সে চিঠি লিখতে সাহস করেছে, আর এত কাছে
এসে ডাকবাঙলোয় বসে আছে। ডাকবাঙলোটা আবার
কোথায়!

ডাকবাঙলোর সামনে দিয়ে কস্তুরীকে বেড়াতে যেতে হবে।
দূর থেকে তাকে একটির পর দেখেই 'সম্ভ্রষ্ট' হোয়ে ফিরে
যাবে সরযুপ্রসাদ। শুধু বুঝে যাবে—কস্তুরী তাকে কমা

করেছে। এইটুকু বুঝতে পারলেই বেচারার প্রাণের জ্বালা জুড়বে।

প্রাণের জ্বালা জুড়াবার কথাটা অন্ততঃ বিশ বার আছে চিঠিতে। ইস, কি বিষম জ্বালা বেচারার প্রাণে। আসল কস্তুরী বোধ হয় ঐ বিষম জ্বালা সহ্য করতে না পেবেই নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

নকল কস্তুরী আবার হাসি জুড়ে দিলে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল বিছানার ওপর। এই বন্ধ পাগলটার সংগে প্রেমে পড়েছিল কস্তুরী! হি হি হি হি—ভাগ্যে সে সত্যিকারের কস্তুরী নয়—হি হি হি হি হি হি।

হাসির ঢমক কমে এল কিছুক্ষণ পরে। তারপর উঠে বসে আবার ভাবতে লাগল। আসল কস্তুরী না হলেও সে কস্তুরী। কস্তুরীর অংশে নিখুঁত অভিনয় করতে না পারলে সে কিসের কস্তুরী। অতএব এই চিঠি পাবার পরে কি করা উচিত তার?

একদিন সরযুপ্রসাদের জন্তে কস্তুরী লেকে গেছে, ময়দানে গেছে, বনে বাদাড়ে, হোটেলের সর্বত্র গেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। আজ শুধু যেতে হবে ডাকবাঙলোর সামনের রাস্তায়। মোটে কিছু হাঙ্গামা হবার ভয় নেই। সোজা একবার যাবে ডাকবাঙলোর গেটের সামনে দিয়ে, আবার ফিরে আসবে। সময়ও ঠিক করে দেওয়া আছে। বিকেলবেলা চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। এ আর এমন শক্ত কাজ কি! আহা, বেচারী সরযুপ্রসাদ, এই দয়টুকু করবে তোমায় কস্তুরী, নিশ্চয়ই করবে। এত হৃদয়হীন কস্তুরী হোতেই পারে না। কিন্তু কস্তুরী যাবে আপাদ মস্তক চাঁদর জড়িয়ে, যেমন এদেশের মেয়েরা চাঁদর জড়ায়—কোথাও যেতে আসতে। নানা রকমের ওড়না আর চাঁদর এক গাদা কেনা হয়েছে কস্তুরীর জন্যে। অন্ততঃ একখানা তার বাজে লাগবে। কিন্তু কস্তুরীর শ্রীমুখখানি ত' তুমি দেখতে পাবে না সরযুপ্রসাদ, তা' না দেখতে পেলেও কি তোমার মনের জ্বালা ঠাণ্ডা হবে! চাঁদর ঢাকা মুখ দেখেই—আপাততঃ জুড়াক তোমার মন, এ ভিন্ন আর উপায় কি! যে কস্তুরী তোমায় দর্শন দিতে যাচ্ছে, তার মুখ দর্শন করলে তোমার বুকখানার ভেতর দাঁউ দাঁউ করে জ্বলতে থাকবে আরও।

এই ভয়েই কস্তুরী চাঁদর মুড়ি দিয়ে যাবে ডাকবাঙলোর সামনে দিয়ে।

বেচারী সরযুপ্রসাদের উদ্দেশ্যে মনে মনে কথা কটি বলতে বলতে আবার হাসি পেয়ে গেল। হাসতে গিয়েও হাসা হোল না। হঠাৎ আসল কথাটা মনে পড়ল। আচ্ছা, কস্তুরী কি তা'হলে 'নষ্ট' মেয়ে ছিল! নষ্ট মেয়ে ছিল বলেই বোধ হয় তাকে পালাতে হয়েছে। হয়ত বা তা কাণ্ড একটা বাধিয়ে 'বসেছিল। হোটেলের ঘরে সরযুপ্রসাদের সংগে রাত কাটাবার ফল ফলেছিল বোধ হয়! তারপর আর মুখ দেখাবে কেমন করে বাপের সামনে। যে রকম জাঁদরেল বাপটি, সাহসই পারনি কেনেভাবে বাধিয়ে এসে বাপের সামনে দাঁড়াতে। তাই একদম নিখোজ হয়ে গেছে।

এ সমস্ত কিছুই নয় বোধ হয়। সরযুপ্রসাদের মত আরও ছুঁচরজন প্রেমের ভিখারী ছিল, হয়ত কস্তুরীর। তাদের কারও সংগে ঘর সংসার পেতেছে বহু দূরে কোথাও গিয়ে। এমন কোনও জায়গায় গেছে, যেখানে এই বাপটি বা সরযুপ্রসাদের মত মানুষরা পৌছতেই পারবে না। কিংবা চরম কাণ্ডই করে ফেলেছে কিনা কস্তুরী কে জানে। সকলের হাত থেকে সসম্মানে রেহাই পাবার জন্তে গলায় দড়ি দিয়ে বা বিষ খেয়ে বা অন্য কোন উপায়ে একদম এই দুনিয়া ছেড়ে সরে পড়েছে হয়ত। কি যে করেছে কস্তুরী, এখন সে কোথাও কি ভাবে আছে, কিছুই টের পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে এক প্রেমিক এসে আরও গুণগোল পাকিয়ে তুললে। এখন এই প্রেমিকটিকে বিদেহ করতে পারলে হয় কোনও রকমে। ডাকবাঙলোর এসে বসে আছে যখন, তখন সহজে ফিরবে না। দেখা সে করবেই। শেষ পর্যন্ত না বাড়ীতে এসেই উপস্থিত হয়! বাড়ীতে আসবার সাহস হবে কি! বলা যায় না কিছুই, যে রকম মরিয়া হোয়ে উঠেছে, তাতে সবই সম্ভব। চিঠিতে ত' বিশ বার লিখেছে একটি বার দেখা না পেলে জীবন আর রাখবে না। জীবনের মায়াই যার নেই, সে বাড়ী পর্যন্ত এসে পৌছতেও পারে। জেনেই এসেছে, এখন



পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে শুরু করেছিল তা হচ্ছে বালি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসাত্মক আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শব্দের নিদর্শন রয়েছে তা বালি বলেই পত্তিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালী ও স্প্যানের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বালির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেন্সুজি এর চাষ শুরু করেছিলেন চীনে।



আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর সিদ্ধ-সভ্যতা আবিষ্কারের-মধ্যেও জানা গেছে যে বালির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বালিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা

বালির পুষ্টিগুণ গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এক প্রাত্যহিক আহাৰ্য ও পানীয় হিসেবে বালির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বালিশস্য একাত্ম হয়ে আছে।



আজো বালি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ করে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বালির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বালিশস্য থেকে উৎপন্ন পাল বালি ও গুঁড়ো বালি সহজে হজম হয় এবং শারীরিক ক্রিয়ার সহায়ক বলে রুগীদের ক্ষেত্রেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বালির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বালি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ইন্স) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উচ্চমানের বালিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি তৈরী হয়। এই ক্ষেত্রেই 'পিউরিটি বালি' রুগ, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বালি থেকে উপকার পান।



অ্যাটলান্টিস (ইন্স) লিঃ (ইংল্যান্ডে সংগঠিত)

কস্তুরীর বাবা নেই, তখন সাহস করে এলেই বা বাধা দিচ্ছে কে। কর্মচারীরা বাধা দিতে গেলে কস্তুরীর নাম করবে। হয়ত বলেই বসবে—“কস্তুরী ডেকেছে বলেই এসেছি। ডাক কস্তুরীকে, আম্বক সে আমার সামনে। এসে বলুক আমার ডাকেনি, আমার চেনে না।” তখন কি হবে! ভয়ানক গুণ্ডগোল বাধবে, বিশ্রী কেলেঙ্কার হবে। কর্মচারীরা যাচ্ছেতাই কিছু মনে করবে। ইাকিয়ে দেবে বটে লোকটাকে, কিন্তু কেলেঙ্কারটা কিছু কম হবে না।

তার চেয়ে ঢের বেশী বিশ্রী কাণ্ড বাধবে যদি ঐ সরযুপ্রসাদ কোনও উপায়ে একটাবার দেখে ফেলে এখনকার এই কস্তুরীকে। দেখে ফেলা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এত কাছে এসে যখন বসে আছে, তখন একটা ন একটা ব্যবস্থা করবেই। কর্মচারীদের সংগে আলাপ পরিচয় করে খাতির জগিয়ে ফেলতে পারে। তারপর দূর থেকে কস্তুরীকে দেখে ফেলবে। আজকাল সে প্রায়ই বেড়াতে যায় নদী ধারে, খামারের ভেতরও ঘুরে বেড়ায়। কত লোকই তান দিকে তাকায়। যারা তাকায়, তাদের কাণ্ডকেই সে চেনে না। তাদের মধ্যে হয়ত এমদিন ঐ সরযুপ্রসাদও থাকবে। ভাল করে দেখে নেবে তাকে। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করবে—এই কি বজ্রবাহন বাবুর মেয়ে কস্তুরী? কর্মচারীরা বলবে—হাঁ। সরযুপ্রসাদ বলবে—“না।” ব্যস লাগবে তখন দারুণ হট্টগোল। কিছুই হয়ত করবার সাহস পাবে না কর্মচারীরা যতক্ষণ না কস্তুরীর বাবা ফিরছেন। কিন্তু কি মনে করবে সকলে!

ফ্যাসাদে পড়া গেল বটে! এখন মানে মানে মামুষটাকে এখান থেকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচা যায়। দূর থেকে একটাবার দেখেই চলে যাবে লিখেছে। দেবে নাকি দেখা ডাব-বাঙলোর সামনে গিয়ে! চাঁদরে মুখ মাধা ঢাকা অবস্থায় দেখা দিলে কি সম্ভব হবে! কে জানে কি কু-বুদ্ধি করে বসেছে! থাক গে বাবু, দরকার নেই কিছু করে। সাহসই হবে না তার কিছু করবার। দু'চারদিন ঐ ডাব-বাঙলোয় বসে থেকে তারপর বিরক্ত হয়ে পালাবে।

তখনকার মত স্থগিত রইল চিঠির ভাবনা ভাবা।

চিঠিখানি লুকিয়ে রেখে উঠে পড়ল কস্তুরী। উঠেই বা সে করবে কি!

যাবে কোথায়! বাইরে বেরিয়ে ঘুরতে লাগল বজ্রবাহন বাবুর অন্তরমহলের মস্ত বড় উঠানে। চিঠির ভাবনা আর সেই ডাববাঙলোর সরযুপ্রসাদকে তাড়াবার চেষ্টা কবতে লাগল মন থেকে। সহজ নয়। কোনও বাজ নেই যাব, কোনও কিছু নিয়ে অন্তমনস্ক হোয়ে থাকার উপায় নেই যে হতভাগীর, কি করে সে নিস্তার পাবে চিন্তার হাত থেকে। ঘুবে ফিরে সরযুপ্রসাদ আর কস্তুরী বার বার-আসতে লাগল সামনে। এ আবার একটা নতুন উপদ্রব। বেশ ছিল, খেয়ে ঘুমিয়ে যে কোনও উপায়ে কাটিয়ে দিচ্ছিল দিন রাতগুলো। একমাত্র নিজের হুঁত্যা ছাড়া আর কিছু ভাববার ছিল না। কপাল ত'পুড়েছেই চিবকালেব মত, তবু বেশ শান্তিতে ছিল। এই ভাবে মুখ বুজে থাকতে থাকতে এবদিন মরে যেত। আপদের শেষ হোয়ে যেত। কোথা থেকে উদয় হোল এই মহা বিপদ! কি করে এখন নিস্তার পাবে এই বিপদ থেকে!

এটা কিন্তু তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। কস্তুরীর বাবা বলেছিলেন—‘তোমার মত একটি মেয়ে ছিল আমার। সেও একদিন গেল।’ কোথায় গেল, কেন গেল, এ সমস্ত কিছুই বলেননি। গেল মানে মরে গেল, এই বুঝেছিল তখন সে। তাই বলেছিল—‘আমিই সেই কস্তুরী,’ তিনিও মেনে নিয়েছিলেন। নিয়ে নিজের মেয়েব জন্তে যা করা দরকার সেই ব্যবস্থা করে গেছেন। এতদিন মোটে চিন্তাই কবেনি যে কস্তুরী বেঁচে থাকতে পারে। কস্তুরী পালিয়ে গেছে, এটা কি ভাবতে পেরেছিল। এতগুলো কর্মচারীর মধ্যে একজনও কখনও দেখেনি কস্তুরীকে, এইটাই তার কাছে আশ্চর্য লেগেছিল। আবার আশ্চর্য হবারও নেই কিছু। মনিবের মেয়ে সেই ছোট বেল থেকে কোথায় কোন মেমসাহেবদের স্থলে মামুষ হচ্ছে, এইটুকুই জানত কর্মচারীরা। মেয়ে যে পালিয়ে গেছে, তা' কখনও জানাননি মনিব কাউকে। তাই রেললাইনের ধার থেকে যাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাকেই নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে তাঁর বাধেনি।



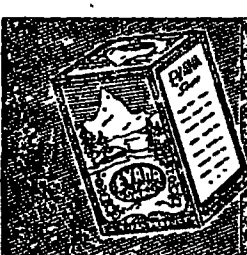


এ পর্যন্ত সমস্তই ঠিকঠাক চলে এ সে ছে। এখন এসেছে ঐ সরযুপ্রসাদ, কিছুদিন পরে হয়ত আসল কস্তুরীই ফিরে আসবে। তখন সে কি করবে! কোথায় গিয়ে কার কাছে আশ্রয় নেবে সে তখন। এই বাড়ী, এই ঘর, এই সমস্ত জিনিষপত্র আর হুকুম-তামিল করার জন্তে এই সব গণ্ডাগণ্ডা চাকর, বাকর কর্মচারী, এ সমস্ত ত' সেই আসল কস্তুরীর। নকল কস্তুরী কতদিন এ সমস্ত ভোগ দখল করতে পারবে। এখানে লুকিয়ে থাকতে গেলে সে পরম নিশ্চিত্তে রয়েছে। উলটে বরং ছুঁখ করে মরছে, এ ভাবে শুধু খেয়ে পরে আর ঘুমিয়ে কি মাছুর বাঁচতে পারে! হায় রে হায়, এই খাওয়া পরা ঘুমের ব্যবস্থা-টুকুও যে ঘুচতে পারে যে কোনও দিন, এটা ত' তার মনে কখনও উদয় হয় নি। ঘুচবে যে দিন, সে দিন সে করবে কি! দাঁড়াবে কোথায়! কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের জাত মান রক্ষা করবে!

জাত মান রক্ষা করা কথাটার সঠিক মানে কল্পনা করাও দুসাহ্য তার পক্ষে। নানা কথা সে শুনেছে, অনেক কিছু দেখেছেও। মেয়েদের যে কত নিচুতে নামতে হয়, তা সে জানে। কলকাতায় জন্মেছে, বড় হয়েছে, কলেজে পড়ত। জানে অনেক কিছুই। মেয়েদের শরীরটা যে বিক্রী করা যায়, বিস্তর ক্রেতা যে হচ্ছে হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী দেহ কেনবার জন্তে, সব সে জানে। যারা দেহ বিক্রী করে পেট চালায়, তাদের দেখেছেও রাস্তার ধারে। বান্ধবীদের সংগে রাস্তার ধারের

মেয়েদের জীবন নিয়ে একটু-আধটু আলাপ আলোচনাও যে হয়নি, তা' নয়। জীবনের ঐ বীভৎস ছবিটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়নি কখনও। মনে উদয় হোলেই বাজে চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। দরকারও হয়নি কখনও বাজে চিন্তা করার। ভাল সংসারের ভাল মেয়ে সে। লেখা পড়া করেছে, বড় হোয়েছে। জানত, একদিন বিয়ে হবে তাদেরই মত ভদ্র সংসারে। বাপ-মা বিয়ে ঠিক করে-বিয়ে দিয়ে দেবেন। ব্যস, এক বাড়ী ছেড়ে আর এক বাড়ীতে চলে যাবে। সেখানে পাবে আশ্রয়, নিকপত্রব আশ্রয়, আর একটি মাহুষ। বিশেষ করে নিজের জন্তে পাবে একজনকে। সেই একজন তার ছুঁখ বুঝবে, আদ্যার বুঝবে, মান অভিমান অনেক কিছু বুঝবে। শুধু সেই মাহুষটিই বুঝবে, আর কেউ নয়। অজানা অচেনা সেই মাহুষটি, একদিন যে আসবে জীবনে, এসে সমস্ত তার তুলে নেবে কাঁধে, তার সম্বন্ধে কুমারী মেয়ের মনে অনেক রকম রঙের পাগড়িওয়াল ফুল কোটে। অধ্যাপক নীহার-রঞ্জন বাবুর মেয়ে স্বজাতার মনেও অতি সংগোপনে সে ফুল ফুটত। কিছুই অস্তায় নেই এতে। তা' বলে এতটুকু বেহারাপনা, এতটুকু চাল চলনের গোলমাল কেউ দেখেছে না কি কখনও! মনের মধ্যে একটু আধটু ভূমিকম্প হোলেও বাইরে কিছুতে প্রকাশ পায়নি তার ধাক্কা। অসম্ভব ব্যাপার, বাঙালী ভদ্র সংসারে আর যাই থাক, বেহারাপনার স্থান নেই। ও সমস্ত বদ চালচলন বড়লোকের বাড়ীতে চলে। স্বজাতার বাবা বড়লোক ছিলেন না।

মনে পড়ে গেল স্বজাতার বাবাকে। স্বজাতার বাবা কস্তুরীর বাবার মত বড়লোক নয়। সেই বাবার মত ভাল মাহুষ কে আছে বিশ্ব সংসারে! একটি-বার যদি গিয়ে সে দাঁড়াতে পারে বাবার সামনে, তা'হলে কি বাবা স্বজাতাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। কখনও পারবেন না, কিছুতে নয়। কেন তাড়াবেন তিনি? কি অস্তায় করেছে স্বজাতা? বাবা ঠিকই টের পাবেন, মেয়ে তাঁর কোনও অস্তায় করেনি,



রূপ ও লাবণ্যের জন্য

ইভানা

সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-৩



করতে পারে না। এমন কিছু করতে পারে না স্বজ্ঞাতা, যাতে তার বাবার মাথা হেঁট হয়।

ঠিক ঐ কারণেই কখনও সে ফিরে যেতে পারবে না বাবার সামনে। গেলে বাবার মাথা হেঁট হবে। বাবা আর বাঁচবেন না। লোকের কথা শোনান ভয়ে কিছু একটা করে নিজেই মারা যাবেন। না, না, কখনও তা' হয় না। কখনও স্বজ্ঞাতা সে রকম চেষ্টা করবে না। কখনও না, কখনও না। তার আগেই স্বজ্ঞাতা যে কোনও উপায়ে নিজে মরবে। মরে সব অশান্তির শেষ করে ফেলবে।

ছুটে গিয়ে ঢুকল আবার ঘরে। ঢুকে আছড়ে গড়ল বিছানার ওপর। মরতে হবে, মরতেই হবে তাকে। মবে রেহাই পেতে হবে এই সাংঘাতিক সব ভাবনা চিন্তার কবল থেকে। কস্তুরী হোয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কস্তুরীও হত মরে রেহাই পেয়েছে। না মলে ঠিক তাকে খুঁজে বার করত তার বাবা। কস্তুরীর বাবা আর স্বজ্ঞাতার বাবা অনেক তফাৎ। মেয়ে নিখোঁজ হোয়ে গেলে স্বজ্ঞাতার বাবা কিছুই করতে পারেন নি। এমন কি কারও সমনে একটু দুঃখ প্রকাশও করতে পাবেন না লজ্জায়। মুখ বুজে শুধু সঙ্করবেন লোকের বাঁকা হাসি। কস্তুরীর বাবা কিন্তু সে রকম মানুষ নন। যতটুকু সময় দেখেছে সে তাঁকে, তাতেই তার ধারণা হোয়েছে, কি জাতের মানুষ তিনি। এত লোকজন, এত কর্মচারী, সবাই তাঁর নামে ধরধর করে কাঁপে। তিনি নেই এখানে, তবু সবাই তটস্থ হোয়ে আছে। যে যার কাজ নিহুঁত ভাবে করে চলেছে। জানে কিনা সকলে, ফিরে এসে যদি দেখেন তিনি কোথাও কোনও গোলমাল হোয়েছে, তা' হলে আর রক্ষে রাখবেন না। এই রকম মানুষ কস্তুরীর বাবা। কিছুতেই তিনি চূপ করে থাকতেন না, যদি জানতেন যে তাঁর কস্তুরী বেঁচে আছে। বাপকে ফাঁকি দিয়ে 'কিছুতেই কস্তুরী লুকিয়ে থাকতে পারত না। নিশ্চয়ই সে মরেছে। ঐ লোকটা, ঐ সরযুপ্রসাদ জানে

না, কবে মরেছে কস্তুরী, কি ভাবে মরেছে। এত দিন পরে কোনও রকমে জানতে পেরেছে যে, কস্তুরী আছে তার বাবার কাছে। জানতে পেরে, ছুটে এসেছে জ্বালাতে। হতভাগা লোকটা কিছুতেই কস্তুরীকে রেহাই দেবে না। মবে গিয়েও কস্তুরী ওর হাত থেকে রেহাই পাবে না। কি জঘন্য মানুষ ঐ সরযুপ্রসাদ। সত্যিকারের কস্তুরী যদি সে হোত, তা'হলে এখনই সেই ডাক বাঙালোয় গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে আসত ওর সংগে। সাত পাতা ছাইভস্ম লিখে মন ভেজাবার চেষ্টা করা বার করে দিত। মুশকিল হচ্ছে যে ওইখানেই। আসল কস্তুরী ত' নয় সে, নকল কস্তুরী। নকল কস্তুরীকে অনর্থক নাকাল বরতে এসেছে লোকটা, মিছিমিছি জ্বালাতে এসেছে। নকল কস্তুরী জানলে হত আসতই না মরতে এখানে। নিশ্চয়ই আসত না। কস্তুরীর জন্তে ও এসেছে। 'স্বজ্ঞাতার জন্তে নয়। স্বজ্ঞাতার জন্তে কেউ কোনও দিন আসবে না। স্বজ্ঞাতাকে খুঁজে বার করার গরজ কারও নেই, এমন সঙ্কর কার আছে স্বজ্ঞাতার সংগে, যে বছরের পর বছর খুঁজে খুঁজে স্বজ্ঞাতাকে বার করবে! কে সে? এতদূর পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসে হঠাৎ ভাবনাটা হোঁচট খাব। কেমন যেন ঝিম ঝিম বরে ওঠে সর্ব শরীর। সব উত্তেজনা, সমস্ত সমস্তা তখনকার মত তলিয়ে যায়। হাত পা সর্শরীর কেমন যেন হুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, ধরা পড়ে যায় খুব জোরালো ছ'খানা বাহুর মধ্যে। তারপর নিষ্পেষিত হোতে থাকে ছোট শরীরটুকু খুব চওড়া খুব ফর্সা একখানা বকের ওপর। তারপর তীব্র একটা নেশায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ে মন বুদ্ধি সব। তারপরই কান্না শুরু হয়। কেউ নেই, এমন আমার কে আছে, যে আমাকে খুঁজে বার করতে বেরবে। কস্তুরীর জন্তেই এসেছে সরযুপ্রসাদ, আসল কস্তুরীর জন্তেই বেচারী পাগল হোয়ে ছুটে এসেছে। নকল কস্তুরীর জন্তে কোনও কালে কেউ আসবে না।

দিনটা কোনও রকমে খরচ হোয়ে গেল। এল রাত। নির্দয়



রাত, দুর্জয় রাত, অস্তহীন
রাত শুটি শুটি এসে
হায়ড়ি খেয়ে পড়ল।

প্রচণ্ড উচু বিশাল ঘরখানার মধ্যে আশ্রয় নিতে হোল
কল্পরীকে। এবার প্রচণ্ড ভারী রাতের সংগে একলা
যুঝতে হবে। বাইরের আলো, আকাশ, গাছপালা ঝড়
শব্দ, সব কিছু সংগে সযত্ন গেল ঘুচে। জলতে লাগল মস্ত
বড় একটা কেরোসীনের আলো বিপরীত দর্শন টেবিলটার
ওপর বসে, একটা মাত্র ঘুরুর পোকা বিদ্যুটে জ্বালের
একধেরে আগুয়াজ তুলে ঘুরতে লাগল আলোটার চতুর্দিকে।
টেবিলের পাশে উচু টুলের ওপর বসে রইল নকল কল্পরী।
ছুটি কহুই রইল তার টেবিলের কিনারায় ঠেকানো, ছু'
জ্বালের ওপর রইল মুখখানি। জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল
সে কুচ্ছিত পোকাটার পানে। কতক্ষণে শেষ হবে ওর
ঘোরা, কতক্ষণে ওটা বাতির ভেতর ঢুকে পুড়ে মরবে,
পোড়বার সময় কেমন ছটকট করে মরবে, দেখতে হবে।
এই একই জ্বালের পুড়ে মরার দৃষ্ট রোজই দেখতে হয়,

কোনও না কোনও জ্বালের ছুটো চারটে পোকা পুড়ে
মরতে আসে রোজ আলোটার কাছে। না পুড়লে যেন
ওদের স্বস্তি নেই। যতক্ষণ না পুড়ে মরে, ততক্ষণ কিছুতেই
থামে না। সমানে ঘুরতেই থাকে আলোটার চারিদিকে।
রাত আরও ভারী হোয়ে ওঠে।

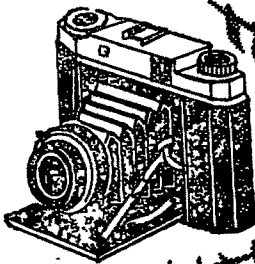
পোকাটার পোড়া শেষ হয়। বিল্ট্রী একটা গন্ধে ঘরের
বাতাস বিবাক্ত হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ায় নকল কল্পরী।
তারপর নিজেই সে প্রদক্ষিণ শুরু করে দেয়। আলো স্তব্ধ
টেবিলটার চতুর্দিকে অনবরত পাক খেতে থাকে।

রাত মোটে চলে না। শুদ্ধ হতভম্ব হোয়ে তাকিয়ে থাকে
তার দিকে। বাইরেও কোথাও নিশাচর নেউলে সাপ
ধরে। সাপের হিস্‌হিস্‌ আর নেউলের ফোঁস ফোঁস—স্পষ্ট
শোনা যায়। ক্ষুধ্র আক্রোশে চরাচর বিশ্ব যেন ফোঁসাতে
থাকে। ফোঁস ফোঁস হিস্‌ হিস্‌ করে অভিশাপ দেয় রাতকে।
জরদগব রাত তবু একটু নড়ে না। অচল অনড় হোয়ে
চেপে বসে থাকে।

ক্লাস্তি নেই কল্পরীর, পা থামে না। ঘুরতেই থাকে টেবিল-

টার চতুর্দিকে। ঘুরতে ঘুরতে
ছ'শই হারিয়ে কেলে বোধ হয়।
আঁচল খসে পড়ে গা থেকে,
লোটাতে থাকে মেঝের। চুল-
গুলোও খুলে ছড়িয়ে পড়ে পিঠে
কাঁধে বৃকে। চোখের পাতা মুদে
আসে। তবু ঘোরে। ঘোরে
ঘোরে আর ঘোরে। চোখ
বুজে ঘুরতে থাকে অবিরাম।
টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড আলোটা
স্থির হোয়ে অপেক্ষা করতে
থাকে, কখন ওর ঘোরার শেষ
হবে, কখন ও ঝাঁপ দেবে
আগুনে।

আচম্বিতে একটা বুক কাটা আর্জ-
নাদ ওঠে কোথায়। সেই সংগে
অনেকগুলো ডালকুড়া এক সংগে



পুজার প্রীতি উপহার

এইচ, এম, ভি. বেডিও, রেডিওগ্রাম,
গ্রামোফোন ও বেকর্ড। ট্রানসিস্টার রেডিও,
বাইনারিয়ার, আইস ও আগকা
কেনেরা, কোডাক কিলিম এবং
টেপরেকর্ডার পাওয়া যায়।



নান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

১১, ডালহৌসি স্কোয়ার - কলিকাতা-১



চিংকার জুড়ে দেয়। তারপর শোনা যায়—ভয়ংকর হুয়া। চোর, চোর, মার শালাকো, পাকড়াও শালাকো—বহু মাহুষ প্রাণপণে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটে আসতে থাকে। বহু হয় পা ছ'খানি। ছ'হাতে টেবিলের কিনারাটা চেপে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে কস্তুরী। পদ্ম রাত—নড়ে চড়ে উঠে চারিদিকে তাকায়। আলোটাও দপ্‌দপ্ করে কেঁপে উঠে নিভে যায়।

হুয়াটা ক্রমেই এগিয়ে আসে বজ্রবাহন বাবুর অন্তরমহলের কাছে। দম বন্ধ করে বজ্রবাহন কত্কা কস্তুরী কান পেতে অপেক্ষা কবে।

তারপর দরজার ওপর ঘা পড়ে।

“কে!”

“আমি, আমরা, হামলোক হায়, ভয় নেই, ডরিয়ে মত্, দরজাটা খুলুন দয়া করে।” এক সংগে বহু কণ্ঠের আওরাজ ওঠে দরজার বাইরে।

তখন দম ফেলে কস্তুরী। আঁচলখানা তুলে ভাল করে গায়ে জড়ায়। খোঁপাটাও জড়িয়ে কেলে ছ'হাত তুলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

আমি আমবা হামলোকের দল নিস্তরু হোয়ে মনিব কস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনেক মাহুষ, অনেক লাঠি, অনেক আলো জমা হোয়েছে দরজার সামনে। চকচকে টাঙি ছ'চারখানা, তার সংগে ছ'টো বন্ধুকও দেখা যাচ্ছে। এখার থেকে ওখার পর্বন্ত প্রত্যেকটি মাহুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন মনিব কস্তা বিত্বারিত চোখে। সর্বশেষে তার নজর গিয়ে থামে বুদ্ধ হংসরাজের মুখের ওপর। বাঁশের লাঠিখানা হাতে নিয়ে সেও এসে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। হংসরাজের দিকে ছ'পা এগিয়ে যান মনিব কস্তা, নড়ে ওঠে তাঁর ঠোঁট ছ'খানি। গলাটা বেশ কেঁপে ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন—“কি হোয়েছে হংসরাজ?”

হংসরাজ ছ'ধারে মাথা নাড়তে নাড়তে ছ'পা এগিয়ে আসে। কিসকিস

করে বলে—“কুছ নেহি বেটা, কুছ নেহি। ডরো মত্।”

হাক্ প্যাণ্ট আর হাক সার্ট পরা যে ভদ্রলোক বন্ধুক হাতে দাঁড়িয়েছিলেন এক পাশে, তিনি এগিয়ে আসেন। বন্ধুকটা ছ'হাট্টুর মধ্যে চেপে ধরে আগে নমস্কে করে নেন। তারপর নিবেদন করেন, একটা চোর ধরা পড়েছে। ধরা পড়ে সে ব্যাটা কস্তুরী দেবীর নাম বলছে। বলছে, কস্তুরী দেবী নাকি তাকে চেনেন। সেই জন্তে এই অসময়ে ঘুম ভাঙাতে হোল। ঘুম ভাঙাতে হোল বলে সকলেই আন্তরিক ছ'খিত। এখন কথা হচ্ছে, লোকটাকে নিয়ে কি করা যায়। নিবেদন শুনে কস্তুরী দেবী আধ মিনিট স্থির হোয়ে রইলেন। আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর মুখের ভাব বদলাল, চোখের দৃষ্টিতে আসের বদলে জিদ ফুটে উঠল। আকস্মিক কণ্ঠে সত্যিকারের মনিব ছ'হিতার স্বরে হুকুম দিলেন—“চলুন দেখি, কে এল আবার। চোরেও আমায় চেনে! বেশ কথা ত!”

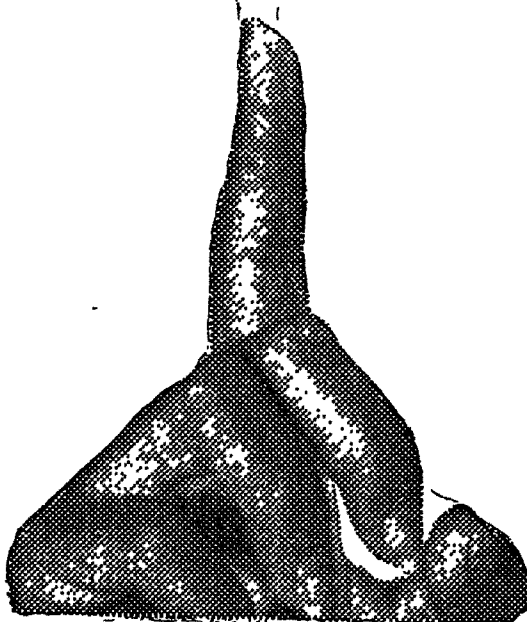
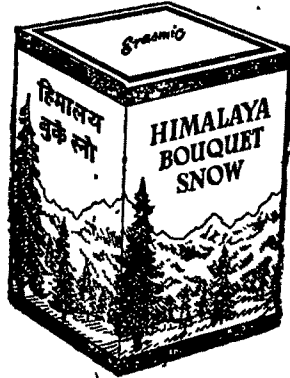
নড়ে উঠল সমস্ত দলটি, পথ তৈরী হোল সকলের মাঝখানে দিয়ে। কস্তুরী দেবী এগলেন সেই পথে, পেছনে চললেন বন্ধুক হাতে ভদ্রলোকটি। তারপর সকলেই চলল। অন্তরমহলের দরজার বাইরে ছোট একটা ভিড় দেখা গেল। লাঠি হাতে জন চার পাঁচ লোক জমা হোয়েছে সেখানে। আরও কাছে পৌছতে দেখা গেল, তাদের পায়ের কাছে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে একটা মাহুষ। কানে গেল, চাপা কাতরানির আওরাজ। লোকটা কাতরাচ্ছে।

হাত চারেক তফাতে পৌছে থামলেন মনিব কস্তা, নিচের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরে তাঁর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লোকটার দিকে। ভয়ংকর স্বরে কে হুকুম করল—“উঠাও উস্কো।” সংগে সংগে ছ'টো লোক এক হেঁচকায় চোরটাকে তুলে সোজা করে বসিয়ে দিলে। বসিয়ে দিলে হবে কি, মাথা সে সোজা করতে পারলে না। খুঁতনিটা ঠেকে রইল বুকের সংগে, যেন ঘাড়টা ভেঙ্গে দেওয়া হোয়েছে।

আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে !

মুখটিকে অকারণ রোদে—খুলোর কালো বা নষ্ট হতে
দেন কেন? চেহারার লাভণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকো স্নো'র ওপরই
ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয়
বুকো স্নো ঘষে দেখুন, হাবানো কাস্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন
কিরে আসছে! ক্রান্ত শুক ত্বক সম্ভব হয়ে উঠছে।
হিমালয় বুকো স্নো আপনার মুখে কখনও বর্ণ বা দাগ পড়তে
দেবে না। নিজের চেহারার দেখুন...লাভণ্যতা এনে ধরেছে...

হিমালয় বুকো স্নো!



HBS.18-X52BG

ইয়াসমিক লগনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

আবার হুহুম হোল—“মুখ ওঠাও ওর।”

তৎক্ষণাৎ চুলের মুঠি ধরে টেনে একজন তার মাথাটাকে সোজা করে ফেললে।

“এই বদমাশ, চোখ খোল। চোখ খুলে দেখ, কে দাঁড়িয়ে আছেন তোর সামনে।” বাবু বক্রবাহন ঝামের খামার যে ভাষার কথাবার্তা চলে, তা হোল খাস হিন্দী। খাস হিন্দীতে হুহুম গুলো দেওয়া হোতে লাগল। খাস হিন্দীতে হুহুম দিলে হুহুম গুলোর জোর আশীর্গুণ বৃদ্ধি পায়। নেন এক এণ্টা বুলেট, ছিটকে বেরিয়ে লক্ষ বস্তুর এ ধার দিয়ে প্রবেশ করে অপর ধার দিয়ে বেরিয়ে যায়। খাস হিন্দীতে হুহুম দিলে, সে হুহুম অমান্য করা চাটখানি কথা নয়।

শেষ হুহুমটি কিন্তু মাত্র করা হোল না। বদমাশ লোবটা চোখ দুটো মেলতেই পাবল না। মেলবে কি কনে। এমন ভাবে ফুলে উঠেছে মুখখানা যে চোখ দুটো শ্রাব ঢেকে গেছে। ডান ভুরুর ওপর এক খাবলা মাংস নেই, রক্তের খারা নেমেছে ডান গাল বেয়ে। ওপরের চোঁটখানাও কেটে ছ’ ফাঁক হোয়েছে, মুখের মধ্যে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাও লালে লাল। দাঁত ভেঙেছে বোধ হয় কয়েকটা। বীভৎস অবস্থা হোয়েছে মুখের। সেই মুখের দিকে অপরক নৈরাজ্যে তাকিয়ে রইলেন মনিব কহা। থাকতেই হবে, মনিব কহা যে, মনিব কহা কি সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া সাজে।

যে লোকটি চুলের মুঠি ধরে সোজা করে রেখেছিল চোরের মুণ্ডটা, তাকে তখন হুহুম দেওয়া হোল—

“খোল ওর চোখ। বদমাশি করে চোখ বুজে আছে ব্যাটা। কতক্ষণ ইনি ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন।”

সঙ্গে সঙ্গে তামিল করা হোল হুহুম। চুলের মুঠি ত’ ধরাই ছিল, প্রচণ্ড ভাবে ঝাঁকতে লাগল সে মুণ্ডটা।

“খোল, চোখ খোল জলদি। বল জলদি, একে চিনিস কি না।”

অবশেষে খুলল চোরের চোখ দুটো। সম্পূর্ণ খুলল না, যতটুকু খোলা সম্ভব খুলল। সেই ভয়ংকর রক্তবর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। ছ’জন ছ’টো জোঁরালো আলো তুলে ধরল মনিব কহা মুখের ছ’পাশে।

পেছন থেকে বজ্র কঠিন

কঠে কে জিজ্ঞাসা

করলে—“কি, চিনতে

পারছিস? বল জলদি ইনি কে।”

উত্তর নেই, চোর চিনতে পারল না।

আবার একটা ঝাঁকি দেওয়া হোল লোকটার মাথায়।

আবার জিজ্ঞাসা করা হোল—“কি, চিনতে পারছিস না একে? তবে যে তুই বললি, কস্তুরী দেবীকে তুই চিনিস, কস্তুরী দেবী তোকে চেনেন। ইনি কস্তুরী দেবী নন?”

বিশ্রান্ত চোর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—“না, এ কস্তুরী নয়।

অন্য এক কস্তুরী—আমায় চেনে যে কস্তুরী বক্রবাহন বাবুর

মেয়ে। এ মোটে কস্তুরীই নয়। আমাকে ঠকাবার জন্তে

কোথা থেকে একে এনে খাড়া করেছ সামনে। একে যদি

আমি কস্তুরী বলে মেনে নেই, তা’হলে আরো শাস্তি

আমায় দিতে পারবে তোমরা। কস্তুরী ও নয়। তার

প্রমাণ, ও যদি কস্তুরী হোত, আমায় ঠিক চিনতে পারত।

আমার এই অবস্থা দেখলে কস্তুরী কিছুতেই চূপ করে

দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না ওর মত, কিছুতেই পারত না।”

চোরের বক্তব্য শেষ হোল, আবার তার মাথাটা ঝুকে

পড়ল বৃকের ওপর। বন্ধুধারী ভক্তলোকটি এগিয়ে এলেন

মনিব কহার সামনে। সবিনয়ে নিবেদন করলেন—“এবার

চলুন। ওর ব্যবস্থা আমবা করছি। হতভাগা বলে কিনা

আপনাকে চেনে। কি আপ্পর্ধা লোকটার! এইবার ওকে

দেখাচ্ছি, বক্রবাহন বাবুর খামারে বদ-মতলবে এসে ঢুকলে

কি ফল পেতে হয়।”

ফিরলেন বক্রবাহন বাবুর কহা। ফিরে কয়েক পা এগিয়ে

গেলেন। পেছন থেকে মর্মভেদী আর্তনাদ উঠল আবার,

বক্রবাহন বাবুর খামারে বদ-মতলবে প্রবেশ করার প্রতিফল

দেওয়া হচ্ছে।

ছ’হাতে ছ’কান চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কস্তুরী

দেবী। ছ’মুহূর্ত রইলেন সেই ভাবে। তারপর ঝাই করে

পেছন ফিরে লাগালেন দৌড়। দৌড়ে গিয়ে আছড়ে

পড়লেন চোরটার গায়ের ওপর। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে

ফারা প্রতিফল দিচ্ছিল চোরকে, তার ভাবাচাচাকা খেঁষে





সরে দাঁড়াল। চোরের গলাটা ছ'হাতে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলেন বক্রবাহন কস্তুরী—“চিনেছি, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি সরযুপ্রসাদ। তুমি আমার চিনতে পারনি। কেন আমার চিনতে পারলে না সরযুপ্রসাদ? কেন পারলে না চিনতে? এরা তোমায় শেষ করে ফেলেছে, আমার জন্তে তুমি শেষ হোয়ে গেলে। সরযুপ্রসাদ, সরযুপ্রসাদ—” সেই বুকফাটা আকুল আহ্বান, বক্রবাহন বাবুর খামারের আকাশটাকে ধরধর করে কাঁপিয়ে তুলল। বক্রবাহনের অতি বিশ্বস্ত কর্মচারীর দল পাষাণ হোয়ে গেল মনিবকস্তার কাণ্ড দেখে। মনিবকস্তা ক্রমাগত এক হুয়ে এক ভাবে চিৎকার করতে লাগলেন—সরযুপ্রসাদ, সরযুপ্রসাদ সরযুপ্রসাদ।”

কার সাধ্য, সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে। সরযুপ্রসাদও অবহেলা করতে পারল না সেই ডাক, ফিরল সে।

তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারের অতল গহ্বরে, যাওয়া হোল না, ফিরল। কোনও রকমে, তুলল একটুখানি মাথাটা, একটুখানি তাকাবার চেষ্টা করল চোখ মেলে। একটা হাত তুলে জড়িয়ে ধরল কস্তুরীর গলাটা। তারপর আর পারলে না, আবার মুখ খুঁড়ে পড়ল। ধরে ফেলল মাথাটা কস্তুরী, ছ'হাতে মাথাটা চেপে ধরে রইল নিজের বুকের সংগে। ফিসফিস করে বলতে লাগল—“চল সরযুপ্রসাদ, চল। চল আমরা পালাই এখন থেকে। এরা তোমায় খুন করে ফেলেছে, আমাকেও খুন করবে। চল সরযুপ্রসাদ, উঠে দাঁড়াও আমার ধরে। কোনও রকমে একটু ওঠ। আমি তোমায় নিয়ে যাব। আমি যাব তোমার সংগে।” কান্নায় জড়িয়ে গেল তার পরের কথাগুলো, আর কিছুই বোঝা গেল না।

বোঝা গেল, সরযুপ্রসাদ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। শরীরটা তার ফুলে উঠে আবার চুপসে গেল। তারপর ছ'হাত মাটিতে দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সে। তাই দেখে স্থির থাকতে পারল না কম বয়সী একটি



অঞ্জনা

ফেস্‌প্যাড্ডার

হকের সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করে

অঞ্জনা প্রডাক্টস্‌ কলিকাতা-৬

Pp. 1/100

ছোকরা। হাতের লাঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে সরযুপ্রসাদকে ধরলে। হু'বগলের তলায় হু'হাত দিয়ে ওপর দিকে টানতে লাগল। কস্তুরী তাড়াতাড়ি নিচু হোয়ে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিলে সরযুপ্রসাদের বুকের নীচে। তারপর আশ্বে আশ্বে এক সংগে উঠে দাঁড়াল কস্তুরী আর সরযুপ্রসাদ। দাঁড়াবার পব সরযুপ্রসাদ গৌ গৌ করে বলতে লাগল—“হাঁ আমরই ভুল হোয়েছিল কস্তুরী, তোমায় আমি চিনতে পারিনি। কি করব, চোখ যে ভাল করে মেলতে পারছি না। এখন চিনেছি, তুমি কস্তুরী। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম, এরা তোমায় আটকে রেখেছে। চিঠি দেবার পর যখন তুমি গেলে না ডাকবাঙলোর সামনে, তখন ঠিকই ধরেছিলাম, তোমায় এরা যেতে দেবে না। তাই এসেছিলাম।” সরযুপ্রসাদ থামল। ঐ অবস্থায় আর কিছু বলা সম্ভব হোল না। থামবার সংগে সংগে মাথাটা আবার বুকে পড়র বুকের ওপর।

ডুকরে কঁদে উঠল কস্তুরী—“ঠিক যেতাম, ঠিক আমি যেতাম কাল সরযুপ্রসাদ। আজই তোমায় চিঠি পেলাম। ভেবেছিলাম, কাল যাব বিকেলে। কেন তুমি এলে এখানে? কেন এভাবে খুন হোতে গেলে?” নীরব নিঃশ্বাস হোয়ে দাঁড়িয়ে গুনছিল এতক্ষণ সকলে ওদের কথাবার্তা। দেখছিল ওদের শৌচনীয় অবস্থা। এবার চাপা গুল্লন উঠল চারিদিকে। রাজে মাথা মাথা কর্মচারীরা খামারে থাকেন না, থাকেন মাত্র একজন মাঝারী গোছের কর্মচারী রাতের পাহারাদারদের ওপর খবরদারী করার জন্তে। তিনিই বন্দুক হাতে গিয়েছিলেন মনিব কস্তাকে ঘুম থেকে তুলে নিঃশ্বাস আর জন্তে। ভরানক বিপাকে পড়ে গেলেন সেই ভদ্রলোক, ব্যাপারটা যে হঠাৎ ঘুরে যাবে, এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। অন্ধকারে একটা লোককে ধরে ফেলে দরোয়ানরা, ধরে তৎক্ষণাৎ আধমরা করে ফেলে। তারপর তাঁর কাছে সংবাদ দেয়। তিনি এসে মারধোর রক্ষ করে লোকটাকেই জিজ্ঞাসা করেন, কে সে, কেন হঠাৎ ঢুকেছে মরতে বজ্রবাহন বাবুর খামারে। লোকটা কস্তুরী দেবীর নাম করে। বলে, কস্তুরী দেবী

তাকে চেনে। তখন যান তিনি, কস্তুরী দেবীর ঘুম ভাঙতে। ঘুম ভাঙতে গেলেও তাঁর এবং তাঁর সান্দো-পান্দোদেব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কস্তুরী দেবী লোকটাকে ঠিকই চিনতে পারবেন না। কোথাকার কে একটা বদমাস বদ-মতলবে ঢুকেছে খামারে রাতের বেলা, ঢুকে ধরা পড়ে মারের চোটে মনিব কস্তার নাম বলছে। নাম বলছে বলেই যে মনিব কস্তা তাকে চিনে ফেলবেন, এটা যে কল্পনা করাও অত্যাচার। হোলও তাই, কস্তুরী দেবী এসে লোকটাকে চিনতে পারলেন না, লোকটাও কস্তুরী দেবীকে চিনল না। তারপর হঠাৎ গেল সবই উলটে পালটে। ছুটে গিয়ে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরলেন স্বয়ং মনিব কস্তা। এতগুলো মাহুঘের সামনে একটু শরম পর্বস্ত করলেন না। তারপর আবার লোকটাও চিনল কস্তুরী দেবীকে। তারপর ওরা চলল। সত্যিই চলেছেন মনিব কস্তা লোকটাকে জড়িয়ে ধরে। এখন উপায় কি! বাধা দেওয়া উচিত, না যেতে দেওয়াই দবকার! কস্তুর ত' যথেষ্টই হোয়ে গেছে। এখন কর্তব্য কি? উদ্ভট পরিস্থিতি হঠাৎ উদয় হোলে সেটির সংগে মোকাবিলা করবার যে শক্তি, সেই শক্তির নাম প্রত্যাশনমতিত্ব। এই শক্তিটি অতি বড় বিশ্বাসী অত্যন্ত কর্মঠ লোকেরও থাকে না। যার থাকে, সে লোক পাক্কা, হতভাগা, ফাঁকি-বাজ হোলেও ছুনিয়ার বাজারে তার অনেক দাম। ঐ শক্তি না থাকার দক্ষণ সত্যিকারের গুণীকেও সারা জীবন পরের ছকুম তামিল করে বেঁচে থাকতে হয়। বজ্রবাহন বাবুর ঐ কর্মচারিটি রাতের পাহারাদারদের খবরদারী করার ডিউটিতে ছিলেন। চোর, ছ্যাচড় খেদাবার কাজ, পাহারাদাররা না ঘুমিয়ে পড়ে, সেইটুকুই দেখলেই কর্তব্যের শেষ। গভীর রাজে মনিব কস্তার জন্তে কেউ এসে হানা দেবে, মনিব কস্তা তার সংগে প্রস্থান করার উত্তোগ করবেন, এ হেন পরিস্থিতির জন্তে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এ অবস্থায় তাঁর চেয়ে উচ্চপদস্থ কারও থেকে যে পরামর্শ গ্রহণ করবেন, সে উপায়ও নেই তখন। তার চেয়ে উচ্চপদস্থ কেউ নেই তখন খামারে। ফাঁপরে পড়ে গেলেন





তিনি। মনিব কন্ঠাকে
বাধা দেওয়াটা গুরুতর
অভ্যাস হবে, এটুকু

বুঝলেন। একে ত' লোকটাকে মারধোর করাটা খুবই
বদ কাজ হোয়ে গেছে, মারের চোটে যা অবস্থা
দাঁড়িয়েছে তাতে বাঁচে কিনা লোকটা কে জানে।
এখন আবার মনিব কন্ঠাকে বাধা দেওয়া, তার মানে হোল,
লোকটার মৃত্যুর জন্তে সম্পূর্ণ দায়টা নিজের ঘাড়ে নেওয়া।
সর্বনাশ! ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে গেলেন।
যাতে স্বশৃংখলে জখমী লোকটাকে নিয়ে মনিব কন্ঠা
যেখানে যেতে চান, যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করলেন।
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব হাঙ্গামা মিটে গেল। একথানা
চোরার এনে তার ওপর বসিয়ে দেওয়া হোল সরযুপ্রসাদকে।
চারটে লোক বসে নিয়ে চলল চোরখানা। ছ'টো আলো
নিয়ে চলল আরও ছ'টো মাল্লুস। মনিব কন্ঠাটিও গেলেন
চোরার পাশে পাশে। কেউ বাধা দিলে না, কেউ কিছু
বললে না। অনায়াসে অক্লেশে সরযুপ্রসাদকে নিয়ে কস্তুরী
খামার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

॥ সাত ॥

ওরাও রওনা হোল বাবু বজ্রবাহন। ঝায়ের খামার বাড়ীর
উদ্দেশ্যে। জনন্থক কয়েকটা দিন নষ্ট হোল মাঝখানে,
কলকাতায় পৌছতে দেরি হোয়ে গেল পুরুষোত্তমের।
টেলিগ্রাম পাবার সংগে সংগেই সে কানপুর ত্যাগ করতে
পারল না। সব চুকিয়ে বুকিয়ে আসতে হোল কিনা,
তাই একটু দেরি হোয়ে গেল। চুকিয়ে বুকিয়ে না আসলে

আসাই হোত না তার, আত্মীয়-স্বজনরা কথ্যে উঠেছিলেন।
বিয়ের পর দিনই যে বউ অস্ত্রধীন করল, তার জন্তে
বারবার ছুটোছুটি করাটা অত্যধিক রকমের বাড়াবাড়ি
মনে হোয়েছিল পুরুষোত্তমের মা ভাই বৌদিদিদের কাছে।
বিয়ের পর বউ-বিহীন বাড়ী ফিরেই তৎক্ষণাৎ বউ খুঁজতে
বের হোল যখন পুরুষোত্তম, তখন কেউ বাধা দেননি।
বরং যথোচিত উদবেগ আশংকা উৎসাহ প্রদর্শন করে-
ছিলেন। ভয়ংকর কাণ্ড কিনা, একটা পরের মেয়েকে
সংগে নিয়ে আসতে আসতে তাকে রাস্তায় হারিয়ে আসাটা
একটা যা তা ব্যাপার নয়! মেয়েটার মা বাপের কাছেই
বা কি জবাব দেওয়া যাবে। লোকেই বা বলবে কি!
হুতরাং যাক, দেখুব গিয়ে কিছু করা যায় কিনা। করা
কিছু না গেলেও অস্ত্রতঃ এটা ত প্রমাণ হবে যে, বউটাকে
খোঁজবার জন্তে স্বস্তর বাড়ীর পক্ষ থেকে চেষ্টা চরিত্র
কিছু কম হয় নি। এই সমস্ত বিবেচনা করেই প্রথম বার
পুরুষোত্তমের মা দাদা বৌদিরা বাধা দেননি। কিন্তু
দ্বিতীয়বার দিলেন। স্পষ্টাঙ্গি জানিয়ে দিলেন পুরুষো-
ত্তমকে যে, সেই বউকে খুঁজে পাওয়া গেলেও তাকে
নিয়ে ঘর করা চলবে না। সেই বউ নিয়ে ঘর করতে
হোলে সকলের সংগে সখ্যক ত্যাগ করতে হবে। কারণ
তাদেরও সমাজে বাস করতে হয়। সমাজে বাস করার
গরজ পুরুষোত্তমের ছিল না, সে আবার ছুটির দরখাস্ত
দিয়ে বসল। ছুটি মঞ্জুর হোল না। যে মিলে ও কাজ
করত, সেই মিলের একদম ডগায় ছিলেন পুরুষোত্তমের
দাদার এক মামাশস্তর। তিনি ভেতর থেকে কলকাটি
নাড়তে লাগলেন। মনিবরা বলল, এইত পর পর ছ'বার
ছুটি নিলে, মাস দুই পরে আবার নিও। পুরুষোত্তম

কাছে ইস্তফা দিলে। ইস্তফা
দিয়েই সংগে সংগে ঠুসিল ছেড়ে
বেরনো যায় না, সেটা আইনে
বাধে। যতক্ষণ না আর একজন
ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এসে ওর
কাছ থেকে কাজের ভার বুঝে
নিলে, ততক্ষণ আটকা থাকতে

সত্যতা-মৌলিকতা-আধুনিকতা ও নিপুনতা নির্ভরযোগ্য!

মল্লোর
বিবাহের
বিদ্যনা

শৈলেন্দ্র মণিলাল
১৬৯, বহু বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মল্লোর
ওভার
পোষাক

হোল। এই সমস্ত কারণে টেলিগ্রাম পাবার পরে দু'টো দিন, দু'টো রাত কানপুরেই কাটাতে হোল তাকে। সেই দু'দিনে বার ছয়েক টেলিগ্রাম করে জানাল স্বশাস্ত্রকে যে, নিশ্চয়ই সে আসছে। তারপর ঘণ্টা কুড়ি রাস্তায় খরচা করে অবশেষে নামল এসে হাওড়া স্টেশনে। স্বশাস্ত্র গিয়েছিল আনতে। গাড়ী থেকে নামতে নামতেই তাকে বলল—ট্যাক্সী একটা ধরে রেখেছিল ত? তা না হোলে ঘণ্টাখানেক এখন খাবি খেতে হবে এখানেই।” গভীর গলায় ক্রশান্ত জবাব দিল—আমি না, কেন খামকা মাথা ঘামাচ্ছিস, এক মিনিট আটকে থাকতে হবে না।”

হোলও না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মস্ত একটা দামী গাড়ীতে মালপত্র তুলতে লাগল স্বশাস্ত্র। চকচকে নাদ পোষাক পরা ড্রাইভার—লম্বা এক নমস্তে নিবেদন কালে পুরুষোত্তমকে। ব্যাপার দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল গুরু-ষোত্তম, কিন্তু সে সময় সেই তুমুল হট্টগোলার মধ্যে ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠতে হোল, পুলিশ ওধারে তাড়া লাগাচ্ছে। তারপর গাড়ী যখন চড়ল পুলের ওপর, তখন চুপি চুপি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে—“কার গাড়ী এনেছিস রে? তোর স্টুডিওর গাড়ী বুঝি?” উত্তরে একটি খিচুনি

খেলে বন্ধুর কাছ থেকে—“কেন? আমি বুঝি কিনতে পারি না?”

আর কথা বাড়ালে না পুরুষোত্তম। ছোট্ট একটু ও উচ্চারণ করে—আরাম করে কসল পেছনে হেলান দিয়ে। গাড়ীখানা যখন বন্ধুর সম্পত্তি তখন আর অ'ড়ষ্ট হোয়ে বসে থেকে লাভ কি। লাভ ক্ষতির কথাটা তৎক্ষণাৎ উধাও হোয়ে গেল মন থেকে, ভাবতে লাগল বন্ধু স্বশাস্ত্রের কপালের কেরামতির কথা। ওব আপন জনেরা ত' ছেড়েই দিয়েছিলেন ওর আশা, ফিল্ম লাইনে ঢুকে নাকি একেবারে ঝরঝরে হোয়ে গিয়েছিল ওর ইহকাল পরকাল। এখন

ফেমিন না জানি লাগছে তাঁদের। পঁচিশ বছর অল্প কোনও লাইনে কপাল

ঘষে কপালখানা খুইয়ে ফেললেও এই রকমের গাড়ী একখানি ছুঁতে পেত না। এই ত' সবে বছর চাব পঁচেক ঢুকেছে ফিল্ম লাইনে। এরই মধ্যে কিনে বসেছে এই গাড়ী—ইস! ফিল্ম লাইন কি শুধু শুধুই ফিল্ম লাইন! এই একটি মাত্র লাইন আছে দুনিয়ায়, যেখানে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়াটা সত্যিই ঘটে যেতে পারে। স্বতরাং স্বশাস্ত্রকেই শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করতে হবে। চাকরিটা ত' গোম্মায় গেলই। যার জন্তে গেল, তাকে যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন ত' আবার একটা কিছু ধরতে হবে। নয়ত চলবে কেমন কবে! আপনাব লোকের কাছে ও বউ নিয়ে একটি রাত আশ্রয় পাবার উপায় নেই। তাঁদের সমাজ আছে। ফিল্ম লাইনটা সমাজের বাইরেব লাইন, স্বতরাং ঐ লাইনই ভাল। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চয়ই কাজ আছে ওদের ষ্টুডিওতে, সবই যখন ইলেকট্রিকের ব্যাপার। স্বশাস্ত্র নিশ্চয়ই পারবে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। না পারলে চলবে কেন, বউটাকে ত' আর চিরকাল তার বাপের



এখন পিলকারপ্রকৃত ক্যাপসুল
শিশিতে পাওয়া যায়

সুপ্রা

ফাউন্টেনপেন কালি

'নিওসল' সলভেন্ট যুক্ত

বিশ্বের
সর্বশ্রেষ্ঠ
মানে প্রস্তুত



প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক
সুপ্রা কালি ব্যবহার করেন।
সুপ্রা কালি একজন ব্যাতনামা
এপ্রাইভ কম্পিটের বিজ্ঞ তত্ত্ব-
বধানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে প্রস্তুত। এজন্য ইহা
কালি-জগতে শীর্ষস্থানীয়।

স্পেশাল

কপার টস-লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬



বাড়ীতে ফেলে রাখা
যাবে না। সে যা হয়
হবে, এখন বলা যাবে কি!

শুধুর নিশ্চয়ই আশা করে আছেন, জামাই এসে মেয়েকে
নিয়ে যাবে। জামাই যে সে পথ চিরকালের মত বন্ধ
করে আসছেন, তা'ত জানেন না। এখন তাঁদের
কি বলে সে ঠাণ্ডা করবে! শুধুরের মেয়েকেই বা বলবে
কি! কিছুই বলবে না, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবে
না। কোথায় ছিল, কেমন ভাবে ছিল, গাড়ী থেকে
উধাও হবার কারণটি কি, একটি প্রশ্নও সে জিজ্ঞাসা
করবে না। যেন কিছুই হয়নি, একদম কিছুই হয়নি, এমনি
ভাবটা বজায় রাখবে যে কোনও উপায়ে। বাপ মা আত্মীয়
স্বজনরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই যথেষ্ট লান্হনা করেছেন তার।
স্বামী দেবতা যখন পৌছবেন, তখন তিনিও নিশ্চয়ই স্বামী-
গিরি ফলাবার জন্তে আর একপ্রস্থ শাসন করতে বসবেন।
হয়ত বলেই বসবেন, অমন স্ত্রী ত্যাগ করলাম। ইত্যাদি
ইত্যাদি—রোগমর্ষ কাণ্ডকারখানার জন্তেই নিশ্চয়ই তৈরী
হোয়ে আছে সকলে। সেই জন্তেই নিজেরা টেলিগ্রাম না
করে হুশাস্তকে দিয়ে করিয়েছে। জামাই যে ফিরে আসবে,
এসে ঐ মেয়েকে আবার স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে, এতটা
কেউ আশা করতে পারে নি। জানে না ত', পুরুষোত্তম

মাহুষটা কি ধাতু দিয়ে তৈরী। বিয়ে করেছে বলেই
একটা মেয়েকে ক্রীতদাসী মনে করে না পুরুষোত্তম। ছোট
খাট সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাহুষ
পুরুষোত্তম নয়। যাকে বিয়ে করে একবার স্ত্রী হিসেবে
মেনে নিয়েছে, তার সম্মান রাখতে সে জানে।
মাথা কিন্তু ঘামতেই লাগল। একটার ঘাড়ে আর একটা,
একশ গুণ মাথা ঘামাবার উপকরণ ছড়োছড়ি করতে লাগল
মাথার মধ্যে। আরামে চোখ বুজে বসে রইল বন্ধুর
গাড়ীতে। চোখ বুজে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল সেই
ছোট দেহখানি, ভয়ানক নরম, ভয়ানক অসহায় আর ভয়ানক
ভীকু সেই দেহটি। কেমন যেন থরগোশের মত ভীকু, এবদম
তার বুকের সংগে লেপটে বুকের ভেতর মুখ গুঁজে লুকিয়ে
থাকতে পারলে বাঁচে। ঐ মাহুষ কি করে একলা কাটাল
এতদিন! খুব সম্ভব, কোনও বান্ধবীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে
ছিল। কোনও ষ্টেশনে হয়ত হঠাৎ দেখা পেয়েছিল কোনও
বান্ধবীর, সংগে সংগে চুপ করে নেমে পড়েছিল গাড়ী থেকে।
বিচিত্র কিছুই নয়,—যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল সেই ভীক
মাহুষের চোখের ওপর, তাতে মাথা বিগড়ে যাওয়া কিছুই
বিচিত্র নয়। পালাবার মতলবটা ঠিকই উদয় হোয়েছিল
মাথায়, নয়ত কাপড় বদলাতে যাবে কেন! ধুতিখানাই
ছিল হাতের কাছে, এক ফাঁকে সেখানা পরে বসেছিল।



তারপর স্বযোগ পাওয়া মাত্র
নেমে যাওয়া। মেয়েমাহুষের
বুদ্ধি ত'। সাথে কি আর ঐ
জাতকে অবলা বলা হয়!
অবলাটিকে যেন সত্যিই হু'হাতে
আঁকড়ে ধরলে পুরুষোত্তম, স্পষ্ট
তার চুলের গন্ধ পেল নাকে।
কেমন যেন একটা ঘোর লেগে
গেল, কেমন যেন এলিয়ে গেল
শরীরটা। বুদ হোয়ে বসে রইল
এক পাশে। গাড়ী পুল পার
হোয়ে হারিসন রোডের মোড়ে দম
নিতে দাঁড়াল, লালবাতি জ্বলছে।

হঠাৎ কথা বলে উঠল সুশাস্ত। জিজ্ঞাসা করলে—“কিরে উঠবি কোথায়? ভবানীপুরে মাসীমার বাড়ীতে যাবি, না পার্ক সার্কাসে কাকার কাছে থাকবি?”

দুর্দান্ত রকম চমকে উঠল পুরুষোত্তম। হাঁ করে তাকিয়ে রইল বন্ধুর মুখের দিকে। সুশাস্ত আর একবার বুঝিয়ে বললে তার জিজ্ঞাস্ত।

“কোথায় থাকবি এবার, তাই জানতে চাচ্ছি— একটা কোথাও থাকতে হবে ত।” আমতা-আমতা করে পুরুষোত্তম বললে—“কেন? একেবারে সেখানে গেলেই ত হয়।” একটুখানি তাকিয়ে রইল সুশাস্ত বন্ধুর চোখ দুটির দিকে। খানিকটা আন্দাজ করতে পারল বোধহু ব্যাপারটা। বলল—“সেখানে মানে কোনখানে? যেখানে তাঁর বউ আছে এখন, সেখানে যেতে চাস বুঝি সোজা।” সেখানে গিয়ে পৌছতে এখনও বিস্তর দেরি আছে ভাই, দাঁড়া, আগে সব বন্দোবস্ত করেনি। এইত এলি কলকাতায়, দেখ এখন কতদূর কি আমি করতে পেরেছি।” দয়

আটকে পুরুষোত্তম বলল—“তা’হলে কি সে এখনও ফেবেনি।”

বন্ধুর একখানা হাত টিপে ধরে সুশাস্ত বলল—“তার দেরি আছে অনেক। ফিরেছে সে, এ কথা কি জানিয়ে-ছিলাম তোকে? টেলিগ্রামে কি লিখেছিলাম? লিখে-ছিলাম ত শুধু সন্ধান পাওয়া গেছে, শিগগির চলে আস।” দমটা ছাড়ল পুরুষোত্তম, মাথাটা হুয়ে পড়ল তার। কেমন যেন চূপসে গেল অতবড় মাহুঘটা। কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখ! টেলিগ্রামটা পাওয়ার পর থেকে যেন বিকারে পেয়ে বসেছিল তাকে। একেবারে ধরেই নিয়েছিল, নিশ্চয়ই সে ফিরেছে মা বাপের কাছে। কেন কবতে গেল এতবড় ভুলটা! বিকারের ঘোরে আর কিছু সে ভাবতেই পারেনি। কলকাতায় পৌছে সোজা চলে যাবে স্বস্তর বাড়ীতে, অত্ন কোথাও বাবার ভাবনাটা মনের কোণেও উদয় হয় নি। টেলিগ্রাম পাবার পর থেকে



এবার পূজায়

শ্রী শ্রী

স্বাস্থ্যবোধ

নির্ভরিত বিবরণ- জীপারের কাছে দেখুন

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য GE 25016

গীতঞ্জী সজ্জা মুখোপাধ্যায় GE 25017

পান্নালাল ভট্টা: GE 25018

দ্বিজেন মুখো: GE 25019

প্রতিমা বন্দ্যো: GE 25020

গীতঞ্জী ছবি বন্দ্যো: GE 25021

হেমন্ত মুখো: GE 25022

লতা মল্লেশ্বর GE 25023

গীতা দত্ত GE 25024

গায়ত্রী বসু GE 25025

কীৰ্ত্তন-কলানিধি

রখীন ঘোষ GE 25026

কৃষ্ণা চট্টো: GE 25027

কুমার শচীন দেববর্গ P 11934

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় N 82887

উৎপলা সেন N 82888

ভরুণ বন্দ্যো: N 82889

কণিকা বন্দ্যো: N 82890

সনৎ সিংহ N 82891

নির্মলেন্দু চৌধুরী N 82892

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় N 82894

ইলা বসু N 82895

মায়া ঘো N 82896

নির্মলা শিশু N 82897

শ্রীমল মিত্র N 82898

‘হিঙ্গু মাস্টার্স ভায়োজ’ ও কলস্রিয়া

বিক্রয়



উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আত্মকাল
 এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার
 খুশী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার
 বিব্রেকনার তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের
 জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু
 তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক।
 আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র
 নতুন 'স্ট্রামলাইন্ড' মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক
 লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য
 ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত
 —এদেশে এই প্রথম
 বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

হাওড়ায় পৌছন পৰ্বন্ত এত রকমের ভাবনা তাকে ভাবতে
হোয়েছে, এত রকমের কাণ্ড কারখানা করতে হোয়েছে
যে আসল ব্যাপারটাই সে বুঝতে পারেনি। এখন উপায়!
এখন যাবে কোথায়। কাকার বাড়ী, মাসীর বাড়ী,
দিদির বাড়ী, বাড়ীর অভাব নেই কলকাতায়। কলকাতায়
থাকবার জায়গার অভাব এতকাল ছিল না। কিন্তু এবার
যে সব বাড়ীর দরজাই বন্ধ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কানপুর
থেকে চিঠি পত্র এসে পৌছে গেছে সব বাড়ীতে। কাকা,
মাসী, দিদিরা সাবধান হোয়ে গেছেন। তাঁদেরও ত সমাজে
বাস করতে হয়। একলা পুরুষোত্তমের জন্তে কে আর
সমাজ ত্যাগ করতে যাবে।

উপায় চিন্তা করতে করতে গাড়ী পৌছল চৌরঙ্গীতে,
পার্ক ষ্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়াল। আবার জিজ্ঞাসা করল
স্বশাস্ত—“পার্ক সার্কাসে কাকার বাড়ীতেই যেতে বলি—
কি বল?”

ক্ষীণকণ্ঠে পুরুষোত্তম বলল—“না ভাই, সে উপায় আর
নেই। কালীবাট বা চেতসার দিকে একটা সস্তার হোটেল
আশ্রয় নিতে হবে এখন। চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আসতে
হোল যে। আত্মীয়দের সংগে সম্পর্ক তুলে দিয়ে আসতে
হোল কিনা, নয়ত যে এবার আসাই হত না।”

চোখ দুটো গেলে করে তাকিয়ে রইল স্বশাস্ত বন্ধুর
মুখের দিকে একটি কথাও বলতে পারল না। বন্ধুটি
খুব চেষ্টা করে মর্মান্তিক রকমের একটু হাসির আশ্রয়
করল চোখে মুখে। যতদূর সম্ভব বেপরোয়া ভাবটা বজা-
য়েখে বলল—“সেই জন্তেই ত এত দেরি হোল আসতে
কি করি বল? পরাদীন ত, টেলিগ্রাম পেলেই কি ছাঁ
করে বেরনে যায়। মা দাদারা বৌদিরা বেঁকে বসলেন
কিছুতেই আসতে দেবেন না। ঐ বউ নিয়ে ঘর করলে
তাঁদের নাতি সমাজে মুখ দেখানো দায় হবে। অগত্যা
সব ছেড়ে ছুড়েই চলে এলাম। সম্ভান যখন পাওয়া
গেছে তার, তখন ত আসতেই হবে আমাকে। মিছি-
মিছি দেরি বরে লাভ কি।”

চুপ করে রইল স্বশাস্ত। বলবার নেই কিছুই, বন্ধুটিতে
সে ভাল ভাবে চিন্ত। এক সংগে পড়াশুনা করেছে,

এক ক্লাবে খেলেছে।

কোনও কালেই কোনও

কিছু হালকা ভাবে নিতে

পারত না পুরুষোত্তম, ঠাট্টা ইয়ার্কি ছেঁদো কথা একদম
বরদাস্ত করতে পারত না। ঘাড় পেতে যদি একটা দায়
নিত, তাহলে সে দায়টিকে যথাস্থানে পৌছে না দিয়ে
ঘাড় থেকে কেলে দিত না। এই বদ অভ্যাসটি থাকার
দক্ষণ বহবার বহু ঝঙ্কারে পড়েছে। স্বভাবটি কিন্তু খোয়ায়
নি। ঐ একগুঁয়ে স্বভাবের জন্তেই চাকরিটা পৰ্বন্ত ছুটিয়ে
চলে এল। বিয়ে যখন কবেছে একটা মেয়েকে, তখন সেই
মেয়ের সংগে হওয়াই চাই একটা হেস্তনেস্ত। এভাবে
ফাঁকি দিয়ে পালাবে একটা মেয়ে পুরুষোত্তমকে, আর
পুরুষোত্তম চুপ করে থাকবে, একি কখনও সম্ভব হোতে
পারে! তাহলে আর পুরুষোত্তম উত্তম পুরুষ হোতে
গেল কেন!

মহা সংকটে পড়ে গেল স্বশাস্ত। কেন মরতে গিয়েছিল
সে টেলিগ্রাম করতে! যদি সেই ঝড়ের ছবিব মেয়েটা
অন্ত কেউ হয়, তাহলে কি হবে! চেহারার গিল হওয়াটা
একটা খুব বড় কথা নয়। দেখতে এক রকম, এমন
ছোটো মানুষ এস্তার পাওয়া যায়—। ওর বউয়ের মত
দেখতে আর একটা মেয়ে যে থাকতে নেই, এমন কথা



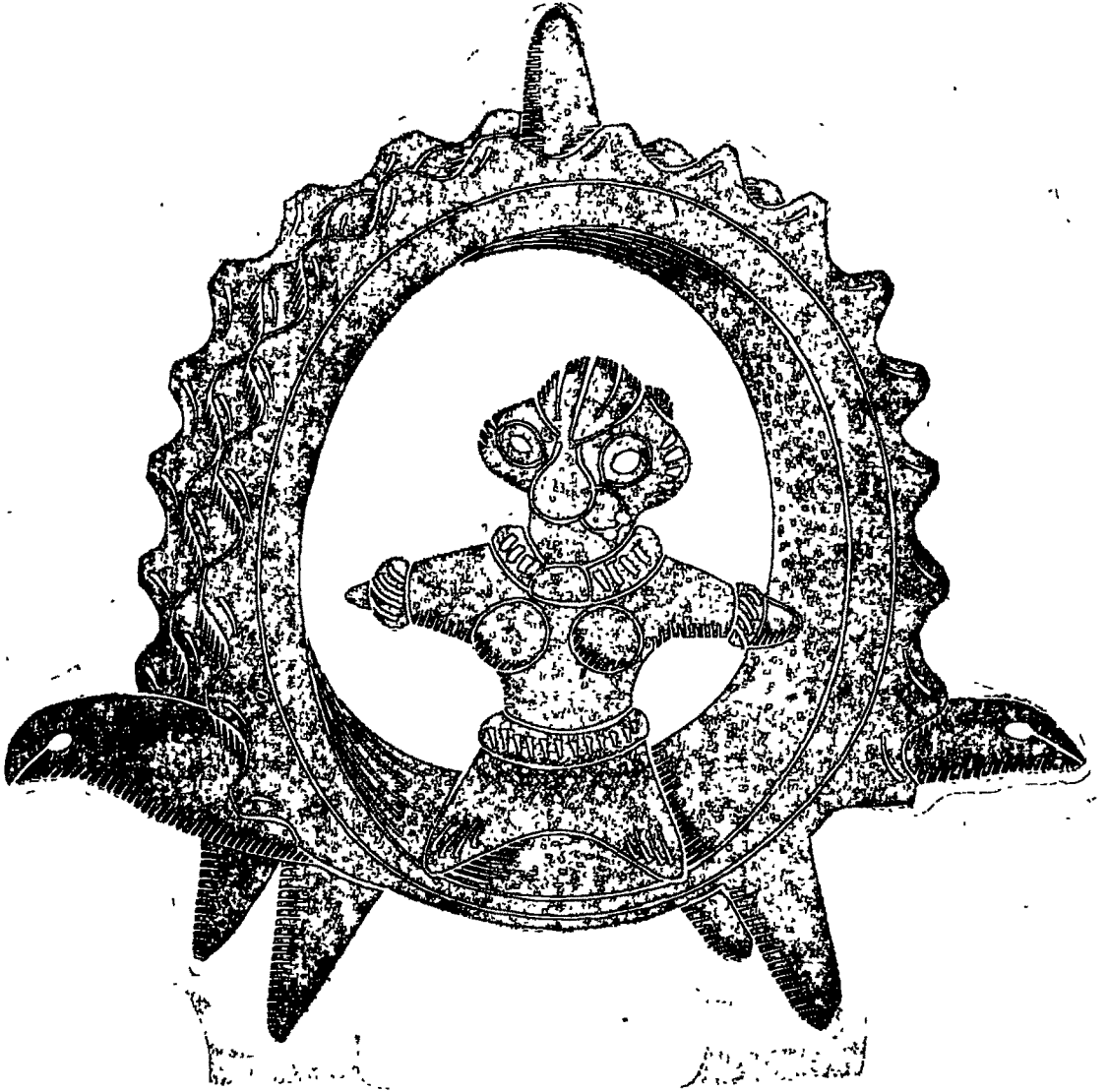
হিমালী

গ্লিসারিন স্যাবান

স্নানে তৃপ্তি আনে



হিমালী প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-২



বনবাদ্যে খালখন্দ পেরিয়ে পালকি চলে।

বোয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি কুলের গন্ধে মন আনচান। বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূর?

ঐতর্য যাত্রায় দুবাদের তর্ক সহন হোক

পূর্ব রেলওয়ে

উদ্ভিগ্নাথ লোকশিল্পের নিদর্শনে।

M.E. 3/10



কে বললে! দেখতে এক রকম, তাই সে টেলিগ্রাম করেছিল। টেলিগ্রাম করার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে গিয়ে একটিবার—স্বচক্ষে দেখে আসবে তাকে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম বা স্বশাস্ত্রর পক্ষে ত আর ফস করে আলাপ করা সম্ভব হবে না তার সংগে। প্রহেলিকার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। প্রহেলিকার সংগে তার আলাপ পরিচয়ও হোয়ে গেছে আগের বারে। সেই জন্তেই প্রহেলিকার মত মানুষকেও সে গলিয়ে ফেলেছে কেঁদে কেটে। কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও যদি সেই মেয়ে সত্যিই গর বউ না হয়, তখন হবে কি! চাকরি বাকরি সংস্থ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসে পৌছলেন ত ইনি। বউটিকেও যদি না পান, তখন করবেন কি! কি ববে বাঁচবে তখন স্বশাস্ত্র এই কাঠ-গোয়ারের কবল থেকে!

গাড়ী পৌছে গেল জগুবাবুর বাজারের সামনে। ড্রাইভার মুখ ফেরাল পেছন দিকে, অর্থাৎ এবার বলতে হবে কোথায় নিয়ে যাবে সে। সেকেণ্ড হুঁসকেই মধ্যে হুঁস পাওয়া গেল। কতকটা ভোতলাবার মত করে স্বশাস্ত্র বলল—“বাড়ীতেই চল, আগে সেখানেই যাওয়া যাক।”

বাড়ী যান স্বশাস্ত্রর নিজের বাড়ী। তার মনে আবার একপ্রস্থ নতুন আত্মীয়-স্বজনের স্রষ্টি। আর একপ্রস্থ আমড়াগাছি করা এবং উপদেশ শ্রবণ। দরকার কি ফ্যাসাদে পড়বার। তাড়াতাড়ি বলে উঠল পুরুষোত্তম—“নারে, আর বাড়ী টাডী নয়। তোর বাবা হয়ত কিছু মনেও করতে পারেন। কেন খামকা বিব্রত করা সকলকে। তার চেয়ে একটা কোনও সস্তার হোটেল—”

জোর খিচিয়ে উঠল স্বশাস্ত্র—“হোটেলওয়ালারা কালছে তার জন্তে, থাকবার লোকের অভাব পড়েছে কি না দেশে। কলকাতা সহরে হোটেলের ঠাই জুটতেও ছ’মাসের থাকা। চূপ করে বসে থাক।”

চূপ করেই রইল পুরুষোত্তম। নতুন বড়লোক বন্ধুর সংগে তারই নতুন কেনা এত বড় গাড়ীতে বসে চাঁচামেটি করাটা কি ঠিক কাজ হবে! ড্রাইভারই বা মনে করবে কি! তা’ছাড়া সেই শ্রীমতীকে যখন পাওয়া যাবে, তখন ত আর হোটেলের থাকা চলবে না। স্বশাস্ত্রই এখন

একমাত্র ভবসা। স্বশাস্ত্র যখন এতটা করছে, তখন ওকে চটানো ঠিক হবে

না। কি হাঙ্গামাতেই ফেলে পানাল সে। সেই ভীতু মানুষ, কোথায় কি ভাবে যে কাটাচ্ছে এতদিন তাই বা কে জানে! আবও কত হাঙ্গামা যে পোয়াতে হবে তাকে মানুষের মত মানুষ তৈরী করার জন্তে! যাক গে এখন সে সব ভাবনা, এখন তাড়াতাড়ি হাতে পেলে হয় তাকে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ফলে কয়েক মাসের মাইনে এক সংগে এসে গেছে হাতে। কয়েকটা মাস ত’ নিশ্চিন্তে কটবে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, একবার দেখাটা হোলে হয়।

একটিবার, আর একটিবার শুধু দেখাটা হোক তার সংগে। ব্যস—আর কিছুই কামনা করার নেই পুরুষোত্তমের। এই কামনার মধ্যে কোনও ভেজালও নেই। কিছু চাইবে না তাব কাছে পুরুষোত্তম, কিছুই পাবাব আশা নেই তার। তবু একটিবার দেখাটা হওয়াই চাই। না হয়, একটি কথাও তার সংগে বলবে না পুরুষোত্তম, একটিবার চার চক্ষে মিলন হোলেই তৎক্ষণাৎ সে ফিরে আসবে। শুধু চোখের ভাষায়, যদি পুরুষোত্তমের চোখ দু’টি সত্যিকারের চোখ হয়, তবে সেই চোখ দু’টি দিয়েই তাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যা বোঝাবার। বোঝাবারই বা এমন কি আছে। সামান্য একটি কথা, মাত্র সিকি মিনিটের মধ্যে শেষ হোয়ে যাবে কথাটুকু। তারপর যদি তার ইচ্ছে হয়, সে আসবে পুরুষোত্তমের সংগে, নয়ত বেখানে শাস্তিতে থাকতে পারে থাকবে! পুরুষোত্তম কিছুতেই আপত্তি করতে যাবে না।

আপত্তি করার উপায়ই বা কোথায়! ‘আর ভোমাদের সহ করতে পারছি না, যাও দূর হও—বললে কি আকাশের মেঘেরা দূর হয়! আকাশে যেমন মেঘ জমে, তেমনি ভাবে বিশ্বের ভয় জমে আছে সেই চক্ষু দুটিতে। চক্ষু দু’টির দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই কলুষহীন ভয়ের ছোঁয়া পাওয়া যায়! স্পষ্ট বোঝা যায়,—একদম যাব্দে বলে, মর্মে মর্মে অজ্ঞতব করা যায় সেই ভবটুকু। সেই



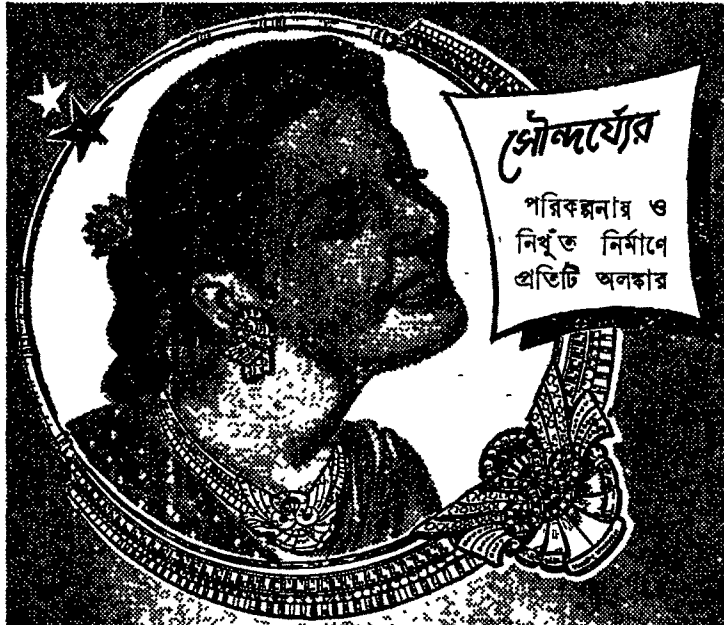
বোবা ভয়ের ভাষাও শোনা যায়। চোখ দু'টি থেকে শুধু একটি মিনিতি উথলে উঠছে যেন সারাক্ষণ, গুণ-গুণিয়ে ঘুম পাড়ানী গান গাইছে যেন সেই চোখ দু'টি। একমাত্র একটি অহুরোধই করছে—আমায় ভয় দেখিও না।

বেশ শিউরে উঠল পুরুষোত্তম, বুকের ভেতরটা তার থর-থর করে কাঁপতে লাগল। ঠিক বুঝতে পারল না, কি হচ্ছে তার শরীরের মধ্যে। যথেষ্ট শক্ত সামর্থ্য দেহ তার, মনটাও যাকে বলে—নেহাত তুলতুলে নয়। তবু এ রকম হচ্ছে কেন। কেন এতটা দুর্বল বোধ করছে সে।

কি হয়েছে তার! কেন সে নিজেকে ভয়ানক ভয় পাচ্ছে! ভয় পেয়ে অতি অদ্ভুত—একটা কামনা করছে। কে যেন তার বুকের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে। কান্নার ভাষাটা এমনই আজগবী ধরণের যে, লজ্জায় শিউরে উঠল পুরুষোত্তম। স্পষ্ট সে স্তনতে পেল, তারই বুকের ভেতর থেকে অতি কল্পণ ভয়াব্র্ত এক মিনিতি গুমরে উঠছে—ধর, তোমার ঐ ছোট্ট হাত দু'খানি দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধর—। ভয়ানক ভয় করছে যে আমার। সবাই যে আমার ত্যাগ করেছে। কোথায় কার কাছে যাব আমি! কে আমার আশ্রয় দেবে! ধর, শিগগির ধর আমার জড়িয়ে। তোমার ঐ ছোট্ট হাত দু'খানির ভেতর আশ্রয় পেলো আমি ষাটি।

অল্প একটু ঝাঁকুনি লাগল। হুঁপুনিটাও সংগে সংগে থেমে গেল পুরুষোত্তমের। বুঝতে পারল, গাড়ী খেঁদে গেছে। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, দরজা খুলে হুশাস্ত নামছে। নেমে দরজাটা খুলে ধরে হুশাস্ত বললে—“আয় নেমে আয়। এখানকার কাজ সেরে তারপর যেখানে যেতে হয় যাব!”

অগত্যা নামতে হোল পুরুষোত্তমকে। কোথায় নামছে কি কাজ-সারতে হবে, না জেনেই নামতে হোল। নেমে বুঝতে পারল, বেজায় রকমের বেজায়-গায় নেমে পড়েছে। ভয়ানক দামী ভয়ানক নতুন ভয়ানক হালকাশানের এক বাড়ীর দরজার ওপর নেমে পড়েছে একেবারে। সত্যিই গাড়ী থেকে পা দিতে হয়েছে দরজার সামনের



গ্রাম 'AICHPIES'

ফোন-৩৪-৪৮৪৮

এইচ.পি. সরকার
এণ্ড কোং

স্বর্ণ শিল্পী ও প্রসিদ্ধ

হেড-১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
ব্রাঞ্চ-১২৫ এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
(বহুবাউসার) কলিকাতা-১২

মার্বেল বাধানো সিঁড়ির ওপর। আরও দু'টো সিঁড়ি উঠলে তবে সেই বাড়ীর ভয়ানক বড় ভয়ানক স্বপ্ন কঁচ লাগানো দরজার গায়ে হাত দেওয়া যায়। কোথায় এলান, কার বাড়ীর দরজার নামলায়, এই রকমের কিছু বলবার জ্ঞে হা করলে পুরুষোত্তম। হা দিয়ে কিছু বেরবার আগেই স্বশাস্ত্র ধরে ফেললে তার হাত একখানা। তার পর এক টানে দু'টো সিঁড়ি পার করে একেবারে সেই ভয়ানক দানী কঁচের দরজার ওপারে নিয়ে পৌঁছে দিলে।

এক ঝাঁক উৎকট রকমের ভয়ানক নতুন জিনিষের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হোষে একেই মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল পুরুষোত্তমের। গুলিয়ে যাওয়া ঘিলুটুকু আবার জমে বরফ হোষে যাবার উপক্রম হোল ভয়ানক রকম ঠাণ্ডা অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনে। যে মুহূর্তে তার হাতখানা ছেড়ে দিল স্বশাস্ত্র, সেই মুহূর্তে ঠিক পেছনে জয় গ্রহণ করল সেই আগ্রাজ্ঞতা। একটা দম দেওয়া যন্ত্র নির্জলা প্রাণহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—“আত্মন পুরুষোত্তমবাবু। গাড়ীতে বিশেষ কষ্ট হয়নি ত’!”

আর চমকালো না পুরুষোত্তম, চমকানিরও একটা সীমা আছে। খুব আস্তে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। কঠিন অকম্পিত চোখ তুলে তাকাল সামনে। দেখল, যা দেখল তাতেও এতটুকু বিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল না তার চোখে মুখে। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে কিনা ইতিমধ্যে যে, কিছুতেই আর বিস্মিত হবে না। তবু তার ভেতরটা একটু নাড়া পড়ল। কারণ—যাকে দেখল, সে পুরুষ না নারী না

হু চতুর কোন শিল্পীর আঁকা একখানি ছবি, ঠিক বুঝতে পারল না।

দরজার ডান ধারের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবিখানি। ছবিখানির চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে দেখল, তাতে মোটে আগুন নেই। শিল্পী সবটুকুই নির্ভূত করতে পেরেছে, শুধু চোখ দু'টিতে একটুও প্রাণের ছোঁয়া লাগাতে পারে নি।

সেই প্রাণহীন চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন আলোর ঝিলিক দেখা গেল। আলোটুকু যেন একটা বড় রকম লড়াই শুরু হবার রহস্যময় সংকেত। কঠিন আঘাত দেবার আর ততোধিক কঠিন আঘাত সহ্য করবার জ্ঞে যেন চূড়ান্ত রকম হুঁসিয়ার হোল—সেই চোখের দৃষ্টি। আর একবার সেই আগের মত হিমশীতল শব্দ শুনতে পেল পুরুষোত্তম। আবেগ উচ্ছ্বাস আন্তরিকতার ছিটে ফোঁটা নেই সেই শব্দগুলোর গায়ে। কেটে কেটে খুব স্পষ্ট ভাবে প্রতিটি কথা উচ্চারণ করা হোতে লাগল—“আপনার বন্ধু স্বশাস্ত্র বাবু আমায় বলেছেন আপনার নাম। আমার নামও নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি ওঁর কাছে। হয়ত আমার ছবিও দেখেছেন সিনেমায। আপনার জীবন সংগে পরিচয় হোয়েছে আমার। তাকে আমি ভাল ভাবে চিনি। আপনার বন্ধু তাই আমায় ধরেছেন, তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যেতে হবে।”

শুরু হোয়ে রইল পুরুষোত্তম। আরও কিছু শোনার জ্ঞেই





UN Sirkar & Co

J e w e l l e r s

126-A, B.B. GANGULY ST. (BOWBAZAR) CAL-12

159/1B, R.B. AVENUE (HINDUSTHAN MART I) CAL-29

Phone : BOWBAZAR 34-2501
BALLYGUNJ 46-4734





বোধহয় চূপ করে রইল।
কলও মিলল একটু পরে।
বাকীটুকুও তার কানের

দরজা দিয়ে ঢুকল গিয়ে যগজের মধ্যে। সিনেমার অভিনেত্রী তাঁর মাথা-স্বরের মাথা-উচ্চারণ করে একটু বিশ্বয় প্রকাশ করলেন—“কিন্তু আমি ত কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন সে পালাল আপনার কাছ থেকে! সেইটুকুই আমি জানতে চাই। খোঁখোখুঁখি যদি সব জানান আমাকে, তবেই আমি সাহায্য করতে পারি। নয়ত—” শেষটুকু আর শেষ পর্যন্ত বলাই হোল না। হঠাৎ পুরুষোত্তম এক হাত তুলে অল্প একটু নাড়ল তাঁর দিকে। যেন মানা করল আর একটি কথা উচ্চারণ করতে! তারপর মাথা হেঁট করে সেই হাতখানা কিরেই নিজের ঘাড়টা ঘষতে লাগল। অর্থাৎ কিনা, একটু সময় সে নিজের মনের ভেতরটা শুছিয়ে নিতে চায়। শুছিয়ে নিতে গিয়ে দেখল, গোছাবার মত কিছুই নেই। মনের ভেতরটা ধুয়ে মুছে সাক হোয়ে গেছে। বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি খেলিয়েছে ত! নেহাত গোবেচারী আজ ভীতু বলে মনে হোয়েছিল যাকে, তার পেটে এত বুদ্ধি! আর কি অদ্ভুত অভিনয় করবার ক্ষমতা! ঐ ক্ষমতা

আছে বলেই না সিনেমা লাইনে নাগতে যাচ্ছে। এত অভিনেত্রীর সংগে আলাপ পরিচয় আছে। ইনি তাকে বেশ ভাল করে চেনেন। চেনাচিনিতা নিশ্চয়ই অনেক দিনের। অনেক দিন আগেই পাকা ব্যবস্থা করা হোয়েছিল নিশ্চয়ই। বাবা অধ্যাপক মাহুদ, বাপের নামে একটুও কালির দাগ না লাগে, সেই জন্তেই এত তোড়জোড়। দিচ্ছে বিয়ে বাপ মা, দিক। বাধা দেবার দরকার কি। স্বস্তর বাড়ীতে গিয়ে না ঢুকলেই হোল। স্বস্তর বাড়ী পর্যন্ত পৌছতে না হয়, সে জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলেন এঁরা। যে ছোড়াটা বেকির তলায় লুকিয়ে ছিল, সেও নিশ্চয়ই এঁদেরই চর। ঠিক আয়গায় ঠিক সময় গাড়ী থামলেই নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে তৈরী ছিলেন ধারা, তাঁরা নামিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই ছোড়াটাকে আর ভেতর থেকে সাহায্য করতে হয়নি। সাহায্যের দরকারও করেনি। তাকে গাড়ী থেকে ক্লে দেবার পরে ইনিই তৈরী হোয়ে বসেছিলেন।

অতি হুন্দর মতলব এঁটেছিল, মতলবটি অতি সুশৃংখলে সফল করে ছেড়েছে। সব দিক রক্ষা করে স্বচ্ছন্দে নিজের পথে সোজা চলে গেছে। কিন্তু রক্ষা করতে

পেরেছে ত' সব দিক! বোধ হয় পারেনি। একটু গুণ্ডগোল করেই ফেলেছে হিসেবের। মানে—বিয়েটা হোল যার সংগে, তাকে তার হিসেবের মধ্যেই ধরেনি। যা ভাবা স্বাভাবিক তাই ভেবে নিয়েছে। ঠিকই করে ফেলেছে যে, বিয়েটা হোল যার সংগে, সে লোকটা কিছু দিন পরে সবই ভুলে যাবে। ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে থা করে সংসারী হবে। তাই হওয়াই ত' উচিত। একদিনের বউয়ের জন্তে কে আর মরিয়া হোয়ে ওঠে। হিসেবের ভুলটা হোয়েছে এখানেই, মারাত্মক ভুল হোয়েছে। ভাগ্যদোষে বিয়েটা হোয়ে গেছে পুরুষোত্তমের সংগে।

**আপনার বাণিজ্যের
প্রসারণের জন্য
আজই পরামর্শ করুন**

প্রজ্ঞা প্রচারণী

নগরীর অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার সংস্থা ॥

পরিচালক-শ্রীদ্বিজেনদত্ত প্রসন্নবিদ্য

১৩২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, #

কলিকাতা-৪

এবং পুরুষোত্তম লোকটা আর পাঁচটা লোকের মত নয়। সহজে কিছু ভোলে না পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমকে ঠকিয়ে সহজে কেউ নিস্তার পায় না।

ঘাড় ঘষতে ঘষতে অল্প একটু হাসল পুরুষোত্তম, হাসিটুকু ঝাম্ঝাম্ অভিনেত্রী প্রহেলিকার নজর এড়াল না। হাসিটুকুর মোচড়ানিতে কেমন যেন একটু কঁপে উঠল তার বুকে। আরও নিবিষ্ট চিন্তে লোকটার হাবভাব লক্ষ করতে লাগল। কথা বলল স্তব্ধ। পরিচয় করিয়ে দেবার হাংগামটা পোহাতে হোল না বলে বেশ উৎফুল্ল হোয়ে উঠেছিল সে। বন্ধু হাবভাব দেখে তার মনে হোল, পরিচয়টা বোল আনা সম্পূর্ণ হয়নি। প্রহেলিকা দেবী যে কত উচুদরের অভিনেত্রী, তা' বোধ হয় জানে না পুরুষোত্তম। স্তব্ধ ত' আর সত্যিই কিছু জানায়নি রাস্তায়। পরিচয় হওয়ার ফাঁকটুকু ভবিষ্যে দিতে গেল সে। বললে—
“তোকে ত' আমি এঁর—পরিচয় দেবার ফুরসত পাইনি ভাই। ইনি হচ্ছেন প্রহেলিকা দেবী। কতবার আমরা এক সংগে বসে এঁর ছবি দেখেছি। এঁর মত শিল্পী একজনও নেই দেশে, তুইও নিশ্চয়ই মানবি। ইনি যত বড় শিল্পী, মনটিও ঠিক তেমনি বড়। এঁর দয়াও ওপরেই সব নির্ভর করছে। ইনি দয়া করবেন, এই ভরসাতেই তোকে আসবার জন্তে টেলিগ্রাম করলাম।”

পুরুষোত্তম মুখ ফিরিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে। একটা ঢোক গিলে বলল—“কি নির্ভর করছে?”

স্তব্ধ বলল—“সবই, সবই। ইনি সাহায্য না করলে আমরা তার সামনে পৌছতেই পারব না। ইনি যদি ব্যবস্থা না করে দেন, তা' হলে তাঁর সংগে একটি কথাও বলতে পারব না। মানে—এমনই এক আয়গার রয়েছে সে এখন, যেখানে আমাদের নাগালেই পৌছবে না যদি ইনি আমাদের সংগে সেখানে না যান।”

ঘাড় ঘষা বন্ধ হোয়েছিল পুরুষোত্তমের। স্তব্ধের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সে প্রহেলিকার পানে। তারপর একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে মহা-আড়ম্বরের সংগে শুরু করলে—“ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে! আপনার সংগে পরিচয় হওয়াটা কত বড়



সৌভাগ্য আমার তা' আমি জানি। আপনি যখন খোঁচাখুঁচি জানতে

চাচ্ছেন, কেন সে পালিয়ে গেল, তখন খোঁচাখুঁচিই বলছি আপনাকে। মানে—ভুল বুঝে পালাল, এই আঁব কি। মনে করেছিল বোধ হয়, আমি বাধা দোঁব। ঠিক চিনতে পারেনি কিনা আমাকে। চিনবে কি করে বলুন। মোটে পরিচয়ই যে হোল না। পরিচয় হোলেই বুঝতে পারত, আমারও একান্ত সখ সিনেমায় নামবার। কত রকমের কত চেষ্টাই করেছি, কিন্তু স্তব্ধ পাই নি। কি কপাল দেখুন, বিধে করলাম এমন একজনকে যাব ওপর আপনাদের মত মানুষের নজর পড়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমিও এখন তাক্ষর রনে যাচ্ছি তার অভিনয় করার ক্ষমতা দেখে। কিছুই ধবতে পারি নি আমি, সত্যি এতটুকু সন্দেহ করতে পারিনি এমন নিখুঁত অভিনয় করে গেছে আগাগোড়া। অথচ এ সমস্তর মোটে দরকারই ছিল না। এটুকু যদি জানতে পারতাম যে, সিনেমায় চান্স পাচ্ছে সে, তা'হলে আমিই সব ব্যবস্থা করতাম। তা'ছাড়া অনর্থক একটা ছোকরা খুন হোত না। আহা রে, বেচারী মিছিমিছি জানটা দিয়ে ফেললে।”

ঘায়েল হোয়ে পড়ল দু'জনেই। যাকে বলে, একেবারে খাবি খাবার মত অবস্থা হোল দু'জনের মুখের। স্তব্ধ তাকাল প্রহেলিকার দিকে। এ আবার কি কাণ্ড বে বাপু। কি সব আবোল তাবোল বকছে লোকটা! মাথা ফাতা খাবাপ হোয়ে গেল নাকি! আবার খুনখাবাপি কথাও বলে যে! কে আবার খুন হোতে গেল এব মধ্যে!

ওদের চোখ মুখের অবস্থা দেখে খুবই যেন আগোদ পেল পুরুষোত্তম। দস্তরমত ফুঁতির আমেজ এসে গেল তাব গলায়। আবার শুরু করে দিলে দিলদরিয়া চালে।

“ব্যাপার কি জানেন, সবাই আজকাল বেশী রকম চালাক হোয়ে পড়েছে। এই যে বন্ধুটি আমার, এই বন্ধুটিই এই বিয়ের সঙ্কল্প করেছিল। কেন করেছিল, এখন তা পরিকার বুঝতে পারছি। সাপও মরে—লাঠিও না মচকায, এমন ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল বন্ধুটি। যার অত ভাল অভিনয়



করার শক্তি আছে, সেই
মেয়ের বাবা আবার
গোড়া অধ্যাপক। মেয়ে

সিনেমায় নামতে চাইলে বাপ নিশ্চয়ই বাধা দেবে।
অতএব আগে বাপের খপ্পর থেকে বার করে নাও।
লাগাল আমার সংগে বিয়ের সম্বন্ধ। বিয়েটা হোয়ে গেল।
তারপর ব্যবস্থা ত' পাকা করা রয়েছেই, খপ্পর বাড়ী
পর্বস্ত আর যেতে হবে না কনেকে। ট্রেন থেকেই
যথাস্থানে নামিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের ও ভাল
ভাবেই চেনে বলে মনে করে। ধারণা করেছিল, বিয়ের
পরদিনই যে বউ পালিয়ে যায়, তার জন্তে নিশ্চয়ই আমি
হস্তে হোয়ে উঠব না। অতবড় শক্তিসম্পন্ন আনকোরা
নতুন তারকা আমদানি করতে পারা ত' সহজ কথা নয়।
এ জন্তে ওরও যথেষ্ট উন্নতি হবে। আরে উন্নতি তোর
হোক, কে যাচ্ছে বাধা দিতে। কিন্তু আমাদেরই বা বাদ
দিতে যাচ্ছিস কেন? আমাদেরও একটু স্বযোগ করে নিতে

দে। বিয়ে যখন হোয়েছে তার সংগে, তখন স্ত্রী বলে
অন্ততঃ পরিচর্যা দিতে দে। মন্ত বড় সিনেমা ষ্টারের
স্বামী আমি, স্ত্রীর উপার্জনে মন্ত মন্ত গাড়ী চেপে বেড়াচ্ছি,
হোটেল খাচ্ছি, বিদেশে ঘুরছি, এ সমস্ত কি কম সৌভাগ্য
নাকি! শুনেছি ত' যে নামকরা সব অভিনেত্রীদের একটি
করে স্বামী থাকেন! তা' আমি বেচারী দোষ করলাম
কিসে! যদি কখনও কোনদিন তার কোনও কাজে বাগড়া
দি, তখন না হয় সে আমাদের ছেঁড়া জুতোর মত ছেঁড়ে
চলে যাবে। বাধা দিই কি না আগে দেখ। তা' নয়,
আগে থাকতে বেশী বুদ্ধি খরচা করতে গিয়ে এই বিপত্তি।
একটা নিরীহ মানুষ প্রাণ দিলে। কত টাকাই বা পেত
সে! কত টাকার জন্তে ওভাবে বেশির তলার নুবিয়ে
থাকতে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই জানেন আপনি, কত টাকার
লোভ দেখান হোয়েছিল সেই ছোঁড়াটাকে। বলুন, খুলেই
বলুন না শুনি, কত টাকার জন্তে সে জানটা দিতে গেল?"

প্রহেলিকার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল জবাব
পাবার আশায়। কিন্তু জবাব আর
দিতে হোল না প্রহেলিকাকে, ছ'
চোখে অন্ধকার দেখছে সে তখন।
এসব সে শুনেছে কি! কিই বা অর্থ
এই সমস্ত উদ্ভট কথা বার্তার। হঠাৎ
মাথাটা ঘুরে গেল তার, টলতে টলতে
গিয়ে একখানা সোফায় তলিয়ে গেল।
তখন ফিরে তাকাল পুরুষোত্তম বন্ধুর
দিকে। তার অবস্থা আরও শোচনীয়
হোয়ে উঠেছে। এক বিন্দু রক্ত নেই
চোখে মুখে, দম বন্ধ হোয়ে গেছে।
নিদারুণ আতংকে কাঠ হোয়ে গেছে
একেবারে। যেন ভূত দেখছে সামনে,
এই ভাবে পুরুষোত্তমের দিকে তাকিয়ে
আছে।

ছ'জনের দিকে তাকিয়ে মূঢ়কে মূঢ়কে
হাসতে লাগল পুরুষোত্তম। হাসির
সংগে তাল রেখে মাথা দু'গিয়ে বলতে



লাগল—বুদ্ধি জিনিষটা বেশী খরচা করতে নেই, জাননি
স্বশাস্ত, অতি বুদ্ধি যার—তার শেষ পর্যন্ত গলায় ফাঁদ
পড়ে।”

ফাঁসটা যেন সত্যিই গলায় লেগে পড়েছে তৎক্ষণাৎ।
একটা হাত তুলে নিজের গলাটার বুলিয়ে নিলে স্বশাস্ত।
আতঙ্কে তার প্রাণটা প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে তখন।
চুপিচুপি নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করলে—“ফাঁস! কি
সর্বনাশ!”

পুরুষোত্তমও গলা খাটো করে ফেললে। নিবিড় রহস্যে
প্রায় বুজে এল তার গলার স্বর। মস্ত বড় একটা ষড়যন্ত্র
করছে যেন সে, সত্যিই যেন সেই ষড়যন্ত্রের সকলতার
ওপর—সকলের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। পাকা ব্যবসা-
দারের মত বলতে লাগল—“হাঁ, ফাঁস। দড়িগাছা আমাকেই
পড়তে হবে গলায়, এ আমি জানি। কিন্তু তোমারাও
ত’ রেহাই পাবে না। তুমি, ঐ উনি এবং সেই তিনি,
তোমাদের উন্নতি স্বথ শাস্তি, ঐ দামী গাড়ী চেলে
বেড়ানো আর এই ইঙ্গপবীতে থাকা, লক্ষ লক্ষ ভক্তের
উদ্ধৃষ্ণ, সমস্ত ফুস করে উবে যাবে। কারণ এখান থেকে
বেরিয়েই সোজা যথাস্থানে গিয়ে আমি কবুল করব যে, সেই
ছোড়াটাকে আমি খুন করেছি। সেই ছোড়াটা কেন
উঠেছিল সেই রিজার্ভ গাড়ীতে, কারা তাকে কি উদ্দেশ্যে
পাঠিয়েছিল, সবই বলব। তারপর তোমাদের যেতে হবে
যেখানে যাবার, খোলাসা করে বলতেই হবে কোথায়
লুকিয়ে আছেন সেই ভবিষ্যৎ সিনেমা ষ্টারটি। কোনও
কষ্টই আর করতে হবে না আমাকে, কোনও সাহায্য
করতে হবে না ওঁকে তার সংগে দেখা করিয়ে দেবার
জন্তে। একটু আগেই ত’ উনি বললেন, খোলাখুলি সব
না জানালে উনি আমার সাহায্য করবেন না। সেই
খোলাখুলিই এবার সব জানাতে চললাম ঠিক জায়গায়।
আচ্ছা, চলি তা’হলে, নমস্কার, নমস্কার।”

সত্যিই চনল তৎক্ষণাৎ, পেছন কিয়ে একেবারে হাঁচা
শুক করলে। দরজাটা হোয়ার আগেই ছিটকে উঠল
প্রহেলিকা, তীরের মত ছুটে এসে এক ধাক্কা পুরুষোত্তমকে
এক ধারে সরিয়ে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

সজোরে ওঠা নামা করছে
তখন তার বুকেটা, নাকের
গর্ত দুটো অস্বাভাবিক

বড় হয়েছে। প্রায় মিনিট খানেক কথাই বলতে
পারল না। ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুরুষোত্তমের
মুখের দিকে, পুরুষোত্তমও চোখ বুঁচকে দেখতে লাগল
তাকে। দেখতে দেখতে আবার ঠোঁট দুটো একটু
বঁকে উঠল তার। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—“বাধা দিচ্ছেন
কেন? আপনার আদেশ মাস্কি খোলাখুলিই ত’ বলতে
চলেছি সমস্ত। বাধা দিচ্ছেন কেন? এ ভাবে বাধা দিয়ে
কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাকে? তার চেয়ে একটা
কাজ করুন, চিরকালের মত যাতে আমার গলা বন্ধ হয়,
তাই করুন। নয়ত সর্বনাশ হবে যে আপনার। এত নাগ,
এত দাম, এত স্বথ, শাস্তি, সবই গোম্মায় যাবে যে।
বাবস্থা করুন, যাতে চিরকালের জন্তে আমার মুখ বন্ধ হয়।”

“কি সেটা!” হিসহিস করে উচ্চারণ করলে প্রহেলিকা।
“তাও আমার শিথিয়ে দিতে হবে!” শব্দ করে হেঁসে
উঠল পুরুষোত্তম। আবার বললে একই কথা—“তাও
আমায় শিথিয়ে দিতে হবে নাকি?”

একক্ষণ স্বশাস্ত পাষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাষণ চাপা
স্বরে বললে—“হাঁ, শিথিয়ে দে। শিথিয়ে দে আমাদের
এখনই, কি হোলে তুই আমাদের রেহাই দিবি। কি
চাস তুই? ইস্—কি পাপ করেছিলাম তোর ব্যাপারে
মাথা দিতে গিয়ে!”

সোজা হয়ে দাঁড়াল পুরুষোত্তম। ছ’খানা হাত ছ’জনের
দিকে লম্বা করে দিয়ে হাতের চোটো ছ’টো পেতে রইল।
চোখ বুজে নিরতিশয় মিনতি করে, একেবারে অকপট
ভিক্ষে চাওয়ার স্বরে বললে—“দাঁও তোমরা, আমার
হাতের ওপর ফেলে দাঁও যা দেবার। চোখ খুলব না
আমি, একদম চেয়ে দেখব না কি দিলে তোমরা। দেবার
সংগে সংগে মুখে ফেলে দোব। ব্যস—সব হজাগা
চুকে যাবে।”

এক সংগে ছ’জনেই চিৎকার করে উঠল—“কি! কি
সে জিনিষ?”



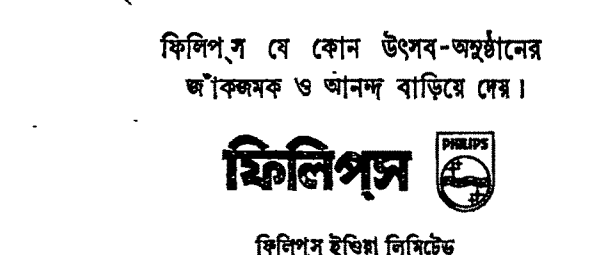


একই ভাবে একই স্বরে
জবাব দিলে পুরুষোত্তম—
“বিষ, সোঁকো বিষ। যা

মুখে পুরলে টু শব্দও আর বেরবেনা আমার গলা থেকে।”
“বিষ! বিষ দোব আমরা!” আকুল আর্তনাদ করে
উঠল ছ’জনেই, সেই সংগে হৃদিক থেকে ছ’জনে খামচে
ধরল ওর হাত ছ’খানা। তারপর আব একটি শব্দ উচ্চারণ
করতে পারল না।

চোখ মেলতে হোল পুরুষোত্তমকে। মেলে ছ’দিকে মুখ
ঘুরিয়ে ছ’জনের দিকেই তাকালে। তাকিয়ে বেশ যেন
একটু খতমত খেয়ে গেল। “কিসকিস করে বলে উঠল
—“একি! কি হোল তোমাদের! আমি কি ভুল করলাম।”
প্রহেলিকা ঠকঠক করে কাঁপছে তখন। গলাটাও বেশ
কাঁপতে লাগল। বললে—“বিষ দোব! বিশ্বাস করেন
আপনি আমি বিষ দিতেও পারি!”

বেশ অনেকটা সময় নিস্তব্ধ হোয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে
রইল পুরুষোত্তম। তারপর খুব লম্বা একটা নিঃশ্বাস
কেলে বললে—“আমায় ছেড়ে দাও। যেতে দাও আমায়
তোমরা। আমার কথা ভুলে যাও। কোনও অনিষ্ট
আমি করব না তোমাদের। আমায় যেতে দাও।”
সেই মর্মস্পর্শী অল্পণয় চাপা পড়ে গেল স্থশান্তর হৃৎকারের
তলায়—“কোথায় যাচ্ছিস মরতে? মাথা টাটা কি একদম
খারাপ হোয়ে গেছে নাকি?”
প্রহেলিকাও চোঁচিয়ে উঠল—“সেখানে সেই যমের বাড়ীতে
পড়ে রইল সেই মেয়েটা। কি উপায় হবে তার? কি
অপরাধ সে করেছে?”
স্থশান্ত ততক্ষণে একেবারে খেপে উঠেছে যেন। বজুর
যে হাতখানা ধরেছিল সে, সেখানা প্রাণপণে মোচড়াত্তে
লাগল। সেই সংগে চলল তার হৃৎকার দেওয়া—“কোথায়
যাবি? যাবি কোথায় তুই? সব ছেড়ে এসেছিস।



ফিলিপ্স যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের
জাঁকজমক ও আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

ফিলিপ্স 

ফিলিপ্স ইন্ডিয়া লিমিটেড



চাকরি বাকরি আত্মীয়স্বজন সব খুইয়ে এসেছিল যার জন্তে, তার সামনে একবার না দাঁড়িয়ে কোথায় যাবি তুই? বিশ্বের কথা বলাছিল না? হাঁ, বিষই দোব আমি তোকে, একেবারে শেষ করে দেবো। কিন্তু তার আগে যাবি তুই আমাদের সংগে, যার জন্তে তোর সর্বনাশটা ঘটল তাকে উপযুক্ত প্রতিকূল না দিয়ে কোথায় তুই যাবি?”

আর পারল না পুরুষোত্তম, জেদে পড়ল। বসে পড়তে গেল ওদের পায়ের কাছেই। ওরা হাত ছাড়লে না, টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একখানা সোফায় বসিয়ে দিলে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল প্রহেলিকা—“কি উলটো বোঝা মানুষ রে বাপু! একদিনের বিয়ে করা বউয়ের জন্তে এই ভাবে মানুষ পাগল হোয়ে উঠতে পারে।”

স্বশাস্ত বলল—“গাংল হওয়ার কতটুকু আর জানেন আপনি। সব খুইয়ে এসে পড়েছে। চাকরি ছেড়েছে, মা দাদার বৌদিরা সবাই সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে ওর সংগে। এই সহরে বহু আত্মীয়স্বজন আছে ওর, কারও কাছে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই।”

প্রহেলিকা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি। বললে—“বেশ করেছেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। এখন একটু ঠাণ্ডা রাগুন মাথাটা, দয়া করে একটু চুপ করে থাকুন। সব ব্যবস্থা ঠিক হোয়ে গেছে। আজ রাত্রেই আমরা বেরবো। কেউ কেড়ে নিয়ে যায়নি আপনার বউকে, সিনেমার নামবার জন্তে পালায়নি সে। কি করে পালিয়েছে, তাও আমরা কেউ জানি না। একটা বাঙালীর মেয়েকে একেবারে বাঙালী নেই যেখানে, এমন জায়গায় আমি দেখে এসেছি। স্বশাস্ত বলছে, সে আপনার বউ। নাও হোতে পারে, এক রকম দেখতে দু’টো মানুষ সংসার অনেক আছে। চলুন, আপনি নিজে গিয়ে দেখুন তাকে। দয়া করে আর উলটো পালাটা কিছু বুঝে ফেলবেন না। স্বশাস্ত সব বলছে আপনাকে, আমি চলি। আপনারা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাবার ব্যবস্থাও সব শেষ করা চাই। আজ রাত্রেই রওনা হব—আমরা।”



বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল প্রহেলিকা। স্বশাস্ত তার উলটো-বোঝা বন্ধুটিকে তখন আগাগোড়া সব সোজা ভাবে বুঝিয়ে দিলে। বোঝবার সংগে সংগে বন্ধুটি আবার নিম্নগ হোয়ে পড়ল। পুরাতন ব্যাধিটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে। ভয়ে ছমছম করতে লাগল আবার বুকের তেতরটা। কেন সে গেল ওখানে! কি করেই বা গেল! অতবড় ভীতু মানুষ, একলা সেই জঙ্গলের মধ্যে আছেই বা কেমন করে! চোর ডাকাত খুনেরা আটকে রাখেনি ত’! আটকে যে রাখেনি, তা’ অবশ্য বোঝাই থাকে। এঁদের সংগে দেখা করতে দিয়েছে, মিশতে পর্যন্ত দিয়েছে। এঁদের মারফত নিজের বাপের কাছে একটা খবর পাঠালেই পারত। সত্যিই কি সে আসল স্বভাব! নিশ্চয়ই নয়। আসল স্বভাব হোলে নিজের বাপের কাছেও একটা সংবাদ দিত। হোল কি তার! আপনার জনদের একেবারে ভুলে গেল নাকি।

কুহক বলে একটা কথা আছে। কবিরা আশাকে কুহকিনী বলে আদর করেন। সেই কুহকিনী আশা আবার জুড়িয়ে দিলে মনের জালা। আবার মনের মধ্যে চুপিচুপি এসে বাসা বাঁধলো সেই মেয়েটি। ভয়ানক ভীক যে, একেবারে খরগোশের মত ভীক। যাকে দু’হাতে বুকের ওপর জাগটে ধরলে বুকের সংগে চেপটে থাকে। মুখখানা এমন ভাবেই ওঁড়ে রাখে বুকের মধ্যে যে, সেই মুখের ছোপ স্পষ্ট উঠে যার বুকের তেতর। যে মেয়ের কুচকুচের কালো দুটি ডাগর চোখে বিশ্বের ভয় লুকিয়ে আছে, যে মেয়ে সেই চোখ দুটি দিয়ে অনবরত মোন মিনতি জানাতে পারে—‘খাম, একটু চুপ করে থাক, আমায় ভয় দেখিও না।’ না, আর ভয় দেখাবে না তাকে পুরুষোত্তম, সমস্ত বিশ্বসংসারের যাবতীয় ভয়ভীতি আতংক থেকে তাকে আড়াল করে রাখবে। শুধু একটিবার দেখাটা হোক, আর একটিবার সে পুরুষোত্তমকে বিশ্বাস করে দেখুক। যতক্ষণ না দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ পুরুষোত্তমের দমটুকু



যেন বজায় থাকে।

দম বজায় রাখবার জন্তে
নিজস্ব হোয়ে গড়ে রইল

পূর্ববাস্তব রাত আটটা পৰ্বন্ত। আটটার পর উঠে
গিয়ে বসল সেই চকচকে নতুন গাড়ীখানা করে, তাও
তার অজানা নেই তখন। বার গাড়ী, সেও বসল
তার পাশে। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল স্ত্রীশাস্ত্র।
মুনসী গাড়ীতে টার্ট দিলে। ইতিমধ্যে সে খোঁজখবর
নিরে নিয়েছে। যে ড্রাইভারটি ট্রুভিয়ের গাড়ী নিয়ে
গিয়েছিল, তার কাছ থেকে পথ বাটের হদিস জেনে
এসেছে মুনসী। বাবু ব্রজবাহন ঝায়ের খামারটা যে
ঠিক কোনখানে, তা' প্রাহেলিকাও জানত না। বিহারের
গয়া জেলার মধ্যে কোথাও হবে সেই খামারটা,
এইটুকুই প্রাহেলিকা জানত। পরিচালক দীক্ষিত বা
তীয় সংগে বারা গিয়েছিলেন খামারে, তাঁদের কাছে
খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত ফল ফলত।
পাঁচজনকে পাঁচ রকম কৈকিয়ত দিতে হোত। তাতেও
ফলত না। শেষ পৰ্বন্ত সিনেমা সংক্রান্ত কাগজ
ওয়ারীদের কানে পৌছত সংবাদটি। তাঁদের কাছে
সবই সংবাদ। প্রাহেলিকাদেবী কি খান, কি পরেন,
কার সংগে কি আলাপ করেন, এ সবও ঐকান্তিক
নিষ্ঠার সংগে ছেপে দেন তাঁরা কাগজে। হুতরাং
সূকতে হোল সবার কাছে যে, প্রাহেলিকা পাল নগর
ত্যাগ করছেন। চোরের মত চুপিচুপি নগর ছেড়ে
পালিয়ে গেলেন প্রাহেলিকাদেবী। সত্যি সত্যিই শেষ
পৰ্বন্ত ওরা রওয়ানা হোল।

■ আট ■

ওরা ওখানে পৌছে গেল।

কস্তুরীর কৃতিকায় অভিনয় করতে নামলে যেখানে পৌছন
প্রয়োজন, সেখানেই পৌছল শেষ পৰ্বন্ত। পৌছতেই
হবে, অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এলে সার্থক অভিনয় করা
হয় কি করে।

পৌছল কোথায়, তা' জানার পরজ ছিল না নকল কস্তুরীর।
অর্ধেক রাতে সম্পূর্ণ অচেনা অধর্মত্ব একটা মাহুঘের
সংগে একান্ত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে যখন বেরিয়ে
পড়ছিল, তখন কোথায় পৌছবার আশা করেছিল সে।
পৌছবার চিন্তাটা একটি বারের জন্তেও যদি উকি দিত
তখন মনে, তা'হলে কি অমন অনায়াসে অন্ধকারের
অন্তরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। এক দল হস্তে পশু
ছিড়ে খাচ্ছে একটা জ্যাঙ্ক মাহুঘকে, সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর-
তার তাপে এমন ভাবেই বলসে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা
যে দিগবিদিক্‌ জ্ঞান পৰ্বন্ত ছিল না। হতভাগা মাহুঘটাকে
কোনও রকমে নরপশুদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে
পালানো—এই ছাঁটুকুই মাজ বেঁচে ছিল। তারপর যখন
পৌছল ডাকবাঙলোর সামনে, তখনও আঙ পিছু ভেবে
দেখার জ্বলন্ত মিলল না। ছুটো মাহুঘ নড়বড়ে এক-
খানা গাড়ী নিয়ে যেন তৈরীই হোয়ে ছিল। কোনও
কিছু জিজ্ঞাসাও করল না তার, ভাড়াভাড়ি সরমুগ্রসাদকে
গাড়ীর ভেতর তুলতে গেল। -সেই মুহূর্তে করে বসল
আর একটা তুল। তুল নয় ঠিক, কস্তুরীর পক্ষে বা করা
উচিত ছিল, ঠিক তাই করে বসল। পাছে সরমুগ্রসাদের
চোট-খেকো মুখখানা ঠোঙর খায় গাড়ীর দরজার সংগে,
এই ভয়ে সাবধানে তার মাথাটা ধরে প্রথমেই নিজে
উঠে পড়ল গাড়ীর ভেতর। উঠল, কিন্তু আর নামতে
পারল না। বো সো করে সরমুগ্রসাদের সমস্ত খড়টা
গুজড়ে দিল তারা গাড়ীর মধ্যে। তখন তাকে ঠিক
ববে হেলান দিয়ে বসবার জন্তে চেষ্টা করতে হোল।
ইতিমধ্যে হঠাৎ গর্জন করে উঠল গাড়ী, সংগে সংগে
একটা হেঁচকা টান মেরে ছুটেতে শুরু করলে। আচমকা
যেন মাটি সরে গেল পায়ের নীচে থেকে, ছমড়ি ধরে
পড়ল সরমুগ্রসাদের ঘাড়ো। অনেক কষ্টে অনেক কসরত
করে সোজা হোয়ে বসল যখন, তখন কোথায় ডাক-
বাঙলো আর কোথায় খামার। নড়বড়ে গাড়ীখানা তখন
উল্ট আওয়ার তুলে তরংকর ঝাঁকানি দিতে দিতে গাঢ়
অন্ধকারের বুকে চিরে উদ্বাসনে ছুটিছে। আর গাড়ীর
পেছনের আসনে বেহঁশ সরমুগ্রসাদকে ঠিক ভাবে রাখবার

জন্মে নকল কস্তুরী প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

বাকী রাতটুকু গাড়ীতেই কাটল। সুমুর্ একটা মাছকে গাড়ীতে ভুলে নিয়ে চলল তারা, তারা একটি বারের জন্মে পেছন দিকে তাকাল না। একজন চালাতে লাগল গাড়ী, আর একজন তার পাশে বসে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছিল শুধু দুটো পাগড়ি। পাগড়ির তেতর যে মুণ্ড দুটো ছিল, সে দুটোকে মনে মনে চর্চণ করতে লাগল নকল কস্তুরী। ওরা মাছ না আর কিছু। যে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে, সে ময়ল না বেঁচে রইল, সে ধোঁজটাও একটিবার নিলে না। এভাবে ওরা নিয়েই বা চলল কোথায়। বলা নেই, কওয়া নেই, তাকে স্বপ্ন যে নিয়ে চলল, এর মানে কি। আগে থাকতে সব ঠিকঠাক করা ছিল নাকি। তাই বা হয় কেমন করে। কস্তুরীকে সংগে নিয়ে কিরবে সরস্বতীসদ এই কি ওরা আশা করেছিল।

মরুতগে যাক, ওদের মতলব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরে কোনও লাভ নেই। যে কোনও চুলোয় এখন পৌঁছেলো বাঁচা যায়। খড়ের খাসটুকু বজায় থাকতে থাকতে সরস্ব-প্রসাদকে ওর আপনার লোকদের হাতে ভুলে দিতে পারলে হয় একবার, তারপর ছুটি। ছুটি পাবার পরে আর কে যাচ্ছে সরস্বতীসদ কস্তুরীকে নিয়ে মাথা ঘামাতে। সরস্বতীসদ আর কস্তুরী ছাড়াও ছনিয়ায় অনেক জিনিষ আছে, বা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।

কি সেটা।

এরপর কোথায় যাবে, কি করবে, কেমন করে বেঁচে থাকবে স্বজাতি, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েও কোনও লাভ নেই। ওটা একেবারে পচা পুরনো বছার শোনা হ-ব-ব-ল গোছের গল্প, যার মাথা মুণ্ড কিছুই আশ্রয় করা যায় না। এক যে ছিল স্বজাতি এই দিয়ে শুধু গল্পটায়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিন স্বজাতি দেখল যে সে কস্তুরী হয়েছে গেছে। উদ্ভট কাণ্ড আর কাকে বলে। স্বজাতি কেন কস্তুরী হোল, কার দোষে হোল, হোয়ে তার কোন চতুর্বর্গের ফল লাভ হোল, এ সমস্ত কিছুই নেই গল্পে। কস্তুরী আবার কি হবে, তাও

জানার উপায় নেই। দুব দুব, এই ছাই গল্প নিয়ে আর কাঁহাতক মাথা



ঘামানো যায়। মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে কি। বা হবার তা' হবেই, আগে ছুটি ত' মিলুক। স্বজাতি যখন কস্তুরী হোয়েছিল তখন কে কতটুকু মাথা ঘামিয়ে ছিল। কস্তুরীর বরাতে যদি আবার অস্ত্র কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাও হবে খপ্পরে। ও নিয়ে মন খামাপ করার এতটুকু প্রয়োজন নেই। একবার যে ভেসে পড়েছে, তার কাছে এ কুল ও কুল সব কুলই সমান। তাসতে তাসতে কোথায় কোন কুল গিয়ে কত দিনের জন্মে ঠেকে থাকবে, তার কি কোনও ঠিক ঠিকানা আছে। তখন স্রোতের টানে এক কুল ছেড়ে—অজানা কুলের উদ্দেশে তাসতে বুক কাঁপবে কেন? কতই বা আর কাঁপবে বুক? যে ভাবনার কুল কিনারা নেই, তা নিয়ে আর কাঁহাতক মাথা খুঁড়ে মরা যায়।

তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ভাবনা সংগে রয়েছে। খাসটুকু বজায় থাকতে থাকতে সরস্বতীসদকে তার আপন জনদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। আসল কস্তুরীও নিশ্চয়ই তাই করত। প্রাণটাই ধোঁয়াতে বসেছিল বেচারী কস্তুরীর জন্মে। হায়রে—কস্তুরী যদি আজ এ সংবাদটা জানতে পারত। জানতে পারলে নিশ্চয়ই চূপ করে থাকতে পারত না সে। যেখানেই থাকুক, নিশ্চয়ই ছুটে এসে পড়ত। সহজ কথা না কি। একজনকে পাবার জন্মে প্রাণের মারা পরিত্যাগ করাটা কি এতই সম্ভব। শুনে হরত অনেকে হাসবে। বলবে, হৃদ বোকা না হোলে কেউ ও ভাবে একটা মেয়ের জন্মে মরতে যায় না। বোকামি ত বাটেই, চালাক যদি হোত সরস্বতীসদ, তা' হলে কবে কস্তুরীকে ভুলে যেত। মেয়ের ত' আর অভাব হয়নি গৃহিবীতে। কস্তুরীর মত মেয়ে গণ্ডার গণ্ডার মেলে। মেলে যে, তা নিশ্চয়ই সরস্বতীসদও জানে। তবুও কস্তুরীকে ভুলতে পারেনি। কস্তুরীর জন্মে প্রাণটা দিতে দৌড়ে এসেছে।

কেন।

এই 'কেন'র জবাবটা নিজের বুকখানার মধ্যে আঁতিপাতি



কবে খুঁজেও পাওয়া গেল
না। খুঁজতে গিয়ে ফলটা
হোল এই যে, বুকের

ভেতরটা ভয়ানক খালি খালি মনে হোতে-লাগল।
কিছুই যেন নেই বুকের মধ্যে, শুকিয়ে কাঠ হোয়ে
রয়েছে যেন গলা পর্যন্ত। কল্পনাকালে কখনও এক বিন্দু
জল নামেনি যেন গলা দিয়ে। তেটী, বুক-কাটা তেটী।
তেটীর চোটে সর্বশরীর অসাড় হোয়ে পড়ল। মনে হোল,
আন্তে আন্তে হুঁশ জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। সেই অবস্থায়
একটা কিছু হাতের মুঠোর ধরবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা
করতে লাগল। কি ধরবে! কিছুই যে নেই ধরবার।
ধরবার মত কিছু থাকলে আজ এ তা'বে তাকে তেঁসে
বেড়াতে হবে কেন।

বস্তুরীও কি ভাসছে! কোথায় গেল সে! মরে যদি যেত,
তা'হলে সে সংবাদটা সরযুপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানত। মরে নি
নিশ্চয়ই, আছে কোথাও লুকিয়ে। লুকিয়ে আছে কেন!
খুবই মুশকিলে পড়েছে বোধ হয় বেচারী, কোনও মতেই
কাকেও মুখ দেখাতে পারছে না। ভুল করছে বস্তুরী, আর
কেউ না থাকুক সরযুপ্রসাদ ত রয়েছে। সরযুপ্রসাদকে
সে ধরা দিচ্ছে না কেন! সরযুপ্রসাদকে ধরা দিয়ে তার
কাছে নিজে'কে সমর্পণ করলে বাঁচত বস্তুরী। যত বড়
অজ্ঞারই করে থাকুক, সরযুপ্রসাদ নিশ্চয়ই তা'ক্ষমা করত।
সরযুপ্রসাদকে ভয় করবার কি আছে! একেবারে ছেলে
মাজ্জব বাকে বলে তাই। ছেলেমাজ্জবের মত সরল, ছেলে
মাজ্জবের মত বোকা আর গৌয়ার। এ রকম মাজ্জবকে
নিয়ে যা খুশি করা যায়, যেমন ইচ্ছে চালান যায়। সরযু-
প্রসাদ কিছুতেই বস্তুরীকে শান্তি দিতে পারবে না।

শান্তি! উঃ, কি শান্তি দিতে পারে মাজ্জব মাজ্জবকে!
হাত খেঁতলাতে পারে, চুল ধরে টেনে ছুঁড়ে কেলে দিতে
পারে চলন্ত গাড়ী থেকে, দল বেঁধে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে
কেলতে পারে। সমস্ত রাত ধরেই ওরা হুত মারত
সরযুপ্রসাদকে। যতক্ষণ ধরে প্রাণটুকু থাকত, ততক্ষণ
প্রত্যেকে মেরে হাতের জুখ করত। উঃ—
চোখ বুজে ব্যরবার শিউরে উঠল। কোলের ওপর রয়েছে

সরযুপ্রসাদের মাথাটা। চাপা গলায় গোঙাচ্ছে সে।
যার কোলে মাথা রয়েছে, সে মোটে টেরই পেল না,
কখন তার একখানা হাতে চলে গেছে সরযুপ্রসাদের মাথায়।
আজুলগুলো আন্তে আন্তে চলতে শুরু করেছে সরযুপ্রসাদের
চুলের ভেতর। সে আজুল বস্তুরীর না জ্ঞাতার! সে
আজুল পাঁচটি বস্তুরীরও নয়, জ্ঞাতারও নয়। প্রেক একটি
নারীর তাড়ের আজুল। যে নারী রমণী নয়, কামিনী নয়,
প্রেমসী নয়, যার একমাত্র পরিচয় সে নারী-যুগ যুগান্তের
চিরতনী নারী শুধু, আর কিছু নয়। যে নারী জন্মগ্রহণ
করে এমন হু'খানি করপন্নব নিয়ে, যা পুরুষের দৃষ্টি ললাটের
ওপর ছোঁয়ালে ললাট জুড়িয়ে যায়। যে স্পর্শটুকু পাবার
আশায় পুরুষ রসাতলে নামতেও ইতস্তত করে না। যে
স্পর্শটুকুর তৃষ্ণায় যাযাবর পুরুষ বর বাঁধে, সমাজ গড়ে,
আইনের পর আইন বানিয়ে নিজে'কে আইনের ফাঁসে
আট্টেপৃষ্ঠ জড়িয়ে পজু করে কেলে পরম নিশ্চিন্তে বৃন্দ
হোয়ে থাকে।

সব সময় পৃথিবী জুড় জী জাতির বৃকে আসল নারী
সজাগ থাকে না। নারীও রক্ত মাংস দিয়ে গড়া জীব,
তারও জুখ জুখ আশা আকাংখা আছে। মাতা তরী
জায়া কজা, নানারূপে নারীকে বেঁচে থাকতে হয় সংসারে।
সেইটুকুই কিন্তু নারীর আসল রূপ নয়। এ ছাড়াও আর
এক রূপ আছে, যা হোল নারীর স্বাধীন শক্তির প্রতীক,
যে শক্তিটুকু থাকার দরুন নারীকে শক্তিরূপে বলা হয়।
সেই শাখতী শক্তি কখন কোন অজুহাতে কোন মাহেজ্ঞকণে
যে ভেগে উঠবে নারীর বৃকে, তা কেউ ধারণাও করতে
পারে না। তখন আর সেই নারী মাতা তরী জায়া
কজা থাকে না, অসাধারণ অসামান্য রূপ গ্রহণ করে।
তখন সে সেবিকা, কে আপন কে পর, মোটে বুঝতেই
পারে না। তখন তার জুখ নেই, জুখ নেই, মান নেই,
অপমান নেই। যে অবস্থার পৌত্তবার জন্তে পুরুষকে
কঠোর তপস্তা করে আত্মগুহি করতে হয়, কোনও
তপস্তা না করেই নারী সেই অবস্থায় পৌছে যায়। পৌছে

যায় বলেই ছুনিয়াটা আজও শুকিয়ে যায়নি। পুরুষের শক্তি পুরুষের মস্ত পুরুষের ঘেঘোরেষি সম্বল করে এই ছুনিয়া কতদিন টিকে থাকতে পারত।

নারীর কাছ থেকে প্রেম কাম নিষ্ঠা বহু কত কি আশা করে পুরুষে। এক জাতের পুরুষ ভয়ানক গর্বিত, কারুণ্য তারা নাকি নারীকে মা নাম দিয়ে ভয়ানক পবিত্র স্তুতি করে ফেলেছে। তারপর পুরুষের লেখা ইতিহাসে নির্ভীক সত্যি কথা লেখা রয়েছে, কতবার কত জায়গায় কেবল মাত্র মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করার জন্তে পুরুষ বৃকের রক্ত ঢেলে জননী খরিজীকে স্নান করিয়েছে। করতেই হবে যে, পুরুষ যে নারীর রক্ষক প্রতিপালক পরিচালক। নারীকে রক্ষা করা তার পবিত্র কর্তব্য। সবই অতি সত্যি কথা, ইতিহাস কখনও মিথ্যে সাক্ষি দিতে পারে না। কিন্তু ঐ সব জলন্ত সত্যি কথার মধ্যে অদোষ আখরে আর যা লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়, তাণ্ডে তা' সহজে কারও নজরে পড়ে না। পড়লে নারীর প্রতি পুরুষের পবিত্র অপবিত্র সব স্বকন্মের মোহ বোঝ-জানা ঘুচে যেত। জানত তখন সবাই, নারীর নারী স্বাক্ষরে আছে তার ছ'হাতের পাতা ছ'খানিতে, পাতা ছ'খানির মাঝায় দশটি আঙ্গুলের স্পর্শে। সেই স্পর্শটুকু কিছুতেই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোতে পারে না। প্রয়োজনের মুহুর্তে সেই করণময় ছ'খানি সবায়ের অহুই এগিয়ে যায়। জীবন বৃদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পুরুষের জালা যন্ত্রণা ছুড়িয়ে দেবার হাছ সুকিয়ে আছে যে করণময় ছ'খানিতে, তার মর্দাদা কতটুকু দিতে পেরেছে পুরুষে। বিশ্বটাকে নিজেদের মর্জিমার্কিক ভেঙ্গে চূড়ে গড়বার জন্তে অনেক মাংস ঘাস অনেক বৃকের রক্ত ঢেলেছে বটে পুরুষে, ফলে অনেক রক্ত অনেক ঘাস মোছাতে হোয়েছে ছ'হাতে নারীকে। হাত ছ'খানি কোনও কালে বিজয়ম পায় নি। কেন পুরুষ এমন ভাবে ছুনিয়াখানাকে চালাতে পারে না, যাতে কোনও কালে আর নারীর হাতে ঘম রক্ত লাগবে না।

তা হবার নয়, তা'হলে যে ইতিহাসই তৈরী হোত না। অগ্নিগর্ভ বস্ত্রতা, অজ্ঞা যুক্তিহীন আর অসামান্য বীরত্ব

সম্বল করে বহুবার খরি-জীর বৃকে আগুন জ্বলেছে পুরুষে। চারখার করে

ছেড়েছে সৃষ্টিটাকে। সেই ভয়ংকর ধ্বংসের মুখে নারী ছ'হাত মেলে দাঁড়িয়েছে। সর্বনাশটা ঘোল আনা ঘটতে দেখনি। একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেনি, বাদ প্রতিবাদ এড়িয়ে গেছে। শুধু ছ'খানি হাতের নিঃশব্দ সেবা দান করে হিংস্র পুরুষের হিংসা বৃত্তিটাকে ঘুম পাড়িয়ে ছেড়েছে। নারীর এই শক্তিটাকে যে হতভাগা চিনতে পারেন না, এই ছুনিয়া তার জুড়বার জায়গা কোথায়?

কোথাকার কে একটা সামান্য অধ্যাপকের মেয়ে, মাত্র কুড়ি বাইশ বছর যে ছুনিয়া বৃকে পদার্পণ করেছে, ক'রে বাপ মায়ের নজরের বাইরে কখনও পদার্পণ করতে পারনি, যার চক্ষু ছুটিতে বিশ্বের সম্রাস বাসা বেঁধে থাকে সর্বক্ষণ, হঠাৎ তার সর্বসংস্কার উবে গেল। সরস্বতীসদ তার কে, কি সম্পর্ক সরস্বতীসদেবীর সংগে, কোথায় চলেছে তাকে নিয়ে সরস্বতীসদেবীর অমুচর ছ'জন, এই সমস্ত প্রশ্ন একটি বারের জন্তেও মনের কোণে উঁকি দিল না। সরস্বতীসদ তখন তার কাছে পুরুষও রইল না। নারীও রইল না। তখন তার একটি মাত্র পরিচয়ই বেঁচে রইল। পরিচয়টি হোল, সে আর্জ, তার সেবার প্রয়োজন। একটা অসহায় মুমূর্ষুকে হাতে পেয়ে নারীর ছ'খানি হাতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর অজ্ঞাতারও কিছু করার রইল না, কস্তুরীরও কিছু বলার রইল না। যা কিছু করার বলার নিঃশব্দে সেই হাত ছ'খানি সমাপ্ত করতে লাগল।

এইভাবে রাত পথ ছুইই জ্বরল এক সময়। পৌছল গাড়ী যেখানে পৌছবার। পৌছবার পরেও নারীর হাত ছ'খানি রেহাই গেল না। যা আশা করেছিল তা ঘটল না। কেউ ছুটে এল না বেহাশ সরস্বতীসদকে নামিয়ে নিতে। তখনও সমস্ত দয়কারি কাজ করতে হোল সেই নারীকেই, যে সংগে এল সরস্বতীসদেবীর। অমুচর ছ'জনকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করে অতি সতর্পণে গাড়ী থেকে নামালো সে





সরযুগ্রসাদকে, সাবধানে
ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে
একটা ঘরের মধ্যে খাটের

ওপর শোয়ালে। খাটের ওপর যে শয্যা ছিল, তার দশা
অবর্ণনীয়। সেই অজ্ঞান ভৎসনাৎ সাধ না করে উপায়
নেই। একটা ছোট বাঙালি সংগে এসেছিল সরযুগ্রসাদের,
সেটা খুলে ছুঁথানা কছল আর একটা বালিশ পাওয়া গেল।
অল্পের ছুঁজন জানাল, ওখানে তাদের মনিবের সম্পত্তি।
মনিব ওগুলোর ওপর দ্বাখি স্থাপন করেন সন্মারে বেরিয়ে।
তখন ভৎসনাৎ আবার খাট থেকে নামাবার ব্যবস্থা করল
সরযুগ্রসাদকে। নামিয়ে খাট পরিষ্কার করে কছল বিছিয়ে
কের বখন শোয়াল তাকে ঠিক ভাবে, তখন দরকার হোয়ে
পড়ল এক লোটা পানির। রক্ত ধোয়াতে হবে, খেঁতলানো
জায়গাগুলোর জল পটি দিতে হবে। পানি এক লোটা এনে
দিয়ে ছুটল লোক ছুটো ভাস্কর ভাকতে। কাছেই নাকি
এক ভাস্কর থাকেন, ভাস্কর নাকি ভাল করে চেনেনও
তাদের মনিবকে। ভাকলেই এখনই ছুটে আসবেন।

ভাস্কর এলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। এসে একটা ইনজেক্-
শন দিয়ে বা কিছু বলা কওয়ার, সব বলে কয়ে স্থায়ী
দিয়ে গেলেন সেই নারীকেই, যে বসে রয়েছে রোগীর
পাশে। আলাদা ছুটো বড়ি দিয়ে বারবার সাবধান করে
গেলেন। বড়ি ছুটো যেন সহজে না খাওয়ান হয়। যদি
তয়ানক বজায় তয়ানক বকম অস্থির হোয়ে উঠেন রোগী,
তবেই আখখানা বড়ি দিতে হবে। তারপর ঘণ্টা তিনেক
পরে আর আখখানা। খবরদার, পুরো একটা বড়ি যেন
কিছুতে না দেওয়া হয়। তবে কিছু খাওয়ারই বোধ
হয় দরকার করবে না। যে ইনজেক্শন দেওয়া হোল,
তাতেই রোগী চক্ষিণ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবেন। বাবার সময়
ভাস্কর বেশ খিট্ট করে সাহসও দিয়ে গেলেন। বললেন
—“কিছু ভাববেন না, ছুটার দিনের মধ্যে আপনার
স্বামী সুস্থ হোয়ে উঠবেন। আশা করছি, কাল এই সময়
বখন আমি আসব, তখন দেখব, আপনি আপনার স্বামীর
সংগে বসে গল্প করছেন। আপনার মত জী বিনি পেয়েছেন,
তিনি বেশীকণ অস্থির থাকতে পারেন না। আপনার

এ হাত ছুঁথানির সেবা পেলে মরা মাহুও নিশ্চয়ই বেঁচে
উঠবে। আচ্ছা—চলি এখন—কাল আবার দেখা হবে।
কিছু ভাববেন না।”

মুখ নিচু করে বসে হজম করতে হোল ভাস্করের
সহনয়তাটুকু। ভাস্কর চলে বাবার পরেও অনেককণ
মুখ ভুলতে পারল না। দাঁড় দাঁড় করে আগুন জ্বলে
উঠল মাথার মধ্যে। এটা কি হোল! ভাস্করকে কে
বলেছে যে রোগীর পাশে রোগীর জী বসে আছে?
কে বলেছে এ কথা? ওই লোক ছুটোই ভাস্করকে
বলেছে নিশ্চয়ই। আর এই লোক ছুটোকে বলেছে
ওদের মনিব। পাশের অচেতন লোকটার ওপর নজর
পড়ল। নিশ্চয়ই ওই বলেছে। ভাকবাংলার সামনে
বখন পৌছয়, তখনও বেশ হাঁশ ছিল। পৌ পৌ করে
কি যেন বলেছিল তখন ওর লোক ছুটোকে। নিশ্চয়ই
এই পরিচয়ই দিয়েছিল। না দিলে খামকা ওয়া
হু করে গাড়ী চালিয়ে দিত না। ভাল করে ওইয়ে
দেবার আগেই গাড়ী ছুটল। কি শরতানী মতলব।
দয়া করে উদ্ধার না করলে মারতে মারতে মেয়েই
কেলত খামায়ের ঠোঙাফেরা। বেশ হোত, যে ওর
প্রাণ বাঁচালে তাকে কাদে ফেলবার শরতানী মতলব
বুকে নিয়েই মরতে হোত। আপদ যেত।
ভাস্কর বলে গেল, কিছু না ভাবতে। চক্ষিণ ঘণ্টা পরে
নাকি হাঁশ ফিরে আসবে। হাঁশ ফিরলে কি মূর্তি ধারণ
করবে, কে জানে! কিন্তু হাঁশ যদি আর না ফেরে কখনও!
নিদারুণ বিড়কাই ছুই চক্ষু বিজী ভাবে হুঁচকে গেল।
একটু পরেই বিড়কার জায়গায় উদয় হোল তর।
আসল স্ফাতা এইবার ভেগে উঠল। যে স্ফাতা
একটি মাত্র পরিচয়ই জানে পুরুষের। পুরুষের এক
জাতের ক্ষুধার পরিচয়ই শুধু জানে স্ফাতা। সেই
নিষ্ঠুর ক্ষুধা কিছু মানে না। দয়া মায়ী শী শালীনতা
কিছুই কোনও মূল্য নেই সেই ক্ষুধার কাছে। ক্ষুধা
মেটাতে ভিলমাজ সব্ব পর্বস্ত সয় না। ক্ষুধা মিটলেই
সম্পর্ক চুকে গেল, তখন আবার অজ্ঞাতের ক্ষুধার
ভাঙনার পুরুষ হস্তে হোয়ে ওঠে।

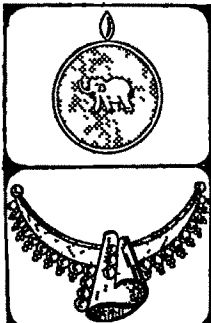
নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বেহাশ হোয়ে পড়ে আছে পুরুষটা হাতের ডগায়। ইচ্ছে করলে, অন্যায়সে এর শরতানী মন্তলবের শেষ করে দিতে পারে তৎক্ষণাৎ। বড়ি ছুটো এক সংগে গিলিয়ে দিলেই হোল। ডাক্তার যা বলে গেল, তার মানে বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি স্বজাতার। বড়ি ছুটো এক সংগে গিলিয়ে দিলে এমন ঘুমই ঘুমবে বাছাখন, যে ঘুম আর কিছুতে ভাঙবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই শরতানী বুদ্ধির দক্ষারকা হোয়ে বাবে। একটু তফাতে একখানি ছোট্ট টুলের ওপর বসানো রয়েছে ছোট্ট একটি শিশি। শিশিটা ফিকে সবুজ রঙের। তার মধ্যে পরে রয়েছে গাঢ় হলুদ রঙের বড়ি ছুটো। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শিশিটির পানে, ল্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বড়ি ছুটোকে। ঠিক যেন সাপের ছুটো চক্ষু, জলজল করে জলছে। স্বজাতা জানে সাপের চোখ জলে কেমন ভাবে, বহবার সাপুড়েকে সাপ খেলাতে দেখেছে স্বজাতা। ভুল তার হোতেই পারে না, হবহ সাপের চোখের মত বড়ি ছুটো। মন্ত একটা কাল সাপ ছ' হাত উঁচু হোয়ে কণা মেলে দাঁড়িয়েছে, জগছে তার চোখ ছুটো। মারল বলে ছোবল, ছপাৎ করে ঐ বুঝি ছোবল মারলে!

আর একটু হোলেই আঁতকে উঠত। আঁতকে ওঠার বদলে চমকে উঠল ভয়ানক রকম। সরস্বতীসাদ কাকার উঠল বিলী ভাবে। এখানে চোখ ফিরিয়ে দেখল, পাশ

কেরবার চোটা করছে সে। পাশ ফিরতে গিয়েই বোধ- হয় কোথাও টনটনিয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ আবার উলটে গেল সব, স্বজাতা আর স্বজাতা রইল না। যে হাতে বিয়ের বড়ি ছুটো হতভাগা পুরুষটার মুখে ভুলে দিত, সেই হাত ছ'খানি নিমেষের মধ্যে কাজে লেগে গেল। অতি সন্তর্পণে আন্তে আন্তে পাশ ফিরিয়ে দিলে সরস্বতীসাদকে, মাথার নীচে বালিশটা ঠিক করে দিলে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত হোল সরস্বতীসাদ, তার গোলান্টি একটু একটু করে কমে শেষে মিলিয়ে গেল। বতক্ষণ না একেবারে চূপ করল সরস্বতীসাদ ততক্ষণ এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ফুরিয়ে গেল হাত ছ'খানি, কাজ মনের কাজ শুরু হোল আবার। কণাখরা সাপটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না বটে মনের মধ্যে, তবে বিয়ের জ্বালাটুকু ঘুচল না। বিয়ের জ্বালায় ছুটি পাবার প্রস্তুতাই সবার আগে সামনে এসে দাঁড়াল। এক প্রাণী যে নেই, কার হাতে হতভাগাটাকে গছিয়ে দিয়ে সে ছুটি নেবে!

সে লোক ছুটোই বা কোথায় গেল? যে লোকটা গাড়ী চালিয়ে এল, সে বোধহয় বাঙ্গালী। যা ছ'এককা কথা বললে, বাংলাতেই বললে। আর একটা লোক বোধহয় দাবোয়ান বা ঐ রকমের কিছু হবে। কিন্তু গেল কোথায় তারা! সেই যে চলে গেল ডাক্তারের সংগে, আর ত' ফিরল না। ওরাও কি সরে পড়ল নাকি! অসম্ভব নয়,





আপনার পছন্দ মত জলজ্বারের

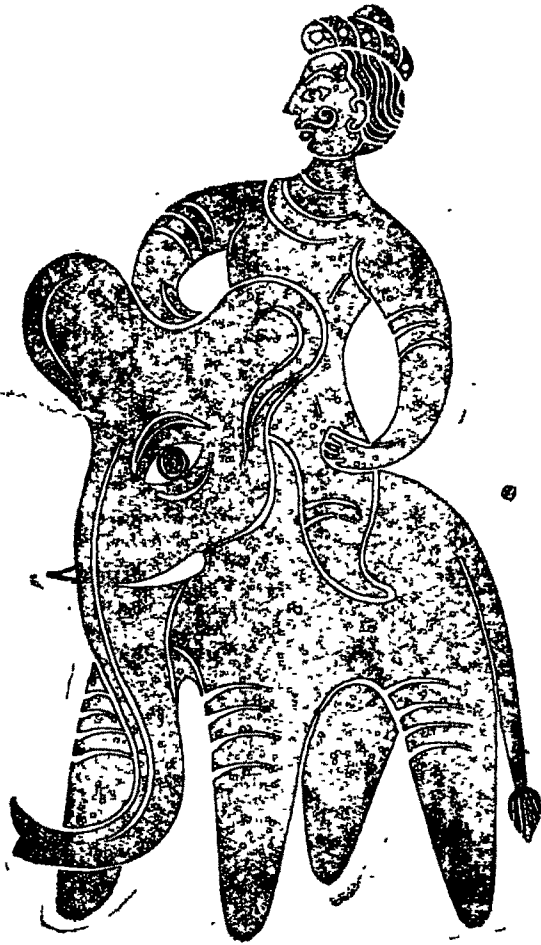
বিপুল সন্মিলন

রাজলক্ষ্মী শিল্পমন্ডির

১০১, নিপ্রিত নিহারি গ্যাসুলী স্ট্রীট, কলিঃ ১২

ফোনঃ ৩৪-৩৮৫২





ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି
ସମ୍ବଲପୁର



କର୍ମ ବେଦିରେ ଉଠିଲେ
ଉତ୍ତମ ମମାଦ୍ଭାଷ
ଦୁଇଗୁଣ ଆଶିଷ
ନିଦିହୁଅନ୍ତୁ ମାତୃବି
ଉଠିଲେ ଯେ ହାତ....

ନିକଟ ପୂର୍ବ ଗୋପାଳ

শয়তানের অল্পচর শয়তানই হয়। কিন্তু শয়তানও বোধ হয় এতটা পারত না। মরণাপন্ন মানুষটাকে এভাবে এই জনমানব শূন্য জায়গায় ফেলে শয়তানও বোধ হয় পালাতে পারত না। একলা মেয়ে মানুষ সে, এখন সে কি করে কি করবে।

কি করে কি করবে! উপায় একটা খুঁজে বার করবার জন্তেই বোধহয় ঘরখানার চতুর্দিকে নজর ফেললে। এসে অবধি দেখানে বসে আছে, সেখানটা একবার ভাল করে দেখবার ফুরসত পায় নি। ঘরের ভেতর কি আছে না আছে, খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সব। দেখতে দেখতে নম বস্তু হবার উপক্রম। এত রকমের এত বস্তু আছে ঘরে যা জীবন তোর দেখেও শেষ করা সম্ভব নয়। নেই হেন জিনিষ নেই! - রাজ্যের জঞ্জাল জুটিয়ে ঘরখানার মধ্যে জমা করা হয়েছে। টেবিল চেয়ার খাট আয়নাওয়ালা আলমারি, হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন, টাইপ-রাইটার, ক্যামেরা, গোটা পাঁচ সাত নানা জাতের টুপি, কয়েক গজা ছিঁড়ি আর ছাতা তাঁই প্রমাণ জুতো, টিকিন ক্যারিয়ার, ওয়াটার ক্যারিয়ার, আরও সব নানা জাতের চামড়ার ক্যারিয়ার বার নাম জানা দূরে থাকুক; কব্বিনকালে চোখেও দেখেনি সে। এক কথায় হুনিয়ার বাজারে যেখানে যা মিলেছে সব ঘরের ভেতর আশ্রয় লাভ করেছে। আশ্রয় লাভ করার ফলে সবই, জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। খুলায় ধুসরিত দশা সব জিনিষের, কতকাল যে ওদের কেউ স্পর্শ করেনি, তা'কে বলতে পারে। বাজার থেকে ওদের কিনে আনা হয়েছিল বখন, তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজনের খাতিরে কেনা হয়েছিল। প্রয়োজন ফুরবার পর এই হাল হয়েছে। এখন আর কেউ ওদের পানে কিরেও তাকায় না। অবহেলায় অবস্থে যেন মরেই গেছে জিনিষগুলো, ঘরের মধ্যে ওদের যেন কবর দেওয়া হয়েছে।

ঠিক, ঘরখানাকে ঠিক কবরখানার মতই দেখতে বটে! মাকড়সার জালে আর বুলে দেওয়ালের আপাদমস্তক আর আসবার পজ সব অঙ্কার হয়ে আছে। আর কি বিতর্কিচ্ছি তেপলা গন্ধ। ছুঁচো ইঁদুর মরে পচে শুকিয়ে আছে হরত কোথাও। ইস, এই গন্ধের ভেতর কি করে

এতক্ষণ বসে আছে সে! দম আটকে মারা পড়বে নাকি?

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল বিছানার ওপর থেকে। নেমে পা বাড়াল দরজার দিকে। পাশাপাশি তিনটে দরজা ঘরের, একটাই খোলা হয়েছে। উলটে দিকের দেওয়ালে তিনটে জানালা, তারও একটা মাজ খোলা হয়েছে। জান ধারের দেওয়ালের পায়ে আলমারি, আলমারির সামনে টেবিল চেয়ার, এখানে খাট, খাটের ওপর শোয়ান হয়েছে সরযুশ্রীদকে। খাট থেকে নেমে দরজার দিকে পা বাড়াতো গিয়ে আলমারির ছ'পাশে দেওয়ালের ওপর নজর পড়ল। খান দশ বিশ ক্যালেন্ডার ঝুলছে দেওয়াল-ময়। কোনও খানাই চলতি সালের নয়। পাঁচ বছর আগে ক্যালেন্ডারগুলোর পরমাণু ফুরিয়ে গেছে। তবু ওদের ফেলে দেওয়া হয়নি। কিছুই ফেলা হয়নি, যার যেখানে যেমন অবস্থায় থাকবার কথা, সব ঠিক তেমনি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাপার কি! পাঁচ বছরই বোধ হয় কেউ চোকে নি এই ঘরে। পাঁচ বছর পরে এই বোধ-হয় প্রথম এ ঘরের দরজা খোলা হোল। পাঁচ বছর এ ঘরে কেউ পা দেয়নি। এটা কি পোড়ো-বাড়ী নাকি! কোথায় এনে তুলল তাকে এরা!

দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের মত চণ্ডা টানা বারান্দা, পাশাপাশি অনেকগুলো বস্তু দরজার সামনে এখার ওখার অনেক দূর চলে গেছে। তার মানে, ছ'পাশের অনেকগুলো ঘর এইভাবে বন্ধ হয়ে আছে। ছ'পাশের তাকাতে তাকাতে বারান্দা থেকে নেমে এল উঠানে। উঠান না বলে বাগানই বলা উচিত। বহু বকমের ফুলের গাছ বস্তু করে লাগানো হয়েছিল এক সময়। মাঝখানে ইঁট খাড়া করে মাটিতে পুতে-কাঁকর ঢেলে লক্ষ রাস্তা বানানো হয়েছিল। কাঁকরের ভেতর থেকে লম্বা লম্বা ঘাস উঠে রাস্তাকে আর রাস্তা রাখে নি। ছ'পাশের ফুলের গাছগুলোকেও চেনা যায় না, ঘরের তলায় প্রায় তলিয়ে গেছে সব। সামনে অনেকটা আগে কটক। ঠিক, এই কটকের ভেতর দিয়েই তা' বঁরে আনা



হোয়েছিল সবুপ্রসাদকে।
তখন কি কোনও দিকে
নজর দেবার জরসত ছিল।

তা'হাড়া ভাল করে তখন অঙ্ককারও কাটে নি। কোথায়
এল, কি রকম বাড়াতে চুকছে, কিছুই বোঝবার উপায়
ছিল না।

কোমর সমান উচু ঘাস ছ'হাতে সরিয়ে এগতে লাগল
কটকের দিকে। রাশি রাশি চোরকাটা লেগে গেল
কাপড়ময়। রোদের তেজ এমন যে চাঁদি পুড়ে যায়।
আঁচলটা ভুলে দিল মাথার ওপর। সেই ফাঁকে ওপর
দিকে মুখ ভুলে দেখল, পূর্ব প্রায় মাথার ওপর এসে
পৌছেছে। বেলাও ত' কম হয়নি তা'হলে, সেই কোন
সাত সকালে নেমেছে গাড়ী থেকে, তখন থেকে এ
পৰ্বন্ত চোখে মুখেও একটু জল দিতে পারনি। জল কোথায়
পাওয়া যাবে! এখানেও নিশ্চয়ই জলের কল নেই, ই'দারা
আছে। ই'দারা গেল কোথায়।

ই'দারার সন্ধানে ছ'ধারে তাকাতে তাকাতে পৌছে
গেল কটকের বাইরে। সামনেই পিচ ঢাকা রাস্তা বা
দিক থেকে উঠে এসে ডান দিকে বিরাট এক পাহাড়ের
ভেতর হারিয়ে গেছে। একখানি হাত ভুলে তুরুর ওপর
আড়াল করে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল। হিল-
হিলিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে পাহাড়টার গা থেকে। একটি গাছ
নেই, এতটুকু সবুজ নেই, শুধু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাল
পাথরের চাঙড় আটকানো রয়েছে সারা পাহাড়টার গায়ে।
ভয়াবহ দৃষ্ট, বৈশ্বকণ তাকিয়ে থাকা যায় না, বুকের
ভেতরটা কেমন যেন খা খা করে ওঠে। কি আছে এই
পাহাড়ের ওধারে! পাহাড়টার এধারে এই আয়গাটার
নামই বা কি! এক প্রাণী নেই কোথাও, কাকে জিজ্ঞাসা
করবে! আর কোনও ঘর বাড়ীও নেই নাকি কোনও
দিকে! বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করে গেছ ত' সেই লোক
ছোটো! এমন আয়গায় রেখে গেছে, যেখানে শুধিয়ে মরে
কাঠ হোয়ে থাকলেও কেউ টের পাবে না।

উঠে গেল রাস্তার ওপর। পিচ গলছে, কার সাধ্য পা
দেয় রাস্তায়। রাস্তাটার ছ'ধারে কুচ্ছড়া গাছ। গাছের

তলায় পিচ নেই, আছে ধুলো। ধুলোর তেতর লুকিয়ে
আছে খারালো পাথর কুচি। পা ফেললেই খচখচ করে
গেঁথে যায় গায়ের তলায়। আলতো ভাবে পা ফেলে
গাছ তলা দিয়ে এগিয়ে চলল বা দিকে। ডান দিক
জুড়ে নেড়া পাহাড় খাড়া রয়েছে, বা দিকে কি আছে
দেখা দরকার। রাস্তাটা উঠে এসেছে এই দিক থেকে,
আসবার সময় নিশ্চয়ই এই রাস্তা দিয়ে এই দিক থেকেই
আসতে হোয়েছে। দেখাই যাক না, কি আছে তলার
দিকে, রাস্তাটা কোথা থেকে উঠে এল।

কয়েকটা গাছ তলা পার হোল। তারপর হঠাৎ যেন
চোখের সামনে থেকে একখানা পর্দা সরে গেল। হা
করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। যেন স্বপ্ন দেখছে,
বহু ঘরবাড়ী হুহু আস্ত একটা শহর চূপ করে বসে আছে
অনেকটা নিচে। পিচ বাঁধানো রাস্তাটা সেই শহরের
ভেতর থেকে বেরিয়ে পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে
এসেছে। তাজব কাণ্ড যাকে বলে, এত কাছে এত বড়
একটা শহর লুকিয়ে আছে, কে আশ্চর্য করতে পেরেছিল!
শহরের ওদিকে আবার আর এক পাহাড়। সে পাহাড়টা
আগাগোড়া জঙ্গল ঢাকা। চতুর্দিকে পাহাড়, মাঝখানে
ছবির মত এই শহর। কি নাম এই শহরের কে জানে!
অনেকক্ষণ চূপ করে দাঁড়িয়ে শহর দেখতে লাগল। শহরের
পথে একা চলছে, মোটর গাড়ীও চলছে ছ' একখানা
মাঝে মাঝে। লোকজন ঘোড়া গরু, সবই বেশ চেনা
যাচ্ছে। খুব বেশী দূর নয় নিশ্চয়ই, বেশী দূর হোলে
লোকজন ঘোড়া এত স্পষ্ট ভাবে চেনা যেত না। রাস্তাটা
সমানে নিচের দিকে নেমে গেছে, এক দৌড় লাগালে
শহরে পৌছতে কতক্ষণ লাগবে! বড় জোর দশ মিনিট
কিংবা পনেরো। দশ পনেরো মিনিট সোজা নীচের দিকে
দৌড়তে মোটে কষ্ট হবে না। কিন্তু এই রকুরে—ওরে
বাঁবা! রাস্তার পিচ টগবগিয়ে ফুটছে, ফুটন্ত পিচের মধ্যে
আছড়ে পড়ে আটকে থাকতে হবে। শহর পৰ্বন্ত আর
পৌছতে হবে না।

এ শহর থেকেই বোধ হয় এসেছিলেন ডাক্তারটি। বেশ
ভাল লোক বলেই মনে হোল ডাক্তারকে। স্বপ্নর বাঙলাও

বলতে পারেন। তবে বাঙালী নয় নিশ্চয়ই, বাঙালী হলে
নিজের ভাবার কথা কইতে এমন অদ্ভুত উচ্চারণ করতেন
না। কাল আবার আসবেন। ডাক্তারকে পৌছে দিতে
গেল যারা, তারাও কি কাল কিরবে নাকি! কি ভদ্রানক
কথা! ঐ বেহুঁশ রোগী নিয়ে একলা কাল পর্বন্ত থাকতে
হবে নাকি ঐ পোড়ো বাড়ীতে! কোথায় আলো, কোথায়
জল, কোথায় কি! ইদারটাও খুঁজে পাওয়া গেল না।
সরযুগ্রাসাদ যদি জল চায়! অল্প কিছু না হোক, একটু
জল ও ত' দিতে হবে ওর মুখে। যে রকম জখম হয়েছে,
যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে শরীর থেকে, ভাতে ভেট্টা
পাবেই। জ্ঞান হোলেনই জল চাইবে। তখন উপায়!
জলের অভাবে ছটকট করে মরবে মানুষটা, আর তাই
দেখতে হবে চূপ করে বসে। মরবার সময় এক বিন্দু জলও
মানুষটার মুখে দিতে পারবে না। কি সর্বনেশে ব্যাপার!
সর্বনাশের পরিমাণটা বেশ করে মাথার মধ্যে গুছিয়ে নেবার
চেষ্টা করতে লাগল চোখ বুজে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মনে পড়ে
গেল এক লোটা জলের কথা। ডাক্তার আসবার আগে
এক লোটা জল কোথা থেকে এনেছিল ড্রাইভারটা।
সরযুগ্রাসাদের রক্ত ধোয়াতে আর ডাক্তারের হাত মুতেই
ফুরিয়ে গেল। তা'হলে জল নিশ্চয়ই আছে কাছাকাছি
কোথাও। অত বড় বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা নেই, এ
হোতেই পারে না। ইদারটা খুঁজে বার করতেই হবে।
দিনের আলো থাকতে থাকতে ইদারা খুঁজে বার করা চাই।
ভাষণর জল তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ইদারার
কাছে দড়ি বাঁধি থাকে ভালই, নয়ত অল্প কিছু জোগাড়
করতে হবে। ঐ জঙ্গাল ভর্তি ঘরে খুঁজলে নিশ্চয়ই ছ'এক-
খানা কাপড় পাওয়া যাবে। সেই লোটাটা খালি হয়ে
পড়ে আছে খাটের নীচে এখনও, ওরা নিয়ে যাবনি।
লোটার গলায় কাপড় বেঁধে জল তুলতে হবে। মানে-জল
একটু চাই-ই-চাই, যে ভাবে হোক জলের যোগাড় করতেই
হবে। জল অভাবে একটা মানুষকে মরতে দেওয়া যায় না।
কিরে চলল ভাড়াভাড়ি, পা ছ'খানা আর উঠতে চায় না।
একে পায়ের তলায় ধারালো পাথরকুচা বিধছে, তার ওপর
শরীরও ভেঙে পড়ছে। আর কত সইবে শরীর! ছপুস



রাত থেকে শুরু হয়েছে। হৈ হজ্জত, দিনের ছপুসও
পার হতে চলল। এতটা
সময় কোথা দিয়ে কেমন ভাবে পালিয়ে গেল, মোটে
টেরই পাওয়া গেল না। কিন্তু আর যে চলেনা শরীর,
খানিকটা জল পেলে আগে নিজের মুখে মাথায় খাবরে
দিয়ে জালাটা জুড়ত। সব যেন জলছে, মাথা থেকে
পায়ের তলা পর্বন্ত হু হু করে জলছে। ভেট্টাও পেয়েছে
হু, জল পেলে আগে খানিকটা নিজের গলায় ঢালও।
ভেট্টার চোটে নিজেই যদি সে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে, তা'হলে
ও বেচারাকে বাঁচাবে কে! হতচ্ছাড়া লোক ছ'টো ড
পালাল। একটু জলের ব্যবস্থা পর্বন্ত করে গেল না। এ
কথাটাও গুদে মনে হোল না যে মরণাপন্ন মানুষটা বিনা
জলে শুকিয়ে মরতে পারে। জ্যান্ত ছশমন, ছশমন না হলে
কেউ এ কাজ করতে পারে।

ছশমন ছটোর ওপর রাগটা যত চড়তে লাগল, পায়ের
জোরও তত বাড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছে
সরযুগ্রাসাদকে। কি জানি কি করছে সে এখন! হাঁপ
ফিরেছে হয়ত, হয়ত ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে খাঁট থেকে
পড়ে গেছে। হয়ত ইতিমধ্যেই ভেট্টা পেয়েছে তার, জলের
জন্তে ছটকট করছে। এতটা সময় ওকে একলা ঘরে ফেলে
রেখে নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকটা মোটেই ভাল কাজ হয়নি।
আঙ্কেল বিবেচনা ধোয়াতে বসল নাকি! নিজের প্রাণ
বাঁচাবার জন্তে-সেও কি ছশমনি করবে নাকি ঐ মুহুঁ
লোকটার সংগে। ইস্ কি ভদ্রানক প্রাণের মায়ারে।

প্রাণের মারা।

কথাটা মনে উদয় হোতেই পা ছ'খানা নিজে থেকে খেনে
গেল। তুর কুঁসকে নিজের পা ছ'খানার দিকে তাকিয়ে
অনেকটা হেঁট হোয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পা
ছ'খানাকে বিশ্বাস নেই, পা ছ'খানা যখন বা খুঁশি করতে
পারে। প্রাণের মারা খুব বেশী থাকুক না থাকুক, তার
জন্ত বেনী কিছু যায় আসে না। ঠিক সময় পা ছ'খানা বা
কহার তা' করে ফেলে। ছ'বার করলেও, প্রাণের মারা
কতটা আছে, তার হিসেব করারও সময় ছিল না। পা



হু'থানা হুজাতাকে হঠাৎ
উধাও করেছিল পাড়ী
থেকে, হু'টো মুহূর্তও সময়

পায়নি হুজাতা তৈরী হবার। কলে হুজাতা কস্তুরী হোল।
কস্তুরীকেও আবার ঠকালে এই পা হু'থানাই। কস্তুরী
কি খুশেও কল্পনা করতে পারত এই আশ্রয় ছেড়ে আবার
ভাগবার কথা। আঙ্কেল বিবেচনা থাকলেই বা কি, না
থাকলেই বা কি। দরকারের সময় কিছুই কোনও কাজে
লাগে না। যা করার তা পা হু'থানাই করে বলে থাকে।

এবার আর সে হুখোপ কিছুতেই দেওয়া হবে না পা হু'-
থানাকে, কিছুতেই না। এই অসহায় লোকটাকে একলা কেলে
রেখে কিছুতেই পালানো চ'লবে না। মরতে হয়, ওর পাশে
বসেই মরতে হবে। এই সরযুপ্রসাদ, এতটুকু আশ্রয়ের মারা
যদি ওর থাকত, তা'লে ও কিছুতেই অমন তাবে সাক্ষাৎ
বমালয়ে মাথা গলাতে পারত না। নিম্নের বাঁচা মরার কথা
ভুলেই গিয়েছিল। একটবার কস্তুরীকে দেখতে হবে,
কস্তুরীকে না দেখে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ওর
কাছে। ঠিক ওই ব্যাপারটাই ঘটবে। সরযুপ্রসাদকে এই
অবস্থায় কেলে রেখে নিজের আশ্রয় নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে
থাকতে হবে ত'। সেই বেঁচে থাকাটা কি সম্ভব করতে পারা
যাবে তখন। যেখানেই থাকা থাক, যে অবস্থাতেই থাকা
থাক, কি করে তোলা যাবে সরযুপ্রসাদকে। কি করে তোলা
যাবে এই কবরখানার মত ধরখানাকে। এই ঘরে ছটট
করতে করতে মরবে সরযুপ্রসাদ, মরবার সময়েও কেউ তার
মুখে একটু জল দেবে না, মরবার আগে চারিদিকে তাকিয়ে
তাকিয়ে কাকেও দেখতে পাবে না সে। এ সব কথা কি
করে ভুলে থাকা যাবে।

তোলা যাবে না, কিছুতেই তোলা সম্ভব নয়। এই সরযু-
প্রসাদ জল জল করে চিরকাল ছুটবে গিছু গিছু। কিছুতেই
কোথাও গিয়ে ওর হাত থেকে পরিজ্ঞান পাওয়া যাবে না।
হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। কে যেন ধরতে আসছে পেছনে,
খয়ে নিয়ে যাবে অনেক দূরে সরযুপ্রসাদের কাছ থেকে।
ডাকছে পেছন থেকে, 'পট্ট শোনা যাচ্ছে—পালিয়ে আয়,
শিগগির পালিয়ে আয়, ওই লোকটা তোর কে? কেন

ওর সংগে তুমি মরতে যাচ্ছিন?

হু'হাত চেপে ধরল কান হু'টো, দৌড়ে এসে চুকে, পড়ল
ফটকের মধ্যে। চোর কাঁটার জ্বল তেলে আশ্রয়ে ছুটে
লাগল। পা হু'থানা যেন কিছুতেই না এবার ঠকতে পারে।
বিশ্বাস নেই, বিদ্রুমান বিশ্বাস নেই পা হু'থানাকে। যদি
ওরা আবার ঠকায়, তা'হলে আর কোথাও গিয়ে কিছুতেই
বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

বারান্দার পা দেবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের
ভেতর থেকে সাড়া শব্দ কিছু আসছে নাকি! একটু সময়
দাঁড়িয়ে রইল কান পেতে। না সরযুপ্রসাদ জাগেনি তা'হলে,
জাগলে নিশ্চয়ই কাতরাড। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পা
দিল বারান্দার ওপর, নজর পড়ল ঘরের দরজায়। ও কি!
ওসব রাখলে কে ওখানে। দরজার পাশে কিছুই ত' ছিল না।
গোবর লেপা চাকা চাপা দেওয়া বেশ বড় একটা
কাঁপি আর একটি পেতলের কলসী ঠিক দরজার
পাশে বসে আছে। কলসীর ওপর রয়েছে একটি
লোটা, লোটা কলসী এমন স্বকমক করছে যে চোখ
ধাঁধিয়ে যায়। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল
কলসীটার দিকে। নিশ্চয়ই জল আছে ওতে। কে
দিয়ে গেল জল। কখন দিয়ে গেল।

এবার ওদার তাকাতো লাগল। কোথাও কেউ নেই।
তাকাডাড়া চুকে পড়ল ঘরে। যে জল এনেছে, সে
নিশ্চয়ই ঘরের ভেতর আছে। না, ঘরের ভেতরেও
কেউ নেই, সরযুপ্রসাদ অঘোরে ঘুমছে। ঘুমছে যে
তা' ওর নিঃশ্বাস কেলা দেখেই বোকা যায়।

কিছুক্ষণ সরযুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর
আবার বাইরে বেরিয়ে এল। কেন তা'হলে রেখে গেল
এ সব জিনিস! যে-ই রেখে গিয়ে থাকুক, মোটের
ওপর বোকা যাচ্ছে যে, ধারে কাছে মাছ মাছ আছে।
অকারণ এতক্ষণ সেই লোক হু'টোর ওপর রাগ হচ্ছিল।
একটা কিছু বন্দোবস্ত না করে কি যেতে পারে তারা।
বিনা জলে তাদের মনিব শুকিয়ে মরবে এখানে, এ

কেনেও তারা পালিয়ে যাবে, তারা যেন মাছ নয়।
 ছি ছি, শুধু শুধু সে বেচারাদের মন্দ মনে করে
 এতক্ষণ জলে মরছিল নিজে। সমস্ত ব্যবস্থা করে তবে
 তারা গেছে। গেছে হরত সরস্বতীর আশ্রয় স্বপ্নের
 কাছে সংবাদ দিতে। একেবারে তাদের নিয়ে এসে
 পড়বে। ভ্রমণ রোগীকে এই পাহাড়ের মাথায় কতক্ষণ
 ফেলে রাখা যায়। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ
 পত্র দেবার জন্তেই এখানে এনে তুলেছে আগে, তালই
 করেছে। তাড়াতাড়ি ঐ ইনজেকশনটা না দিলে হরত
 এতক্ষণ সর্বশরীর বিষয়ে উঠত রোগীর। টেট্যানাস
 না কি বলে, তাই হোয়ে পড়ত হরত এতক্ষণ।
 তারপর আর কোনও উপায়ই থাকত না। খুব বুদ্ধির
 কাজ করেছে তারা এখানে এনে তুলে। এইবার
 অনেকটা সামলে উঠবে সরস্বতীদ, রাস্তায় থকল
 সেইবার মত অবস্থা হবে। ওর আপনার লোকেরাও
 এসে পড়বে ইতিমধ্যে। তারপর আর কোনও
 ভাবনাই থাকবে না। নিজের বাড়িতে চলে যাবে।
 ভাবনার বোঝাটা হঠাৎ অনেক হালকা হোয়ে গেল।
 কলসীটার দিকে তাকিয়ে আর নিজেকে সামলাতে
 পারল না। এক লোটা জল ঢেলে নিল কলসী থেকে,
 নিয়ে বারান্দার কিনারায় গিয়ে মুখে মাথায় ধাবড়ে
 দিতে লাগল। গোটা কতক ফুলফুচো করে নিল
 বাকী জলটুকু দিয়ে। তারপর আঁচল তুলে মুখ মাথা
 মুছতে মুছতে কলসীর কাছে ফিরে গিয়ে আবার এক
 লোটা জল গড়িয়ে নিলে। নিয়ে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে
 ওপর দিকে মুখ তুলে আলগোছে মুখের মধ্যে ঢালতে
 লাগল। কয়েক ঢোক গেলবার পরই বাধল ক্যান্সাস।
 গলা বুক শুকিয়ে ছিল, ও তাবে জল গেলও কখনো
 অভ্যাস করে নি। জল চলে গেল খাসনালীর মধ্যে,
 ফলে বিষম গোছের বিষম লেগে গেল। মুখের তেতর
 যে জলটুকু ছিল, সেটা তৎক্ষণাৎ ছিটকে পড়ল বাইরে।
 তারপর কাশি, কাশির খাতার দম বন্ধ হোয়ে মাঝ
 যায় আর কি। সেখানেই বসে পড়ল উবু হোয়ে,
 কসে হুঁহাতে বুক চেপে ধরে বেদম কাশি কাশতে লাগল।

বিষম লাগলে যথেষ্ট
 লাড়ানশ হবই, নিশেষে
 বিষম সামলানো কারও
 পক্ষেই সম্ভব নয়। নিরুপ পুরী, মস্ত উচু বারান্দার ছাত্ত,
 অল্প আঁওরাজও কয়েকগুণ বেড়ে যায় প্রতিধ্বনিত হোয়ে।
 হোলও তাই, একটা মাছের কাশির শব্দ একপাল মাছের
 হৈ হট্টগোলে পরিণত হোল। ফলে বার্না ছিল নজরের
 আড়ালে, তারা ছুটে আসতে বাধ্য হোল। কাশির থকলে
 মুখ তুলে তাকাত্তে পারল না। বুঝতে পারল না। এক
 থুথুড়ে বুড়ী পেছনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মস্ত
 আঙড়ে মাথায় ওপর হুঁ দিচ্ছে। বুড়ীর ঝাড়ফুকের
 জন্তেই হোক, বা নিজে থেকেই হোক, কাশির দমক
 ক্রমেই কমে এল। মুখ চোখ লাল হোয়ে উঠেছে ডগুন,
 ভান্ন করে দম ফেলতেও পারছে না। সেই অবস্থাতেই
 টের পেল মাথায় কপালে যেন কিসের ছিটে পড়ছে। মুখ
 উচু করে দেখতে গেল, সংগে সংগে মুখের ওপরেও পড়ল
 ছিটে। শুদ্ধাক করে লাফিয়ে উঠে কয়েক হাত পিছিয়ে
 দাঁড়াল। তরে হুঁচোখ কপালে উঠে গেছে, বিষম লাগা।
 কাশি সব উখাও। বিকট দর্শন বুড়ীটার দিকে দম আটকে
 তাকিয়ে রইল।
 বুড়ীটাও তখন সোজা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। দস্তহীন মাটী
 বার করে বোধ হয় হাসবায়ই চেষ্টা করল সে। হাসিটার
 অর্থ অতর দেওয়া। সেই অতর-হাস্য দর্শন করে জলে উঠল
 পিঁপ্তি। আঁচল দিয়ে মুখ মাথায় থুথু মুছতে মুছতে তেড়ে
 উঠল বুড়ীকে—“কোন হার তুমি?”
 দমক খেয়ে বুড়ীর মাটী বন্ধ হোল। থতমত খেয়ে আশে-
 পাশে তাকাত্তে লাগল সে। যাকে দেখবার আশা করেছিল,
 তাকে দেখতে না পেয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। পালাবে
 কোথায় বুড়ী, বতটুকু রপ্ত হোয়েছিল ও দেশের ভাষা সবটুকু
 ছুটে গেল ঠোঁটের ডগায়। লাগালে আর এক দমক
 বুড়ীকে—“জলদি বল, তুমি কোন হার? কেন হামরা মাথায়
 থুথু দিয়া হার?”
 বুড়ীকে আর কিছু বলতে হোল না, ধামের আড়াল থেকে
 আবিভূত হোল তখন আর একজন। আবিভূত হোল





বটে, কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না। পারবে কি করে, তার অবস্থাও তখন কাহিল। ভয়ানক নোংরা পরণের কাপড়ের আঁচলটা নিজের মুখের মধ্যে গুঁরে হাসি বন্ধ করবার চেষ্টা করছে সে তখন। তাড়াতাড়ি বুড়ীর সামনে এসে বুড়ীকে আড়াল করে দাঁড়াল সে। দাঁড়িয়েই আবার হাসি, হাসি যেন কেটে পড়তে চায়। চোখ মুখ সর্বশরীর থেকে। হাসি সামলাতে গিয়ে প্রাণটাই বুঝি বেরিয়ে যায় বেচারীর। সেই খেপা হাসির তোড়ে বুয়ে গেল রাগ কাপ সব, অনেকটা প্রসন্ন কণ্ঠে তাকেই আবার জিজ্ঞাসা করলে—
“কোন হায় তুমলোক ? মিছিমিছি এমন হাসতা হায় কেন ?”
অদ্ভুত অদ্ভুত হিন্দী শুনেই বোধ হয় কমে এল হাসিটা। তখন সে মুখের কাপড় নামিয়ে নিজেদের পরিচয় দিলে। পরিচয় দিলে আবার বাঙালি, সে বাঙালিও অদ্ভুত। বাই হোক, পরিচয়টা বোঝা গেল। ওরা হোল সেই কুটির চৌকিদার। বুড়ী হচ্ছে চৌকিদারের মা আর সে চৌকিদারের মেয়ে। তার নাম পীতাম্বরী। চৌকিদার শহরে গেছে হজুর সাহেবকে সংবাদ দিতে। যে সাহেব ঘরের ভেতর শুয়ে আছেন, তিনি হজুর সাহেবের বন্ধু। অনেক বার এসেছেন কুটিতে, কুটির মালিক হজুর সাহেবের সংগেও এসেছেন। হজুর সাহেবের হুকুম আছে, তিনি না থাকলেও তাঁর বন্ধুর যেন কোনও অসুবিধা না হয়। তাই ওরা থানা বানিয়ে এনেছে, আরও যা লাগবে হুকুম করলেই এনে হাজির করবে।

মুখে খুঁ খুঁ দেবার আলাটা অনেক কমে এসেছিল, মেয়েটিকে দেখে তার কথা শুনে মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা হোল। অল্প বয়েস মেয়েটির, বোধ হয় পনেরো বোল হবে। মাথার আঁচল দিয়েছে, কাঁচুলির মত একটা কিছু আছে গায়ে। কাপড় জামা এমন যে চিমটি কাটলে বোধ হয় থানিক ময়লা উঠে আসে। হাত মুখ দেহের অবস্থাও তেমনি। তবে বয়েসের ধর্ম বাবে কোথা। সেই তরুণ নোংরামির আড়াল থেকে বয়েসের আঁচ মুটে উঠছে। তাতে শ্রী হয়ত নেই, কিন্তু এমন কিছু আছে যা নিজেই নিজের পরিচয়

ঘোষণা করছে সগৌরবে। ওর চাউনি, ওর কথা বলার চণ্ড ওর হাসি চাপবার ভংগিমাটুকু সবই খুব ইংগিতমুখর। যেন অনেক কিছু জানে ও, অনেক কিছু বোঝে। জানে বোঝে বলেই কারও রাগকে পরোয়া না করে হেসে কুটিছুটি হজিল এতক্ষণ। হাসিটা ওর চোখের কোণে লেগে রয়েছে তখনও, কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে আবার জিজ্ঞাসা করল হাসির কারণটা। এবার খাটা বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করলে।

“হাসছে কেন ? এত হাসবার কারণ কি ?”

কল করে পীতাম্বরী বলে বসল—“কই হাসিনি ত।”

“হাসিনি ! কি সর্বনাশ ! তা’হলে করছিলে কি এতক্ষণ !”

কথাগুলো বেরিয়ে গেল মুখ কলকে। পর মুহূর্তেই যেন একটা থাকা খেল নিজের মনের মধ্যে। ব্যাপারটা কি ! মেয়েটা তাকে ভেৎচাচ্ছে না ত ? কি মনে করছে তাকে মেয়েটা ! কি রকম একটা কুৎসিত ভাব লুকিয়ে আছে যেন ওর চোখের কোণে ! ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু চালচলন যেন কেমন পাকা পাকা ধরণের। কথা বলার ধরণও খুব বাঁকা।

কি যেন বলতে চাচ্ছে, অথচ বলছে না। মস্ত বড় একটা মজার ব্যাপার আছে যেন কিছু ভেতরে। মজাটা কি !

ভুরু কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটাকে। তারপর একেবারে তোল ফিরিয়ে ফেলল নিজের। চেষ্টা করে মুখে চোখে একটা বেশ তরল ভাব আমদানি করল। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হৃৎকানের ওপর হৃৎহাত তুলে দিয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিসকিস করে বললে—“বেশ হোয়েছে, বহুত আচ্ছা হোয়েছে। আজ রাতে তুমি আমার কাছে থাকবে। খুব মজা হবে, কেমন ?”

এতখানি বাড়াবাড়ির জন্তে পীতাম্বরী প্রস্তুত ছিল না। ভাল সামলাতে পারল না সে। বলে ফেলল—“না, আমি থাকলে হজুর সাহেব, রাগ করবে। সেবার তোমার মত এক বিবি এসেছিল। আমাকে তাড়িয়ে দিল হজুর সাহেব।

তোমরা কেউ না আস যখন, তখন আমি হজুর সাহেবের কাছে থাকি। তোমাদের মত বিবি পেলে আমাকে আর রাখবে কেন ? আমি কি ? আমার ভাল কাপড় জামা



নেই তোমাদের মত, তোমাদের মত সাজতেও জানি না। তোমাদের কত কি দেয় হজুর সাহেব, আমাকে কিছুই দেয় না। মাঝে মাঝে একটা ছুঁটো টাকা কেলে দিয়ে চলে যায়।” সহজ কথা, সোজা কথা, শ্রীতাত্ত্বীর দিক থেকে খুবই চুখের কথা বটে। শুনে দাঁতে দাঁত দিয়ে কি বেন ভেবে নিলে একটু সময়। তারপর হাবতাবটা আরও খানিক রসস্তম্ব করে তুলে বললে—“তাতে হোয়েছে কি। ঐ ত’ আর এক সাহেব রয়েছে, ওর সংগে তুমি থাকবে।” হেঁসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল পীতাম্বরী। বললে—“হুঁ, ও সাহেব ত’ পাগলা। ও কিচ্ছ জানে না। কতবার কত বিবি এনেছে হজুর সাহেব, হজুর সাহেবের সংগে ও সাহেবেও এসেছে। আরও ছুঁটার জন সাহেব এসেছে। কত মজা কত কি হোয়েছে। ওই পাগলা সাহেব কখনও সে সব রাতে কুঠিতে থাকেনি। সারা রাত একলা অন্ধকারে ঘুরে বেদিয়েছে ঐ সামনের রাস্তায়—আর গীত গেয়েছে। ওর বিবি নাকি পালিয়ে গেছে, তাই ওর মাথা খারাপ হোয়ে গেছে। ও আর কোনও মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।”

শুনে চাপা নিঃশ্বাসটা ফেলল বুক খালি করে। পীতাম্বরীর মাথায় ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বুড়ীটা বারান্দার ধারে গিয়ে বসে পড়েছে ইতিমধ্যে। বসে নিজের মাথার উকুন বাছতে শুরু করেছে ছুঁহাত দিয়ে। তখনক ঘিনঘিন করে উঠল সমস্ত শরীরটার ভেতর। তখনও ছুঁহাতে ধরে আছে পীতাম্বরীর ছুঁ কাঁধ। ইচ্ছে হোল, ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেয়েটাকে জঙ্গলের মধ্যে। ইচ্ছেটা কোনও রকমে চেপে জিজ্ঞাসা করল—“কত রাত্রে আসবেন হজুর সাহেব? কোথা থেকে আসবেন তিনি?”

পীতাম্বরী তাও জানে। বললে—“তা আসতে সেই রাত নটা দশটা বাজবে। আরও দেড়ি হোতে পারে। শহর ত কন ঘুরে নয়। একবার আমি গিয়েছিলাম শহরে, হজুর সাহেবের গাড়ী চেপে গিয়েছিলাম। এক ছোকরা পেরাদা আছে হজুর সাহেবের। সেও গাড়ী চালায়। একবার সে গাড়ী নিয়ে এসে বললে, হজুর সাহেব আমার নিয়ে যেতে বলেছে। বাবা কুঠিতে ছিল না। ঐ বুড়ী

আমাকে ধোর করে তুলে দিলে গাড়ীতে। তারপর শহরে গিয়ে যা হাল হোল আমার—“বলতে বলতে পীতাম্বরী আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। ভীষণ রকম মজার ব্যাপার একটা রলছে বেন, বলতে বলতেও মজাটা বেন সে বোল আনা চোখে নিচ্ছে। হাসির তোড় সামলে শেষটুকুও বলে ফেললে। চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে—“খুব বদমাশ সেই ছোকরা। মিছিমিছি হজুর সাহেবের নাম করেছিল। আমিও তাকে ছেড়ে দিইনি, জামা কাপড় আর এই গয়না আদায় করে নিয়েছি। তর দেথলাম, হজুর সাহেবকে বগে ধোব। তখন সব দিলে। এখনও মাঝে মাঝে আসে এখানে। ঐ বুড়ীকে হাত করে নিয়েছে। কিন্তু আমি আর কিছুতেই রাজী হব না। তখনক বদমাশি করে সবাই মিলে। একলা আসে আত্মক। তা না ছুঁ একজন সংগে থাকবেই। তুমিই বল না, কত সচ্ছ হয়। বেন কোনও ইজ্জত নেই আমার, সবাই মিলে এক সংগে বদমাশি করবে। টাকা পায় ঐ বুড়ী, আর আমি ওদের বদমাশি সচ্ছ করি।”

বলতে বলতে আবার হাসি। হাসতে হাসতে গলে পড়ল একেবারে। আর সচ্ছ হোল না সেই বেহুদ বেহায়াপনা, ছেড়ে দিলে পীতাম্বরীর ছুঁ কাঁধ। দিয়ে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করল তাকে। দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, “কোন শহর থেকে আসবেন তোমার হজুর সাহেব, তা’ ত’ বললে না। কি নাম সে শহরটার?”

নতুন আমদানী বিবিটির অজ্ঞতার বহর দেখে দস্তর মত অবাক হোয়ে গেল পীতাম্বরী। বিবিটির ওপর খানিক কুপাও হোল বেন তার। বললে—“এ মা-ঈ! তাও জান না তুমি! পাটনা শহরের নাম শোননি কখনও? পাটনা শহরের হজুর সাহেবকে চেন না? কান জুড়ে তোমায় এখানে আনা হোয়েছে? কোথা থেকে এনেছে তোমায়? এই বুঝি প্রথম এলে?”

চুপ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর গতি কি? কি জবাব দেবে পীতাম্বরীর প্রশ্নগুলোর। ও ওর মত করে

গীতাঘীর ফিল্ম বক্স
১২নং ৩০-লিটোন স্টোরার,
কলিকাতা-১৩

দিনে
দিনে
দিনে
দি...



রেজেনা সাবানে 'ক্যাডল'
বলে একটি বিশেষ ধবসের ভেল
মেশানো হয়, যাতে স্বক আরও
কোমল, আরও হৃদয়, আরও
লাবণ্যময়ী হয়...! স্বাস ভরা, রেজেনার
গরম সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য সাধনার সর্বদা
রেজেনা ব্যবহার করুন।

রেজেনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেজেনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিডার লিঃ তৈরী।

RP.165-X52 BG

সব ভেবে নিয়েছে। এইটুকু বয়েসেই যা দেখেছে, যা শিখেছে, তাতে ওর দোষই বা কোথায়। এমন ঘরে জন্মেছে হতভাগী, এমন বিপাকে পড়েছে যে নরকে নরক বলে নিজেও বুঝতে পারছে না। নরকের মধ্যে ডুবে থেকে মনে করছে কি মজাতেই আছে। নরকের কীট আর কাকে বলে।

নরকের কীট আবার হিহি করে হেসে উঠল। বললে—“যাই, ভইবা ছুটোকে নিয়ে আসি। হয়ত জন্মে গিয়ে ঢুকবে একেবারে। কিছু ভেব না জুনি, কোনও ভয় নেই। হুজুর সাহেব খুব ভাল লোক। বাবড়ামছ কেন? প্রথম প্রথম আমারও খুব ভয় লাগত। তারপর এখন—” বলতে বলতে ছুটে চলে গেল। এমন একটা বিক্রী ইংগিত করে গেল চোখে মুখে যে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যেন জমে পাথর হোয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। তীব্র দৃষ্টিতে বারান্দার মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেঝেটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। পাথরগুলোকে যতটা সম্ভব চেঁচে ছুলে সমান করবার চেষ্টা করা হোয়েছে। পাথরগুলো মাপে সমান নয়। কোনটা তিন কোণা, কোনটা চৌকো, কোনটা লম্বা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেঝেটাকে, হিজিবিজি আঁকজোক কাটা সাংঘাতিক কোনও সংকেত যেন। ঐ সংকেতের অর্থ যে বার করতে পারবে, সে উদ্ধার পাবে এখান থেকে। নয়ত তাকে পঁচে মরতে হবে এখানেই, এই কালো পাথরের টুকরোগুলোর মত চিরকাল এই বাড়ীর সংগে আটকে থাকতে হবে। চিরকাল ভনতে হবে ঐ নরকের হাসি, নরকের মজা দেখে মজে থাকতে হবে। কেউ টের পাবে না, কখনও কেউ জানতে পারবে না কোথায় আছে স্ফাভা। স্ফাভা কস্তুরী হোয়ে গিরেছিল, এবার কালো পাথরের চাঙড় হোয়ে যাবে। আর সেই চাঙড়ের ওপর চলবে পৈশাচিক কাণ্ড কারখানা, পিশাচরা গভীর রাজ্য এসে জুটবে, জুটে মজা করবে। কি মজা! হিজিবিজি আঁকজোকগুলোর সংকেত কেউ

কোনও কালে বুঝতে পারবে না। কি মজা।

মেঝের হুজুর দাগগুলো

খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল। একটা রেণী ঠিক করে নিলে মনে মনে, রেখাটা কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে দেখবার জন্তে চেষ্টা করতে লাগল। অসম্ভব চেষ্টা, এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে সেটা, আবার চলে এল এখানে। তারপর একেবারে হাণিয়েই গেল। এমন ভাবে গোলমাল হোয়ে গেল যে কার লাখ্য আর সেই রেখাটিকে চিনে বার করতে পারবে। বাঁধা দাকে বলে, আদ্যবন খেললেও এই বিতর্কিত ধাঁধার খেলা শেষ হবে না।

হবে না শেষ!

ওপর দিকে মুখ তুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বপাল কুঁকে ফিসফিস করে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করল—“শেষ হবে না?”

অবশ্য চাই। শেষ হবে কি না, কবে হবে, কেমন করে হবে, এই সব জটিল রহস্যের চরম মীমাংসা হোয়ে যাওয়া চাই। আর নয়, কিছুটা করেছে হিজিবিজি আঁকজোক কাটা ধাঁধার। এখনই এইখানেই যদি করে দেওয়া যায় দেয়, তাহলে কেমন হয়! এক যে ছিল স্ফাভা, এই দিয়ে যে গল্পের গল্প, সেই গল্পের শেষটুকু যদি এখানে এই পোড়ো বাড়ীতে চুপিচুপি ঘটিয়ে ফেলা যায়, তাহলে কে আটকাতো আসছে! কার কতটুকু ক্ষতি হবে ডাতে? ভাবা খুঁজতে লাগল ওপর দিকে তাকিয়ে। নিচে পাথর তলায় ধাঁধা—ঘুঘু ধাঁধা। পা ছুঁখানকেও এন্ড টুইট বিশ্বাস নেই, একটা ধাঁধা থেকে বার করে নিয়ে এনে আর একটা ধাঁধার মাঝে উপস্থিত করে। চুপে বার পা, পা আর কোনও মতেই কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। পা ছুঁখানার সাহায্যে পালিয়ে বেড়ানোরও শেষ হওয়া চাই। শেষ হওয়া চাই সব কিছু, স্ফাভা আর পালাতে পারবে না। স্ফাভা আর কিছুতেই জন্ত কারও নামের লেবেল গায়ে সেঁটে অস্ত্রের প্রাণ্য নাশের আপ্যায়ন চুবি করে বেঁচে থাকবে না। স্ফাভার চাওনা





কিছুই নেই ছুনিয়ান্ন,
সুজাতা নিজে ঠেকেছে
এবার পরকে ঠকাচ্ছে।

ঠকিয়েছে কস্তুরীকে। বেচারী কস্তুরী যদি কখনও ফিরে আসে! ফিরে এসে যখন জানতে পারবে কেমন ভাবে একটা মেয়ে তার নাম নিয়ে তার বাবার দেওয়া কাপড় জামা পরেছে, তার বাবার কর্মচারীদের ওপর চকুম চালিয়েছে, এমন কি তার সরস্বতীসাদকে পর্যন্ত নিয়ে পালিয়েছে—
নিয়ে পালিয়েছে।

আলবত নিয়ে পালিয়েছে, একশ বার তাই। তা' ছাড়া আর অল্প কি মানে হোতে পারে। কস্তুরীর বাবা ফিরে আসবেন, এসে শুনবেন সব। শুনে তিনি কি ভাববেন? তিনি ত' জানেন, কারেক তিনি রেখে গিয়েছিলেন। নিজের হারানো মেয়ের জায়গায় যাকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তার ছাংলপনার বহর দেখে তাঁর মনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। যা তা'বা উচিত, তাই ভাববেন। মনে করবেন, একটা নষ্ট বজ্জাত মেয়েকে তিনি নিজের মেয়ের মান, মর্যাদা ভোগ করতে দিয়েছিলেন। লোভ সামলাতে পারল না সে। সরস্বতীসাদকে পেয়ে মনে করল, স্বর্ণ বুঝি পেয়ে গেল হাতে। সরস্বতীসাদের কাছে কস্তুরীর যা প্রাপ্য, সেই জিনিষের লোভে ফস করে ভেগে পড়ল। সুযোগটা কিছুতেই হাত ছাড়া হোতে দিলে না। তাঁর মত মাহুষের বুকে কেমন বাজবে এ ব্যাপারটা।

কি অশুভ বদনাম। এটা ঝাড়ে নিয়েও বেঁচে থাকতে হবে না কি।

একটা বদনামের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে সুজাতা মরেছিল, তাতে কার কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি হোয়েছিল। কিছুই হয়নি, এতদিনে সুজাতার কথা স্থলেই গেছে সকলে। সুজাতার বাপ মা আত্মীয়স্বজন, সুজাতার চেনা জানা যে যেখানে আছে, তারা কেউ একটা দিনের জন্তে ধোঁজও নেয়নি সুজাতার। কেন নেবে? সকলের মুখে কালি লেপে দিয়ে যে মেয়ে উখাও হোয়ে গেল, কার গরজ পড়েছে সেই মেয়েকে খুঁজে বার করে

আহা ভুতু করবার! গেছে না আপন গেছে, এই ভেবে নিশ্চিন্ত হোয়ে রয়েছে তারা। এবার কিন্তু তা' হবে না, কস্তুরীর বাবা অমন ধাতের মাহুষই নন। কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না তিনি। খুঁজে বার করবেন সরস্বতীসাদকে। তারপর খুঁজে বার করবেন সেই মেয়েকে— যে তাঁকে ঠকিয়ে পালিয়েছে, যে তাঁর মেয়ের স্বত্বকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। সুজাতার বাবার কাছে থেকে যত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়েছিল, কিছুতেই তত সহজে কস্তুরীর বাবার কাছে থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না।

নিস্তার কিন্তু পেতেই হবে। সেই সংগে অব্যাহতিও দিতে হবে সবাইকে সুজাতার চিন্তা থেকে। আর পালানো নয়, সবাইকে ধোঁকার ফেলে দড়ানো নয়। সহজ সবল পন্থা, কারও বুঝতে কষ্ট হবে না কোথায় গেল সুজাতা, খুঁজতে হবে না একেবারে। ঐ বড় বড় কড়িগুলোকে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি দেখা যাবে সুজাতাকে। চমৎকার সাজিয়েছে কিছু কড়িগুলোকে, একদম গোজা লাইনে সাজিয়েছে। এতটুকু কম বেশী হয়নি কোনও ফাঁক। এর নামই হোল সমান্তরাল। গুণে ফেলা যায় কড়িগুলোকে, গুণতে গুণতে দেখাও যায়, কোন কড়িতে কি স্থূলছে। ছুঁটো করে আংটা লাগানো রয়েছে প্রত্যেকটা কড়ির গায়ে। কে জানে, কি ঝোলাবার জন্তে লাগানো হোয়েছিল এত আংটা। একটা আংটার কত তার সইবে! একমন! দেড়মন! দু'মন। বেশী তার কোলালে কড়ির গা থেকে আংটাটা খুলে আসবে না ত। দেখলে হোত পরীক্ষা করে। এক গাছা দড়ি যদি ঝোলানো থাকত কোনও আংটার, তা'হলে ঝুলে দেখা যেত। ঝুলে দোল খেতে মজাও খুব। ছোট বেলার পার্কে অনেক দোল খেয়েছে। দোল খাওয়ার মত মজা নেই। ইস্—এক গাছা দড়িও টাঙানো নেই কোনও আংটার! মহা মুশকিল হোল ত' দেখছি।

ওপর দিকে মুখ তুলে ঘুরে এল দালানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। না, কোথাও কিছু ঝুলছে না।

এক বড় দালানের এতগুলো কড়ির একটাতেও কিছু ঝোলানো নেই। দু' ছাই, অনর্থক তা'লে ঐ আঁটাগুলো আটকাতে গিয়েছিল কেন কড়ির গায়ে। অন্যস্ট কাণ্ড আর কাকে বলে!

মাহাবিরক্ত হোয়ে ষাড় সোজা করল। একহাত তুলে ঘাড়ে ঘষতে লাগল, অনেকক্ষণ ওপর দিকে মুখ তুলে থাকবার দরুণ ঘাড়ে ব্যথা হোয়ে গেছে। ষাড় ঘষতে ঘষতে হাতখানা গলায় এসে গেল। অচমন্স হোয়ে গলাতেও হাতখানা বুলিয়ে নিলে কয়েকবার। কেন নরম আর কেমন স্বভোল গোল। গলাটা এত স্নায়, তা' কিন্তু আগে কখনও খেয়াল করে নি। গলা 'ত' কখনও খালি থাকে নি, সেই ছোট বেল। থেকে হ'র ছিল। ডিনবার হার বদলায়, কেটে গেলেই নতুন গড়ানো হোত। শেষবার হোল বিয়ের সময়, যেমন তারী তেমন অবজ্ঞা। ঐ নাকি আজকালকার ফ্যাশন। ফ্যাশনের বালাই নিয়ে মরি। অচমন্স হোয়ে মুখ মাথা এখার ওখার করলেই খচ করে ফুট বসেছে গলায়। স্বখ্যাতি কিন্তু করেছিল সকলে। এমন গলায় নাকি ও জিনিষ ভিন্ন অল্প কিছু মানাই না। মানায় যখন, তখন আর কি! কুকুরের মত সেই বগলস গলায় আটকে রাখতেই হবে।

রাখতে কিন্তু হয়নি।

সেটা খুলে আর একটা পরতে হোয়েছিল।

কখন পরতে হোয়েছিল। কেন পরতে হোয়েছিল।

জ্বত হোয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, পা আর তুলতে পারল না। মেয়ের হিজিবিজি রেখাগুলো আবার পড়ল নম্বরে, সেগুলোকেও আর তেমন বিতর্কিচ্ছ বলে মনে হোল না। সেই রেখার জ্বলে ঘীরে ঘীরে ফুটে উঠল ছোট্ট একটি ঘটনা। অস্বকাবে ঘটেছিল ঘটনাটা, নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছিল। স্ট মনে পড়েছে সেই কথাগুলোও। হঠাৎ টের পেল, ডান কানটার ওপর মুখ ঠেকিয়ে কি যেন বলছে। হু' একবার শোনবার পরে বুঝতে পেরেছিল।

"গলায় যেটা পরে আছে, খুলে ফেল। কি করে ওটা

খুলতে হয়, আমি জানি না।"

বেশ জব্ব হচ্ছে মনে করে

সজোবে মাথা নাড়িয়েছিল।

ঘনছে কে, শোনবার পাছ নাকি। আবাব সেই কথা, একেবারে ছেলেমানুষের মত আবদার।

"গোল ওটা শিগ'রি। আমারটা আমি পরিয়ে দোব যে। কত কষ্টে কতদিন ধরে টাকা জমিয়ে তোমার জ্বন্তে তৈরী করিয়েছি। ওটারটাইম খেটে লুকিয়ে টাকা জমাতাম বোকে গরনা দোব বলে। পরবে না আমার হার—"

ব্যা, অতিমানে একেবারে বজ্ব হোয়ে গিয়েছিল ফিফিসানি। কি আর করে তখন, নাছোরবান্দা মাজুকের কথা রাখতেই হোল। খুলে ফেলল সেই হার, সংগে সংগে নিজেরটা পরিয়ে দিল গলায়। অস্বকাবে দেখতেও পেলনা কেমন জিনিস সেটা। তারপর তুলেই গেল সে হারের কথা। পরদিন সেই হার গলায় দিয়ে ঘর থেকে বেরবার পর কি নাছানাবুদই না হোতে হোল সকলের কাছে—

ছি—
চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল খুঁতনিটা বুকে ঠেকিয়ে, আন্তে আন্তে তলিয়ে যেতে লাগল একটা স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্ন দেবার রাত জীবনে একটি মাজই এসেছিল, যে রাতের স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। রাত্রিটা হারিয়ে গেছে, সেই রাত্রি আর ঘিরবে না। স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে সব, সেই রাতের লক্ষ্য, সেই রাতের ভয়, সেই রাতের পিপাসা, সেই রাতের উদ্দাননা সবই স্বপ্ন। স্বপ্নের নিবিড় আলিঙ্গনে সঁপে দিলে নিজেকে, স্বপ্নের নির্দয় নিপীড়ন সহিতে লাগল নিরালায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। ধরধর করে ঝাঁপতে লাগল ছোট্ট শরীরটুকু, অগন্ত বেদনা অগহনীয় স্বপ্ন একই সংগে শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা মধ্য ডরড তুলে ছুট চলল। তেসে গেল সব, জালা যজ্ঞা অপমান অসহায়তা কিছুই আর মনে রইল না। বাইশ বছরের পুরনো জীবনের সবটুকু সঞ্চিত গরল নিমেষের মধ্যে তয়তে পরিণত হোল।



ডান দিকের উল্লস
পাহাড়ের পোড়া মুখে
আলো আঁধারি হাশি

জমে উঠছে তখন, শেষ হোল তার পঞ্চতপ করা।
সিদ্ধকাম তপস্বী অন্তরস্থিত স্তম্ভাসিক্তে নিমগ্ন। কীণকীবী
দিন পাহাড়ের মাথার ওপর-পৌছে নিষ্ফল আক্রোশে
কোঁসাজে। চলে যেতে হবে তাকে, চিরকালের মত
বিদায় নিতে হবে। অনন্ত অতীতে থেকে প্রতিটি দিনকে
যেভাবে ঐ পাহাড় ভিজিয়ে নিগন্তের-বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে
হোয়েছে, তেমনি তাকেও পড়তে হবে। মেঘের শেষ,
কিছুই করতে পারল না সে। নিঃশ্বাস পাহাড়টার নির্লজ্জ
নির্লিপ্ততাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যেতে পারল না।

এক পাল চড়ুই ভুলল কিচিরমিচির করতে করতে, বড়ের
মত চুকে পড়ল বারান্দার তেতর। কয়েকসুহৃদের জন্তে
আলোড়ন উঠল নিস্তরঙ্গ নিযুক্তির বুকে। পাখীগুলো
যেমন ভাবে চুকেছিল তেমনি তাবেই বেড়িয়ে গেল।
ভয়ানক ব্যস্ত সবাই, গুরুতর রকমের কোন-সমস্যার সমাধান
খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিগ্গির ফুরিয়ে যাবে আলো, আলো
নিভবার আগেই একটা কোনও ফরসালা হওয়া চাই।
ব্যাপারটা এতই জরুরী যে আগামী কালের জন্তে মূলতুষ্ট
রাখলে চলবে না।

বুড়ীটা কখন উঠে গেছে, কে জানে। উকুনগুলো নিষ্কৃতি
শেল সে দিনের মত। নিশ্চিন্ত হোয়ে আর একটা রাত
ওরা শুয়ে পড়বে বুড়ীর মাথার রক্ত। কতটুকু রক্তই
বা শুবে। কতটুকু রক্ত আছেই বা বুড়ীর শরীরে।
বড়টুকুই থাকুক একটা রাতের মধ্যে উকুনগুলো কিছুতেই
নিঃশেষ করতে পারবে না।

রাত আসছে। দিনের দৃষ্টি শেষ হোতে চলল। আলো
ফুরিয়ে যাবে একটু পরেই। দরজার পাশে এক কলসী
জল রয়েছে, ঝাঁপির তেতর নাকি খাবার দাবারও আছে।
সেই মেয়েটা আর ঐ বুড়ী-তৈরী করেছে সব। ওরা—
খুঃ থাক ঐ ঝাঁপি-যেমন আছে, ওদের হজুর সাহেব এলে
কাজে লাগবে।

আসছেন তিনি। পীতাম্বরী বলে গেল, ভয় করবার নেই

কিছু তাঁকে। খুবই নাকি ভাল লোক, মজার মজা খুব।
পীতাম্বরী সাহস দিয়ে গেল। প্রথম প্রথম তারও নাকি খুব
ভয় লাগত, তারপর—এখন লাগে না। ভয়ের বদলে এখন
সে মজা পায়।

সেই মজার মজাখটি আসছেন। ইনজেকসেন নিয়ে ঘুরছে
সরস্বতীসাদ, চক্ৰবর্তী আর আগের মূম তার তালুবে না।
ভাললেও কিছু যাবে আসবে না। সরস্বতীসাদ হজুর
সাহেবের স্মৃতিতে বাধার সৃষ্টি করে না কখনও। অস্বস্তিকারে
ঐ-রাস্তার ধাঁটে আর দীত পায়।

বড়ি ছুটে আর খরচা হোল না। শিশির তেতর থেকেই
গেল। খরচা করে ফেললেও কোনও লাভ হবে না।
অট্টেভক্ত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। তাতে যথেষ্ট স্মৃতিয়েই
হবে হজুর সাহেবের। অট্টেভক্ত দেহটা নিয়ে যা খুশি তাই
করতে পারবেন।

শক্ত হোল দেহটাই। এই শক্তকে এমন অবস্থায় দাঁড়
করানো যায়, যা চোখে পড়লেই সকলের বমি উঠে আসে।
ঐ-বুড়ীটার মত, ঠিক ঐ রকম হওয়া যায় যদি, তাহলে সব
দিক থেকে শান্তি মেলে। তখন আর কোনও ভয় নেই,
নির্ভয়ে সকলের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়ানো যায়। কেউ
চিনতেও পারবে না। চিনতে পারলেও কোন বিপদ নেই।
তখন হজুরার সেই দেহ কারও কোনও কাজে লাগবে না।
যেহা হবে তখন হজুরাতাকে দেখলে, মুখ ফিরিয়ে নিতে
হবে। হাতে পাওয়া মাত্র হজুরাতার দেহটা নিয়ে উন্নাদ
হোয়ে উঠবে না কেউ, হজুরাতা কাছে গেলেই ছুটে পালাতে
হবে।

পশ্চিমের রোদ তেরছা হোয়ে চুকেছে বারান্দার তেতর।
মোটা মোটা ধামের ছায়া পড়েছে মেঝের। একটা ধামের
ছায়াতেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ কি মনে করে ছায়া
হেঁড়ে রোদে গিয়ে দাঁড়াল। তখন নিষেধ ছায়া পড়ল ছাই
ধামের ছায়ার মাঝখানে। ছায়াটার দিকে তাকিয়ে একটা
হাত তুলল। ছায়ার হাতও উঠল সংগে সংগে। একটা পা
তুলল, মাথাটা নাড়ল, একটু ঘুরে পড়ল। সংগে সংগে
ছায়াও করতে লাগল সব কিছু। তারপর হঠাৎ লাগলো
দৌড়, ছায়াটাও সংগে সংগে দৌড়তে লাগল। কয়েকটা



খাম পার হোয়ে, এসে পড়ল খোলা দরজার সামনে। ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো আবার ছায়াটার দিকে, সংগে সংগে ঠিক এসে উপস্থিত হোয়েছে সে। আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ছিটকে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে ঘরে ঢুকেও কোনও দিকে তাকাল না, ত্রস্ত পদে গিয়ে দাঁড়ালো আয়না লাগালো আলখারির সামনে। দাঁড়িয়ে তাল করে দেখতে লাগল নিজেকে। মুখ চোখ গলা বুক হাত পা, আবার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিঃশ্বাস বহু করে দেখে নিল। না, কোথাও কিছু বদলায় নি, গতিকারের স্বজাতাই বটে। হতচ্ছাড়ী বুড়ীটা শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বুড়ীটারও তেমন দোষ নেই, কেন যে খামকা নিদের ছায়াটাকে বুড়ী বলে ভুল হোয়েছিল। আশ্চর্য ক'ণ্ড বটে। নিজের ছায়া দেখে ভয়ে দম আটকে এসেছিল। নেকামি আর কাকে বলে।

অসহ্য র'গ হোতে লাগল নিজের ওপর। তাত্তাত্তি গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিয়ে চুলগুলোও বেশ আঁট করে জড়িয়ে নিলে। আর একবার স্বজাতাকে তাল করে দেখে নিতে গেল আয়নায়। দেখতে গিয়ে নজর পড়ল আয়নার স্বজাতার মাথার পেছনে। মাথাটা একটু হুইয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল একবার। সংগে সংগে বিজ্যৎ বেগে ছুরে দাঁড়িয়ে বাঁশিয়ে পড়ল টেবিলের ধারে। একসংগে ছ'রকমের হুঁটো আওয়াজ হোল। হড়মড় করে আছড়ে পড়ল খুব ভারী কোনও কাঠের জিনিষ, কিছু, তার সংগে মিশল বুক ফাটা আত্ননাদ। হুঁটো আওয়াজই এক সংগে মিলিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল পোড়ো বাড়ীর ন্তিরঙ্গ নিস্তব্ধতায় গর্তে। উঠল একটা সাংঘাতিক আলোভন, পরমুহূর্তেই সব জুড়িয়ে গেল। ক্ষুধার্ত বাড়ীখানা আবার খাঁ খাঁ করতে লাগল।

॥ ময় ॥

বাবু বক্রবাহন খায়ের অম্মরমহলের অভ্যন্তরে অনাবড়ক উচু অহচিভ লম্বাচওড়া একখানা ঘরের মধ্যে অগঙ্গল প্রমাণ স্তব্ধতা শুধু হোয়ে বসে আছে। বড় বড় জানাঙ্গা

দরজা-দিয়ে প্রচুর রোদ আলো এসে ঢুকেছে ঘরে, ল্পট দেখা যাচ্ছে ঘরের

অস্তিসঙ্গি পর্যন্ত। তবু যেন মনে হচ্ছে, নিষৃতী বাঙের নীরক্স অন্ধকারে বরখানা ভলিয়ে গেছে। সেই অ্যকারের অস্ত্রশালে লুকিয়ে আছে একজন, নিশ্চয়ই সে রয়েছে ঘনে। শুধু একটি ডাক দেওয়ার গুয়াস্তা, ডাবটি দিগেই তৎক্ষণাৎ সামনে এসে উপস্থিত হবে।

ডাকের মত ডাক একটিবার দিতেই হবে। গলার ভেতর দিয়ে ঠেলে উঠে আসছে নামটি, কিন্তু মুখ পর্যন্ত পৌছচ্ছে না। নামটি এখন পর্যন্ত একটিবারের অস্ত্র উচ্চারণ করতে হ'লি পুরুষোত্তমকে, স্বযোগ ঘাটনি উচ্চারণ করবার, প্রয়োজনও হয়নি। বৃকের ভেতর লুকিয়ে আছে সেই নাম, সেইখানেই অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে। যখন ইচ্ছে তখন, নিজের বৃকের মধ্যে কান পেতে শুনেই ল্পট শোনা যায়। সেই নাম যার, সে রয়েছে ঘরে। কোথাও গ'লায় নি। না ডাকলে কিছুতেই তার ভয় ভাঙবে না, অতিমান যুচবে না, ধরা দেবে না। এত কাছে এসে ডাক না দিয়ে ফিরে গেলে কি ভাববে সে! বাচবে তেমন করে তারপর।

না, ডাক না দিয়ে কিছুতেই ফিরবে না পুরুষোত্তম। নিশ্চয়ই সে রয়েছে ঘরে, অদৃষ্ট হোয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পালিয়ে গেছে, একখনও হোতে পারে! কোথার পালাবে আবার। যার খুশী হয়, বিশ্বাস করুক যে সে নেই, পুরুষোত্তম কিছুতেই তা' বিশ্বাস করে না।

দয় নিয়ে মুখ তুলল পুরুষোত্তম, নামটি এসেছে ঠোঁটের ডগায়। পাশ থেকে স্বশাস্ত বলে উঠল—তা'হলে এখন বরা যার কি? ছায়ার পেছনে কাঁহাতক আর ছুটে যরব আমরা?

“ছায়ার পেছনে।” প্রায় চিংকার করে উঠল প্রহেলিকা

—“ছায়ার পেছনে কি রকম? এই গয়নাগুলো দেখবার গয়েও বলছ ছায়া। কেন? এখনও সন্মহ রয়েছে নাকি? পুরুষোত্তম বাবুরও কি ভুল হোল নাকি? ঐ ছায়াটা উনিই গড়িয়ে এনেছিলেন সংগে, বিয়ের পয়ে



পরিষে দিয়েছিলেন তার
সুগার। ঐ হারটা দেখেই
উনি চিনলেন। এর পরেও

আবার সম্মেহ ?

গয়নাগুলো ছড়ানো রয়েছে টেবিলের ওপর। বক্রবাহন
বাবুর কর্মচারীদের মধ্যে যিনি সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ,
মালিকের সব থেকে বিশ্বাসের পাঞ্জা যিনি, যার কাছে
বক্রবাহন বাবুর কোনও কিছুই লুকনো নেই, তিনি বসে
আছেন একথানা চেয়ারে। আর তিনখানা চেয়ারে এরা
তিনজন বসেছে। গয়না দেখা শেষ হোয়ে গিয়েছে।
জগৎরামবাবু নিঃশব্দে হোয়েছেন। মেয়েটির স্বামীই যে
এসেছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। গয়নাগুলো
দেখতে দেখতে হারটা হাতে করেই যেভাবে চমকে উঠল,
তারপর থেকে যেভাবে মাথা হেঁট করে বসে আছে,
তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় কি হচ্ছে জোকরার মনের
ভেতর। জগৎরাম বাবুর বয়েস হোয়েছে ষাণ্ঠে, তবু তাঁর
বোয়ালজিটা ভোঁতা হোয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন আছেন
তিনি বক্রবাহন বাবুর সংগে। অনেক রকমের অনেক
ব্যাপার ঘটে তাঁর চোখের সামনে। চোখের আড়ালে
যা ঘটে, তাও তাঁর অজানা থাকে না। সবই তাঁকে
মুখ টিপে হজম করে থাকতে হয়। এই শক্তিটি থাকার
দরুণই তিনি বক্রবাহন বাবুর সব থেকে বিশ্বাসের পাঞ্জা।
অপ্রয়োজনে একটি কথাও তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে
বের হয় না।

এতক্ষণ পরে তাঁর মনে হোল, আরও হুঁ একটি কথা
থরচা করলেও হয়ত বিশেষ দোষের হবে না। প্রচুর
সাদা গৌরীর মধ্যে নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট হুঁথানি।
ধীরে ধীরে বললেন—“এ গয়না যদি আপনাদের হয়,
আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। সেই রকম হুকুম আছে
মালিকের। মেয়েটিকে যখন আনা হয় এখানে, তখন
সে অজান হোয়েছিল। গয়নাগুলো গায়ে ছিল। মালিক
হুকুম করলেন, গয়নাগুলো খুলে নিয়ে সরিয়ে রাখতে।
তাঁর ধারণা হোয়েছিল, মেয়েটির মাথা ধারণা হোয়ে
গেছে। পাছে গয়নাগুলো নষ্ট করে ফেলে এই জন্ত

তিনি খুলে রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য
সব গয়না তাকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একদিনের
জন্তেও সে একখানি গয়না গায়ে দেয়নি। ঐ আলমারির
ভেতর পড়ে ছিল। মালিকের হুকুমে বহু কাপড় জামাও
দেওয়া হোয়েছে তাকে, সবই ঐ আলমারি বোঝাই
হোয়ে রয়েছে। কোনও কিছুই সে না। খান
হুঁতিন সাদা কাপড় ব্যবহার করত শুধু। এখন আপনারা
সবই নিয়ে যেতে পারেন। মালিক হুকুম দিয়ে গিয়েছেন
সেই রকম। যাবার সময় বলে গেছেন, কখনও যদি
স্বামী আসে মেয়েটিকে নিতে তা’হলে যেন তাকে সমস্ত
গয়না কাপড় দিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া—”

হঠাৎ খেমে গেলেন জগৎরাম বাবু। খেমে যাওয়াটা
এমনই খাপছাড়া গোছের হোল যে প্রত্যেকে তাকাত্তে
বাহ্য হোল তাঁর মুখের দিকে। বেশ অপ্রস্তুত হোয়ে
পড়লেন জগৎরাম, মাথার পাকা চুলগুলোর ভেতর হাত
চালিয়ে নিলেন কয়েক বার। তারপর অত্যন্ত কুণ্ঠিত
ভাবে বললেন—“সামান্য কিছু টাকাও তিনি দিয়ে গিয়ে-
ছেন মেয়েটিকে। বেশী নয় এই হাজার দশেক।”

“হাজার দশেক।” সবিস্ময়ে টেচিয়ে উঠল হুঁশাস্ত।

প্রাথমিক ঠিক টেচিয়ে উঠল না। তাঁর কণ্ঠে বলে
উঠল—“এতগুলো টাকা দেবার মানে ?” জগৎরাম আরও
অপ্রস্তুত হোয়ে পড়লেন যেন। ওদের শাস্ত করার জন্তে
খুবই মিনতি পূর্ণ স্বরে বলতে লাগলেন—“না না, খুব
বেশী আর দিলেন কই। এই সম্পত্তি, যা কিছু রেখে
যায়েন মালিক, সবই তা’ তাঁর মেয়ের জন্তেই থাকবে।
সে মেয়ে কোথায়, তার কোনও ঠিক ঠিকানাই মিলল
না। ঐ মেয়েটিকে পাওয়ার পরে মালিক ওকে নিজের মেয়ের
নাম দিলেন। আমাদের বলে গেলেন, খবরদার যেন
ওকে তাঁর মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু না ভাবা হয়। এখানে
সকলে জানেও তাই। আমি আর আমার মত আরও
হুঁজন পুরনো কর্মচারী আছেন, আমরা তিনজনই
জানতাম আসল ব্যাপার। বাকী সবাই জানে, মালিকের
মেয়ে কোনও পাহাড়ে ছিল এতদিন। সেখানে মিশনা-
ব্রিদের স্কুলে লেখাপড়া করছিল। লেখাপড়া শেষ হোয়ে

গেল বলে মালিক তাকে এখানে আনিয়ে নিলেন।”

রক্ত কণ্ঠে প্রহেলিকা বলে উঠল—“সেই রক্ত আমরাও শুনেছিলাম মিশনারি জুলে লেখাপড়া শেখা মেয়ের সাজপোষাক চালচলন দেখে বেশ আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক যেন এক যোগিনী, কঠোর তপস্বী কন্যা এই জঙ্গলের মধ্যে একলা। এমন মনে হোয়েছিল দেখে যে বুকের ভেতরটা ছাঁক করে উঠেছিল।”

জগৎরাম হুঁটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—“সতী, সাক্ষাৎ ভগবতী। ছলনা করতে এসেছিলেন আমাদের। ছলনা করে চলে গেলেন। আমরা তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। মালিক যখন ফিরবেন, তখন কি নৈকিয়ৎ দোষ আমরা। কি তাঁকে বোঝাব?”

বুকের গলাটা ধরে এল। লম্বা লম্বা সাদা পল্লব ঢাকা টলটলে চোখ দুটো তুলে একবার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন।

জুশান্তর আর সন্তোষ হোল না। সতী ভগবতী ইত্যাদি গদগদ কণ্ঠে গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিল তার। বৈষ্ণবিত্তে গৌণে মাছ জলের ওপর পর্যন্ত উঠে নিম্নের পরিচয় প্রদান করার পরে যদি বৈষ্ণব থেকে ঠোট খুলে নিয়ে সরে পড়ে, তখন যেমন মনের অবস্থা হয় পাকা মেছুড়ের, তেমনি মনের অবস্থা হোয়ে উঠেছে জুশান্তর। দম্ভমত্ত খিঁচিয়ে উঠল সে। টেবিলের উপর এক চাপড় মেরে বলল—“ও সব ভাল ভাল কথা এখন রাখুন জগৎরাম বাবু। স্পষ্ট করে বলে ফেলুন, কবে চলে গেল এখান থেকে। আস্ত একটা মাছ য’ত আর সত্যিই হাওয়ায় মিশে যেতে পারে না। হাওয়ায় যদি মিশে গিয়ে থাকে তবে তার প্রাপ্যই মিশেছে। লাশটা গেল কোথায়? লাশটা লোপাট হোয়ে গেল শুনেছে কে? যত বড় সতী ভগবতী হোক সে, লাশ স্তব্ধ অস্তর্য্যান করেছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে মনে করেন? কাজেই সোজা সত্যি কথাটা শুনিয়ে দিন এবার, কবে সে গেল? যাবার কারণটা কি ঘটল? একটা মাছ য’ত উধাও হোয়ে গেল, আর আপনারা চূপ করে রইলেন, একদম খোঁজা-খুঁজি করলেন না, এ কি কখনও হোতে পারে।”

জগৎরাম সোজা হোয়ে বসেছেন তখন, তাঁর চোখের স্পষ্ট দৃষ্টি

কেমন যেন পালটে গেল হঠাৎ। যে মুখের ওপর রক্ত বিবাদের ছায়া ছিল এতক্ষণ, এবার সেই মুখেই এমন কয়েকটি রেখা জুটে উঠল, যাতে আসল মানুষটির পরিচয় বুঝতে কারও একটু কষ্ট হোয় না। বেশ ধীরে যুগ্মে ওঠান করে বলতে লাগলেন তিনি—“হাঁ, বাবুজী, খোঁজা-খুঁজি ত’ নিশ্চয়ই করেছিলাম আমরা। আমাদের যা কর উচিত ছিল, সবই করা হোয়েছে। তা’ যদি না করতাম, তা’হলে মালিকের সামনে কৈফিয়ৎ দিতাম কি। যার নিমক খাই, তাঁর কাছে জবাব দিতে হবে ত’।”

“সেইটুকুই বলে ফেলুন না দয়া করে।” ভেংচে ইঁদল জুশান্ত। মুখটা কিছুভুক্তিমাকার করে বললেন—“সেইটুকু বললেই আমরা বর্তে যাই। সেই সকাল থেকে কভ কিটুই শুনলাম। এসে পর্যন্ত দেখছি, আপনারা স্নেহে মুখান হোয়ে আছেন। কিন্তু আসল কথাটা কিম্বো আমাদের কাছে ভাঙছেন না। এখন দয়া করে সেইটুকুই বলে ফেলুন, কখন সে গেল, কবে গেল, যাবার পরে আপনারা খোঁজাখুঁজি করে কি জানতে পারলেন। আপনারা যা জানতে পেরেছেন, সেইটুকু আমাদের জানিয়ে দিন। তারপর আমরা কিছু করতে পারি কিনা দেবি।” কয়েক মুহূর্ত চূপ করে রইলেন জগৎরাম। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বললেন—“দে উপায় নেই বাবুজী। মালিকের হুকুম না পেলে আর কোনও কণ্ঠই বলতে পারব না। মালিককে সংবাদ জানানো হোয়েছে, তিনি আসছেন। দয়া করে একটা হুঁটো দিন আপনারা থেকে যান এখানে। মালিক এসে পৌঁছেই সব ফরমালা হোয়ে যাবে।”

“তার আগেও হোতে পারে।” গভীর ঘরে কথা কটা অ’ওড়ে খাড়া হোয়ে উঠল জুশান্ত। প্রহেলিকার দিকে তাকিয়ে বলল—“চলুন এখন। এখানে আর দেবী করা অনর্থক। থানা একটা নিশ্চয়ই আছে এখানে। সেখানে জানিয়ে দিয়ে সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে হবে।



শহর কেখায় কে জানে।
যেখানেই হোক, খানায়
জিজ্ঞাসা করলে ম্যাজি-
স্ট্রেটের খোঁজ পাওয়া যাবেই। চলুন, বড তাকাতাড়ি
সম্ভব এ কাজগুলো সেরে ফেলা চাই।”

অশান্তর তাকাতাড়ি লাগানো একেবারে বিফল হোল। পুরুষোত্তম
বা প্রহেলিকা মুখ ভুলেও তাকালো না। জগৎরাম বাবু
অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠলেন শুধু। হালিমাখা
হালকা অয়েই বলে উঠলেন—“তা’ ত’ হবার উপায়
নেই বাবুজী। মালিকের সে রকম হুকুম নেই যে। এই
খামারে যখন দয়া করে এসেছেন আপনারা, তখন হু’দিন
এখানে বিশ্রাম করে যেতেই হবে। আসাটা যেমন
আপনাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর কবেছে, যাওয়াটা তেমনি
এখানকার মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করছে। থাকুন
দয়া করে হু’টো দিন। আমাদের সমাজ সামর্থ্য উপযুক্ত
খাতির যত্ন করতে পারব না। আপনাদের কষ্ট হবে
থাকতে। তাতে আর কি, কষ্ট করতাই ত’ বেরিয়েছেন।
হু’টো দিন কষ্ট করে থেকে যান।”

অশান্ত আবার কি বলতে থাকিল ভেড়ে, তড়াক করে
উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দিল প্রহেলিকা। জগৎরাম
বাবুর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল—
“তা’হলে আমরা এখন যেতে পারছি না? মানে যদি
আমরা যেতে চাই, আপনারা বাধা দেবেন?”

জগৎরামও উঠে দাঁড়ালেন। তত্ত্বলোক একেবারে বিনয়ের
অবতায়। জোড় হাত করে বার বার মাথা নাড়িয়ে
বললেন—“ছি ছি ছি, সে কি কথা! আপনাদের বাধা
দেওয়া হবে কেন? কিন্তু আপনাদের গাড়ীটা যে
কারখানায় নিয়ে গেল। বলকাতা থেকে এতটা পথ
এসেছে গাড়ী, তেল জল দেওয়া চাই ত’। আপনাদের
ড্রাইভার, কি যেন নাম তার। হাঁ হাঁ—মুনসী। মুনসীই
নিয়ে গেছে কারখানায়। খামারেই কারখানা আছে কি না।
মাটি কাটার যন্ত্র কল্প সমস্ত সেখানে মেরামত হয়। ভাল
মেক্যানিক আছে। কোনও ভয় নেই, গাড়ীর কিছু
হবে না। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। দেখি খোঁজ নিয়ে,

আপনাদের গাড়ীর কতদূর কি হোল। আপনারা দয়া
করে আন-টান করে বিছা মুখে দিন তত্ত্বকণ। মুনসীকে
পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। তার কাঁছেই খোঁজ পাবেন সব।”
হৃদয়স্ত হোয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সত্যিই তত্ত্বলোকের
মাজাজান আছে।

অল্পবিস্তর মাজাজান তখন অশান্তর মগজেও জগৎগ্রহণ
করেছে। আর একটা কথাও না বলে জগৎ দৃষ্টিতে
সে একবার তাকাল বজ্র দিকে। তারপর চোখ বুজে
স্থির হয়ে বসে রইল চেয়ারে। যেন একটি খানী বৃদ্ধ।
চরাচর বিশ্বের চরম দুর্গতিটুকু মর্মে মর্মে অহুভব করে
মোহ থেকে মুক্তি পাবার উপায় খুঁজছে।

পাশেই বসে রয়েছে পুরুষোত্তম। নিজের কোঙ্গের ওপর
নজর রেখে এমন ভাবে বসে আছে, যেন সে কিছু
শুনতেও পারনি, বুঝতেও পারেনি। কিছুতেই কিছু যায়
আসে না যেন তার। চেয়ারটিতে চিরকালের মত ঐ
ভাবে বসে থাকতে পারলেই যেন সে চরম নিষ্কৃতি
পায়। ছোট্টাছুটি খোঁজাখুঁজি শেষ হোয়ে গেছে। যার
জন্যে ছোট্টাছুটি, তাকে পাওয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে।
পাওয়ার পরে জুড়িয়ে গেছে সব উদ্বেজনা, ফুরিয়ে গেছে
উত্তম। মাহুঘটা নিজেও যেন ফুরিয়ে গেছে। আসল
মাহুঘটাই যেন অতপস্থিত, শুধু খোলাটা খাড়া হোয়ে
মাথা হেঁট করে বসে আছে চেয়ারে।

তারপর প্রহেলিকা। তখনও সে দাঁড়িয়ে আছে দরবার
দিকে তাকিয়ে, যে দরজা দিয়ে জগৎরাম পাশা অভিনেতার
মত সটিক মাজায় পা ফেলে নিজস্ব হোয়ে গেলেন।
প্রহেলিকা যে কি ভাবছে, তা’ তার মুখ দেখে বোঝবার
উপায় নেই। রাগ শেষ হতাশা অপমান কিছুই ফুটে ওঠেনি
তার চোখে মুখে। ভাবাগাকা খেয়ে গেছে সে, একথা
বললেও ঠিক বলা হবে না। বরং বলা চলে হঠাৎ
ব্যাপারটার নার্টকীয় পরিণতি ঘটতে দেখে সে বেশ মুগ্ধ
হোয়ে গেছে।

দেওয়াল ঘড়িটার টিকটিক আওয়াজ ছাড়া ঘরখানার মধ্যে
আর এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। ঘড়ির আওয়াজটা যেন
সুস্থ ঘরখানার হৃৎপিণ্ডের শব্দ। অনেকক্ষণ কান পেতে

গুনলে পুরুষোত্তম। তারপর মুখ তুলে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হোল, ঘড়িটা যেন একটা অ্যান্ড প্রাণী। প্রাণীটা স্পষ্ট তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি যেন বলতে চাচ্ছে টিকটিক করে, ভাষাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভাষাটা বুঝতে পারলে অনেক কিছু জানা সম্ভব হোত। ঐ ঘড়িটাই ছিল এই ঘরে তার একমাত্র সংগী। দিবারাজ অষ্টগ্রহর সজাগ থেকে ঐ ঘড়ি দেখেছে, একলা এই ঘরখানার মধ্যে কি করত সে, কি নিয়ে ভুলে ছিল, কি করে বোঝাপড়া করত নিজের সংগে। এমন কি ঘটল যে আর পারলে না নিজেকে নিয়ে ভুলে থাকতে এই ঘরে, ঐ ঘড়িটা বলে দিতে পারে। পালাবার নিশ্চয়ই একটা উপলক্ষ ছিল, সেই উপলক্ষটাও ঐ ঘড়িই জানে।

খর-র-র-র টং খর-র-র টং বাজতে শুরু করলে হঠাৎ ঘড়িটা। এগার বার টং করবার পর খর-র-র-র করা বন্ধ হোল। সংগে সংগে মুখ তুলে তাকালো সুশান্ত। একান্ত ভাল মাহুঘের মত স্বর টেনে টেনে বলতে লাগল—“নগদ দশ হাজার টাকা আর এতগুলো সোনার গয়না, সব নিয়ে বাও। শুধু জানতে চেও না, কোথায় গেল আন্ত একটা রক্ত মাংসের মাহুঘ। বিশ্বাস কর, সে দেবী ছিল, ভগবতী ছিল, সাক্ষাৎ সত্যী ছিল। ছলনা করতে এগেছিল, ছলনা করার সখ মিটে যাবার পরে শরীরে অস্তর্ধান করেছে। যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে চমৎকার বন্দোবস্ত করেছিল। টাকা গয়নার লোভ সামলে হঠাৎ লাশটার কথা উত্থাপন করতেই বস্তার ভেতর থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। সহজে পরিজ্ঞাণ আর পাচ্ছি না আমরা এখান থেকে। এরপর টাকার পরিমাণটা বোধহয় ভুল করে দেওয়া হবে। টাকাটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের লিখে দিয়ে যেতে হবে পুরুষোত্তমের অ্যান্ড বউটাকে আমরা সংগে নিয়ে ফিরে চললাম। ব্যস তা’হলেই সব দিক রক্ষা পাবে। অতগুলো টাকা আর এতগুলো গয়না পাবার পরেও কি বেরাড়াপনা করতে আছে—ছিঃ।”

শেষ হোল সুশান্তর স্পষ্ট উচ্চারণের স্বগতোক্তি। সংগে সংগে বাহবা দিয়ে উঠল প্রহেলিকা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে

বলে উঠল—“বাঃ বাঃ বেশ। একদম ডিটেক্টিভ উপস্থাপন হোয়ে

দাঁড়াচ্ছে। ইস্—এই না হোলে রহস্য উদ্ঘাটন। এরপর বাকী থাকছে একটি সূত্র আবিষ্কার করা, তারপর অপরাধীকে পাকড়াও করা। ব্যস একদম থাকে বলে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দার দুর্জয়-অভিধান। নাও তাই, এইবার চটপট তোমার সূত্র আবিষ্কার করে ফেলে অপরাধীকে ধরে নিয়ে ফিরে চল। সবাই যখন বুঝতে পেরেছে, তখন আর খামকা আমাদের জালাচ্ছ কেন। এগারটা বেজে গেল এখানে, আর কতক্ষণ জ্ঞান টান না করে বলে থাকব?”

কাটা ঘায়ে ছনের ছিটে। মুখ ঘুরিয়ে প্রহেলিকার দিকে তাকালো সুশান্ত। এমন ভাবে তাকালো যে, সত্যিকারের আগুন চোখে থাকলে বেচারী ভস্মীভূত হোত নির্ধাত। বরাত জোরে রক্ষা পেয়ে গেল সে যাত্রা, পেয়ে বেড়ে গেল সাহস। আচম্বিতে হাসি ছুড়ে দিলে। হাসি ত’ নয়, যেন ঘূর্ণী বাতাস হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে তোলপার লাগিয়ে দিলে। চমকে উঠল পুরুষোত্তম, এমন অদ্ভুত জাঁভের হাসির সংগে কামিনীকালে পরিচয় ঘটেনি তার। হাসি ফুটে ওঠে মাহুঘের মুখে চোখে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে হৈ হটগোল হয়। হাসির প্রকোপে নানা রকমের হাস্যকর অঙ্গ-ভঙ্গীও দেখা দেয়। কিন্তু এ একেবারে অস্ত্র জাঁভের জিনিষ। মস্ত বড় একটা জলের ট্যাঙ্ক কৈসে গেল যেন হঠাৎ। স্বচ্ছ জলরাশি ফুলে ফেঁপে চতুর্দিক ভাসিয়ে নিয়ে ছুটে চলল। তাও ঠিক নয়, হাসিটা যেন কমলা রঙের আলো, সারা শরীরের ভেতর থেকে ফুটে বেরচ্ছে। সেই আলোর ছোয়া পেয়ে পুরুষোত্তমের মনের আঁধার ক্রমেই ফিকে হোয়ে উঠতে লাগল। হতভম্ব হোয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, ফলে সেই ছোয়াচে-হাসি তাকেও পেয়ে বসল। শেষ পর্যন্ত হেসে কেলতে বাধ্য হোল পুরুষোত্তম। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—“কি হোল। হঠাৎ এত হাসি যে?”





“হাসব না! বলেন কি।”
হাসি ভুলে গিয়ে ভয়ানক
তাঁজ ব ব নে গেল

প্রহেলিকা। দুই চোখ গোল করে গালে হাত দিয়ে বলতে লাগল—“এমন ব্যাপারেও হাসতে পাব না। কি কাণ্ড যে বাপু! জাহাঁবাজ মেয়ে বটে বাবা একখানি! কোথায় হোতে চলেছিল আপনার মত ভালমাহুষ ভদ্রলোকের লক্ষ্মী বউটি, হোয়ে দাঁড়াল দুর্দান্ত গোয়েন্দা উপক্ৰাসের রহস্যময়ী নায়িকা। এইবার ডুবটি মেয়ে একটা বাজের মত কাজ করেছে। নানুন এখন তুর্কিনাচন এখানকার এই চাষারা। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে প্রাণ বাঁচানো, নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেওয়া, এক পাল মাহুষকে হুকুম জামিল করতে লাগানো, চাষাড়ে কাণ্ডকারখানা আর কাকে বলে! হাড়ে হাড়ে মালুম হবে এখন মজাটা, কালসাপ কুড়িয়ে নিয়ে এসে দুখ কলা দিয়ে পোবার মজাটা এবার বুঝবে।”

বিচিত্র স্বরে বিচিত্র চণ্ডে বলা হোল কথাগুলো, সত্যিই যেন এমন মজার ব্যাপার সচরাচর ঘটে না। সর্বজনীন মনোহারিণী সকলের চেয়ে সুখোড় অভিনেত্রীর গলার কারদায় খুঁত থাকতে পারে না, মজার কথা মজার রসে টুগটুসে হবেই। কিন্তু জ্যোতা দু’জনের কাছে রসটা কেমন যেন বিজী তেতো বলে মনে হোল। জাহাঁবাজ মেয়ে, তুর্কিনাচন, দুখ কলা দিয়ে কালসাপ পোবা, এই সব বাক্যগুলোর ধর্ম হচ্ছে, যে শোনে তার মর্মে হল ফোটানো। হলের বিষটুকু মুখ টিপে সহ্য করা সহজ কথা নয়। সুশাস্ত কিন্তু সহ্য করল, একটি বাক্যও সে উচ্চারণ করল না। সিনেমা ষ্টুডিওর গর্ভে যাকে দিনরাত কাজ করতে হয়, তার কান বহুকেমের সংলাপ শোনার অভ্যস্ত হোয়ে ওঠে। সংলাপের জাত বিচার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালো না সে, প্রহেলিকার সংলাপে প্রহেলিকা থাকবেই। সেই প্রহেলিকার আড়ালে কি জাতের মতলব লুকিয়ে আছে, সেইটুকু ধরাই আসল কাজ। সুশাস্ত সেই আসল কাজে আত্মনিয়োগ করল। বহু পুরুষোত্তম কিন্তু খাবড়ে গেল। অতবড়

অভিনেত্রী, বীর যশ সম্মান মর্যাদা গগনচুম্বী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ এমন খিমচি-কাটা খেলো ভাষা বেরতে পারে, এ যে ধারণারও অতীত। পুরুষোত্তমের মনে পড়ে গেল সেই মহিলাটিকে, বীর দিকে নজর পড়ার সংগে সংগে দম্ভরমত তটস্থ হোয়ে উঠেছিল সে। শিক্ষা সংস্কৃতি অভিজাত্য, তার সংগে আত্মপ্রত্যয়ের অনির্বচনীয় অর্থগা সিন্ধু জ্যোতির মত ঘিরেছিল মহিলাটিকে। পরিচয় না পেলে বোঝবারই উপায় ছিলনা যে, পেশাদার অভিনেত্রী প্রহেলিকা দেবীর সংগে সামনা সামনি কথা বলার স্বযোগ ঘটল তার ভাগ্যে। তারপর থেকে কত রকমের রূপ পরিবর্তনই না তাকে দেখতে হোল! কিন্তু সস্তা জাতের খাদ মেশানো গায়ে-পড়া নোংরা হাবভাব একটি বাতের জলেও প্রকাশ পায়নি। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল আসল চেহারা, ভোজবাজির মত উখাও হোয়ে গেল আভিজাত্যের মহিমা, জুজুর ভংগিমায় ঠোঁটের ঠসকে কর্তের কারসাজিতে যা আহির হোল, তাতে নেহাত বেহারারও গা ঘিনঘিন না করে পায়ে না। যেমটা লুকতে পারল না পুরুষোত্তম, পালটে গেল তার চোখ মুখের চেহারা। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করল গলার স্বরটিকে মোলারেম রাখতে। চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল—“কি করে বুঝলেন, নে গা ঢাকা দিয়েছে? এঁদের ক্যানাদে কেলার কন্দি বরেছে সে, জানলেন কেমন করে?”

“কেমন করে জানলাম! ও মা গো! আমি বুঝি মেয়ে মাহুষ নই!” হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল প্রহেলিকা। চেয়ারে বসে ছিল তাই রক্ষে, পাশে বসে থাকলে নির্ধাৎ গায়ের ওপর চলে পড়ত। ঢলা-ঢলির বাকীও রাখলে না কিছু, অতিরিক্ত আহুরেপানার চোটে সমস্ত শরীরটাই কেমন যেন গলে গেল। বেশ বসে আলুথালু হোয়ে উঠল, চোখের চাউনিতে ফুটে উঠল ভয়ানক হড়হড়ে গোছেয় একটা ভয়ঙ্গী। বোল আনা মেয়ে মাহুষ কাকে বলে, তার পরিচয় দেবার জন্তে একেবারে মরিয়া হোয়ে উঠল যেন।

চমকে উঠল হুশান্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে রইল প্রহেলিকার দিকে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—“আরে তাই ত’! এ দিকটা ত’ মোটে খেয়াল করিনি। সবই সম্ভব, নিশ্চয়ই তাও ঘটে যেতে পারে। মেয়েমানুষ ত’, মেয়েমানুষের ষারা কি না ঘটতে পারে।”

ওঠে দাঁড়াল পুরুষোত্তমও। বজ্রমুষ্টিতে খামচে ধরল প্রশান্তর ঠাণ্ডা। হিসহিস করে উচ্চারণ করল—“কি সম্ভব? কি ঘটতে পারে মেয়েমানুষের ষারা? স্পষ্ট করে খুলে বল বলছি, হেঁয়ালির নিকৃতি করেছে—”

তোতলাড়ে লাগল হুশান্ত—“আ-আ-আ-আমি—”। হঠাৎ ভয় পেয়ে চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হোল।

হাসি বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল প্রহেলিকারও। ব্যাপারটা এতদূর গভাবে আন্ধান করতে পারেনি সে। মুহূর্ত মধ্যে তার চেহারাটাই পালটে গেল। কাপড় চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, চোখে মুখে কোথাও আর ছিটে কোঁটা তরলতার চিহ্ন নেই। একান্ত নিরুৎসাহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—“আপনার বউটির মন বলে একটা জিনিষ আছে, এটা ত’ আপনি মানবেন পুরুষোত্তম বাবু?”

হুশান্তকে ছেড়ে দিয়ে খুঁরে দাঁড়াল পুরুষোত্তম। অবাক না দিয়ে আরও কিছু শোনার আশায় মুখিয়ে রইল। ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে ওর মারমুখে ভাবটাবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হিমশীতল কণ্ঠে বলতে লাগল প্রহেলিকা—“মেয়েমানুষের মনকে কাবু করতে হোলে গায়ের জোর ছাড়াও অনেক কিছুই দরকার হয় পুরুষোত্তম বাবু। আপনার গায়ের জোরের পরিচয় বিয়ের পয় দিনই সে পেয়েছে। তাতে তার মন ভরে নি। তাই সে প্রাণের মারা ত্যাগ করে আপনার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে। তারপর হয়ত এমন মানুষের নাগাল পেয়েছে এখানে, যে মেয়েমানুষকেও মানুষ বলে মনে করে, মেয়ে-মানুষের মন বলে একটা পদার্থ আছে তা’ জানে, শুধু গায়ের জোর দেখিয়ে তাকে—”

“চুপ” বজ্রাঘাত তুল্য একটা আওয়াজ হোল হঠাৎ, সংগে

সংগে দড়াম করে আছড়ে পড়ল চেয়ারখানা পুরুষোত্তমের পেছন থেকে।

পরমুহূর্তে চেয়ার ভিত্তি দিয়ে ছিটকে পড়ল সে দরজায় সামনে। তারপর ছুট, চোপের পলক ফেলবার আগেই বদন্ত হোয়ে গেল।

ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়, এমন তাবে বোবা হোয়ে গেল। ঘরখানা। ঘড়ির টিকটিকনি পৰ্ব্বত যেন তলিয়ে গেল স্তম্ভতার মধ্যে। নিবের্ট পাখান খোদাই করা দু’টো মূর্তি দাঁড়িয়ে রইল টেবিলের এপাশে ওপাশে একটার মধ্যে পুরুষের মন অপরটার মধ্যে মেয়েমানুষের মন ভেঙ্গে রইল না ঘুমিয়ে পড়ল, বোম্ববার উপায় রইল না। অ্যা-লিউমিনিয়ামের পুরু চাঁদর দিয়ে তৈরি স্ট্রটকেস ধরনের একটা বাজর তালী খোলা অবস্থায় পড়ে রইল টেবিলের মাঝখানে, তার চার পাশে ছড়ানো রইল রাশীকৃত সেনার গয়না। গয়নাগুলো নিশ্চেষ্ট মুখ তেংচে ছুঁই হাসি হাসতে লাগল, সে হাসির অর্থ বোম্ববার জন্তে কেউ তাদের দিকে কিরেও তাকাল না।

দরজার বাইরে অল্প একটু গলা ধাঁকারির আওয়াজ শোনা গেল। আধ মিনিট পরে মুনসীর লম্বা শরীর চৌকট পার হোয়ে সটান খাড়া হোয়ে রইল। তার ডানদিক দামী মেয়েমানুষ-মনিবের তজ্জা ভাঙল তখন, চেখ তুলে চাইল তার দিকে। দম দেওয়া কলের মত গড়গড় করে বলতে লাগল মুনসী তার বক্তব্য। বক্তব্য তার নয়, খামারের ম্যানেজার খোদ অগংরাম বাবুর। তিনি মুনসীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, খামারের অফিস সংলগ্ন অতিথিশালায় অতিথিদের আরাম বিরামের যথোচিত ব্যবস্থা করা হোয়েছে। অনেকটা বেলাও হোয়ে গেছে, অতিথিরা দয়া করে অতিথিশালায় পদার্পণ করে আন অহার সমাধা করে বিজ্ঞাপন করুন। যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে গাড়ীখানা ভাড়াভাড়ি দৌড়বার শক্তি ফিরে পায়। আশা করা যায়, চব্বিশ ঘণ্টাও লাগবে না গাড়ী



কলকাতার দিকে রওনা
হবে।

রা ফুটল শেষ পৰ্যন্ত

মুনসীর মনিবের মুখে। কতকটা যেন অসম্মত ভাবে জিজ্ঞাসা
করলেন তিনি—“কি হয়েছে গাড়ীর? কই, আসবার
সময় কোনও গোলমাল টের পাওয়া গেল না?”

মুনসীর গলায় দ্বন্দ্ব একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল। তার
ঝাঁজালো স্ববাব তনে জানা গেল, গাড়ীর কিছুই হয়
নি। গাড়ী নিয়ে বসেছিল সে অফিসের সামনে। ছ’জন

বড় দরের অফিসার এসে চড়ে বসলেন গাড়ীতে। বললেন,
নিয়ে চল গাড়ী এখানকার কারখানায়। গাড়ী ধোয়া

মোছা হবে, দেখেও আসবে কত বড় গায়েজ আছে
এখানে। কি আর করে তখন মুনসী, নিয়ে গেল গাড়ী

গ্যারেজে। সে এক ইলাহী ব্যাপার। কত গাড়ী কত
ট্রাক কত রকমের মাটি কাটাব যন্ত্র যে আছে ধামারে,

তা’ গুণে শেষ করা যায় না। মস্ত বড় কারখানায়
পঞ্জাবী গুজরাটী মাল্জাভী মিক্যানিকরা কাজ করছে।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কারখানাটা
মুনসী, এক পঞ্জাবী তাকে সব বুঝিয়ে দেবার প্রস্ত

সঙ্গে রইল। কারখানা দেখে গাড়ীর ঝাঁজ নিতে
গিয়ে তার চক্ষু স্থির হবার জোগাড়। সেখানকার

সাহেবটা গাড়ীর সমস্ত কলকজা খুলে ফেলে ভেলে
ডুবিয়ে রেখেছে। বললে, দেখ না তোমার গাড়ীকে

কেমন করে দি। ছ’বছর আর কোনও মিজীকে হাত
ছোঁয়াতে হবে না গাড়ীর গায়ে। কি আর করে তখন

মুনসী, ফিরে এল আবার অফিসে। মানেজার জগৎরাম
বাবু তাকে ডেকে বললেন, “ধাবড়ার দরকার নেই।

ছ’দিন যখন থাকছেন তোমার মনিবরা, তখন গাড়ীখানা
ভাল করে দেখে গুনে দিক।” তারপর তাকে হুকুম

গাড়ীও এসে গেছে। আমাকে ভাড়াভাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে
জগৎরাম বাবু একজনকে গাড়ী নিয়ে আসতে বললেন।

অফিস ত’ কম দূর নয়, গাড়ীতে না গেলে যোদে
আপনাদের কষ্ট হবে।”

মুখ তুলে অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করল প্রহেলিকা—
“কিন্তু পুরুষোত্তম বাবু। তাঁকে না নিয়ে আমরা যাই

কেমন করে।” মুনসী বলল—“তিনি সেখানেই চলে
যাবেন। আমি যে সাইকেলে আসছিলাম, সেই সাইকেলেই

তিনি গেছেন পোষ্ট অফিসে।
এক রকম ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে

বললেন—সাইকেলটা দাও ত’ একবার মুনসী, পোষ্ট
অফিস থেকে ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমাকেই

বলুন না কি করতে হবে, আমিই যাচ্ছি পোষ্ট
অফিসে। বাবু শুনলেন না, বললেন, পোষ্ট অফিস

নাকি আমি খুঁজে পাব না। তাঁর একটা তার করতে
হবে, খুবই জরুরী তার। খুব ভাড়াভাড়ি করা চাই।

তাঁকে সাইকেল দিয়ে বলে দিয়েছি, পোষ্ট অফিস
থেকে অফিসে যেতে। আপনারা যে অভিযিশালায়

থাকবেন, তা’ তাঁকে বলে দিয়েছি।”
হী স্বরল স্রুশাস্ত্র কি বলবার প্রস্ত, জগৎরাম বাবু

সম্মুখেরে আবিস্কৃত হোলেন মুনসীর পেছনে। অসম্মিক
সৌজন্তের সাকার মূর্তিটি যেন, সাদা গৌরব দাড়ির

তেতর থেকে নিখুঁত হাসিটি চমৎকার ভাবে ফুটে
বেকছে। তাঁকে দেখেই প্রহেলিকা ব্যস্ত হোয়ে বলে

উঠল—“এই বা! আপনি এখানে এসে পড়লেন।
পুরুষোত্তম বাবু এতক্ষণে আপনার ওখানে গিয়ে বসে

আছেন।”
ধতমত খেয়ে গেলেন জগৎরাম। ঘরের মধ্যে চতুর্দিকে

আচ্ছা ক্যাসাদ বটে ত! মুনসী বলছে, আমার গাড়ীখানাও নাকি খুলে ফেলা হয়েছে। খুব ভাল কথা, যতদিন থাকতে হয় থাকছি না হয় আমরা। তা' বলে গয়না গাঁটি পাহারা দিতে পারব না। এই কথাই আপনাকে জানাতে গেছেন পুরুষোত্তম বাবু।" একটুখানি সময় চুপ করে তাকিয়ে রইলেন জগৎরাম অভিনেত্রীর চোখের দিকে। তাঁর মত ঘাগী মালুবে। সাধ্য হোল না চোখ দেখে কিছু ঠাহর করবার। অগত্যা নিজের দাড়ির মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে অন্তমনস্ক হোয়ে বললেন—"খাতুক ওখানেই গয়নাগুলো, এখানে লোক আছে সাজিয়ে তুলে রাখবে। আপনারা আছেন, অনেক দেরি হোয়ে গেল। ওদারে পুরুষোত্তমবাবুজীও বসে আছেন।" হুশাস্ত মিনমিন করে বলতে গেল "গয়নাগুলো একবার মিলিয়ে নিয়ে—"

জগৎরাম পেছন কিরেছেন তখন। বললেন—"চলে আসুন, মিলিয়ে নেবার দরকার করবে না।

॥ দশ ॥

মিলিয়ে নেওয়া মানে হিসেব মিলনো। সব সময় সব হিসেব কি মিলতে পারে কেউ! হিসেব করে কে কটা কাজ করে জীবনে। হিসেব করে পা ফেলতে পারে যারা, তাদের কখনও হিসেব মেলাবার জন্তে গৌজামিল খুঁজে মরতে হয় না। পুরুষোত্তম হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছিল। কেন সে হঠাৎ পালিয়ে এল, তার সঠিক জবাব পাওয়া চাই। জবাবটি পেলেই হিসেবটি ঠিকঠাক মিলে যায়। যখন সে চেয়ারখানা উলটে ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তখন কি তার মনে পালিয়ে আসবার মতলব ছিল। কখনোই নয়, কিছুতেই নয়, পালাবার চিন্তা দূরে থাক, নিজের চিন্তাটাও তখন উধাও হোয়ে গিয়েছিল মাথার ভেতর থেকে। অসহ্য রাগে স্টেটে যাবার উপক্রম হোয়েছিল ব্রহ্মরক্ষুটা, রাগটা সামলাতে

না পেরে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে। বেরিয়ে পড়েছিল বলেই

রক্ষে, নয়ত যা-তা কাণ্ড হোয়ে যেতে পারত। বেন অমন ভাকের রাগটা হোতে গেল!

আর একটা জাল হিসেবের মধ্যে পড়ে গেল পুরুষোত্তম। খুঁজতে লাগল রাগ হবার কারণটা। কোনও কারণই নেই, একেবারে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অভিনেত্রী প্রেহেলিকা যেমন খুশি হাসতে পারেন, কঁদতে পারেন, বিলী জাতের নেকামি করতে পারেন, তাতে পুরুষোত্তম নামক ভদ্রলোকের ছেলেটিই কি গেল এল? কোন অধিকারে প্রেহেলিকাকে শাসন করতে যার পুরুষোত্তম? তরানক বিপদে পড়ে গেছে একটা ভদ্রলোকের ছেলে, তার বউটা গেছে পালিয়ে। বিপদে সাহায্য করবার জন্তে দয়া কবে এগিয়ে এসেছে প্রেহেলিকা, এইটুকুই তার অপরাধ। সেই দয়ার প্রতিদান হোল তাকে শাসন করতে যাওয়া। তার চেয়ে ঢের জবজব বাপার হোল, যার বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এল, সেই লোকটাই নিজের প্রশ্ন নিয়ে পলাল। একটবার চিন্তাও করল না, কি উপায়ে ওরা উদ্ধার পাবে ওখান থেকে। কি অমাহবিক ব্যবহার!

বুকের ভেতরটা ক্রমেই অসাড় হোয়ে উঠতে লাগল পুরুষোত্তমের। একটার ওপর আর একটা ভদ্রকর নৌলমেনে হিসেব চেপে বসতে লাগল বুকের ভেতর। অধিকারের প্রশ্ন, নেমকহারামির প্রশ্ন, সেই খামার থেকে ভরা উদ্ধার পাবে কেমন করে সেই প্রশ্ন, আরও নানা রকমের প্রশ্ন চোখ লাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। জবাব দাও, জলদি জবাব দাও, কেন তুমি পালিয়ে আসতে গেলে?

কাঠ হোয়ে বসে রইল পুরুষোত্তম বেকির কোণে, মেল-ট্রেন ছ ছ শব্দে ছুটতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে তার হেঁচটা—দূরে গিয়ে পৌছেছে সেই খামার বাড়ী থেকে, মনটা কিন্তু সগান বেগে উগটে দিকে গিয়ে উপস্থিত হোলো সেই জায়গাটিতে, যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু



করেছিল। কি করছে
এখন তারা! স্বশাস্ত্রটাই
বা কি করছে! সত্যি-

কারের বন্ধু, বন্ধুর চেয়ে অনেক বেশী স্বশাস্ত্র। কি এমন
দায় পড়েছিল তার,—নিজেকে এই বিপদের সংগে জড়িয়ে
ফেলবার! হয়ত তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে,
হয়ত তাদের সেধান থেকে অস্ত্র কোথাও সরিয়ে ফেলা
হবে। তিনজনের মধ্যে একজন যখন পালিয়েছে, তখন
নিশ্চয়ই মস্ত বিপদ একটা ঘটিয়ে ছাড়বে। এই ভয়ে ওদের
দু'জনকে নিশ্চয়ই অস্ত্র কোথাও নিয়ে গেছে। তারপর যে
কি ভাগ্যে আছে ওদের, কে বলতে পারে।

ভোর হোয়ে গেল। থামল গাড়ী একবার। মুখ বাড়িয়ে
দেখল পুরুষোত্তম টেশনের নাম ডিহিরী-অন-শোন।
ডিহিরী-অন-শোন ছেড়ে কোথায় গিয়ে থামবে! ভাবতে
ভাবতে গাড়ী ছেড়ে দিল। আবার শুক্ক হোল হিসেব
মেলানো, হিসেব না করে সে পা বাড়িয়েছিল। কোথায়
যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছুই চিন্তা করেনি পা বাড়ানোর
সময়। ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে, ছুটেও ছিল
খানিকটা। হাঁ, বেশ মনে পড়ছে, প্রথমে খানিকটা
ছুটেই ছিল। ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল সেই বাড়ী থেকে।
সামনেই রাস্তা, রাস্তার উঠে বা দিকে ঘুরে আবার
ছুটেছিল। ঠিক ছোট্টা না হলেও ছোট্টার মতই বটে।
হঠাৎ মুনসী এসে উদয় হোল সাইকেল চড়ে। সাইকেল-
খানা দেখেই অস্ত্র মতলব গজাল মাথায়। চাইল
সাইকেলখানা মুনসীর কাছে, সংগে সংগে মুনসী দিয়ে
দিলে সাইকেল। চড়ে বসল সাইকেলে, তারপর আর
মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট করল না। সোজা সাইকেল চালিয়ে
খামারের জিসীমানা পার হোয়ে এল। একটি মাত্র
চিন্তা মাথায় ছিল তখন, ধরুক ব্যাটার কি করে ধরবে।
সাইকেল চড়ে বসবার পরেই কেমন যেন একটা জিদ
চেপে গেল যাচ্ছে। সেই জিদের বশে দিগ্বিদিক-
জ্ঞানশূন্য হোয়ে দিল দৌড়। বতরুণ না নামতে
বাধ্য হোয়েছিল সাইকেল থেকে, ততক্ষণ সমান বেগে
সাইকেল চালিয়েছিল। একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি

বা একটুও চিলে দেয়নি। যে পুরুষোত্তম বছরের পর বছর
চ্যাম্পিয়ন হোয়েছে সাইকেল রেসে, সে সাইকেলের ওপর
খাকলে তাকে ধরবে, এমন বান্দা কে আছে সেই খামারে,
তাই দেখবার ইচ্ছে হোয়ে ছিল। কিন্তু কোনও বান্দাই
পেছনে ত্যাগ করে এল না। বিপদ ঘটল আর এক দিক
থেকে। সাইকেল চালানোর উপায়ই আর রইল না, রাস্তা
ফুরিয়ে গেল। শুক্ক হোল ধুলোর সমুদ্র। এক হাঁটু ধুলোর
ভেতর সাইকেল চালান কোন চ্যাম্পিয়নের পক্ষেই
সম্ভব নয়।

তখন সেই সাইকেল ঠেলে ধুমোর সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা,
যার নাম অসাধ্য সাধন করার অস্ত্রে প্রাণপণ সাধনা।
পালানোর কথাটা তখনও একবার মনে হয়নি, শুধু একটা
উৎকট পৌত্তে পেয়ে বসেছিল। কিছুতেই ধরা দেওয়া হবে
না, হার মানবার পাত্র পুরুষোত্তম নয়। দেখা যাক, কি
করে ধরে পুরুষোত্তমকে।

শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হোল সাইকেলখানা, প্রয়োজন
ফুরিয়ে যাবার পর অনর্থক সেই বোঝা ঠেলে মারবার কোনও
অর্থ হয় না। তা'ছাড়া সোজা রাস্তায় না গিয়ে বন জঙ্গল
ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগলে নিজেকে লুকনোও হয়,
এই খেয়ালটা মাথায় এসে গেল হঠাৎ। আসা মাত্রই
সাইকেলখানাকে একটা ডোবার ভেতর নামিয়ে নিয়ে
চুকে পড়ল জঙ্গলে। সেই জঙ্গল পার হোতেই সন্ধ্যা হোয়ে
গেল। উঠল এসে রেল লাইনের ওপর। রেল লাইনের
দেখা পেয়ে অস্ত্র কিছু চিন্তা করার অবকাশই গেল।
টেশন কত দূরে, কতক্ষণ হাঁটলে টেশনে পৌছন যাবে,
টেশনে পৌছেই কোনও গাড়ী পাওয়া যাবে কিনা, টেশনে
কেউ ওত পেতে আছে কি না ধরে নিয়ে যাবার অস্ত্রে
ইত্যাদি হাজারো রকমের চিন্তার মাথা গরম হোয়ে উঠল।
সমানে হাঁটতে লাগল রেল লাইন ধরে। যে কোনও একটা
টেশনে পৌছন যাবেই রেল লাইন ধরে হাঁটলে। শেষ
পর্যন্ত দেখা গেল আলো, আলো দেখে হাতুড়ি শিটতে
লাগল বুকের ভেতর। টেশন ত' দেখা যাচ্ছে। ওখানে
গিয়ে পৌছলে, কি ঘটবে কপালে কে বলতে পারে! বিনা
বাধায় চড়তে পারলে হয় গাড়ীতে, তারপর দেখা যাবে,

পূর্বোক্তদের চুলের ভগা ছুঁতে কে পারে।

ঝাড়া চার ঘণ্টা লুকিয়ে বসে থাকতে হোল টেশনের পাশে একটা খাজের মধ্যে। টেশনে গিয়ে যে বসবে, সে উপায়ও ছিল না। তাঁরা কেউ ওত পেতে না থাকলেও, আর এক বিপদের ভয় ছিল। এমন টেশন যে একটা গ্যাসেস্কারও দেখা গেল না। দিনে হয়ত লোকজন জোটে, রাত এগারটার কার পরজ পড়েছে ঐ টেশনে এসে গাড়ীতে চড়বার। অজ পাড়ানী, চতুর্দিকে—পাঁচ ক্রোশের ভেতর লোকালয় নেই। এমন স্থানে যে টেশন, সে টেশনে রাত এগারটার গাড়ী ধরবার জন্তে অচেনা মানুষ একটা উপস্থিত হোলে সম্ভব হবারই কথা। তখন ঘেরার মুখে পড়তে হবেই। ঐ ঘেরার ভয়েই চারটে ঘণ্টা কাটাতে হোল মাটি কাটা খাদের ভেতর বসে। সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল মশার কামড়ে। তারপর গাড়ীর আলো দেখা গেল। তখন আবার আর এক দুর্ভাবনা, গাড়ীখানা থামবে কি না। সে দুর্ভাবনার অল্পকণ ভুগতে হোল, থামল গাড়ী, চড়ে বসল গাড়ীতে, গাড়ী ছেড়ে দিল। মুড়ি মুড়ি দিয়ে যে দু'জন লোক বসেছিল গাড়ীতে, তারা ফিরেও তাকাল না। তাকাবার তাদের দবকারও করল না, মিনিট দশেক টিকিয়ে টিকিয়ে চলে আবার যখন থামল গাড়ী, তখন তারা দু'জনও নেমে গেল। ব্যস, একেবারে একলা, ঘণ্টা তিনেক একলাই বসে রইল সেই গাড়ীতে। বার ছয় সাত থামল গাড়ীখানা, এমন সব টেশনে থামল, যেখানে না আছে লোকজন না আছে আলো। কোথায় বাচ্ছে, কোন গাড়ীতে চড়েছে, তা' মোটে বুঝতেই পারল না। সেই ডিন ঘণ্টা কেটে গেল ঘরা পড়ার হুঙ্কার। থামারের লোকলের পাল্লার পড়ার চেয়ে টিকিট চেকারের হাতে পড়ার ভয় ছিল বেশী। তারপর দেখা গেল মস্ত বড় টেশনের শত শত আলো। সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান হোল তখন, নিশ্চয়ই নাম ডাকওয়ালা জানা টেশন। ওখানে পৌছলেই বুঝতে পারা যাবে, কোথা থেকে কোথায়—পৌছে গেল। থামল গাড়ী, নেমে পড়ল গাড়ী থেকে। হাঁ, একেবারে চেনা টেশনই বটে—গয়া। জীবনে অন্ততঃ একশ বারেরও

বেশী গয়া টেশনের ওপর

দিয়ে যাওয়া আসা

করেছে। গয়াতে যখন

পৌছেছে, তখন, আর ভাবনা নেই। এই বার দেখা যাবে, কে তার কাছে এগতে পারে।

অঙ্গুষ্ঠান করে জানল, ঘণ্টাখানেক পরে দিল্লী-মেল আনছে। কোথা থেকে কোন লাইন দিয়ে এসে পৌছল নিশ্চয়, তাও জেনে নিল। পাটনা গয়া ব্রাঞ্চ লাইনের কোনও টেশনে গাড়ী চেপে বসেছিল। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন দু'ঘণ্টা দেড়িতে পৌছেছে। ঠিক সময় পৌছলে কলকাতার গাড়ীই ধরতে পারত।

চুলোয় বাক কলকাতা, এলাহাবাদের একখানা টিকিট কিনে তৈরী হোয়ে রইল। গাড়ী আসতে চড়ে বসে তবে নিশ্চিত হোল। বাক, এতক্ষণে নিস্তার পাওয়া গেল।

তারপর সে গাড়ীও ছাড়ল। নিস্তার পাবার পরে নিশ্চিত হোয়ে বসে যেই বুজল দু'চোখ, অমনি রাজ্যের হিসেব-পত্র সামনে এসে হাজির হোল। হিসাব মেলাতে হবে। কেন সে পালিয়ে এল? কুশাস্ত আর প্রহেলিক: কি অপরাধ করেছিল যে তাদের কেলে সে পালিয়ে এল? কার জন্তে ওরা দু'জন ঐ বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল? কেন পালিয়ে এল সে নিজের প্রাণ নিয়ে? কেন?

জবাব নেই।

কোজামিল নিয়ে হিসেব মেলাবারও উপায় নেই। হিসেব না করে পা বাড়ালে এই অবস্থাই হয়, নিজের মাজের হিসেব নিজে কেই দিতে পারা যায় না।

পালিয়ে এসেছে শুধু পালাবার উদ্দেশ্যেই হোয়ে, এটা কি একটা জবাব হোতে পারে! একটা জবাব অবশ্য খাড়া করা যায়। যখন বুঝতে পারল, ওখানে থাকবার আর প্রয়োজন নেই, তখন—চলে এসেছে। থামাকা—আর ওখানে আটকে থেকে লাভ কি হোত।

ওখান থেকে পালিয়ে এসেই বা কি লাভ হচ্ছে? যার জন্তে গিয়েছিল সেখানে, তাকে না দেখতে পেয়েই চলে



এসেছে। খুবই ভাল
কথা। কিন্তু—ও খান
থেকে নিজে উদ্ধার পেয়ে

এসে এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে? যাকে পাবার
জন্তে এত কাঁড়, তার জন্তে এবার সে কি করবে?

আকাশ পাতাল তাবনা। তাবনার কোনও কুলকিনারা
নেই। একটা কেন-র অবাবও পাওয়া যায় না।

ফাঁপরে পড়ে গেল বেচারী পুরুষোত্তম। হঠাৎ এক সময়
আবার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। এবার নিজের
ওপর। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোখ বুজে তাকিয়ে রইল
সে পুরুষোত্তম লোকটার দিকে। হতভাগা লোকটা চায়
কি! লজ্জা নেই, ঘোরা নেই, ছাংলা কুকুরের মত লকলকে
জিত্ত বার করে ছুটে মরছে কিসের জন্তে? ছুনিয়া স্বয়ং
মাছুষ কি তাবছে এই ছাংলাপনা দেখে? কিছুতেই
আক্কেস হচ্ছে না, কিছুতেই নেশা কাটছে না, কিছুতেই
আলস ব্যাপারটা মগজে স্ফুটছে না। ধরা যে দেবে না,
ধরতেই হবে তাকে। ধরতে পারলেই বা কি লাভ হবে?
কি দিয়ে বেঁধে রাখবে তাকে? ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে
রাখলে কি পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে? কি পাবার
আশায় আলস্যের পেছনে ছুটে মরছে পুরুষোত্তম?

পুরুষোত্তম মাছুষটার দিকে তাকিয়ে নিদারুণ ঘৃণার সর্ব-
শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল, প্রাহেলিকার
শেষ কথাগুলো—“হতভাগা এমন মাছুষের নাগাল পেয়েছে
এখানে, যে মেয়েমাছুষেরও মন বলে একটা পদার্থ আছে
তা’ জানে।” মেয়েমাছুষের মন কেমন বস্তু, তা সত্যিই
জানেনা পুরুষোত্তম। জানেনা বলেই তার এই ছাংলা-
পনা, সর্বদা বিসর্জন দিয়ে ছুটে মরা। মেয়েমাছুষ এস্তার
আছে ছুনিয়ায়, নিশ্চয়ই তাদের মন বলেও পদার্থ আছে।
সেই মনের নাগাল পাবার জন্তে পুরুষোত্তমকে সাধনা
করতে হবে। তারপর সে ছুনিয়া শুদ্ধ মেয়েমাছুষদের
মধ্যে একটির মন জুগিয়ে চলবার উপযুক্ত হবে। তা’
যদি না হয়, মেয়েমাছুষটি ছেঁড়া জুতোয় মত তাকে
পরিভ্রমণ করে নিজের মনের মাছুষের সড়ানে বেরিয়ে
পড়বে।

সোজা কথা, সোজা হিসেব, মেয়েমাছুষটির দিক থেকে
হিসেব মেলাতে মোটেই গৌজামিল খুঁজে মরতে হয়
নি। কিন্তু এই সোজা হিসেবটিকে উলটো দিক থেকে
দেখতে গিয়েই বেচারী পুরুষোত্তম হিমশিম খেয়ে মরছে।

চমৎকার—

চোখ চেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। দাঁড়াতেই
খেয়াল হোল দিল্লী মেল ছুটছে। টলে পড়ে যাচ্ছিল,
হাত বাড়িয়ে বাকের চেনটা ধরে সামলাল। সামনে
বসেছিল এক সর্দারজী, তিনি কি জিজ্ঞাসা করলেন।
অবাব না দিয়ে আবার বসে পড়ল নিজের জায়গায়।
এত জোরে ছুটছে গাড়ীখানা, এমন ভাবে চলছে যে
দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই।

ছুনিয়ার কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই তার। তারও
সামনে গিয়ে মুখ ভুলে তাকাবার উপায় নেই। চেনা
জানা যে যেখানে আছে, সবাই জানে যে একটা মেয়ে
পুরুষোত্তমকে সহ্য করতে পারলনা বলে পালিয়ে গেল।
পুরুষোত্তম লোকটার এমন কোনও গুণ নেই, যা দিয়ে
একটা মেয়ের মন জয় করতে পারে।

পুরুষোত্তমের যা নেই, আর একজনের তা’ আছে।
আছে বলেই তার জয় হোল, পুরুষোত্তম হেরে গেল।

কে সে? সেই মাছুষটিকে একবার দেখতে পেলে
হোত। একটাবার তার দেখা পেলে বোঝা যেত,
এমন কি সম্পদ তার আছে যা পুরুষোত্তমের নেই।
না না, তাকে হিংসা করছে না পুরুষোত্তম। দেখা
হোলে, চেনা পরিচয় হোলে, একটি কথাও তাকে
বলবে না। বলবার যাচ্ছেই বা কি! বলবার মধ্যে
এইটুকুই বলা যায়—ডোমরা স্বামী হও। অকপটে
এই কামনাটুকুই করা যায় শুধু। কোনও অত্যাচারই তা’
করেনি সে বেচারী। তার গুণ আছে, সেই গুণের
উপযুক্ত মর্দাদা লাভ করেছে। পুরুষোত্তমের নে গুণ
নেই, তাই পুরুষোত্তমের মান মর্দাদা পথের ধুলোয় লুটোচ্ছে।
অসহ্য বেদনার মোড় দিতে লাগল বৃকের ভেতরটা।
এই যে নজর আভের বেদনা এর আশ্বাদ ভীবনে
প্রথম বৃষ্টিতে পারল হতভাগ্য পুরুষোত্তম। নিষেকে

নিজে কখনও এত ছোট এত নগ্ন এত নিঃশব্দ ভাবতে
শেখেনি। বিয়ের পর দিনই বউটা উধাও হোরে
গেল। অতটুকু একটা মেয়ে, সে বোকেই বা কি,
জানেই বা কতটুকু। যে কোনও উপায়ে হোক, তাকে
যদি খুঁজে বার করতে না পারে সে, তার সমস্ত
দোষ অপরাধ ক্ষমা করে তাকে রক্ষা করতে না পারে,
তা'হলে পুরুষোত্তমের উত্তমত্বটুকু যে খাটো হোরে যাবে।
এই খাটো হবার ভয়, এই অহং সর্বস্বতা, এই
আত্মমর্দাদা-জ্ঞান খুঁইয়ে খুঁইয়ে পুড়তে লাগল বুকের
ভেতর। সেই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হোরে গেল বুদ্ধি।
তারপর শুরু হোল কান্না। সে কান্না কেউ চোখে
দেখতে পায় না। অস্তঃশলিলা নদীর মত অস্তঃকরণের
মধ্যে বইতে লাগল অশ্রু স্রোত। পাছে বাইরে কিছু
প্রকাশ হোয়ে পড়ে, এই তরে ষাড় শুজে বসে রইল।
জবাব খুঁজে মরবার, হিসেব মেলাবার আর কোনও
প্রয়োজনেই বোধ করল না।

আবার খামল গাড়ী। ব্রিগ্যাডেইর, বিপুল উদ্ভেজন
কাঁপিয়ে পড়ল গাড়ীর গায়ে। একটু পড়ে থিতুয়ে
গেল উদ্ধাম উৎপাতের বজ্রা, তখন পুরুষোত্তম যুগ
ভুলল। ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক হাজার,
সবিনয়ে নিবেদন করলেন তিনি, মুখখানি তাঁর চোখে
সমর্পণ করবার জন্তে। চমকে উঠে হাত তুলে গালেন
ওপর বুলিয়ে দেখলে পুরুষোত্তম। সত্যিই হাজার
সাহেবের লোভ হবার মত অবস্থা হোয়ে উঠেছে
গালের। কলকাতায় পৌছবার পর থেকে নিত্য
মুখখানার দিকে নজর দেবারও অবকাশ মেলেনি।
গালে হাত ঘষতে ঘষতে উঠে দাঁড়াল। তারপর
অন্তমনস্ত্র ভাবে নেমেই পড়ল গাড়ী থেকে। সংগে
সংগে এক দল বিহারী যাজ্ঞা বোচকা লাঠি লোটা
ঘাড়ে নিয়ে ছুটেতে ছুটেতে এসে ঘিরে ধরল চতুর্দিক
থেকে। এক সংগে জন চার পাঁচ জিঞ্জালা করে
উঠল, গাড়ীখানা পাটনা যাবে কি না। পুরুষোত্তমকে

আন জবাব দিতে হোল
না গাড়ীর দরজার
দাঁড়িয়ে ছিলেন হাজার
সাহেব, বিজী একটা মুখখানাপ করে তিনি তড়া দিয়ে
উঠলেন তাদের। সামনেই একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল,
দেখিয়ে দিয়ে বললেন ছুটে। গাড়ীখানা ছেড়ে যাচ্ছে
পাটনা যাচ্ছে গাড়ীখানা।

কণাটা কানে যেতেই পুরুষোত্তম ছুটল। বিহারী
যাজ্ঞা গাড়ীর কাছে পৌছবার আগেই চলতে শুরু
করল গাড়ী। ছুটে গিয়ে পুরুষোত্তম একটা খোলা
দরজার ভেতর লাফিয়ে পড়ল। কে একজন পাশ থেকে
ইংরেজীতে বললে, চলতি গাড়ীতে এভাবে উঠতে নেই
বাবু। দম নিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখলে, টিকিট
চেকার। ইংরেজী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করল পুরুষোত্তম,
ক্ষমা চাইল। তারপর চেকার সাহেবের হাতে
এলাহাবাদের টিকিটখানি দিয়ে ডানাল, ভয়ানক অক্লান্ত
একটা কাজ মনে পড়ে যাওয়ার এলাহাবাদ না গিয়ে
পাটনা চলেছে। টিকিট কেনবারও সময় পেল না।
বেশী বা লাগে দিতে রাজী আছে, একখানা পাটনার
টিকিট দিতে হবে। চেকার সাহেব বসতে বললেন,
পাটনার ভাড়া তাঁকে হিসেব কষে বার করতে হবে।
পাটনা থেকে গয়া ব্রাঞ্চ লাইন গেছে। সেই লাইনের
ঘোনও ষ্টেশনেই গাড়ীতে উঠে বসেছিল রাত এগারটায়।
পাটনার পৌছবার পরে জেনে নিতে হবে, রাত এগারটায়
ব্রাঞ্চ লাইনের কোন ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে। তারপর
সেই ষ্টেশনে নেমে বামারের খোঁজ নিলেই ঠিক জায়গায়
আবার পৌছে যাওয়া যাবে।

বসে পড়ল পুরুষোত্তম। অটল জায়গা খালি পড়ে
রয়েছে গাড়ীতে। ভাড়া হিসেব করে টাকা নিয়ে
টিকিট লিখে দিলেন চেকার সাহেব। পাটনার কখন
পৌছচ্ছে গাড়ী, জিঞ্জালা করল পুরুষোত্তম। বেদা
ছুটো নাগার পৌছতে পারে, শুনে একখানা খালি
বেকিতে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়বার সংগে নংগেই
এলিয়ে পড়তে লাগল সর্বশরীর। কলিকাতা থেকে



বেরবার পর আন্ত ছুটো
রাত আর একটা দিন
ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুম তুলেই

গিয়েছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথাটা তখনও উদয় হোল না মনে, ঘুম কিন্তু ক্ষমা করল না। লম্বা হোয়ে শুয়ে চোখ বোজবার পরেই আন্তে আন্তে হাঁশ হারাতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়ছে বুঝতে পেরে অনেক চেষ্টা করল উঠে বসবার, পারল না। খুব ভারী লেগের ভঙ্গায় চাপা পড়েছে যেন, লেগ হৃদয় কে যেন তাকে চেপে ধরেছে। অদ্ভুত একটা নিবিড় অহুত্ব, অথ চুৎখের কোনও সম্পর্ক নেই সেই অহুত্বভিতে। মান-অপমান হার-জিৎ পাওয়া না-পাওয়া সব জাতের উৎকট উপসর্গ হার মানল ঘুমের কাছে। সব পাওয়ার বা বড় পাওয়া, ঘুম তাই পাইয়ে দিলে।

॥ এগারো ॥

ঘুম।

জন্মমূর্ত্ত থেকে যে স্বপ্নটি সদা সর্বক্ষণ সজাগ থেকে পাহারা দেয় জীবকে—তার নাম ঘুম। ঘুম ছুটি দেয়, ঘুমের রূপায় অবিশ্রান্ত একঘেয়ে বেঁচে থাক। কর্মটি থেকে মাঝে মাঝে নিস্তার পাওয়া যায়। বিপর্ষয় বোঝা-জীবনের পসরা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে পড়লে যে বজ্রুটি ছ'হাত বাড়িয়ে বোঝাটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে বলে—“বোস তাই, একটু জিড়িয়ে নাও”—সেই বজ্রু হোল ঘুম। এই বজ্রুটি সহায় না থাকলে কি বিপদই না হোত। যে প্রাণটুকু সঞ্চল করে পদার্পণ করা হোল এই ছুনিম্নায়, সেটুকু বজায় রাখতেই প্রাণান্ত হোত।

ঘুম—অতি সতর্ক মাহুষের অতি সূচক শব্দ। অহরহ নিজেকে আগলে নিয়ে বেড়ায় যে মাহুষ, মনকে চোখ রাঙিয়ে শায়েস্তা করে রাখে, বুদ্ধির মুখে শব্দ লাগাম কবে মিখে পথে দৌড় করায়, সেই মাহুষই ঘুমের পাঞ্জায় পড়ে নিজের—পরিচয়টুকু পর্যন্ত আঁকড়ে রাখতে পারে না। টুটি টিপে ধরে যখন ঘুম, তখন সবাই সমান। জগৎজয়ী বীর মহাজানী—মহাপণ্ডিত—সত্যনিষ্ঠ সদাচারী শুদ্ধাত্ম

আর ঐ গণ্ডমূর্খ অজমিথাক ভণ্ডটা, সবাই আহেলী আহম্মক বনে যায়, নিজেকে নিজে চিনতেও পারে না।

ঘুম—জালিয়াতের জাহ্নু, জগদ্ব্যাপী জুয়ার হাটে জুয়াড়ীদের রাজা। ওর খামখেয়ালের খিদমৎ খাটতে রাজাকে কাঙাল বনতে হয়, কাঙাল চড়ে বসে রাজ সিংহাসনে। ওর কারসাজিতে অতি বল অত্যাচারী দাঁতে ছুটো নিয়ে হীনহীনের জন্তে ভিক্ষের নামে, পরম দয়াল দাতা মুহূর্ত্ত অসহায়ের গলায় ফাঁস লাগিয়ে চরম মজা উপভোগ করে। সর্বজয়ী ঘুমের যেমন সর্বসম্ভাপহরণ করার সামর্থ্য আছে, তেমনি সর্বশ্রু লুটে নিয়ে সর্বনাশ করে দেবার মন্ত্রও তার জানা। ছুকা মিটে গেলে শিকারের বুকের ওপর থেকে যখন নেমে যায়—ঘুম, তখন টের পায় শিকারটি কতখানি সে খোয়ালো কতটুকু সে পেল। পেল যেটুকু সেটুকু সত্যি নয়—স্বপ্ন, নির্ভেজাল স্বপ্ন। খোয়ালো বা, তা কিন্তু স্বপ্ন নয়। খোয়ানোর হাহাকার বুকের তেতর দাগ কেটে বসে, সহজে সে দাগ মিলিয়ে যায় না। পাওয়ার সাধনাটুকু কিন্তু মিলিয়ে যায়, স্বপ্নের সংগে সংগে শেষ হয়।

অসহায় একটা মেয়েকে হাতে পেয়ে খামখেয়ালী ঘুম মনের স্বপ্নে রগড় জুড়ে দিয়েছিল। কপাল পোড়া মেয়েটিকে দিয়ে ছোট্ট একটি ছবির মত সংসার সাজিয়ে তুলেছিল। সংসারটি হোল স্বজাতার সংসার। সেই খেলাঘরের এক মাত্র কর্তা স্বজাতা। ছবির মত একখানি বাড়ী ছোট্ট একটু বাগান দিয়ে বেরা। সেই বাড়ীতে সংসার পেতেছে স্বজাতা। মাহুষের মাথার ওপর মাহুষ বাস করছে, ছাপ্পানটি পরিবার পায়রাদের মত খোপে খোপে বন্ধ-বন্ধু করছে, এই রকম আধুনিক ধরণের অট্টালিকা সহ করতে পারে না স্বজাতা, তাই স্বজাতার জন্তে আলাদা নির্রি-বিলিতে একটু নীড় ঘোঁপাড় করতে হোয়েছে। একখানি শোবার ঘর, একখানি বসবার ঘর, আর রান্না খাওয়ার জন্তে অল্প একটু জায়গা, এই নিয়ে স্বজাতার সংসার। সংসারের আগাপজালা রান্নিকুত আসবাব পত্র দিয়ে বোঝাই করেনি স্বজাতা, যে কটি জিনিষ না হোলে নয় তাই দিয়ে

ছিমছাম করে ঘর সাজিয়েছে। কোথাও একটুকু ধুলোবালি
ঝুল কালি নেই। থাকবে কি করে, সংসারখানি নিজের
হাতে—গড়েছে যে স্বজাতি। নিজের হাতে গড়া সংসারের
সব কাজ নিজের হাতেই করে সে, পরের হাতে সংসার
দিলে ঠিক মনের মত করে গুছিয়ে রাখা যায় না কি।

বিকেল হোল। কাজ কর্ম শেষ করে চুল বেঁধে গা ধুয়ে
স্নান তৈরী হোল। সংসারের সব চেয়ে কঠিন কর্তব্যটি
করতে হবে এখন তাকে। এবার সে আসছে, থাকে নিজে
স্বজাতার সংসার সে আসছে। সারা দিন কারখানার
ভেতর ছুটোছুটি করেছে, এক পাল মানুষকে চড়াতে
হোয়েছে সারা দিন, এবার ফিরে আসছে অল্প মানুষ
হোয়ে। বার হকুমের অল্প মানুষ ছুটোছুটি করে মল,
সেই মানুষই এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে যে সামলানো দায়।
এসে যদি দেখে, স্বজাতি মনের মত হোয়ে সেজে গুজে
তৈরী হোয়ে নেই, স্বজাতি তখনও কোনও কাজ করছে,
তা'হলেই হোল। অমনি মুখতার, অমনি শুরু করে দেবে
ধনস্ফুটি। যেন একেবারে নেহাড অবুঝ নেহাড ভাল
মানুষটি। কে তখন বলবে, ঐ মানুষের দাপটে কারখানা
স্বল্প মানুষ সারাদিন কৈপে মরছে।

স্বজাতি সেই অবুঝ মানুষটির মনের মত হোয়ে তৈরী
হোয়ে রয়েছে। স্রবের মত কালো পাড় বসানো সারা
সিঁকের সাত্তী পরেছে, গায়ে দিয়েছে সোনালী জরির কাজ
করা স্কেলভেটের জামা। বেশী গয়নাগাটি বরদাস্ত করতে
পারে না স্বজাতি। হু'হাতে হু'গাছি—বালা পরেছে শুধু
আর গলায় দিয়েছে একছড়া হার। ঐ হারছড়া না পরলেই
বাঁধবে গোলমাল, বড় বড় চোখ দুটি একেবারে টিপে-বুজে
ফেলে বুকের মত ধ্যানস্থ হোয়ে বসে হোল। কার সাধ্য
তখন সে ধ্যান ভাঙায়।

আর একবার সব চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে স্বজাতি। সবই
ঠিকঠাক গুছিয়ে ফেলেছে। কেটলিতে জল গুরে রেখেছে,
সাইকেলের ঘণ্টা কানে গেলেই জ্বইচটা টিপে দেবে।
কলা পেপে কমলা ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, গেলালে
খুঁটে রেখেছে দইটুকু। হাতে দেবার সময় ঠাণ্ডা জলে
মিশিয়ে দেবে। ঐ কল সরবৎ নিয়েই লাগবে হাজামা,

কিছুতেই ওসব মুখে দিতে
চাইবে না। আগেই দাও
চা, সারাটা দিন কার-
খানার গরমে কাটিয়ে এসে আগেই চায়ের অস্ত্র জ্বল্।
বাস—আরম্ভ হবে দুই মি, চোখ বুজে টানটান হোয়ে শুয়েই
পড়া হোল বিছানায়, যেন কত দুঃখই না হোয়েছে। সব
চালাকি, রাগ ভাঙাবার অস্ত্র একটু কাছাকাছি হোলেই—



কয়েকবার শিউরে উঠল ঘুমন্ত মেয়েটি, কেমন যেন হুঁকড়ে
উঠল শরীরটা। একটা শক্ত বাঁধনের ভেতর থেকে
নিজেকে ছাড়বার চেষ্টা করছে যেন, এমনি ভাবে মোচড়াতে
লাগল নিজেকে। দম বন্ধ হোয়ে গেছে তখন, লাল
হোয়ে উঠেছে মুখখানি। সেই মুখে অদ্ভুত রহস্যময় হাসির
আলো ফুটে উঠেছে। হঠাৎ এক ঝটকায় পাশ ফিরল
মেয়েটি, অনেক চেষ্টা করে সত্যিই যেন মুক্ত করলে
নিজেকে। পাশ ফিরেই চোখ মেলে হাঁপাতে লাগল,
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারিদিকে। কিছু যেন
হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলে ভয়ানক বেকুফ বলে গেছে।
উধাও হোয়ে গেল ছবির মত সাজানো ছোট্ট সংসার,
শক্ত বাঁধন মিলিয়ে গেল হাওয়ার সংগে। চোখ মেলবার
সংগে সংগে খতম হোয়ে গেল ঘড়ির ঘূমের বগড় করা।
কুৎসিত একটা আতঙ্ক হাঁ করে গ্রাস করতে এল বোকা
মেয়েটিকে। হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতর, সম্পূর্ণ
সজাগ হোয়ে মেয়েটি চিনে ফেলল নিজেকে। স্বজাতার
পরিচয় আঁকড়ে ধরল স্বজাতি। এখন কে তাকে বলে
দেবে, সর্বনাশ ঘটে গেছে ঘূমের মধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দম আটকে পড়ে রইল। হাত-
ভাতে লাগল মনের অঙ্গিসক্তি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।
কতটা সময় ঘুমিয়েছে! ঘুমিয়ে পড়বার আগে কি ঘটে-
ছিল! কোথায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কিছুতেই কিছু খুঁজে বার করতে পারল না, কোনও



প্রাঙ্গণেই অব্যবহিত না।
আন্তে আন্তে আবার ভূবে
যেতে লাগল নিবিড় অন্ধ-

কারের গর্ভে, আবার বৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে নিজের পরিচয়।
আত্মাণ চেষ্টা করলে নিজেকে নিজে আঁকড়ে ধরবার অস্ত্রে,
স্বজাতার চেহারাটা স্পষ্ট দেখবার অস্ত্রে মনের আয়নার ভীত
দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর চিনতে পারল নিজেকে, ঠিক
দেখা যাচ্ছে স্বজাতাকে, স্বজাতা ঠিকই আছে, স্বজাতার
এতটুকু কিছু বদলায় নি। এতক্ষণ পরে বুক খালি করে
অস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ফেলে আর একবার স্বজাতার
পানে তাকাতে গিয়েই আঁতকে উঠল।

ওকি! ওকি দেখা যাচ্ছে স্বজাতার পেছনে।
স্বজাতার পেছনে টেবিল, টেবিলের ওপর চেয়ার, চেয়ারের
ওপর ছ'খানা পা। একটু নিচু হোয়ে ভাল করে তাকাতেই
কোমর পর্যন্ত দেখতে পেল। কোমর থেকে গলা, গলা
থেকে মাথা, মাথার ওপরে কড়ি পর্যন্ত সবই দেখা গেল।
কি করছে ও। করছে কি।

বুক-কাটা চিৎকার করে উঠল—“সরমুপ্রসাদ”
একটুও আওয়াজ বার হোল না, কিছুই কানে গেল না।
চোখ মেলে ভাবাচাকা খেয়ে গেল ভয়ানক। কোথায়
সেই কড়ি, কোথায়ই বা দড়ি আর কোথায়ই বা সরমু-
প্রসাদ। কড়ি-বরগা-বিহীন সাদা ধপধপে ছাত একখানা।
অনেক ওপর থেকে রক্তশূণ্য শূন্যদৃষ্টি মেলে তার দিকে
তাকিয়ে রয়েছে।

সেই শূন্যদৃষ্টির ছোঁয়া লেগে স্বজাতার ভেতরটা ঝোঁপরা
হোয়ে গেছে বলে মনে হোল। ঝোঁপরা বৃকের মধ্যে পাক
খেতে লাগল একটা বোবা বেদনা। ক্রমেই বাড়তে
লাগল চাপ, চাপের চোটে ফেটে চৌচির হবার উপক্রম
হোল বুকখানা। তারপর সেই চাপটা কান্নার রূপ ধরে—
বাইরে প্রকাশ পেল। একান্ত নিশেষে ফুলে ফুলে কাঁদতে
লাগল হতভাগী স্বজাতা। সে কান্নার কোনও অর্থ নেই,
আবদার নেই অভিযোগ নেই অহুতাপ নেই, নিজের
ওপর নির্ভর প্রতিহিংসা নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও
সার্থকতাও নেই সেই কান্নার। শুধু একটা জালা, অস্ত্রের

অস্ত্রধাঁহ কান্নার রূপ ধরে—ঝলকে ঝলকে বাইরে বেরিয়ে
এল। সর্বস্ব খুঁয়ে নিঃস্ব হবার কান্না সেটা, সহজ সে
কান্না নিঃশেষ হোতে চায় না। অক্লান্ত কান্না—অনর্গল
খারাম অবিরাম বয়ে যেতে লাগল।

কান্না যদি সত্যিকারের নির্বিষ কান্না হয়, তা'হলে তার একটা
নির্দোষ শক্তি থাকে। সেই কান্নার জলে খুব হৃদয়ভাবে
ভুলোকালি ধুয়ে সাফ হয়। যে অনির্বাণ দীপটি জ্বলছে
মনের মধ্যে, যার আচ্ছাদন মন, সেই মন-আবরণের গায়ে
যে ভুলোকালি জমে, তা ধোয়া যায়—নিষ্কলুষ কান্নার জলে।
তখন পরিষ্কার আচ্ছাদনের অন্তরাল থেকে—দীপের দীপ্তি
—দূরের কাছের সব কিছুই পরিষ্কার তাবে চিনিয়ে দেয়।
কিছু কান্নার রঙের সংগে যদি কোনও জ্বালের চাওয়া
পাওয়ার রঙ মেশানো থাকে,—তা'হলেই মুশকিল।
কান্নার রঙের সংগে মনের ময়লা রঙ মিশে গিয়ে এমন
যাচ্ছেতাই প্রলেপ পড়ে যে তেতরের আলোর বাইরের
কিছুই স্পষ্টভাবে চেনা যায় না। তখন ভুল দেখার ফলে
ভুল পথে পা বাড়িয়ে খানায় ভোবায় পড়ে অপঘাতে
সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে।

অচেষ্টা অনাবশ্যক কান্নার গুণে আসল স্বজাতা—নিজের
আসল অবস্থাটা একটু একটু করে বুঝতে লাগল। সেই
কবরখানার মত ঘরখানার চেহারা তেলে উঠল চেখের
সামনে। সেই ঘরের স্তপাকার জঞ্জালগুলোই বা কই।
সেই ঘর থেকে কি করে এসে গেল সে এই ঘরে।
যুম ত'ভেঙেছে, এখন জেগে স্বপ্ন দেখছি নাকি।

এ কোথায় কার বাড়ীতে রয়ে আছে সে?
উঠে বসতে গেল খড়মড়িয়ে, সংগে সংগে অস্পষ্ট একটা
আর্তনাদ করে টলে পড়ল। বিছাত্তর ঝলঝলি লাগল
যেন মাথার মধ্যে। অগত্যা বন্ধনায় কিছুক্ষণ কিছু বুঝতে
পারল না। কোথায় যে হচ্ছে বন্ধনটা তাও ঠাहर
করতে পারল না। অনেকক্ষণ অসাড় হোয়ে পড়ে
থাকবার পর দম ফেলতে পারল। একখানা হাত ভুলে
মাথার ডান পাশে ছোঁয়ালে, বন্ধনটা যেন সেইখানে



হচ্ছে। হাতখানা সেখানে ছোঁয়াবার সংগে সংগে চমকে উঠল ভীষণ ভাবে। এ কি! কি যেন জড়ানো রয়েছে মাথায়! মাথায় আবার এ সব বাঁধতে গেল কে?

আলতো ভাবে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল মাথায়। এক গাছি চুল হাতে ঠেকল না। কপালের ওপর থেকে গুল করে সারা মাথাটা বেশ শক্ত ভাবে জড়ানো হয়েছে। হাতখানা নামিয়ে নাকের কাছে ধরতেই বিতিকিচ্ছি কড়া গন্ধে ঘুম আটকে এল। তখন আর কিছু বাকী রইল না বুঝতে। মাথাটা কেটে গেছে, এমন ভাবেই কেটেছে মাথাটা যে আঠেপুঠে বাঁধতে হয়েছে। তা'হলে অজ্ঞান হোয়েই পড়েছিল মাথায় চোট লাগবার দয়্য। কখন অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিল তা'হলে! কতক্ষণই বা অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়েছে?

সমস্ত শরীরটা কেমন যেন সিঁড়িগড় করে উঠল হঠাৎ। সারা গায়ে অনেকগুলো আরসোলা হাঁটছে যেন। গলা পর্যন্ত একখানা চাঁদর চাপা দেওয়া ছিল, হুঁহাত দিয়ে টেনে চাঁদরখানা খুলে ফেললে। পরমুহুর্তেই আবার সেখানা টেনে নিয়ে পা থেকে মূখ পর্যন্ত ঢেকে ফেললেন। চাঁদর চাপা শরীরটাকে ভাল করে হুঁহাতে ছুঁয়ে দেখল তখন। বুঝতে পারলে, একটা শেমিজের মত কিছু আছে শুধু গায়ে, কোমরে কাপড় নেই। আর একবার তদানক ইকম কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বশরীরে। স্পষ্ট বুঝতে পারলে, কারা যেন চটকাচ্ছে তাকে, তার আকরণহীন দেহটা নিয়ে যা খুশি তাই করছে, সে বাধা দিতে পারছে না।

আরও হোল জালা। এক পাল বিছে চতুর্দিক থেকে চল কোটাচ্ছে গা ময়। জালায় চোটে দাঁত মুখ সিটকে পড়ে রইল। না পারল নড়তে, না পারল পালাতে। সেই চৌকিদারের মেয়ে পীতাম্বরীকে দেখতে গেল। দেখল, ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা সেই কুৎসিত হাসি হাসছে। তার হজুর বাহাজুর এসে পড়েছে সাবপাশ নিয়ে, এসে সবাই মিলে চতুর্দিকে ঘিরে বসে একটা অনাবৃত দেহ

নিয়ে যা খুশি তাই করছে। রাশি রাশি বীভৎস দৃষ্ট হুড়মুড় করে কাঁপিয়ে

পড়ল চোখের সামনে। চোখ দুটো টিপে বুজ থেকেও সেই দৃষ্টান্তলোর হাত থেকে নিস্তার পেল না। ছুটে পালারার জন্তে ঝুঁকবার চেষ্টা করলে, হাত পা নাড়তেই পারলে না। সমস্ত শরীরটা যেন বিশৃঙ্খল ভারী হোয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হোল, নিজের দেহটাকে কাপড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে, হাঁ পর্যন্ত করতে পারল না। হুঁটো চোয়াল যেন জোড়া লেগে গেছে। ভুলে গেল আনার, কোথায় কি ভাবে গুরে আছে। মনে মনে ছোঁবলাতে লাগল নিজেকে, স্পষ্ট শুনতে পেল নিজের বুকের মধ্যে একটা জ্যান্ত কালসাপিনী কৌস কৌস করে গম্বাচ্ছে। আচ্ছন্ন হোয়ে পড়তে লাগল আবার সাপের বিষে, মনের সাপের বিষ মনটাকে আগে অসাড় করে ফেলে। অসাড় মনে ভাল মন্দ জুখ জুখের ছাপ পড়ে না। যোল আনা হুঁশ বজায় থাকলেও হুঁশিয়ার থাকি যায় না অসাড় মন নিয়ে। তখন যা শোনে যা দেখে, সবই যেন গল্প বলে মনে হয়। সেই গল্পের সংগে নিজের কোনও সম্পর্ক আছে, তাও মনে হয় না।

গল্প শুনতে লাগল—হিসহিস করে বলতে লাগল একজন খাতির পাশে দাঁড়িয়ে—“ফটকের সামনে গাড়ী থামতেই উপরি-উপরি ছুঁজাতের দুটো আগুয়াজ কানে এল। মেরেলী গলায় বুক-কাটা চোৎকার একটা, সেই চিংকারটা আনতে না আসতেই হুড়মুড় করে একটা শব্দ হোল। দুটো আগুয়াজ যেমন একসঙ্গে উঠল, তেমনি একসঙ্গেই মিলিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নামব কি, হাত পা তখন অচল হোয়ে পড়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম স্কুটিটার দিকে। তারপর হঠাৎ দেখি সরসুর ড্রাইভারটা ছুটে ঢুক পড়ল ফটকের মধ্যে। তখন আমিও ছুটলাম গাড়ী থেকে নেমে। বারান্দায় উঠে এখার ওখার তাকিয়ে দেখি এক প্রাণী নেই। সামনেই একটা খোলা দরজার এক



পাশে এক কলসী জল
আর একটা টুকরি না কি
বলানো রয়েছে। ড্রাই-

তারটা তখন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। হাউমাউ করে
উঠল সে ঘরের ভেতর থেকে। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম ঘরে,
ঢুকে বানজরে পড়ল তাতে আমারই তখন হার্টফেল হবার
জোগাড়। টেবিল আর চৌকির মাঝখানে উবুড় হোয়ে
পড়ে আছে একজন, তার গলায় একগাছা দড়ি বাঁধা। ড্রাই-
তারের সংগে যে লোকটা ছিল, সে তখন এসে পড়েছে
আমার পেছনে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে
সে ঘরে ঢুকে পড়ল। তখন হ'ল হোল আমার। কাট কাট,
শিগগির কেটে ফেল দড়ি। কাটবে কি দিয়ে,—হাতের কাছে
কিছুই নেই। ড্রাইতার গলার হুঁপাশ দিয়ে হুঁহাতের আঙ্গুল
কোনও রকমে গলিয়ে দড়িটা ছিঁড়ে ফেললে। দড়িটা
পড়ে গিয়েছিল, কোন কালে টানা পাখা টাঙানো
হোত, দড়ির পরমায়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফুরিয়ে গিয়েছিল
বলেই রক্ষে, নয়ত সরবু পরমায়ু টুকু না নিয়ে ছাড়ত না।
আন্ত একটা মাহুষের তার সহিতে পারল না বলেই দড়ি
ছিঁড়ে ছিল। কয়েকটা মিনিটও যদি টিকত দড়িগাছা,
তা'হলে আর করবার কিছু থাকত না। করবই বা কি
তখন আমরা, থাকবার মধ্যে ছিল এক কলসী জল,
ডাড়াডাড়ি সরযুকে বার করে এনে সেই জল ঢালা শুক
করলাম। ড্রাইতারটা ছুটল গাড়ী নিয়ে ডাক্তার আনতে।
সকালে যে ডাক্তারকে এনেছিল, তাকেই নিয়ে এল।
ডাক্তার এসে প্রথমেই খোঁজ করলেন, বাবুজীর বউটি গেল
কোথায়? তখন আমাদের খেয়াল হোল, আরে তাই ত'!
বাবুজী ত' বউ নিয়ে এসেছেন, বউ নিয়ে এসে উঠেছেন
কুঠিতে, এই খবরই ত' দিয়েছিল ড্রাইতারটা। খোঁজ
খোঁজ, বউ কোথা গেল খুঁজে দেখ। বাগান রাস্তা এখার
ওখার চারখার খোঁজা হোল, কোথাও নেই। কুঠির
চৌকিদারের মেয়েটা বললে, বউটি নাকি অনেকক্ষণ ঘরের
বাইরে ছিল, তার সংগে অনেকক্ষণ গল্প করেছে। তখন
নানা রকম সম্বন্ধ হোতে লাগল। হঠাৎ যে ভাবে
বউটিকে ধরে এনেছে বাবুজী, তাতে সবই সম্ভব। বউটিকে

আনবার সময় নিজের সর্বাঙ্গ খেঁতলে এসেছে, তি করে
এমন হাল হোয়েছিল তা ওর ড্রাইতারও বলতে পারলো
না। আমাদের ধারণা হোল, ঘানের কাছ থেকে এনেছে
বউটিকে তারাই পেছন পেছন এসে ওর গলায় দড়ি বেঁধে
ঝুলিয়ে দিয়ে—নিজেদের জিনিষ নিয়ে সটকেছে। ডাক্তার
বাবুটি সে কথা মানতে চাইলেন না। তাঁর ধারণা, এমন
মেয়েকে নাকি সহজে কেউ কিরিয়ে, নিয়ে যেতে পারবে
না। প্রাণ থাকতে বেহুশ স্বামীটিকে ছেড়ে বাবার মাহুষ
নয় নাকি বউটি। ডাক্তার গেলেন ঘরের মধ্যে, স্বচক্ষে
একবার দেখতে গেলেন, গলায় দড়ি দেওয়াটা সত্যি না
মিথ্যে। ঘরে গিয়ে তিনি বার করলেন বউটিকে, টেবিলের
পেছন দিকে আয়নার সামনে চেয়ার চাপা পড়ে রয়েছে।
সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! রক্তে ভেসে যাচ্ছে সর্ব শরীর, চোখ
মুখেব অবস্থা এমন যে মাহুষ বলে চেনবার উপায় নেই।
একটানে এতটা বলে বক্তা থামল। বোধ হয়, দম নেবার
দরকার হোল তার। থাকে শোনাচ্ছিল গল্পটা, সে কথা
বললে এতক্ষণ পরে। থমথমে গলায় বললে—“নিশ্চয়ই
বাধা দিতে গিয়েছিল এ বেচারী,—একে খুন করে তবে
গলায় দড়ি দিতে পেরেছিল সরযু। যে আত্মহত্যা করতে
যাচ্ছে, সেও তখন পাগল, কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে নাকি
তার। তাগো আপনি ঠিক সময় গিয়ে পড়েছিলেন কমল-
বাবু, নয়ত এই হতভাগীও মরত।”

কমলবাবু ভক্তলোকটি আবার কথা বলতে লাগলেন।
এবার তাঁর গলাটা একটু চড়ল। মনে হোল, গলায় একটু
ঝাজ ফুটে উঠল যেন। বললেন—“বীচবে, এ আশা এখনও
করা যায় না। প্রায় আট চল্লিশ ঘণ্টা হোতে চলল, এখনও
জ্ঞান হোল না। হাসপাতালে দেবার উপায় নেই, ভাল
ডাক্তার ডাকব সে সাহসও হচ্ছে না। একমাত্র সেই
রাজস্বীনের ডাক্তার তরসা। সে ভক্তলোক যথেষ্ট করেছেন,
তাঁর সাহায্য না পেলে এতক্ষণ কেলেঙ্কারিটা অনেক দূর
গড়াত। গলায় দড়ি দেওয়া, একটা মেয়েকে নিয়ে এসে
খুন করা, হুঁহুটোই যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ডাক্তার বাবুটি
সব সামলে দিলেন। ভক্তলোকের ছেলে, যদি প্রাণটা
বীচ, তা'হলে কেন আর অনর্থক আইনের পাল্লায় পড়ে



বেইজ্ঞত হই। ডাক্তার বাবুটাই বার করলেন, আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। মেয়ে মাথা ফাটায়নি-এব সবু, সেই বিপরীত ভারী-চেয়ারের তলায় পড়ে মাথাটা ফেটেছে এ ভাবে। চৌকিদারের মেয়ের সংগে গল্প করে ঘরে ঢুকেই এ দেখতে পায়, টেবিলের ওপর চেয়ার চাপিয়ে সরষু গলায় দড়ি বেঁধেছে। তখনও চেয়ারখানা পায়ের ওপর ঠেলে ফেলবার সময় পায়নি, কিংবা অত ভারী চেয়ার ঠেলে ফেলতে পারেনি। ব্যাপারটা দেখেই এ প্রাণপণে চৌকি দিয়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে টেবিলের ওপর। হয়ত উঠেই পড়েছিল টেবিলের কোণায়। তাতেই কাত হোয়ে যায় টেবিলটা, টাল সামলাতে না পেরে চেয়ার নিয়ে এ পড়ে একধারে, সংগে সংগে দড়ি ছিঁড়ে সরষু পড়ে আর এক দিকে। সেই চিৎকার আর হুড়-হুড় শব্দ ফটকের সামনে পৌছেই আমি শুনেছিলাম। যেহেতু এর মাথা ফাটিয়ে টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে সেই চেয়ারে দাঁড়িয়ে গলায় দড়ি দিয়ে চেয়ার ঠেলে ফেলে দেবার সময় কোণায় গেল সে। এর চিৎকার আর চেয়ার পড়ার শব্দ এক সংগেই হোল, শব্দ দুটো শোনবার পর মিনিট দু'য়েকের ভেতর আমার গিয়ে পৌঁছলাম। দড়িটা যেভাবে গলায় বসে গিয়েছিল কব-কবে হোয়ে—তাতে মিনিট পাঁচেক দেয়। হোলেও ও রক্ষা পেল না। যাক্ যেভাবে হোক প্রাণটা নষ্ট হয়নি। এখন আপনি এদের নিয়ে যান ভবেশবাবু, ও রকম ভয়ংকর লোককে আমি আর রাখতে পারব না। বেশী দিন এখানে রাখাও সম্ভব নয়, জানাজানি হোলে মুশকিল বাধবে। তা'ছাড়া এখানে চিকিৎসাও হচ্ছে না। এই মেয়েটাকে অন্ততঃ ভাল ডাক্তার দেখিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার। সরষুর দু'বার জ্ঞান হোয়েছে-এর মধ্যে, এ বেচারীর এখনও জ্ঞানই হোল না। এই জন্তেই টেলিগ্রাম করে দিলাম আপনার কাছে, একমাত্র আপনাকেই টেলিগ্রাম করা যায়। আপনি ছাড়া আর আছেই বা কে সরষু। আপনি এসে পড়েছেন, এখন যা করার করুন।” “কি যে করব!” ভবেশবাবু ভুল্ললোকটির গলায় নেহাত নিরাশার স্বর ফুটে উঠল। একবার গলা ঝাঁকার

দিলেন তিনি, তারপর বেশ চেষ্টা করে আরও কয়েকটা কথা বললেন—

“হাঁ, নিয়ে ত' যেতেই হবে। যথেষ্ট করেছেন আপনি, এখন আমার দায়। মানে আপনাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই করব, কিন্তু আট দশ ঘণ্টা গাড়ীতে কাটবে—তাই ভাবছি।”

কলকাতাবু বললেন—“নিয়ে কিন্তু যাওয়াই উচিত। কলকাতায় নিয়ে গেলে চিকিৎসা হবে, সেখানে লোক জানাজানির ভয় নেই। অন্ততঃ সহরে কে কার খবর রাখছে। আপনি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন ভবেশবাবু, এখানে রাখতে আর আমার সাহস হচ্ছে না।” চলুন, সরষু অবস্থা দেখি গিয়ে। এবার জ্ঞান হোলে ওর সংগে একট' পরামর্শ করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।”

আরও কি সব বলাবলি করতে করতে ও'রা দু'জন তলে গেলেন ঘর থেকে। আড়ষ্ট হোয়ে পড়ে থেকে সবই শুনে নিলে একজন। শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। যাক্, বৈচে আছে তা'হলে সরষুপ্রসাদ। অ্যান্ড সরষু-প্রসাদকে তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দিতে হবে যে কোনও উপায়ে, এই প্রতিজ্ঞাটা পূর্ণ হোল। কস্তুরীর সাজ শেব হোল এতক্ষণে, কস্তুরী যা করত, তা' করা হোল। এখন যদি নিজের জীবনটা যায়, তাতেই বা কি গেল এল।

কলকাতার নিয়ে যাবার পরামর্শ করতে গেল ওরা। আবার কলকাতায় কেন, আবার কলকাতায় যাবে কেন? কলকাতায় যাওয়াটা কোনও রকমে রাখতে হবে। তি তা'বে বদ্ধ করা যায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়াটা?

কলকাতা মানে স্ফুজাতা যেখানে জন্মেছে, বড় হোয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতা মানে আরও অনেক কিছু। আবার বৈচে উঠবে নাকি স্ফুজাতা? আবার সবাই জানবে, স্ফুজাতা বৈচে আছে? জানতে পারলে আসবে আবার সবাই। তার মানে—জবাবদিহি করতে হবে—কেন পালিয়েছিল? কোথায় পালিয়েছিল? কি করে কি অবস্থায় কাটালি এতদিন? ইন্—নিয়ে গেলেই



হোল কিনা কলকাতায়।
দেখা যাক, কি করে কেউ
স্বজাতাকে কলকাতায়

নিরে যেতে পারে।

ক্রমে ক্রমে উদ্বেজনা বাড়তে লাগল, যন্ত্রণা শুরু হোল সাথার মধ্যে। ভাবনাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হোয়ে যেতে লাগল, কল্পরী সরস্বতীসদৃশ স্বজাতা আর স্বজাতার বাপ মা ভাই বোন। কত মানুষ এক সংগে ভিড় করে এসে উপস্থিত হোল। কাউকেই যেন চেনে না স্বজাতা, কারও সংগেই যেন সম্বন্ধ নেই। সবাই এল, সবাই চলে গেল। তারপর একলা একজন মানুষ এসে দাঁড়াল অনেকটা তকাত্তে। মুখখানি দেখেই চিনতে পারল স্বজাতা, তবে বুকটা কঁপে উঠল। তারপর যা দেখল, তাতে তরানক আশ্চর্য হোয়ে পড়ল। মানুষটার চোখ দু'টোর দিকে সাহস করে তাকাত্তেই একেবারে আশ্চর্য হোয়ে পড়ল। একি! চোখে জল কেন? ওভাবে কাঁপছে কেন তাঁটি হুঁখানি একটু একটু। কি বলতে চাইছে ও! ও ভাবে তাকিয়ে আছে কেন। কই রাগ ত' নেই দুই চোখে। আরও অল্প একটু সময় তাকিয়ে রইল সেই চোখ দুটির দিকে। তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর সবই মূছে গেল। আবার অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারের মাঝে আঁতে আঁতে তালিয়ে যেতে লাগল।

॥ বারো ॥

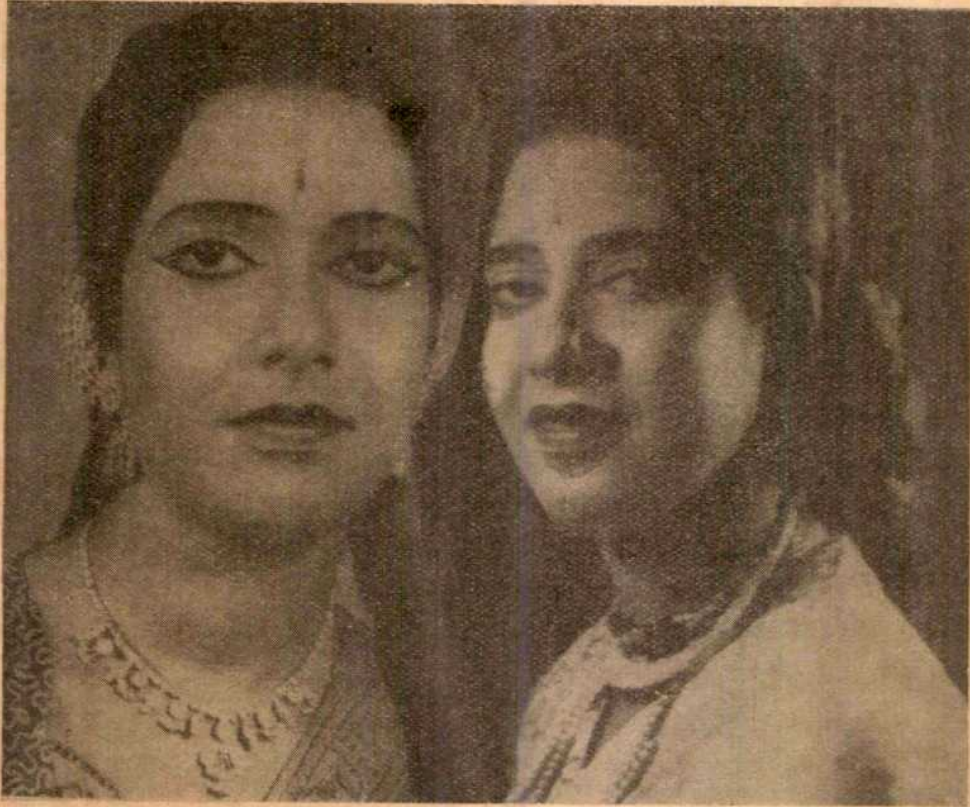
বাবু বজ্রবাহন ঝাঁয়ের ধামারে—অতিথিশালাটি একেবারে হাল-ক্যাশন অলুয়ায়ী সাজানো। সেখানকার আদর আপ্যায়নের বন্দোবস্তও বিশেষ-বঁোবা। চাপরাসী আরদালী বয় বাবুর্চী বেদারী খানসামা গিজগিজ করছে সেখানে। পানাপিনার ব্যবস্থাও তেমনি। ভাল ভাত কুটি মোঙা মেঠাই দই ক্ষীর চুকতে পায় না অতিথিশালায়, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনাররা চোকেন। ঝারা ভাল ভাত খান, তাঁদের অন্ত্রে অতিথিশালা নয়,

ডিনারখেকোরা অতিথিশালায় ঠাই পান। ভাল ভাত ওয়ালাদের অন্ত্রে আলাদা ব্যবস্থা আছে।

সেই অতিথিশালায় দোস্তলার ঘরে ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আছে প্রহেলিকা। সন্ধ্যা থেকেই দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে সে। বলে দিয়েছে কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে, যাত্রে সে কিছুই খাবে না। দিনের খাওয়া চুকতেই প্রায় বিকেল হোয়ে গিয়েছিল, ম্যানেজার জগৎরাম বাবু আয়োজনও করেছিলেন তেমনি। ভাতলোক বোধ হয় তেবেছিলেন, খাওয়ানোটা তুমুল গোছের হোলে অতিথি হুঁজন বন্দী হোয়ে থাকার কথাটা ভুলে যাবে। বন্দী করে রেখেছেন, এ কথাটা অবশ্য স্বীকার করতে রাজী নন জগৎরাম। তাঁর সেই এক কথা, মালিক আসছেন। মালিকের সংগে দেখা না করে অতিথিরা চলে যাবেন, এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। আর ওখানে গাড়ী থানাও ঠিক হোক, মাত্র একটা রাত কষ্ট করে অতিথিদের থাকতে হবে। তারপর ছুটি দেবেন তিনি, একটা রাত থাকলে অতিথিদের আর কতদূর ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে।

প্রহেলিকা অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল, কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি তার হোল। কিছুই নয়, দু'টো দিন আলটপকা বাইবে মূরে যাওয়া হোল। কোথাকার কে পুরুষোত্তম, তার বউটা হারিয়ে গেছে। বেশ হোয়েছে, তাতে প্রহেলিকার কি। কিছুই নয়, এও এক ধরণের তামাশা। ইংরেজীতে যাকে বলে—কান। কান নয়ত কি। যার বউ সেই গেল পালিয়ে, আর ওরা হুঁজন পড়ে রইল আটকে যেন ওদেরই গরজ, ওদেরই যেন বত মাথাব্যথা। আচ্ছা তামাশা বটে। তামাশাটা পুরোপুরি উপভোগ করতে কোথায় যেন একটু বাধবাধ। ঠেকছিল প্রহেলিকার, অনবরত নজর পড়ে যাচ্ছিল নিজের দিকে। ছনিয়া স্বপ্ন মানুষ যে চোখে প্রহেলিকাকে দেখে, সেই চাউনি দিয়ে নিজেকে

শেষাংশ ২০১ পৃষ্ঠায় দেখুন



সুমিষ্ট, কণ্ঠ, অভিনয় ক্ষমতা ও নায়িকার উপযোগী দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে কমলাকী শতদল রায় অভিনয় পিপাসুদের ধোকা দেবার দাবী রাখেন। একটি বিশিষ্ট নাট্য-চরিত্রের রূপ-সজ্জায় কমলাকী শতদল রায়কে এখানে প্রকাশ করা হলো—পাঠক পাঠিকারা তার শক্তিকে বাঁচাই করে সম্পাদককে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে জানাতে পারেন।

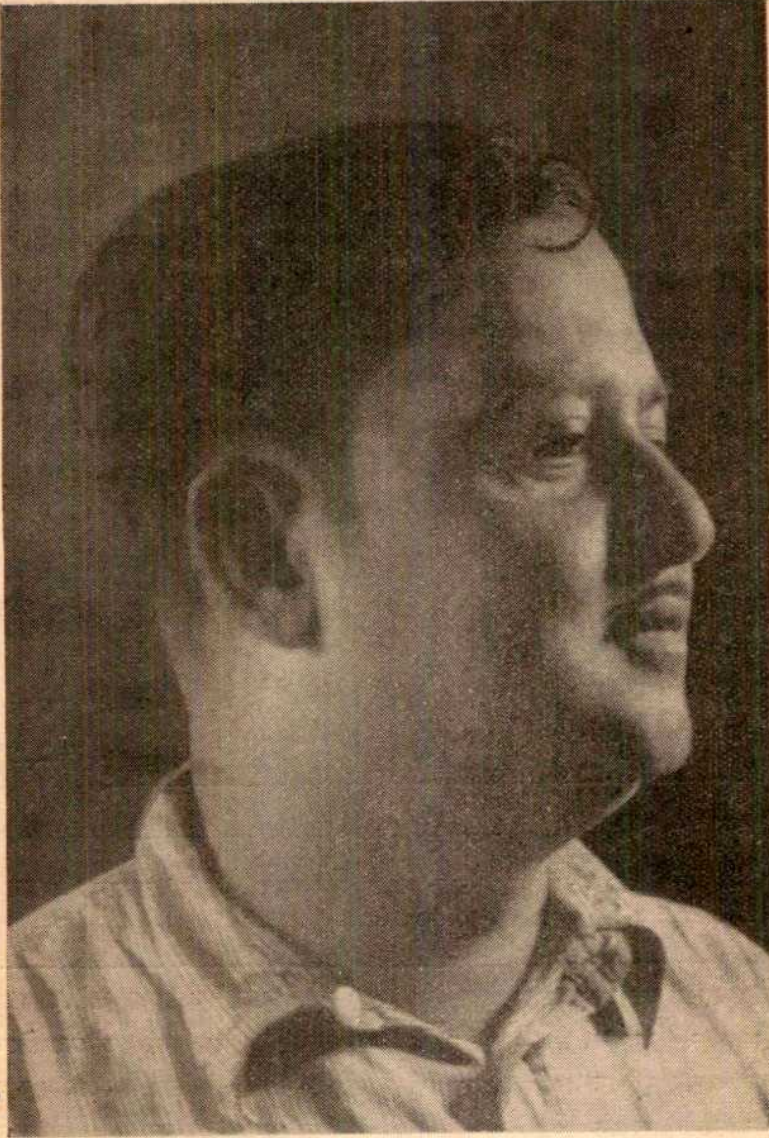
॥ শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ ॥

কার্টুন বা মুখোস কেটে নিতে হয়েছিল। ২০ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী ছন্দা দেবীর ছবিটির ক্ষেত্রে বড় একটা মুখোস তৈরী করে আর একটি পিচবোর্ড হাতের কাছে রেখেছিলাম। একসপোজার দেবার পূর্বে অছাছাংশ যেমন ঢেকে রাখতে হয়েছিল তেমনি,—এক একটি একসপোজার হয়ে যাবার পরও এক্সপোজড অংশ ঢেকে রেখেছিলাম। ২১ পৃষ্ঠার প্রকাশিত হেমন্তকুমার, লতামুদ্রেশ-কর, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আলপনা মুখোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতির ছবিগুলি এই মুখোস পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

(৩) নেগেটিভ-ব্লকিং বা অবরোধ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে

গ্রহণ করা হয়েছে ১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৫ পৃষ্ঠায় নীলিমা দাসের ছবি। এই পদ্ধতিতে নেগেটিভে মডেলের অংশটুকু ছাড়া—বাকী সবটুকুই এক রকম লাল সলিউশন বা প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলতে হয়। তারপর নেগেটিভ সোজা বা উলটো করে—বড় বা ছোট করে ইচ্ছামত ছবি করা যায়।

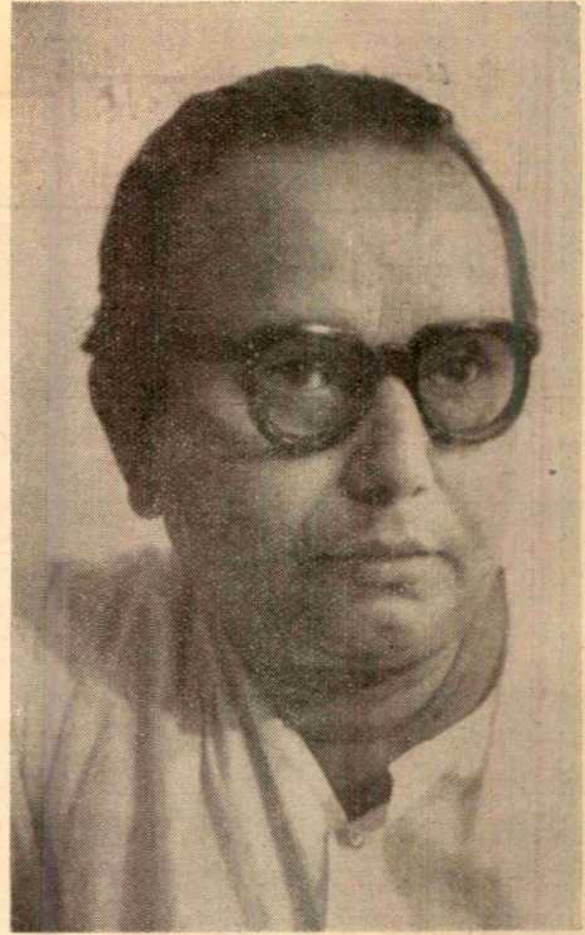
(৪) কার্টুন—বিকৃতি বা অতুলরূপ ধারণের চাতুরী। কালো-ঘরের কারসাজিতে কার্টুন বা বিকৃতি বহুভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এখানে ২২ পৃষ্ঠায় শ্রামলাহার ছবিটি করার সময় প্রথমে পরিবর্ধক যন্ত্রের সমতল ক্ষেত্রে কাগজটি সমতল ভাবে না রেখে একসপোজার দেবার সময় কাগজের একটা দিক হেলিয়ে রাখা হয়েছিল। এবং একসপোজার যা



দেওয়া উচিত ছিল—তার চেয়ে একটু কমই দিয়েছিলাম—কলে ছবিটায় বিকৃতি এবং সংগে সংগে অস্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেল। তারপর শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত তুলি বুলিয়ে প্রয়োজন মত রূপ দেওয়া গেল। পুরো বিকৃতির নিদর্শন হিসেবে ২৩ পৃষ্ঠায় গদ্যপদ বহুর ছবিটা প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর তুলির আঁচড়ের প্রয়োজন হয় নি।

আপাতত আমার কথাটা ফুরলো। কথাটা ফুরোবার পূর্বে আর একটু কথা বলে নেই—সে কথার প্রথমই একটু আভাস দিয়েছিলাম। নিছক ছবির জগৎ আমি ক্যামেরা ধরিনি। আমার ক্যামেরা ধরার মূলে যেমন বিরাট এক প্রয়োজনের কথা লিখিত আছে—তেমনি সেই প্রয়োজনের বাইরে যে কথাটা আছে—তা হচ্ছে—ছবির মধ্য দিয়ে কিছু সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য। প্রতিটা শিল্পের ই যে লক্ষ্য—চিত্রশিল্পী হিসেবে আমারও সেই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের আর একটা নিদর্শন ২৪ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে চিত্রাচার্য দেবকীকুমার বহুর একক চিত্রটির মধ্য দিয়ে। একক চিত্রের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ চিত্রশিল্পী কোন বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে না পারবেন, ততক্ষণ কোন কিছু সৃষ্টি করাই

রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের স্নেহানীবে ধাতু রূপ-মঞ্চের দীর্ঘদিনের গ্রাহক বর্তমান যাত্রা-ন্দোলনের অগ্রতম কর্ণধার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দীর্ঘদিন জ্যোতীষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অন্বেষণ করে যে গভীর জ্ঞানার্জন করেছেন, তাতে মাহুঘের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে নিভুল গণনায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরীক্ষায় পাশ—ফেল, চাকুরী লাভ, নাটক ও চলচ্চিত্রের সাফল্য-অসাফল্য, বিবাহাদি, মামলায় জয়-পরাজয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিভুল প্রশ্ন গণনায় অদ্বিতীয়। রূপ-মঞ্চের গ্রাহক-গ্রাহিকা—পাঠক-পাঠিকাদের জগৎ আগামী সংখ্যা থেকে সুযোগ সুবিধামত রূপ-মঞ্চ মারফৎ এমনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে সচেষ্ট থাকবেন। বিস্তারিত সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করে জেনে নিতে হবে।



বাদিকে—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নামাংকিত গিরিশ-
থিয়েটারে মঞ্চস্থ 'ডাউন ট্রেন' নাটকের নবীন নাট্যকার
সলিল সেন। বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে প্রতি সোম, বুধ ও
শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ও রবিবার এবং ছুটির
দিন সকাল দশটার 'ডাউন ট্রেন' অভিনীত হচ্ছে।

ডানদিকে—নট ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য—নাট্যকার হিসেবে বহু পূর্বেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—।
বিশ্বরূপার সর্ব রেকর্ড ভংগকারী "ক্ষুধা"—বর্তমান অবিস্মরণীয় সৃষ্টি "সেতু" নাটকের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় প্রদানের
পর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ গিরিশ থিয়েটারের সর্বপ্রথম নাটক 'ডাউন-ট্রেন'-এ নরেন দালালের চরিত্রে অদ্ভুত অভিনয়
.....কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।.....

তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পার্থিব সমস্ত শিল্পের মত
চিত্রগ্রহণ শিল্পেরও লক্ষ্য হচ্ছে চিরস্থায়ী...চির আনন্দময়
পরমপুরুষ। তাই সমধর্মী চিত্রশিল্পী ও আমার পাঠক-
পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে ঐ একই কথা বলতে চাই—যে কোন
শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পী যেমন সেই পরম স্রষ্টার
আনন্দময়তার স্পর্শে রাঙ্গিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকবেন,
তেমনি যে সৃষ্টির মাঝে সেই অনৈসর্গিক সৌন্দর্য বা
রসমাধুর্য ধরা পড়বে—তাকেই কেবল যেন শিল্প বলে

গ্রহণ করবার জ্ঞান রসগ্রাহী মন তৈরী হয়ে থাকে।
অর্থাৎ শিল্পের মধ্য দিয়ে তাঁকে ভজনা করতে প্রস্তুত থাকেন।
ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥

আগামী কার্তিক সংখ্যা

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হবে।

★ প্রতীক্ষায় থাকুন ★

“আমি রক্ষমা—জানাই প্রণতি”

॥ একুশটি বছর শরৎ-শিশিরে স্নাত জীবন আমার ॥

সিবিল এনডাইক ও স্মার লুইকাসন

বাংলা নাট্যমঞ্চের অভিনয় দেখে আমরা উভয়েই খুব মুগ্ধ।

মার্কিন চলচ্চিত্রবিদ ফ্র্যাংক ক্যাপরা

আমাদের প্রতি বেশী নির্মম হনো না—আমরাও তোমাদের ভালবাসি। বাংলা ছবির মানে খুশী হয়েছি।



প্রতিভাময়ী গীতা দে—সরকার ভাভুবর্গের প্রশংসনীয়
প্রচেষ্টা গিরিশ থিয়েটারের সর্বপ্রথম নাটক ‘ডাউন ট্রেনে’।

ভিনিসি ও

(ইটালী)

ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের ও আমাদের সরকারের
পক্ষ থেকে বাংলা ছবির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার
কথা জানিয়ে গেলাম।

মিশরীয় প্রতিনিধি—বাংলা ছবির প্রতি আমার গভীর
অহুরাগের কথাই বলে যাচ্ছি।

রোজার ম্যানভেল (ব্রিটিশ ফিল্ম একাডেমী,
পিকাভেলী লগুন—রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে লিখিত—)
আমার মনে হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আর ব্রিটিশ
ফিল্ম ইনস্টিটিউট দুইকে নিয়ে আপনি একটু ঘন্থে
পড়েছেন। দি ব্রিটিশ ফিল্ম একাডেমী একটি সীমাবদ্ধ
কুণ্ঠিমূলক প্রতিষ্ঠান—যার মূলে রয়েছে পুরোন
অভিজ্ঞ চলচ্চিত্রবিদরা। দি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট
আরো ব্যাপকতর কর্ম পদ্ধতি নিয়ে গঠিত। চলচ্চিত্র
সম্পর্কে যারা বিশেষ ভাবে অহুশীলন-ব্রতী, তাঁদের
তথ্যাদি সরবরাহ ইনস্টিটিউটের একটি বিশেষ
কর্তব্য। আমি আপনাকে অহুরোধ করবো—এঁদের
সভ্য হয়ে সরাসরি সংযোগে আসতে—। ভবদীয়—
রোজার ম্যানভেল (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯,
ইংরেজীর অহুবাদ।)

মরিস পি কুবেন—(হামসটিড, লগুন) আপনার
পত্রিকার লগুন ও আমেরিকার জ্ঞাত প্রতিনিধি
হিসেবে আমায় যদি গ্রহণ করেন, খুবই খুশী হবো।
আমি বহু পত্র-পত্রিকার সংগে জড়িত। আপনার
নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।

স্বর্গতঃ ডক্টর প্রভু গুহচাঁকুরতা—রূপ-মঞ্চ স্বীয়
বৈশিষ্ট্যে সকলেরই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

জ্যোতর্ময় রায়—সত্য ও স্নন্দনের সত্যিকারের
পূজারী রূপ-মঞ্চ—তাকে আমার অভিনন্দন জানাই।

অধ্যাপক ভট্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী—
যে মানুষ নির্দার সংগে যে কর্ম গ্রহণ করে—সেইটাই
তার ধর্ম—

স্বামী কালীকানন্দ অবস্থত—কথা দেওয়া, কথার
কথা নয়।

অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য—আমাদের দেশে চাই
সেই নাট্যকার, অভিনেতা ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক—
যারা শিল্পদর্শের ভেতর দিয়ে মানুষের জয়যাত্রার
পথ স্ফুর্ম করে দেবে এবং সর্বসাধারণকে স্বাধীনতার
ও সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে জীবনের জয়গান
শোনাবে।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. পি—
রূপ-মঞ্চকে পরিচালনা করার কৃতিত্ব আপনার।
আশা করি আপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
পথনির্দেশ জানাবার দৃষ্টি নেই। কিন্তু আনন্দে
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি!

অমল হোম—(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের ভার-
প্রাপ্ত সর্বপ্রধান হোতা)। সবচেয়ে ভাল—আর যার
জন্তু আপনাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই—আপনি
ছবিতে বা লেখায় কোথাও লালসা-সালসার কারবার
খোলেননি। রিরংসা আপনার অভিপ্রেত নয়।

কবি নলিনীকান্ত সরকার (পাণ্ডুচরী)—

সুমহান লক্ষ্য তব

সুবিপুল মহিমায়

সত্য হোক, সিদ্ধ হোক

সুন্দরের সাধনায়।

শান্তিদেব ঘোষ (শান্তিনিকেতন) আমরা যেন সহজ-
লভ্য মনোরঞ্জনের আদর্শে কখনও অন্তর্প্রাণীত না হই।
চিত্র পরিচালকেরা সকলেই শিক্ষিত—তাদের সামনে এই
চিন্তাই থাকা উচিত যে, দেশের চিত্রকে উন্নততর-লোকে
ওঠাতে হবে তাদের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের দ্বারা। রূপ-মঞ্চ পত্রিকাটি
নাট্য-মঞ্চ, চলচ্চিত্র, সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে নির্ভয়ে মত
প্রকাশ করে সাধারণের রুচির উন্নতির পক্ষে সহায় হোক।

নাট্যকার ও পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট—

খাতার পাতায় লেখা থাকে শুধু নাম,

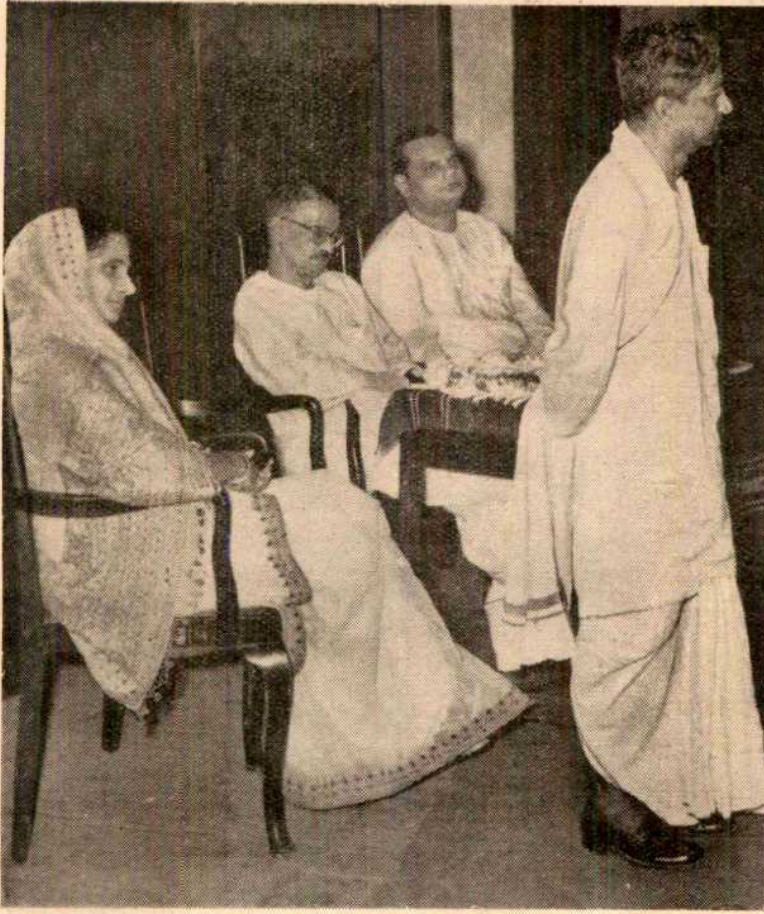


বিশ্বরূপ। রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ দু'শত রজনীর অভিনয়োৎসব
উদ্বাপিত বর্তমান কালের অবিদ্যরণীর নাট্য-সৃষ্টি 'সেতু'
নাটকের একটি দৃশ্যে জয়শ্রী সেন ও মমতাজ আমেদ।

আসল মানুষ কোথায় যে চলিয়া যায়,
কেহ তা জানেনা, কোথায় তখন ধাম
বন্ধুরা হেথা করে শুধু হায় হায়।

কবি শৈলেন রায়—যার লাগি তোর কাঁদে প্রাণ
সেইতো ভগবান।

কবি নরেন দেব—ছবির প্রধান কর্ণধার হচ্ছেন সুপটু
পরিচালক। তিনি ক্যামেরাম্যান—আলোক শিল্পী, শব্দ
যন্ত্রী, কলানায়ক, মঞ্চ স্থপতি, সুরশিল্পী ও অভিনেতৃ-
বৃন্দের সহযোগে তাঁদের সকলকে মিলিয়ে একটি সংযুতি



বিগত ২০শে আগষ্ট বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'সেতু' নাটক দ্বিশতম রজনীর অভিনয়োৎসব উদ্‌যাপন করে। অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। এখানে এঁদের সংগে বিশ্বরূপার শ্রীরাসবিহারী সরকারকে দেখা যাচ্ছে। সেতু পরিপূর্ণ নাট্যগৃহে তিনশত রজনীর অভিনয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।.....

ও সৌসাম্যের মধ্যে চিত্রনাট্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে আপন কল্পনার রং-এ মৃত স্বপ্নের মতো ফুটিয়ে তোলেন ছবির পর ছবি সাজিয়ে তোলার কলা সম্মত নৈপুণ্যে।

অক্ষয়কুমার নন্দী—(অমলাশংকরের পিতা) বহির্জগতের রূপকে যারা অন্তর্জগতের রূপের দিকে নিয়ে গিলিয়ে দিতে পারেন, সেই শিল্পীগণকে নমস্কার করি।

উঠেছে—তার শুভ জন্ম তিথিকে আজীবন অভিনয় ব্রতী। আমি আমার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠালুম, সে দীর্ঘ জীবন লাভ করুক। আমাদের সাহিত্যকে, শিল্পকে, আমাদের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলুক।

অর্গতঃ দেবোপ্রসাদ ঘোষ (চিত্রশিল্পী) :—রূপ-মঞ্চের শুভ কামনা করি।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য—আমি আশিশব ভরত নাট্যম-এ উৎসাহী। আগেকার জন্ম মানলে বলব যে, সে জন্মে নট ছিলাম। এখানে এসে (রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে) আমি পূর্ব জন্ম সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হলাম।

অর্গতঃ তুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :—যারা জীবনে অভিনেতা হবার চেষ্টা করেন—তাদের কার্কে, কর্মে, চিন্তায়, অভিনয় করছি—এমনি 'একটা ভাব দেখা যায়। বিশেষ করে এই সিনেমার যুগে একদল কল্পনা-বিলাসী ছেলে আছে, যারা সর্বদাই মনে করে, তারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে। এটা তাদের কথাবার্তা, হাবভাব থেকে পরিস্কার বুঝতে পারা যায়। তখন আমার অভিনেতা হবার প্রবল ইচ্ছা। কার্কে, কর্মে, জাগ্রতে, নিদ্রিতে সব সময়ই স্বপ্ন দেখছি, 'আমি অভিনেতা—আমি আর্টিষ্ট।

অর্গতঃ বিশ্বনাথ ভাট্টা—যে তরুণ পত্রিকা মাত্র কয়েক বছরের ভিতর সর্বজনপ্রিয় হয়ে

স্বর্গত: নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী :—

“স্মৃতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভাল।

কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে যে হয় কালো ॥”

স্বর্গত: অভিনেতা ধারাজ ভট্টাচার্য—

জীবনের যাত্রা পথে, অগণিত যাত্রি চলে

বিরাম বিশ্রামহীন, কেবা মনে রাখে?

তবু তারি মাঝে, ক্ষণিক দাঁড়ায়ে স্মৃতির ফলকে যারা

পদ চিহ্ন আঁকে, তারা মনে থাকে।

নট ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য :—

বাঞ্ছা থাকিলে বাজার খরচ,

আকাশে দেবতা থাকে

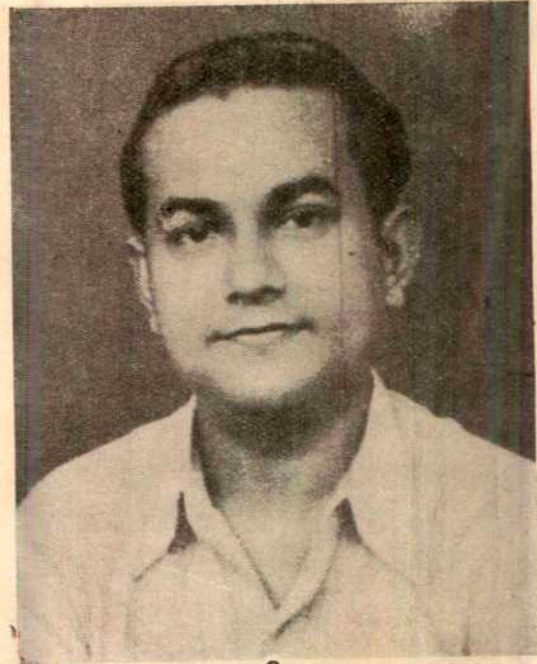
না থাকিলে টাকা দেবতাও ফাঁকা

গালি দিই যাকে তাকে।

নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত :—ছেলে বেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে যাত্রাগান শুনতে যেতুম, সকালে এসে মার খেতুম। তবু ভাল লাগতো থিয়েটার, যাত্রা। চাকরী ছেড়ে এলুম থিয়েটারের নেশায়। দিল্লী ছেড়ে কলকাতা। আজ থিয়েটারের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবু থিয়েটার বাঁচুক, থিয়েটারের উন্নতি হোক, এই কামনা করি।

নাট্যকার জ্যোৎস্না নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—যাত্রার নাটকে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে, কোন সমালোচকের তা দেখবারও অবসর নাই। কোন যুগে ভীম ঝাঁকড়া চুলে গদা ঘুরিয়ে আসর মাং করেছিল—সেই কথাটাই তাঁরা মনে করে রেখেছেন এবং প্রয়োজন মত তার উল্লেখ করে রসস্থিতি করেন। সে ভীম যে আর নেই, হুমুমানের ল্যাজ যে খসে গেছে, কুস্তকর্ণের নাকের ভেতর যে আর বানর সৈন্য ঢোকেনা, সে খবর এঁদের অজানাই রয়ে গেল। এজগতের বহু নিন্দিত মানুষগুলোরও হয়ত কিছু বলবার ছিল এবং আছে—রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশবাবু ছাড়া সেকথা আর কেউ জানতে চান না।

নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত :—শ্রীজ্বরেন নিয়োগীর মাধ্যমে আলাপ হয় কলেজের ছাত্র রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের সংগে। সেখানেই একদিন জ্ঞানচন্দ্রের নির্দেশ-নামার বাস্তব রূপ দিতে পরিকল্পনা হয় রূপ-মঞ্চ পত্রিকার।



উপরে—৬সুধীরলাল চক্রবর্তী। নীচে—৬মৃণালকান্তি ঘোষ।





॥ সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কিছুদিন পরে সুরেনদার নামানুসারে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হল। সকলের মনে সংশয়ও উপস্থিত হল—এধরণের পত্রিকা চলবে কিনা? কিন্তু আদর্শ এবং প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁদের সংশয় দূর করে দিল।.....আলীপুর আদালতে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের দাদা অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের নামে

প্রথম বার তাঁর নামও নামজুর করা হলো—তিনিও সুরেনদার চন্দ্রের দলভুক্ত এবং তদানীন্তন ছাত্র ফেডারেশনের দলভুক্ত বলে। তাই বার্ষিকী হিসেবেই শেষ পর্যন্ত প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। পরে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক রাজনীতির সংগে জড়িত থাকবেন না বলে লালবাজারের তদানীন্তন

জানেন কাঁ!

সারা ভারতে একমাত্র বাংলায় পাঁচটি নাট্যশালার পাদ-প্রদীপের শিখা সপ্তাহের প্রতিদিনই অনিবার্ণ শিখায় দীপ্তিভাত! প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যায় এবং প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়:—

॥ বিশ্বরূপায়—সেতু ॥

॥ ষ্টারে—শ্রেয়সী ॥

॥ মিনাভায়—অঙ্গার ॥

॥ রঙমহলে—সাহেব বিবি গোলাম ॥

আর সহরে সর্বাধুনিক গিরিশ থিয়েটার-এর নিবেদন “ডাউন ট্রেন” অভিনীত হয় প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং রবিবার ও ছুটির দিন সকাল সাড়ে দশটায়।

ডিক্লারেশনের আবেদন করা হল। কিন্তু তিনি সুরভাষচন্দ্রের দলভুক্ত রাজনৈতিক কর্মী—বিশেষ করে শিয়ালদহ ডাকাতি মামলার সংগে জড়িত থাকায় তা না-মঞ্জুর হল—প্রেসের কর্ম কর্তারাও (বেঙ্গল কো-অপারেটিভ প্রেস) আতংক-গ্রস্ত হয়ে উঠলেন। তখন কিন্তু পত্রিকার অনেকখানি ছাপাও হয়ে গেছে। অগত্যা রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের নামে আবেদন করা হলো—কিন্তু

প্রেস বিভাগে মুচলেকা লিখে দেন এবং রূপ-মঞ্চের সংগে রাজনীতির কোন যোগ থাকবে না—এবিষয়ের ডিক্লারেশন দিয়ে নতুন করে আবেদন করেন। এবার আবেদন মঞ্জুর হলেও প্রেসের কর্তার মন থেকে রাজনীতির ভয় দূর হলো না। তাই প্রথম সংখ্যাই হলো এই প্রেসে ছাপানো শেষ সংখ্যা। তখন রূপ-মঞ্চের কার্যালয় ছিল হেডুয়া বা কলেজ স্কোয়ারের বেষ্ট কিস্টা বেথুন কলেজের সামনের জন-বিরল ফুটপাথ।...এই সময় দেখেছি কালীশের অদ্ভুত পরিশ্রম করার ক্ষমতা। ‘ব্যবসা বাণিজ্য’ পত্রিকায় কাজ কচ্ছে—হয়ত খেয়েছে ছু’পয়সার মুড়ি অথবা চিনে বাদাম। কিন্তু এতে তাঁর মনের মাঝে চিড় খায়নি। রূপ-মঞ্চ পরিকল্পনার পর যেন মনের আনন্দ শতগুণে বেড়ে গেল। যে পথ চেয়েছিল—তাই পেয়ে শতগুণ উৎসাহে সব কাজ করে এই পত্রিকা নিয়ে মেতে উঠল। ক্রমে ক্রমে রূপ-মঞ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করে চললো। কালীশের পরিশ্রমের মূল্য সে পেল। রূপ-মঞ্চ অনেক দুঃখ কষ্টের উপরে আন্তরিকতার বনেদে তৈরী—তাই তার জয় চিরদিনের—চিরকালের জয়।”



● নাট্যকার মমথ রায়—“রূপ-মঞ্চের জয়যাত্রা অব্যাহত থাক, আজকের দিনে এই আমার আন্তরিক কামনা।”

● নাট্য পরিচালক শিশির মল্লিক—রূপ-মঞ্চের সেবা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যতে রূপ-মঞ্চ আরও অনেক কিছু করতে পারবে, সে ভরসাও রাখি।

● নাট্য পরিচালক যামিনী মিত্র—রূপ-মঞ্চকে সুন্দরতর করিবার আপনার যে প্রচেষ্টা, প্রার্থনা করি সে চেষ্টা আপনার সফল হোক!

● অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—“শিবাস্তে সন্ত পস্থানঃ” আপনাদের গমন পথ মঙ্গলযুক্ত হোক।

● কর্মবীর দক্ষিণেশ্বর সরকার (বিশ্বরূপা ও গিরিশ-থিয়েটার)—নাট্যকলার সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠা। বিশ্বরূপা নিয়ে ব্যবসা করবার কোন লক্ষ্য নেই।

● নাট্যবিদ রাসবিহারী সরকার (বিশ্বরূপা ও গিরিশ থিয়েটার)—কিছুই জানিনি, এই জানি।

● নাট্যকার শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (লোক নাট্যম)—

হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছে মহান.....
.....কাজী নজরুল ইসলাম।

অভিনয়কে আমি যোগসাধন মনে করি।

● নরেশ চক্রবর্তী—লোকরঞ্জন আমার ব্রত।

● নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়—বন্ধুবর কালীশবাবুকে আন্তরিক স্নেহশীষ জানাই।

● সত্যেন ঘোষাল—রূপ-মঞ্চ আমার অন্তরের জিনিষ।



★ মিনার্ভায় ★

“অস্থার”

হে মোর মরমা তোমা সবাঁকার গরবে গরবিনা রাই আমি—

—:০০০:—

নটসূর্য অহোম্ম চৌধুরী—(ডীন, নৃত্য, নাটক, সংগীত একাডেমী, পশ্চিম বাংলা সরকার)—রূপ-মঞ্চ একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করেছে জেনে সুখী হলাম, এবং আশ্বস্তও হলাম। আশ্বস্ত হলাম এই কারণে যে, যে পত্রিকা একবিংশতি বর্ষের দুর্গম পথ পার হয়েছে, তার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ রূপ-মঞ্চ



—:০০০:—

যে ধরণের পত্রিকা, তার মধ্যে নাট্য ও চিত্রলোকের নানাবিধ পরিচিতি ও আলোচনা থাকলেও, একটা নিজস্ব ধারা বিদ্যমান। এই ধারা যে বিস্তৃত না হয়ে আজও সমান ভাবে প্রবাহমান, এতে নাট্যালোক সেবী হিসেবে আমার পক্ষে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হবার কারণ রয়েছে। রূপ-মঞ্চ রঙ্গ ও চিত্রজগতের পত্রিকা বটে, কিন্তু লক্ষ্য করেছে, ষোঁকটা এর সাধারণ এবং বহুল আচরিত বিকৃতি-বিলাসের দিকে নয়, নাট্য-উন্নয়ন এবং ইতিহাসের দিকে যে মনোযোগ এ পত্রিকার দেখতে পাই, তার একটা সুফল আছে বলে মনে করি। বিশেষ বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ না থাকলে এটা হওয়া সম্ভব ছিল না। জাতির নাট্যকলা ছুঁতাগে অল্পশীলন করা প্রয়োজন।

এক, প্রত্যক্ষ ভাবে নাট্য-প্রযোজনায় মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে নাট্যরচনাকেও আমি অন্তর্গত করতে চাই, আর এক হচ্ছে, এর বিশেষ দৃষ্টিকোণ, এর আংগিক উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি এর শিল্প আবেদনের যথার্থ মূল্যায়ন ও সম্প্রচার, তার ইতিহাস নিয়ে, তার ব্যক্তি নিয়ে, তার অগ্রগতি নিয়ে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে এবং সেটা সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-রচনার মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য, শেষোক্ত প্রয়াস বহুলাংশে নিষ্ঠাবান পত্র ও পত্রিকার ওপর নির্ভর করে। রূপ-মঞ্চ এদিকে বিশেষ মনোযোগী বলে, তার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। আমি এর সর্বাংগীন উন্নতি ও সম্প্রসারণ কামনা করি।

প্রীতি নিও।

★ নাট্যবিদ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—প্রায় ২০ বৎসর রূপ-মঞ্চ পাঠ করিতেছি। মঞ্চের ও পর্দার এমন বলিষ্ঠ পত্রিকা একখানিও নাই। যদিও এখন অনেক পত্রিকা হইয়াছে, তবুও শিল্পী, নাট্যকার ও প্রযোজকদের একপ নির্ভরযোগ্য পত্রিকা আমার চোখে পড়ে নাই। প্রথম আত্মপ্রকাশ হইতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিবে—ঠাকুরের নিকট ইহার শ্রীযুক্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।



কোন দিনই ভুলবো না আপনাদের : গীতা দত্ত (রায়)

★ নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস (সম্পাদক, অভিনেতৃ সংঘ)—
একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করার শুভ মুহূর্তে আমি মঞ্চ ও
চিত্রজগতের শিল্পীদের তরক থেকে আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা জানাই এবং শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি
রূপ-মঞ্চের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি।

★ নাট্যসম্রাজ্ঞী সরস্বতী—এমন কাগজই আজ দরকার,
যে কাগজ একদিকে আমাদের দুর্বলতা শুধরে দিতে সজোরে
আঘাত করবে, আবার বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে
আমাদের রক্ষা করতে নিজে আঘাত পেতে নেবে। রূপ-
মঞ্চের জয়—বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যশিল্পের জয়।

★ সর্বজনপ্রিয় পাহাড়ী সাণ্ডাল—ভাই কালীশদা, গতানু-
গতিক ভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা আমার মত বিকৃত।
তবে তোমার রসিকমন আমাকে চিরকালই আকৃষ্ট করেছে।
তোমার 'মাছভাত' আমাকে চিরকাল পরিতৃপ্ত করেছে।
তোমার সে রসিক মনের পরিচয় রূপ-মঞ্চের পাতায়



সবাই বলে শিল্পী আমি মন্ত,
মোটাই আমি নই সেরকম চোন্ত;
সবার মতই খাই চচ্চরী পোন্ত,
সবাই আমার অন্তরঙ্গ দোন্ত। —ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

পাতায় পরিস্ফুট। তাই সেই রূপ মঞ্চ ও তার স্রষ্টার
মঙ্গল কামনা চিরদিনই আন্তরিক ভাবেই করি। শুধু তাই
নয়—এই রূপ মঞ্চ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, এই
প্রার্থনাও ভগবানের কাছে করি।

★ অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়—জীবনে অভিনেতা হবার
চেষ্টা কোরতে হলে প্রতি কাজে, কর্মে ও চিন্তায় অভিনয়
কচ্ছি এমন একটি ভাব বজায় রাখতে হবে।...রূপ মঞ্চ



কালীশদা আর রূপ-মঞ্চ—দুইই আমার কাছে সমান
প্রিয়।.....সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

দীর্ঘ একুশ বছর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদেরই জয়
ঘোষণা করে চলেছে। রূপ মঞ্চ আর কালদা (সম্পাদক)
দুইকেই আমি অন্তরের সংগে ভালবাসি। আমাদের
ভালবাসার জয় হউক, রূপ-মঞ্চের জয় হউক।

★ কমল মিত্র—শারদীয়া সংখ্যায় রূপ-মঞ্চ একবিংশতি বর্ষ
অতিক্রম করেছে—সেজ্ঞা চেয়েছেন আমার শুভেচ্ছা—
আমার মত বাংলা দেশের এক নগণ্য অভিনেতার
শুভেচ্ছাবাগীর কোনও মূল্য আছে কিনা জানিনা, তবু
বলবো—রূপ-মঞ্চের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় বোধহয়
কম করেও ১৫/১৬ বছরের। এবং বরারবই দেখে
আসছি—একই ভাবে ‘রূপ-মঞ্চ’ নিজ স্বাভাবিক বজায়
রেখে আজও পর্যন্ত মঞ্চ ও চিত্রজগতের সেবা করে
আসছে নিঃস্বার্থ ভাবে মাথা উচু করে—দীর্ঘ, স্থির, দৃঢ়
পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—তার গন্তব্য পথে, সকল বাধা
চূর্ণ করে। কোথাও উত্থাস বা অবহেলা নেই। তাই



“আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে
লিখো না আমার নাম।” —সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আজ ষাটবিংশতি বর্ষে পদার্পণ মুহূর্তে সেই কামনাই জ্ঞানচ্ছিন্ন,
চিরদিন যেন এইভাবে মাথা উচু করে চলতে পারে রূপ-মঞ্চ
সকল প্রলোভন ত্যাগ করে।

★ মলিনা দেবী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, জি,
এনটারপ্রাইজ)— “অরূপ যেথায় রূপের মাঝে
বাজায় রূপের স্বর
মঞ্চ সেথায় পরিবেশন করে
রূপেরই স্বর।”

এই রূপ আর মঞ্চের সমন্বয় নিয়ে দীর্ঘ একবিংশতি
বর্ষ ধীরে ধীরে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর আদর্শে গড়ে
উঠেছে রূপ মঞ্চ। রূপ মঞ্চ আবাহন করে নূতনকে কিন্তু
সেই সংগে বিশ্বস্তির অতল তলে দেয়না বিসর্জন পুরাতনকে।
সত্যিকারের মানবতার বিরাট দিকটা সমস্ত রাজনৈতিক
দলাদলির উদ্দেশ্য থেকে পরিবেশন করবার ব্যাপারে সজাগ



শিল্প ও শিল্পীর এমন দরদী বন্ধু খুব কমই আছে—অনিল বাগচী।.....সংগীত স্বর্গীয় শিল্প—এ, কানন।

প্রহরী। দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ সতর্ক। প্রগতিকে মাথায় তুলে নাচাতে গিয়ে রূপ মঞ্চ অস্বীকার করে না অতীতকে। তাই এই নূতন আর পুরাতনের মাঝে দলাদলি মুক্ত বরগীষ রূপ-মঞ্চের যাত্রা পথ হউক মঙ্গলময়—মঙ্গলময়ের কাছে এই নিবেদন।

★ জহর গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলা দেশের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সেবায় আপনার দান চিরস্মরণীয়। রূপ-মঞ্চ শুধু পাঠকদেরই নয়—আপনার পত্রিকাকে আমরা আমাদের বলেই জানি।

★ শোভা সেন (লিটল থিয়েটার গার্ল)—শিল্পের মধ্য দিয়েই জাতির সেবা করছি বলে মনে করি।

★ নীতীশ মুখোপাধ্যায়—রূপ মঞ্চের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

★ শিপ্রা মিত্র ও শিশির মিত্র—রূপ মঞ্চ আমাদের যেমন প্রিয়—সকলের কাছে তেমনি প্রিয় হোক।

★ স্বর্গতঃ রণজিৎ রায়—আমার শুভাকাংখী দর্শকবৃন্দকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

★ বিপিন গুপ্ত—দূরে আছি তবু, দূরে নাই তোমারি মনের মণিকোঠা পরে আমি যে প্রবাসী ভাই।

★ রাজলক্ষ্মী দেবী ও আশা দেবী—রূপ-মঞ্চকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও নমস্কার।

★ বনানী চৌধুরী—মাহুসকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারাতেই শিল্পীর সত্যকার সার্থকতা।

★ গঙ্গাপদ বসু (বহুধর)—জনগণের জ্ঞান নাটক চাই।

★ শঙ্কু মিত্র—আমার একান্ত কামনা, মাহুসের সম্মান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক।

★ নাট্য সম্রাজ্ঞী তৃপ্তি মিত্র—পরের কথা বলে বলে এমন-বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে যে, নিজে কিছু বানিয়ে বলতে গেলে বড়ই বিপদে পড়ে যায়। তবে এইটুকুই বলতে পারি—যেন সত্য জিনিষ তার ঠিকমত মর্যাদা পায়।

★ সবিতাত্রত দত্ত—রূপ-মঞ্চের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।



কালের যাত্রার ধ্বনি,
আমারে নিতেছে টানি, অনন্ত যাত্রায়।—
তাই এ যাবার পথে, মোর নাম তব পাতে,
স্থান পেতে চেয়ে। —জগন্নাথ মিত্র।

- ★ ভূপেন চক্রবর্তী—আমি শিল্পী তাই রূপের পূজারী আর মঞ্চ আমার প্রাণ। তাই রূপ-মঞ্চ আমি ভালবাসি।
- ★ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।
- ★ বসন্ত চৌধুরী—শিল্পজগতে প্রবেশ করবার পূর্বে থেকেই আমি রূপ-মঞ্চের গ্রাহক। রূপ-মঞ্চ থেকে প্রেরণা পেয়েছি। রূপ-মঞ্চের জন্ম সব সময়ই আমার শুভেচ্ছা রইল।
- ★ নির্মলকুমার—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।
- ★ নাট্যসম্রাজ্ঞী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—অভিনয়ই মাছুষকে বাঁচিয়ে রাখে।
- ★ অজিত চট্টোপাধ্যায় রূপ-মঞ্চ ও কালীশদাকে যে কতখানি ভালবাসি, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করি তা লিখে বা মুখে না জানানোই ভাল। কবিগুরুর গানের মধ্য দিয়েই তা জানিয়ে দি।



তাই কালীশ বাবু, সেই করবার মত দামী সেই আমার
নয়—তবুও আপনার দাবীকে ফাঁকি দেওয়া গেল না—
তাই সুই! —সত্য চৌধুরী।

ডাকবোনা আর ডাকবো না

অমন করে বাহিরে থেকে ডাকবো না
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব
বাহিরে থেকে না—না না।

- ★ গ্রাম লাহা—(ছয়া) জীবনকে উপভোগ করতে হলে শুধু হাসো—
- ★ রসনাগর ভাই বন্দ্যোপাধ্যায়—হাসলে লিভার ভাল থাকে।
- ★ শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫।৭।৫১ তারিখের প্রথম আলাপ, মোর মনের মলিনতা করে দিল ফাঁক।
- ★ রসশ্রষ্টা জহর রায়—রূপ-মঞ্চ আর কালীশদা দু'য়ের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম।
- ★ আরতি মজুমদার—রূপ-মঞ্চের দীর্ঘতর জীবন কামনা করি।
- ★ অনিতা গুহ—রূপ-মঞ্চের দীর্ঘতর জীবন কামনা করে শ্রীবুদ্ধ কালীশবাবুকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
- ★ ওম প্রকাশ—বিশ্বস্তির অতল তলে তলিয়ে যাবার

সংগে সংগেই আমাদের মৃত্যু হয়।

★ স্বর্গতঃ কুলদীপ কাউর—শিল্পের শেষ নেই।

শিল্প পত্রিকা রূপ-মঞ্চের প্রতি শুভেচ্ছা।

★ স্মিত্রা দেবী—আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
জারাই

★ স্বাগতা চক্রবর্তী—আমার প্রিয় রূপ-মঞ্চের
শুভেচ্ছা কামনা করি।

★ অভি ভট্টাচার্য—আমি যেন বাংলা চিত্র-
শিল্পকে আমার স্বল্প চেষ্টায় উৎকর্ষ বিধানে আমার
জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

★ মিতা চট্টোপাধ্যায়—রূপ-মঞ্চের
জন্ম রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

★ শীলা রোমানী—জীবনের ওপরই
জীবন নির্ভরশীল। ★ রুমা দেবী—
আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা।



আজকের দিনটির কথা কোন দিনই ভুলবো না।—আলপনা

★ কিশোরকুমার—ভাগ্যই সব কিছুর নিয়ামক—সর্বশ্রেষ্ঠ
শুভেচ্ছা। ★ চন্দ্রাবতী দেবী—আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

★ অহুতা ওপ্তা—মুখের কথা চোখের ভাষা, বন্ধু হবে যবে।
হাতের লেখা মৌন রেখা, তখন কথা কবে ॥

★ মলয়া সরকার—কেলবার সব জিনিষগুলোরে
রাখিবার মিছে চেষ্টা,
ধুলির প্রাপ্য ধুলিরে না দিলে
জঞ্জাল জমে শেষটা।

★ সুনন্দা দেবী—আমরা থাকি অনেকের অলক্ষ্যে, কিন্তু
রূপ-মঞ্চের সম্পাদক আলেখ্যাগার মাঝে নিয়ে আসেন
আমাদের বাইরে।

★ সুনীরকুমার—প্রত্যেককে জানাই আমার নমস্কার।

★ অঞ্জলি দেবী—আমি বলতে কিছুই আসেনি। শুধু নিজে
এসেছি যারা এখানে রয়েছেন—তাদেরই আশীর্বাদ।

★ মঞ্জু দে—রূপ-মঞ্চকে আর নতুন করে কী শুভেচ্ছা
জানাবো—তার প্রতিসব সময়ই রয়েছে শুভেচ্ছা।

★ অপর্ণা দেবী—রূপ-মঞ্চ আমাদের—এইটেই আমার
কাছে বড় কথা।



রূপ-মঞ্চের জন্ম রইল আমার সক্রিয় ধন্যবাদ।

সাবিত্রী ঘোষ।



রূপ-মঞ্চ আর কালীশ দা আমার অন্তরের জিনিষ।
রূপ-মঞ্চের কাছে বড় ছোট নেই—সবাই সমান। রূপ-
মঞ্চের জয় হোক। —হীরেন ঘোষ।



★ জয়শ্রী সেন—নিজের কথা ভাবতে গেলেই রূপ মঞ্চের কথা মনে পড়ে। ★ তপতী ঘোষ—কালীশদা আর রূপ-মঞ্চকে পৃথক ভাবে ভাবতে পারি না। ★ প্রবীরকুমার চৌধুরী—মানুষ ইচ্ছামত কাজ করে, কিন্তু ইচ্ছা তার ইচ্ছা-ধীন নয়। ★ বাসবী নন্দী—সুখই জীবনের শেষ নয়—চরিত্রবলই জীবনের সবকিছু। ★ আশীষকুমার—অভিনয়ের মধ্যেই জীবনকে জানবো। ★ কণিকা ঘোষ—শিল্পই আমার জীবনের সাধনা। ★ সুলতা চৌধুরী—আমার শিল্প জীবনে রূপ-মঞ্চের ঋণ কোনদিনই ভুলবো না। ★ নলিনী জয়ন্তী—(ইউনিক পার্ক বধে) কলকাতা থেকে মঙ্গলমত ফিরে এসেছি। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে আপনাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ★ অশোককুমার—(বধে) আমার দীর্ঘ কুড়ি বছরের শিল্পী জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি সব সময়ই দেখেছি—জীবনের সংক্ষিপ্ত দুর্দিনগুলি দীর্ঘ মেয়াদী সুদিনের জন্য স্থান করে দিয়েছে। কৃতকার্যতাজর্জনের জন্য ধৈর্যাবলম্বনই জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার বেরা—বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের সর্বজন প্রিয় অচিন্ত্যকুমার বেরা দীর্ঘদিন ধরে অলংকার ব্যবসায়ের সংগে জড়িত আছেন। বাংলার শিল্পীদের রুচি ও খুশীমত অলংকারাদি পরম বিধ্বস্ততার সংগে সরবরাহ করে তিনি সকলের আস্থাভাজন হয়েছেন। ইতিপূর্বে যেসব প্রতিষ্ঠানে সংগে তিনি জড়িত ছিলেন—সে সব প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পূর্ণ যোগাযোগ করে বর্তমানে হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত জে, সরকার এ্যাণ্ড কম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। হাওড়ায় সর্বপ্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জে, সরকার এ্যাণ্ড কম্পানীর স্বর্ণালংকার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শ্রীজগজ্যোতি সরকারও দেসবাসীর কাছে অপরিচিত নন। শ্রীসরকারের স্বত্বাধিকারিত্ব এবং শ্রীবেরার পরিচালনায় নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের আস্থার্জনে সক্ষম হয়েছে জেনে আমরা খুশী হলাম। প্রতিষ্ঠানটির আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।.....

মোর পাতায় পাতায় যুগযুগান্তের তরে, তোমাদের পদচিহ্ন যত, রাখিয়াছি ধরে—

—:::—

অপরাজেয় প্রয়োগ শিল্পী অর্গতঃ প্রমথেশ বড়ুয়া—
পরিচালকের দৃষ্টি—পরিচালকের চোখ হচ্ছে ক্যামেরার
লেন্স। তাঁকে সব সময়ই দেখতে হবে লেন্স দিয়ে। তাঁর
কল্পনা রাজ্যে পৌঁছতে হবে—ক্যামেরার তিতর দিয়ে।
তা না হলে ঝাপসা হয়ে থাকবে তাঁর দৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টি—তাঁর
অন্তর্ভুক্তি, তাঁর ছবি।

অর্গতঃ কবি অজয় ভট্টাচার্য—প্রগতির দিকে প্রতিক্রিয়ার
মোড় ফিরতে আব দেবী নেই বেশী। বাংলা সাহিত্য
আজ সেই প্রত্যক্ষ সত্যেরই বাহক। বাংলার নাট্যশালা
আর ছায়াছবিও স্থিতিবাদের মাটি কামড়ে আর বেশীদিন
পড়ে থাকবে বলে মনে হয় না। সেদিনও চায়েব দোকানে
জমবে ভিড়। বলবে, এ ছবিতে পাই আলো, আকাশ
আর মাটির স্পর্শ। এ ছবি সমাজের—এ ছবি আমাদের—
এ ছবি সকলের। ★ বাংলা ছবি সাধারণ্যে খুব বেশী চলে
কিনা জানিনে—তবে ছবির অগতঃ চালিয়ে নিয়ে রাখবার
ক্ষমতা বাংলা ছবি চিরদিনই থাকবে। রূপ-মঞ্চের মত
কাগজেরই অভাব ছিল এতদিন—যে পত্রিকা চিত্রজগত
আর জনসাধারণের মাঝে সেতু তৈরী করতে পারবে।
রূপ-মঞ্চের ত্রিপাথিবীর দপ্তর—স্টুডিও সংবাদ সরবরাহের
কায়দা—নিরপেক্ষ সমালোচনা—চিরদিন বাংলা চলচ্চিত্র
জগত মনে রাখবে। ঘাবরাইয়ে মাং—চলার পথে যেমন
আসবে অভিনন্দন—তেমনি আসবে ব্যর্থতা। এজন্ম
দমলে চলবেন। 'বেদনার অশ্রু যে বেদনার গাহে জর।
বভ্রানান বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্মক বি, এম,
পি-এ সভাপতি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়—
পরম কলাগীয়েষু, কালীশ, ২২ বছরে পদার্পণ করবার

গৌরব নিয়ে এবাব রূপ-মঞ্চ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার
সূচনা। চলচ্চিত্র-শিল্পের সেবায় তোমাদের পরিশ্রম
ও একনিষ্ঠ সাধনা যে পরম সাফল্য বিমণ্ডিত হয়েছে—
স্বনীয়—২১ বৎসরকাল তারই স্বাক্ষর বহন করে বেঁচে
আছে রূপ-মঞ্চ। শুধু স্বাদুস্বাদু বড়ো কথা নয়, রূপ-মঞ্চ
গোড়ে তুলেছে একটা ঐতিহ্য। অনাগত ভবিষ্যতে
যদি কোনদিন চিত্র তথা মঞ্চশিল্পের ইতিহাস রচিত হয়,
তবে আমি মনে করি, সে ইতিহাস গঠনে ও রচনায়
রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত বহু সারগর্ভ রচনাবলী সহায়
হবে। এবং তোমার চিত্রশালায় সংবক্ষিত ছবিগুলি সে
ইতিহাসকে আরো স্বদয়গ্রাহী করে তুলবে। আমার
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমরা গ্রহণ কর।
যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে
আজ তোমরা গৌরবের অধিকারী, আশা করি তোমার
স্বযোগ্য পবিচালনায় তা অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠবে।

অসিত চৌধুরী—বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে
রূপ-মঞ্চ পত্রিকার অগ্রদূত। তাহার পর আরো চলচ্চিত্র
সাংবাদিক ও সাময়িক পত্রিকার এই দেশে আবির্ভাব
হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যে রূপ-মঞ্চ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায়
রাখিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে—ইহা নতাই
আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। রূপ-মঞ্চের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য
হইল, ইহা বাংলা চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যের ধারক। ইহা
নিতান্তই দুঃখের যে, বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ সম্বন্ধে
এই যুগের অনেকেই অল্পবিস্তর অজ্ঞ। অথচ এই ইতিহাস
লজ্জার নহে, ইহা আমাদের গর্বের ও অহংকারের বস্তু।
নেই যুগে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র ছিল অপাংক্তেয়, গঠন-
শিল্পীরা অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ—অশিক্ষিত। বর্তমান
যুগের বিজ্ঞানের অবদানের স্বযোগ হইতে তাঁহারা ছিলেন
বক্ষিত। তাহা সত্ত্বেও বেশব ছবি তাঁহারা দেশবাসীকে
উপহার দিয়া গিয়াছেন—তাহা আমাদের মনে নিশ্চয়ের
চমক আনে। তাঁহারা ছিলেন সহায় সম্বলহীন, কিন্তু
অপূর্ব কৌশলী, হৃদয় সাহসী ও একনিষ্ঠ। প্রতিটি
পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁহারা হইতেন নিজেদের হৃদয়



বুদ্ধি ও অদম্য কর্ম দক্ষতা
লইয়া এবং তাহার জলন্ত
স্বাক্ষর থাকিত তাঁহাদের

প্রত্যেক ছবিতে। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বহু প্রয়োজনীয়
জিনিষ আজও বহু নুড়িওতে ব্যবহৃত হয় এবং এই দৃশ্যে
পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের মস্তক স্বতঃই অবনত
হইয়া পড়ে। অনাদর, অবহেলায় তাঁহাদের অনেকের
জীবনই অকালে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেই সব
চলচ্চিত্রের চিহ্নও আজ পাওয়া যায় না। আজিকার যুগের
চলচ্চিত্রের অগণিত পৃষ্ঠপোষক আর কোনদিন ইহাদের
দর্শন পাইবেন না। কিন্তু ইহাদের পরিচয় ও কীর্তি
জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরবার সক্ষম প্রচেষ্টার জন্য রূপ-মঞ্চ
বাস্তবিকই অভিনন্দন যোগ্য। ভবিষ্যতের সহিত বর্তমানের
পরিচয় করাইবার প্রচেষ্টাও রূপ-মঞ্চের আর একটি বৈশিষ্ট্য।
নিজদের আদর্শে অবিচলিত থাকিয়া রূপ-মঞ্চ সৃষ্টিরকাল
বহু রঙ্গমঞ্চের তথা দেশবাসীর সেবা করিতে থাকুক, ইহাই
আমার আশা ও প্রার্থনা।

★ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অজ্ঞাতম জনক বীরেন্দ্রনাথ
সরকার—রূপ-মঞ্চের গতি-প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে
অতীতে যেমন বহুবার তার সর্বাঙ্গক উন্নতির কামনা করে
সুভেচ্ছা জানিয়েছি—বর্তমানেও আর একবার রূপ-মঞ্চের
সর্বসাক্ষ্য কামনা করি।

★ দীপচাঁদ কাংকারিয়া—চিহ্নশিল্পের সেবায় রূপ-মঞ্চের
দান স্মরণীয় হয়ে আছে। রূপ-মঞ্চ তার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ
রেখে অগ্রসর হউক এই কামনা করি।

★ দিলীপ সরকার—জীবিতাং জ্যোতিরিতু হ্যায়াম।

★ মোহন মজুমদার—রূপ-মঞ্চের গুণমুগ্ধ পাঠক আমি
অনেক দিনের। আজকে এখানে আসা আমার জীবনের
একটা ঘটনা হয়ে রইল।

★ বি.এল. থেমকা—২৬ | ৪ | ৫৮ প্রথম আমি পদার্পণ
করলাম রূপ-মঞ্চ কাবাংলার—ভবিষ্যতে এমনি আরো
সুখকর উপস্থিতির স্বযোগ পাবার কামনা করে রূপ-
মঞ্চকে সুভেচ্ছা জানাই।

★ ডি, পি, আয়ার—জীবনকে হাস্তময় করে তুলুন।

হাসিও সুখ সমৃদ্ধে ভরা রূপ-মঞ্চের শুভ জীবন কামনা করি।

★ প্রযোজক সুধেন্দু দত্ত—চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন পত্রিকা
যে এত চিন্তা ও পরিশ্রম করেন বাংলার চলচ্চিত্র
ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য, সে ধারণা আপনার অফিসে
আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার ছিল না! আপনার
ও আপনার পত্রিকার সফলতা কামনা করি।

★ সুশীল মজুমদার—রূপ-মঞ্চ ২২ বৎসরে পদার্পণ করবে।
খুবই আনন্দের কথা এবং একে সুখবরই বলতে হবে।
ইংরেজী মতে কামিং অফ এজ—এ সময় উৎসবের প্রয়োজন
আছে বৈকি? এই দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পের
উন্নতির জন্যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন সবলে সরিয়ে দিয়ে রূপ-
মঞ্চ যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে—তার স্বাক্ষর থাকবে
ইতিহাসের পাতায়। পক্ষপাতহীন সমালোচনার গৌরব
সব সময় প্রাণসা পাবে। আজ পূর্ব যৌবনে আপনার
প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতার সাহচর্য লাভ করে রূপ-
মঞ্চের জীবন দীর্ঘতর হউক—জয়-যাত্রায় অগ্রগামী হোক।
ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনা করি। রূপ-মঞ্চ-এর বাধাহীন
অগ্রগমনে আমার সুভেচ্ছা সব সময়ের জন্যে সংগে রইল।

★ চিত্রাচার্য দেবকীকুমার বসু—প্রিয় কালীশবাবু সুভেচ্ছা
জানাই—রূপ-মঞ্চ নিজেকে সার্থক করেছে। দীর্ঘ ২১
বছর জীবনের পথে অনেকখানি চলা। আপনাদের এই
চলা আরো সবল হউক, আরো সুন্দর হোক। রূপ-মঞ্চের
ধারা পূজারী—তাঁদের সকলকেও সুভেচ্ছা জানালাম।

★ সত্যজিৎ সত্যজিৎ রায়—বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চের
ইতিহাসের প্রাচীন তথ্য পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টায় আপনারা
ব্রতী হয়েছেন এবং অনেকাংশে আশ্চর্য ভাবে সফল হয়েছেন
এটা সত্যই আনন্দের কথা। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত
এই সব তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলি এবং সেই সংগে মুদ্রিত
ছবিগুলি আমার খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়।

★ অগ্রদূত—রূপ-মঞ্চের মঙ্গল হউক, নবনব গৌরব অর্জন
করুক। ঈশ্বর আপনার আকাংখা পরিপূর্ণ, চরিতার্থ ও
সুন্দর করুন।

★ সত্যেন-বসু—আমার প্রথম ছবির অহুপ্রেরণার জন্য
কালীশদার কাছে চিরঞ্চী থাকব।



★ পরিচালক অভিনেতা বিকাশ রায়—বাংলা ছবির আজ দুর্দিন। দর্শক ও সমালোচকরা বাংলা ছবির প্রতি আরো সহানুভূতিশীল হোন—এই আমার অনুরোধ। রূপ-মঞ্চ বরাবর তাই করে এসেছেন—তাদের কাছে এ অনুরোধ হয়ত অবাস্তব। তবু তাঁদের বলবো, আরো দৃষ্টি দিতে এদিকে। এই দুঃসময় কাটিয়ে তুলতে তাঁরা বাংলা চিত্র-শিল্পকে সাহায্য করবেন—এটাই আমার প্রত্যাশা।

★ ভোলানাথ মিত্র—এই পৃথিবীতে আছে একটা মাত্র জাতি, আর সেই একটিমাত্র জাতির আছে একটিমাত্র ধর্ম—সেই জাতি হচ্ছে মানুষ, সেই ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

★ শিল্প নির্দেশক বীরেন নাগ—ঘর সাজিয়ে এসেছি চিরদিন, বখা সাজানোর অভ্যেস নেই।

★ কার্তিক চট্টোপাধ্যায়—আপনার রূপ-মঞ্চ পত্রিকা এক-বিংশতাব্দী অতিক্রম করেছে। এই সুদীর্ঘকাল ধরে আপনি আপনার কাগজ যারফৎ, যে সেবা করেছেন—তার জন্ত পাঠকমাত্রেই আপনাকে শুধু ধন্যবাদ দেবে না—কৃতজ্ঞ থাকবে। যে সঠিক তথ্য—যে সারগর্ভ প্রবন্ধ অথবা সম্যকসমালোচনা এতাবৎকাল আপনার কাগজে প্রকাশিত হয়েছে—তার কল্পনা, তার দৃষ্টিভঙ্গীর বিশালতা ও বৈশিষ্ট্য আপনাকে চিরতাস্তর করে রাখবে। উঁচু জাত বলতে যা আমরা বুঝি, সেই শ্রেণীর পত্রিকা আপনার—একথা রসিক পাঠক মাত্রেই জানেন। আজ এই শুভমুহুর্তে আমি রূপ-মঞ্চ পত্রিকার সুপ্রতিষ্ঠিত অপরিমিত আয়ুষ্কালের জন্ত প্রার্থনা জানালাম।

★ পরিচালক হেমেন গুপ্ত—সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্ত বিংশ শতাব্দীর সর্বোচ্চ সভ্যতা যত রকম শিক্ষা-প্রণালী আবিষ্কার করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছায়া চিত্র তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

★ পরিচালক অরবিন্দ সেন (বধে) রূপ-মঞ্চের জন্ত আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

★ পরিচালক এ. কারদার (পাকিস্তান) শ্রদ্ধাঞ্জলি শুভেচ্ছা জানাই।

★ বীরেন ভট্টাচার্য—(বধে) শ্রদ্ধাভিষিক্ত প্রীতি। আজকের ভাল লাগা যেন চিরকালের ভালবাসা হয়ে থাকে।

★ ঞ্জিককুমার ঘটক—আপনার কাগজের যে গৌরবময় অতীত আপ-

নারা গত একুশ বছরে গড়ে তুলেছেন, তার জন্ত দেশেব সমস্ত সংস্কৃতি প্রেমিকের সংগে গলা মিলিয়ে আমাদেরও সাধুবাদ জানাবার এই সুযোগ দেবার জন্তই আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের মত অসংখ্য কর্মীরা ছবির জগতে যে জীবনবোধের আবাহন করে চলেছেন, তাঁদের জন্ত রুচি তৈরী করার দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে ও নিয়ে যাবেন। এই আস্থাতে আপনারদের দীর্ঘজীবন বাগনা আমার শুধু শুভেচ্ছা নয়—স্বার্থপরের মতই নিজের সুবিধা-সন্ধান। আপনারা আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

★ মুণীন্দ্র সেন—যে অসমতল পথ বেয়ে বাংলা চলচ্চিত্র আজ মহান ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পেরেছে—সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের সুসংবদ্ধ ইতিহাস আজও অলিখিত। সেই অলিখিত ইতিহাসের পাতায় ধারা আমাদের চলচ্চিত্রের খবর রাখেন তাঁরা জানেন, রূপ-মঞ্চ নিঃসন্দেহে অনেক-খানি জায়গা জুড়ে থাকবে। চলচ্চিত্রকে সুস্থ সমাজ জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলার আন্দোলন—চলচ্চিত্রকে বিংশশতাব্দীর বলিষ্ঠতম শিল্প মাধ্যমে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রূপ-মঞ্চের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রূপ-মঞ্চের কর্মীদের নমস্কার।

★ অগ্রগামী—অসত্যের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে স্বচ্ছ সত্যের প্রকাশ করা কঠিন—সন্দেহ নেই। যার নিজের প্রাণ শক্তিতে আস্থা আছে তার পক্ষেই তা সম্ভব। রূপ-মঞ্চের দীর্ঘ জীবন তার প্রাণ-শক্তির পরিচায়ক। আমরা যে শিল্পের চর্চা করি—সম্প্রতি তার দিগন্তে নতুন সম্ভাবনার মেঘ জমেছে। সুবাতাস বইছে। প্রত্যাশিত বর্ষণে নবীন হবে প্রাকালের উর্বর ভূমি। এই নবীন সম্ভাবনার নার্তায় মুগ্ধ হয়ে উঠুক আপনারদের পত্রিকার আগামী বছরগুলো। নির্ভীক সত্যের প্রকাশে আপনারা পেছিয়ে পড়বেন না। রূপ-মঞ্চের কাছে এই মহৎ প্রত্যাশার অঙ্গীকার রাখলাম আর জানালাম তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

★ বিমল ঘোষ—বাংলার চিত্রজগতে রূপ-মঞ্চের দান কি বা কতটা—ঈদের রূপ-মঞ্চ বড় করেছে এবং করেছে তাঁরা



তা বলতে পারবেন।
আমার স্বপ্নশোধ করবার
নয়। রূপ-মঞ্চ তার স্বনাম

নিয়ে এগিয়ে যাক এবং আমাদের যে রকম চিত্রজগতে
প্রতিষ্ঠিত করেছে—তেমনি নতুনদের প্রতিষ্ঠা করুক। তার
যাত্রা পথে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা সব সময়ই আছে।

●● নীরেন লাহিড়ী—আপনার রূপ-মঞ্চ চিত্র ও নাট্যজগতে
অন্তরের মর্মবাণী। আপনার সারা জীবনের কর্মধারার
সঙ্গে পত্রিকার আছে আত্মিক যোগ। শুভেচ্ছার প্রয়ো-
জন নেই—কারণ, রূপ-মঞ্চের প্রতি আছে আমাদের শ্রদ্ধা।

●● প্রযোজক বিমল দে—আদর্শনিষ্ঠ রূপ-মঞ্চের সর্ব-
সাফল্য কামনা করি।

ধান্যশীর্ষের মত লুটিয়ে পড়ুক, অন্তর আমার তোমাদের পায়ে—

●● প্রবীণতম সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—রূপ-মঞ্চ
পড়িয়া আনন্দ লাভ করি।

●● চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (এম, পি) : আপনার পরি-
চালনায রূপ-মঞ্চ পরিপূর্ণতা ও পরিণতির দিকে অগ্রসর
হইবে, আমার এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

●● যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—রূপ-মঞ্চ
ইতিমধ্যেই রসিকজনের চিত্ত হরণ করেছে। ভবিষ্যতে
এর প্রতিষ্ঠা আরও দিগন্তব্যাপী হোক—এই কামনা করি।

●● অশোক সরকার (সম্পাদক আনন্দবাজার, দেশ)—
রূপ-মঞ্চ পত্রিকার একবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে আমার
কাছে শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছেন। বাংলা দেশের চিত্র ও
নাট্যাঙ্গুরাঙ্গী ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছার সংগে আমারও
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের সাফল্যে।

●● অগ্রজ তুষারকান্তি ঘোষ—কালীশ, তুমি জানো
তোমার পত্রিকা আমার এবং তোমার বোধির কত প্রিয়!
বাংলা নাট্যমঞ্চের অতীত ইতিহাস রূপ-মঞ্চের পৃষ্ঠায় পরি-
বেশন করে তুমি যে নির্ভর পরিচয় দিয়েছো—ইতিহাসই

তার সাক্ষ্য দেবে। বিস্তৃত একটা দিক আমার নজরে
পড়েছে—রূপ-মঞ্চের পাঠক হিসেবেই আমি বলছি, তোমার
যে কোন পাঠকই তা বলবেন—। দীর্ঘ ২১ বছর কী
কঠোর সংগ্রাম এবং আর্থিক ক্লেশতার মধ্য দিয়ে তুমি
কাগজ প্রকাশ করে চলেছো—অথচ কোনদিন কারোর
কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াওনি। আমার তুমি অগ্রজ বলো,
এবং জানো—কিছুটা ক্ষমতা আমার আছে। অনেকেই
সে ক্ষমতার স্বয়োগ গ্রহণ করেন। অথচ তুমি কোন
দিনই আমার কাছে কিছু বলো না—কিছু চাইলে না।
যদি সত্যই অগ্রজ বলে মনে করো—তোমার যে কোন
প্রয়োজন সম্পর্কে আমার অকপটে বলবে, রূপ-মঞ্চের এবং
তোমার জন্ত কিছু করতে পারলে আত্মতৃপ্তি পাবো।
তবে যে পথে—যে ভাবে তুমি তোমার পত্রিকাকে নিয়ে
চলেছো—এর চেয়ে মহত্তর পথ আর নেই। সম্ভার
প্রলোভনে তুমি ভুলবে না জানি—জয় তোমার অবধারিত।
এই জয়ের কিছুটা গৌরব দাবী করবার স্বয়োগ দিও।
তাই রূপ-মঞ্চের যে কোন প্রয়োজনে অকপটে তোমার
তুষারদাকে স্মরণ করো। শিল্প আমাদের প্রাণকে সজীবিত
করুক। (২ই মে, সোমবার, ১৯৬০ রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে
অতীতে অগ্রজ তুষারকান্তির শুভাগমন আমাদের
আনন্দবিহীন কবে তোলে। তখনই তিনি উপরোক্ত
মন্তব্য করেন। আমাদের সংগ্রহশালা থেকে “রঙ্গালয়ের
রঙ্গকথা” বইটি অগ্রজকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি প্রায়
১ ঘণ্টা আমাদের মাঝে ছিলেন।)

●● স্বধীরেন্দ্র সাত্তাল—রূপের মঞ্চ করেছিলে পূজা, গন্ধ ধূপে
সে ধূপ এখনও জ্বলছে, তাই—

সময় থাকিতে, এইখানে আজ বলে যাই চূপে চূপে
আজীবন যেন তাহারি সুবাস পাই!

●● স্থলীল করণ—চিত্র ও নাট্যালোকের উন্নতির জন্ত
রূপ-মঞ্চের স্বদীর্ঘ কালের অবদান প্রকার সংগে স্মরণীয়।
নেতাজীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠ কচিলীল
এই পত্রিকাটির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

●● সম্ভাষকুমার দে—দেখতে দেখতে বিশ বাঁও জ্বল
পার হয়ে এলাগ। বিশ কেন, একুশ বলাই উচিত।

রূপ-মঞ্চ বাইশ বছরে পড়বে। বাইশ বছরে গঙ্গায় অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। পত্রিকা অধ্যুষিত বাংলা দেশে অনেক পত্রিকা এসেছে—গিয়েছে। অনেক ঢকা নিনাদ শুনেছি, অনেক স্তুতি—নিন্দা—প্রশংসার ঢেউ উঠেছে—পড়েছে। তারই মাঝে দৃঢ় হাতে হাল ধরে রূপ-মঞ্চকে যিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন—তার দিকে অবিস্মিত বিশ্ব ও জ্ঞানীর সংগে তাকিয়ে আছি। কালীশের আমহাষ্ট ষ্ট্রিটের বাসার চারের মজলীসে জুটতাম ধারা—আম্র তাঁরা নানা কাজে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছি। কালীশ যখন এই মজলীস জমিয়ে তোলেন—তার পূর্বে থাকতেন বাগা-পুরুষের এক বস্তুতে আত্মগোপন করে। তাই তখনকার আড্ডা ছিল আমাদের মুরলীধর সেন লেনে সংহতি কাঁধলয়ে। সম্পাদক সুরেন নিয়োগী—সবার সুরেনদা। তিনিই বললেন, কালীশ কাগজ বের করবে। তারতবর্ষের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংহতি অফিসের একজন আড্ডাধারী। তিনি সংবাদটি শুনে হাসলেন। উৎসাহী তরুণদের এমত চাপল্য তিনি ঐ বয়সে কত দেখলেন। তা আমাদের তখন বয়সই বা কত? সবে গৌফে তা দিতে শুরু করেছি। কারো বিশ, কারো বাইশ, কারো চব্বিশ। মোট কথা সবাই তিরিশের চেয়ে ঢের নিচে। কালীশের বিভাসাগরী চটি আর লম্বা-ঝুলের খন্ডরের পাঞ্চাবী একেবারে বনেদী সম্পাদকীয় পোষাক। কাগজ না হয়ে যায় না বলেই আমাদের ধারণা হল। কাগজ কিন্তু সত্যি বেকল—রূপ-মঞ্চের রূপ দেখে সবাই তারিফ করতে লাগলেন। শুভাঙ্কুরা শিউরে উঠলেন—ওরে তোরা করেছিস কি, এই ছাপা, এত ছবি। এষে পষে বসবি! নিজেতো ডুববি—আরো দশজনকে ডোবাবি। রূপ-মঞ্চ ডোবায়নি কাউকে, নিজেও ডোবেনি। বং এই দীর্ঘকাল দেশের-দেশের সেবা করে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। আর না হবেই বা কেন? রূপ-মঞ্চের শিরোভাগে লেখা থাকে শ্রীশ্রী সম্ভদাস বাবাজীর আশীর্বাণী, আর ভিতরে রসদ যোগান ধারা—তাদের পুরোধা স্বামী কালিকানন্দ অবধূত। রূপ-মঞ্চের জয়যাত্রা অব্যাহত হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করি।



- স্থলীল বন্দোপাধ্যায়—কালীশ, তোমার রূপ-মঞ্চ আমাদেরও। রূপ-মঞ্চের একবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তোমাকে ও তোমার সহ-কর্মীদের জানাই আমাদের শ্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন।
- স্বর্গত: এস, এম, বাগড়ে—রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে পারি, কোন মাসের কাগজ যদি সময়মত না পাই, উতলা হয়ে ষ্টলে যেয়ে বারবার অল্পসন্ধান করি—রূপ-মঞ্চ বেরিয়েছে কিনা। রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে এব চেয়ে বেশী কিছু আমার বলার নেই।
- নির্মলুমার ঘোষ (এন-কে-জি)—হুঁটি কারণে, সিনে-মাকে আমরা সংবাদপত্র জগতে স্থান দিয়েছি এদেশে। প্রথমটি, পাঠকসাধারণের মনোরাজ্যে সিনেমার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের খোরাক জোগাতে। দ্বিতীয় কারণটি আরো একটু নিম্নস্তরের। সেটি তাগিদ। বস্তুত: এই নয় সত্যের তাগিদেই জন্ম হয়েছে এই চূর্তগা দেশের নিনেমা সম্পর্কিত বিশেষ পত্র-পত্রিকাগুলির অধিকাংশের। তারা ব্যবসা করবেন না এমন কথা ইংগিত করা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যেসব কাগজের কথা বলছি, তাঁরা তাঁদের সবটুকু শ্রম যেন নিয়োগ করেন ঐ অধ্য-বসায়েরই। তাঁদের ব্রত দিয়ে, লেখনী-সাধন দিয়ে একটি পৃথক সিনেমা-সাহিত্যের সৃষ্টির কাজে তাঁদের সাধু কর্ম-ব্যস্ততা ততোটা দেখা যায় না। রূপ-মঞ্চ শেখোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিক্রম বলেই তার সংগে আমার আত্মিক যোগ।

● রাষ্ট্রীয় শুভেচ্ছা ●

- ১) ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—আপনার প্রেরিত রূপ-মঞ্চের বিশেষ পূজা সংখ্যা [১৩৬৬] রাষ্ট্রপতি পেয়েছেন এবং পড়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তাঁরই পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাবার জন্ত নির্দেশিতা হয়েছি। —[স্বা:] জানবতী দরবার।
- ২) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—রূপ-মঞ্চকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। —[স্বা:] বিধান চন্দ্র রায়।



● পশ্চিমবাংলার খাত্ত, জাণ ও সরবরাহ মন্ত্রী **শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন**—

রূপ-মঞ্চের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের পর রূপ-মঞ্চ ষাটবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করবে ছেনে আনন্দিত হলাম। রূপ-মঞ্চের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। [স্বাঃ] প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

● পশ্চিমবাংলার কৃষি ও খাত্ত উৎপাদন মন্ত্রী **শ্রী তরুণকান্তি ঘোষ**—

আগামী শারদীয়া সংখ্যায় রূপ-মঞ্চ একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করবে ছেনে খুব খুশী হয়েছি। বাংলার চিত্র ও নাট্যজগত রূপ-মঞ্চের সৌজন্তে যে রূপ প্রচারের সুযোগ পেয়েছে, তাতে রসগ্রাহী বাঙালী নিত্য নতুন লেখা পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চার করেছে। রূপ-মঞ্চের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আপনার প্রচেষ্টা সার্থক হোক। [স্বাঃ] শ্রী তরুণকান্তি ঘোষ।

● পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী **ডাঃ অনাথবন্ধু রায়**—
রূপ-মঞ্চের কয়েকটি সংখ্যা পড়িলাম। অবসর সময়ে ইহার বহু লেখা পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। রূপ-মঞ্চের বৈশিষ্ট্য শিল্পীর শিল্পায়ণে সাহায্য করা ছাড়াও আপনারা মাহুষকে বুঝিবার যে অভিনব চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। কলা ও শিল্পের মধ্যে যে আদর্শ সবচেয়ে বড় জিনিষ তাহাকে আপনারা নতুন রূপে ও অভিনব ছন্দে এবং ভাব ও সমালোচনার মধ্যে কোটাইবার চেষ্টা

করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীও সাধারণ আলোচনার মধ্যে যে রূপ আকর্ষণীয় হইয়াছে— তাহা অভিনব এবং ঐতিহাসিক অমূল্যস্বত্ব জাগাইয়া তোলে। —[স্বাঃ] অনাথ বন্ধু রায়।

● পশ্চিমবাংলার রাজস্ব মন্ত্রী **শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ**—
আপনাদের পত্রিকার শুভ কামনা করি।

—[স্বাঃ] বিমলচন্দ্র সিংহ।

● পশ্চিমবাংলার কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী **ডাঃ আরু, আদেদ**—

রূপ-মঞ্চের জন্ত রইল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। দেশের কৃষ্টির ক্ষেত্রে পত্রিকার দান অনস্বীকার্য। আমি রূপ-মঞ্চের ব্যাপকতর সাফল্য কামনা করি। —[স্বাঃ] আরু আদেদ।

●

এত প্রেম যদি থাকে, তবে কেন দাঁও এত জালা—

হিংস্র কণিনীর মত বিধাইছো শুধু বার বার,

চিনিতে পারোনি তাই, এত ফোঁশ এত অহংকার!

আমি হটি, আমি ধ্বংস, সব কিছু করি ছারখার,

আমি কৃষ্ণ-কালী, পুরুষ ও নারী, আমি বৃহল্লা।

মৃত্যুঞ্জয়, নীলকণ্ঠ মহাকাল মহামায়াময়ী

সত্যের পূজারিণী, আনন্দময়ী, আমি রজনয়ী

“মৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুত্তমশ্চ ভবিষ্যত্তাম্।

কীৰ্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণা চ মারোণাং স্মৃতির্মোক্ষাশ্বত্ত্বং কমা ॥”

॥ আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই প্রাণবী ॥

● ফণীন্দ্র পাল ●

আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই পৃথিবী।

জীবনদর্শনের এই কি শেষ কথা, না অশেষ বিস্ময়ের এ শুধু একটা অভিব্যক্তি মাত্র। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর আদম আর ইভ্ হয়তো তেবেছিল আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই পৃথিবী। তারপর যুগে যুগে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনার মধ্য দিয়ে মাহুষ নিজেকে জীবন রহস্যের দুজের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে। বার বারই নব নব বৈচিত্র্যের তরঙ্গায়িত ষুর্ণিপাকের মধ্যে

পড়ে সে বলে উঠেছে—আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই পৃথিবী।

কালকের সত্য—আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। কোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বহু ভাবাবিদ্, উদ্ভিৎ-তত্ত্ববিদ্ মিশনারী উইলিয়াম কেরী স্বদূর ইংলণ্ড থেকে এসেছিলেন অবচারণক প্রতিষ্ঠিত এই কলিকাতায়। অষ্টাদশ-শতকের সেই বিদেশী আগন্তকের জীবন-নাট্য ইতিহাসের অম্লভূতিহীন পৃষ্ঠায় যতটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী করে তাঁকে জানবার আগ্রহ হয়।

কেরী সাহেবের বিশ টাকা মাসিক বেতনের মুনী রামরাম বহুর নামও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলা ভাষার আদি গদ্য রচয়িতা রামরাম বহু। শুধু 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' লিখে তাঁর লেখনী ক্ষান্ত হয়নি। তৎকালীন এক নিষ্ঠুর সংস্কার, সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-পূর্বকার প্রাপ্ত প্রথমখানখা বিশী বচিত 'কেরী সাহেবের মুনী' উপন্যাসে এই দু'টি চরিত্রকে আগার নিকটতর রূপে দেখতে পেয়েছি। ইতিহাস অটুট থেকেছে, জীবন-রহস্যের আলোছায়ায় বিচিত্র অভিনয় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে দু'টি ভিন্নধর্মী, বিভাবী দুই মনশ্চেতনার দু'টি মানুষ।

মধ্যযুগীয় মন কেরীর। নবযুগের স্বপ্নবিহারী মন রামরাম বহুর। ধর্ম, ভক্তি আর গ্রাম-নীতির জগতের অধিবাসী কেরী। রামবাম বহু নীতি, ধর্ম বিবেকের অলুপ্তান নিজে নিজেকে বিব্রত করে রাখতে চায় না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের তৃষ্ণা তার মনকে অনন্ত জিজ্ঞাসার পথে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। সে কেবল অল্পভব করে না, অল্পভূতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। 'কেরী সাহেবের মুনী' গ্রন্থের অনবদ্য সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে জীবনবোধের এই ভিন্নতর রূপের আলোতে অষ্টাদশ শতকের জীবন, সমাজ নব্যচেতনার উন্মেষ ধরা দিয়েছে। প্রাচীন প্রথা নিপীড়িত বহু কুসংস্কারে জীর্ণ এই বাংলাদেশে তৎকালীন দুর্নীতি, লাম্পট্য, প্রবঞ্চনায় ক্ষুদ্র জীবনযাত্রার ছন্দে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখা দিল। সাম্রাজ্য-পন্থন-অভিলাষী বিদেশীদের লোভ-লালসা কপটতার ফাঁকে ফাঁকে সমাজ-জীবনে প্রবর্তিত হ'ল অনেক নূতন ধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন ফুলিঙ্গ মানুষের মনে মনে জ্বালাল নতুন শিক্ষা। সে অগ্নিশিখার দাহ উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আজ বিংশশতাব্দীর জীবনে পরিব্যপ্ত হয়ে গেছে। আজকের কলকাতার পথ ঘাট, অট্টালিকা, উদ্ভান ইট-পাথরের মধ্যে হয়তো মৌর্য বা মোগল যুগের ইতিহাস লুকিয়ে নেই। তবু এই সহরের একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। 'কেরী

সাহেবের মুনীর' ঐতিহাসিক কাঠামো নিয়ে শুধু আলোচনা করতে

বসিনি। আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই পৃথিবীকে অষ্টাদশ শতকের প্রাচীন পটভূমির নানা বর্ণে রঞ্জিত অপরিমেয়-রহস্য জড়িত হয়ে দেখতে পেয়েছি। মানুষের প্রত্যাহার দুঃখ স্বখ বঞ্চনার লীলায় প্রাচীনযুগের মানুষগুলির সংগে আমাদের কতখানি ব্যর্থতান তা' আবিষ্কার করবাব কেঁতুহল অল্পভব করেছি।

রামবাম বহু, টমাস, জনস্মিথ, কেটি, লিজা, দুবায়ী টুশকি, রেশমী, ফুলকি যোতি রায়ের জীবন-পেয়লাঃ কী যেন এক অবরুদ্ধ কামনার তৃষ্ণা গিশে রয়েছে। অমৃতের আশ্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত সে পিপাসার ব্যাকুলতা মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে।

রামবাম বহুর বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি যতই বিশ্বাস পাড়ে ততই তার সামনে অনন্ত জিজ্ঞাসা এসে দাঁড়ায়। জীবনের রহস্য-সমুদ্র মনন করতে গেলে বিচিত্র প্রহেলিকার মূর্তি ধরে আসে নরী। এক রাজির বা এক বৎসরের সংগ দিতে যারা এসেছিল রামরাম বহুর জীবনে, তাদের নংখ্যা গণনা করতে হলে শুভংকরের স্মরণ নিতে হবে। নারী-দেহে যে নেশা আছে তা আকর্ষণ পান করেছে রামবাম বহু, ভোগের পান-পাত্র বার বার পূর্ণ হয়েছে তবু তৃষ্ণা যেটেনি, কী সে তৃষ্ণা? ক্ষণকালের ভোগ্য-বস্তু ভড়ের সামিল। জীবের সাক্ষাৎ মিলল টুশকির কাছে এসে। দেহের সংগে পেল স্নেহের দাক্ষিণ্য। দেহাতীত অন্তর্ভূতির একটি তরঙ্গ এসে পৌছল হৃদয়ের কাছে।

কিন্তু রামরাম বহুর অনন্ত জিজ্ঞাসা শুদ্ধ হতে জানেনা। জীবনে আছে রূপ। রূপ রক্তমাংসের সৃষ্টি। কিন্তু কোথাঃ সে জাহ্ন যার স্বর্ণ-নৌদর্ঘ মনের চোখে নিশ্চল হয়না কোনদিন! এক গোঘুলীর আলো-অঁধারে, মাঝ-বসন্তের খেঁদালে ভরা এলোমেলো বাতাসে দেখা দিল এক নারীমূর্তি। পরম বিশ্বাসের চমক নিয়ে এল এক নিঃসঙ্গ তরুণী। সহস্রবার দেখা একটি মেয়ের মধ্যে সহস্রাতিত একেবারের বিশ্বাস-বিমূঢ় দেখা। প্রত্যাহার পরিচিত একটি মেয়ের





মধ্যে প্রত্যাহের অতীত
এক পরিচয়। রেশমী
রামরাম বহুর তৃষ্ণার্ত

জীবনে সৌন্দর্যের এক পরম সত্যের উপলব্ধি নিয়ে এল।

এই উপলব্ধি অল্প নাম বুঝি প্রেম। কিন্তু প্রত্যক্ষ
জ্ঞানসন্ধানী বাস্তববাদী রামরাম বহুব মনে এই সত্যের
উপলব্ধি যেন অসম্পূর্ণ বলে বোধ হয়। তার মনে হল,
কামের মধ্যে প্রেম না থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমের
মধ্যে কাম থাকেই। রামরাম বহুর এই প্রেমিক সত্তা পরিতৃপ্ত
হয়নি। এক অনিবার্ণ বেন্দনার মধ্য দিয়ে তার জীবনের
ওপর ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এসেছিল।

জীবনের ও মনের, বাঁচার ও ভালোবাসার এই পিপাসা
বোধ হয় মাহুষের জন্মগত। তৃষ্ণার্ত জীবাত্মা অনাদি কাল
হতে অবিশ্রান্ত অন্তঃসন্ধানে ছুটে চলেছে, কোথায় খুঁজে
পাবে সেই ফটিক জল—যাতে মিটেবে এই অনন্ত পিপাসা।
কেউ বা তৃষ্ণা নিবারণের তাগিদে পংকিল জলই তুলেছে
মুখে। কেউ ছুটেছে গরিতীকার পেছনে। এই পিপাসাকে
ঘিরে জীবনদেবতার নিরন্তর কত লীলাখেলা।

উইলিয়াম কেবীর সহকর্মী টমাস থুইল্ড প্রচারব্রতী পাদরী
হয়েও এই পিপাসার আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি পাননি।
জুয়ায়, মদে ঋণে স্বর্বস্বান্ত টমাসও উপভোগের মধ্যে ভাসিয়ে
দিয়েছিল নিজেকে। তার অপরূপ কামনা হঠাৎ জড় জীব
আর জাহ্নব প্রভেদ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চায়নি। নিকি
বাইজি থেকে রেশমী কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই।
খেতাংগ যুবক জনশ্রিত্যেব মনেও সেই এক পিপাসা।
যে ভালোবাসা কেটিকে অবলম্বন করে স্বপ্ন রচনা করে-
ছিল ও কেটি-কে হাবিয়ে সেই ভালবাসাই রোজ
এলমারকে জানিয়েছিল স্ততি। আবার রোজ এলমারের
সমাধির ওপর বসে নেটিভ মেয়ে রেশমীর কাছে উজাড়
করে সমর্পণ করল হৃদয়ের সেই একান্ত অহুত্বটিকে,
শেষ হ'ল কি তার অহুসন্ধান!

কেটি তার হৃদয়কে নিয়ে যে আত্মবঞ্চনার খেলা খেলে-
ছিল, তার ক্ষেত্রে দায়ী ছিল না জন শ্রিত্য, দোষী ছিল
না ম'সিয়ে দুবোঁরা।

রেশমী ও টুশকি এই উপজাতিসের দু'টি প্রধান নারী চরিত্র
তাদের জীবনের রহস্যের কুশাণ ঘিরে সেই একই গুঞ্জন,
আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই পৃথিবী।

বিচিত্র চরিত্র সমাবেশ, বিরাট পটভূমি, প্রাচীন পরিবেশ
আর ইতিহাসের অবিচল সত্য সব মিলে 'কেরী সাহেবের
মুন্সী' একটি স্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি। ছায়াচিত্ররূপে সেই
সৃষ্টিকে প্রতিফলিত করা আর একটি সৃষ্টিধর্মী দুঃসাহসিক
প্রচেষ্টা। কুশলী শিল্পী পরিচালক বিকাশ রায় সেই প্রচেষ্টায়
আত্মনিয়োগ করেছেন।

যে সাধনা, নিষ্ঠা, শিল্পবোধ ও রসবোধ এবং বিরাট
আয়োজন না থাকলে 'কেরী সাহেবের মুন্সী'-র কাহিনী
চিত্রে রূপায়িত করে তোলা সম্ভবপর নয়, তার বিছুরই
অভাব নেই-বিকাশ রায় প্রোডাকসনের এই নিবেদনে।

ছবি বিশ্বাস হয়েছেন কেরী, বিকাশ রায় হয়েছেন মুন্সী
রামরাম বহু, পাহাড়ী সান্ধ্যালকে দেখতে পাবেন টমাস
চরিত্রে, নীতিশ মুখোপাধ্যায় মোতি রায় চরিত্রের রূপদান
করেছেন। যজ্ঞ দে হয়েছেন টুশকি। বনানী চৌধুরীকে
দেখা যাবে উম্মাদিনী কেরী-পত্নীর ভূমিকায়, অতি পনিচিত
শিল্পীদের মধ্যে ঝারা আছেন, তাঁরা হচ্ছেন, শিশির
বটব্যাল, গৌরশী, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়,
প্রভৃতি। রেশমী চরিত্রে রূপলাবণ্যময়ী নবাগতা তন্দ্রা
বর্মণ, জন শ্রিত্যের ভূমিকায় নবাগত অমিত বিকাশ রায়ের
সার্থক আবিষ্কার। লিঙ্গরূপে গ্লোরিয়া জাউথিংটন, কেটি
রূপে শবুস্তলা সারিষা, দুবোঁরা চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়,
জাহ্নব ভূমিকায় কিশোর শিল্পী মাষ্টার পল্লব বিকাশ
রায়ের নিখুঁত নির্বাচন শক্তির প্রোজেক্ট পরিচয় দেবে।

প্রাচীন সংগীত-সংগ্ৰহ ও তার সুরারোপে সুরকার রবীন
চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর সাধনার পরিচয়
আছে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমল মিত্র,
মিটু দাশগুপ্ত প্রভৃতির নেপথ্যে কণ্ঠে গীত গানগুলি এক
অপরূপ সুরপরিবেশ রচনা করেছে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
রচনা করেছেন কয়েকটি গান।

আলোক চিত্রগ্রহণে মায়া সৃষ্টি করেছেন অনিল গুপ্ত।
শিল্প-নির্দেশ সুনীল সরকার, প্রাচীন বাংলার পটভূমিকে
জীবন্ত করে তুলেছেন।

কখনও মহাশ্বে উদার, ভক্তিতে অবিচল, কখনও স্থলিত
দলিত জীবন-যাত্রার তীর-স্পর্শী, উদ্ধত স্পর্ষিত কামনার
শিখায় লেলিহান, সংস্কারে জীর্ণ, হৃদয় বঞ্চনার দানদাহে
প্রজ্জ্বলিত, জ্ঞানের অহুরগনে আশ্চর্য এই জীবন, আশ্চর্য এই
পৃথিবীর পরিক্রমা।

শেষাংশ ১৭৬ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

নিজে দেখতে দেখতে নিজের আসল রূপটা কেমন ঘেন ঘুগিয়ে গিয়েছিল। অভিনেত্রী প্রহেলিকার রূপ ওণ হাসি কান্নার জলুসে এমনই জলে গিয়েছিল চোখের দৃষ্টি যে, নিজেকে নিজে চিনতেও পারত না। হঠাৎ একটি মাত্র আসল পুরুষের একটি মাত্র আসল ধমকে আর তার অনাবিল চোখের আগুনে প্রহেলিকার সত্যিকারের চেহারাটা ভায়নক স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে গেল প্রহেলিকার চোখে। কিছুতেই সেই চেহারাটাকে লুকনো থাকছিল না মস্ত নাম সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তির আড়ালে। হুনিয়া স্বস্ত্র প্রহেলিকাতন্ত্রদের তোষামোদ আর উচ্ছ্বাস দিয়ে তৈরী খোলসটা পুড়ে ছাই হোয়ে গিয়েছিল। তাই তামাশাটাকে তামাশা হিসেবে নিতে গিয়ে কোথায় যেন খচখচ করে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, হুনিয়াখানায় অভিনয় ছাড়া আরও কিছু আছে, সব কিছুকে অভিনয় মনে করে হালকা ভাবে নেওয়াটা নেহাতই যেন ছেলেমানুষী হোয়ে পড়ে।

তবু তামাশা হোল তামাশা। এই তামাশা উপভোগ করতে এইটুকুই লাভ হোল যে একটা আশ্রয় নিরেট বোকা পুরুষমানুষ দেখা গেল। লোকটা একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ইট পাটকেল ভুল্য হোয়ে পড়েছে। এক দিনের বউটিকে এমন ভাবেই বিশ্বাস করে বসেছে যে সেই বউকে সামান্য একটু ইংগিত করে কিছু বললেই একেবারে ঝেঁপে ওঠে। জন্মে যেন মেয়েমানুষ দেখেনি কখনও, মেয়েমানুষ যে কি বস্তু যেন জানেই না। ওরে বাপরে! সত্যিকথাটা একটু উত্থাপন করতেই একেবারে ফেটে পড়ল বোমার মত। জ্ঞান না ত' বাছান, কত ধানে কত চাল হয় তা'ত এখনও টের পাওনি। এইবার পাবে, বাক আরও কয়েকটা দিন, তখন টের পাবেই। প্রেম ভালবাসা সত্যীপনা এই সমস্ত ভাল ভাল কথার সারটুকু গ্রহণ করতে শিখবে তখন, কথায় কথায় বাঁড়ের মত শিং উচিয়ে শুঁতোতে ছুটবে না। বাঁড়ের মত বাড় বৈকিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

অদ্যকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই দাঁড়াবার তংগি মাটা



চোখের উপর ফুটে উঠল প্রহেলিকার। সংগে সংগে ভয়ানক কুকড়ে গেল যেন নিজে। খুব ভয় পেয়ে গেল যেন, ভয় নয় ঠিক, হঠাৎ মনে হোল সর্ব্ব তার খোয়া গেছে। কিছু নেই কোথাও, এক প্রাণী তাকে চেনে না, একেদ্বায়ে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে গভীর অদলে। পথ হারিয়ে ফেলেছে, পথ হারিয়ে হাপুস নয়নে কঁাদতে কঁাদতে গভীর বনের মধ্যে ছুটোছুটি করে মরছে। হাঁপিয়ে উঠল ভয়ানক রকম, কোনও রকমে বিহানা ছেড়ে উঠে খোলা জানদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের দিকে তাকাল, গভীর জগলই বটে। জমাট বাঁধা অন্ধকার চেপে বসেছে বড় বড় গাছের মাথায়। কিছুই দেখা গেল না নিচের দিকে। ওপর দিকে তাকাল। মস্ত বড় আকাশ মস্ত মস্ত তারাগুলো নজরে পড়ল। চাঁদ নেই আকাশে, তবু আলোর আলো হোয়ে রয়েছে। আকাশ হোল আকাশ, দিনে রাতে কোনও সময়েই আকাশে আঁধার ঘনায় না। আকাশের সংগে মাটির ওইখানটো বা তক্তাত। আর একটু তক্তাতও আছে, আকাশ ইচ্ছে করলে মাটি ছুঁতে পারে, মাটি কিন্তু মাথা খুঁড়ে মলেও আকাশ ছুঁতে পারে না।

উদ্ভট চিন্তা কতকগুলো জট পাকাত্তে লাগল মনের মধ্যে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হোল, কি রহস্য যেন লুকিয়ে আছে ওখানে। জীবনে কখনও নিবিবিলিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখার সুযোগ ঘটেছে কিনা, ভাবতে লাগল। বিশেষতঃ রাতের আকাশ। বহু সন্ধ্যা এসেছে জীবনে, বহু রাত্রি পার হোয়ে গেছে। সব কটা রাতই যেন লোকসান হোয়ে গেছে বলে মনে হোল। সন্ধ্যা এসেছে রঙে রঙে রঙিন হোয়ে, রাত এসেছে মস্ত মাতাল অবস্থায়। নেশা ছুটতেই ভোর হোয়ে গেছে। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হোয়েছে দিনের ধঞ্জার। নিঙুড়ে নিঃশেষ করে নিয়েছে দিন, অবশিষ্ট কিছু রাখেনি। কিছুই অবশিষ্ট নেই জীবনে, সত্যিই এমন কিছু অবকাশ নেই যা আঁকড়ে ধরে নিয়ালার দাঁড়িয়ে আকাশের পানে



তাকিয়ে থাকা যায়। ঐ আকাশে যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, নিজেকে লুকিয়ে কেলা যায় যদি ঐ আকাশের এক কোণায়, তা'হলে কেমন হয়! আকাশে অন্ধকার নেই, আকাশের আলো কখনও নেভে না, কি করে ওখানে লুকনো যাবে। অথচ লুকতেই হবে, লুকবার প্রস্তুতিই খুব বড় হয়ে দাঁড়াল। লুকতেই হবে নিজেকে, হেরে গিয়ে মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি! হেরে গেছে প্রহেলিকা, এক রত্তি একটা মেয়ে স্বপ্নাতা, তার কাছে হার মানতে হয়েছে হুঁদে—অভিনেত্রী প্রহেলিকাকে। সাক্ষী রয়ে গেল ঐ স্বপ্নান্তটা, ফিরে গিয়ে সকলের কাছে রটাবে প্রহেলিকার পরাজয়টুকু। ভাল গালা দিয়ে বেশ রসাল করে তুলে বলবে সকলের কাছে, কি ভাবে কেমন করে তার বন্ধু পুরুষোত্তমের কাছে প্রহেলিকা দেবীকে নাকের খত দিতে হয়েছিল। শুনে অনেকের বুকেটা ভরে যাবে। বী পায়ের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে বাদ্যের কখনও পোছেনি প্রহেলিকা, তারা একেবারে বিগলিত হয়ে পড়বে।

জুতরাং মুখ আর দেখানো যাবে না।

একে একে অনেকের ছবি ফুটে উঠল আকাশের গায়ে। সব মুখগুলো প্রায় এক রকম। উৎকট লাগল। উদম প্রবৃত্তি আর উদ্ভট আবদার উপছে পড়ছে মুখগুলো থেকে। সেই মুখগুলোই আবার ক্যাকাশে হোয়ে পড়ল হঠাৎ। দম ফুরিয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি। একেবারে ঠিক পুরণো ছেঁড়া জুতোর মত হোয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল।

ওরই মধ্যে 'হু' একখানি মুখ জলজল করতে লাগল অনেকক্ষণ। একজনকে চিনতে পারল প্রহেলিকা, তার নামটাও মনে পড়ল। ছেলেটির নাম হিমাংশু। হ্যা—হিমাংশু নামই ছিল বটে ছেলেটির, হিমাংশু বললে যেমন ঠাণ্ডা গোছের লাফুক ছেলেকে বোঝায়, তেমনিই ছিল ছেলেটি। একটা টেকটিকো বেঘাবেষিতে পড়ে গিয়ে

ছোকরাটির মাথা খেয়ে দিয়েছিল প্রহেলিকা। ভয়ানক জাঁক দেখিয়েছিল একটা মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল, কেউ নাকি তার কাছ থেকে তার হিমাংশুকে কেড়ে নিতে পারবে না। ছেলেটির মাও ছেলের গরবে ধরাকে সরা জান করত। অমন ভাল ছেলে নাকি বিশ্বরুদ্ধাণ্ডে নেই। পনেরো দিন পার হোল না, জাঁক পাক হোয়ে গেল। পথে বসল মা বউ, মাথা গৌজার বাড়ীখানি বিক্রী করে—হীরের টুকরো ছেলে কিন্ত করতে নামল। তারপর—তারপরেরটুকু আর প্রহেলিকার মনে পড়ে না। মনে পড়বার উপযুক্তও নয় সে সব ব্যাপার! সেই একঘেয়ে কাণ্ড, সেই নাকে কাঁচা, সেই আত্মহত্যা করবার ভয় দেখানো—ভোমার না পেলে আমি আর এ জীবন রাখব না। বেইমানের ঝাড়, নাকে-কাঁচা কাঁদবার সময় তুলে যায় একটা কথা। একটা ঘেয়েকে ঠিকিয়ে তাকে পথে বসিয়ে এগে সেই মেয়েজাতের আর একজনের কাছে ভালবাসার ভাঁড়ামি করবার সময় তুলে যায়, কি ভাবে পিণ্ডী চটকে এল ভালবাসার। ওরে আমার ভালবাসা রে! ভালবাসার বালাই নিয়ে মরি।

হ্যা—তবু সেই হিমাংশুকে, হিমাংশুর মুখখানা মনে পড়ে প্রহেলিকার। শেষ পর্যন্ত কি যে হোল তার, সে খোঁজ অবশ্য রাখে নি প্রহেলিকা, রাখবার দরকার করেনি। অভিনেত্রী প্রহেলিকার বাজার-দর পড়ে যাবে, যদি এ কথাটা একবার রটে যে বিশেষ একজনের ওপর প্রহেলিকার নজর পড়েছে। চিরকুমারী প্রহেলিকা সর্বজনের মনোমোহিনী কিছুতেই একজনের সম্প্রতি হোতে পারে না, প্রহেলিকার মধ্যে প্রহেলিকার এইটুকুই। এই গুণটুকু আছে বলেই পিতামহ পিতা আর পুত্র তিনপুরুষ মিলে এক সংগে বসে প্রহেলিকার হাবভাব ছা-কলা রূপ-গুণ নিয়ে প্রাণ খুলে আলাপ আলোচনা করতে পারে। প্রহেলিকার মধ্যে প্রহেলিকাটুকু না থাকলে আর রইল কি! কিন্তু হিমাংশু ছোকরাটির মুখখানা এখনও প্রহেলিকার মধ্যে মিলিয়ে যায়নি। বয়স খুব কম ছিল ছোকরাটির, অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট হবে নিশ্চয়ই। একদম কাঁচা ছেলে, অত কাঁচা না হোলে অত সহজে তার মস্তিষ্ক চৰ্ণ করা যেত না।

কাঁচা নিজেও একদিন ছিল বটে প্রহেলিকা।

কাঁচা যখন ছিল তখন প্রহেলিকা হোয়ে ওঠেনি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই কাঁচা অবস্থাটার কথা মনে পড়ে গেল। সংগে সংগে আর একখানা কাঁচা মুখও হঠাৎ ফুটে উঠল মনের পর্দার গায়ে। আকাশের গায়ে ফুটে উঠল মুখখানি না মনের পর্দার ফুটে উঠল, ঠিক বোঝা গেল না। তাক্সব কাণ্ড বটে। নিশ্চিতি রাতে নিরালার দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে এখন সব অদ্ভুত কাণ্ড হয়! বহু কাল আগে যা হারিয়ে গেছে, একেবারে ক্যাকাশে হোতে হোতে মিলিয়ে গেছে যে ছবি, সেই ছবিও সব স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকাণ্ড সহরের বৃকে আকাশচূষী অট্টালিকার ছাতে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে এই সব ভোজবাজি দেখা যায় কি! অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। সহরের বৃকটায় যে লক্ষ লক্ষ আলো, সহরের বৃকে যে তিমির আঁধার ঘনিয়ে ওঠে না কখনও, সহর যে কখনও নিজেই লুকিয়ে ফেলতে পারে না। নিচেটা যদি অন্ধকারের বৃকে লেপে মুছে একেবারে নিঃশেষ হোয়ে উবে যায়, তবেই ওপরে কিছু ফুটে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। নয়ত নিচের ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে ওপরে, ওপরের ছবি সেই প্রতি-বিম্বের আড়ালে লুকিয়ে যায়।

তাই হোল, পায়ের তলার মাটি—যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রহেলিকা, সেই মাটি উধাও হোয়ে উবে গেল। সমস্ত গড়ে উঠল আকাশের সংগে, আকাশে ফুটে উঠল আর একটি মেয়ের ছবি। সে মেয়েটি তখন কাঁচা ছিল। মেয়েটির একমাত্র অবলম্বন যা ছিল তখন, তাও খুব কাঁচা জিনিষ। একটুতে হাসত, একটুতে রাগত, একটুতে খুশি হোয়ে উঠত এমন একটি মাছুর নিয়ে মশগুল হোয়ে ছিল তখন মেয়েটি। মাছুর না হাতি! ছোকরা, একদম কাঁচা ছোকরা বাকে বলে তাই। ছোকরাটিকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আকাশের গায়ে। এখনও ঠিক তেমনিটিই আছে। কিছু বদলায় নি, সেই খোঁচা খোঁচা চুল, সেই গোল গোল চোখ,

আর সেই গৌরা-গোবিন্দর মত চাউনি।

বাগ হোলেই অমনি

বাঁড়ের মত ঘাড় বেকিয়ে দাঁড়াত। কোনও নেকামির ধার ধারত না—ভালবাসি কথাটাও বলতেও শেখেনি। তোমায় না পেলে এ প্রাণ আর রাখব না, এই ইন্দো কথাটা কপচাতেও জানত না। ভালবাসা কি ব্যাপার, তাও বোধ হয় জানত না। শুধু বিশ্বাস করতে জানত, নিদারুণ বিশ্বাস করবার শক্তি ছিল বলে নির্ভরভাবে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। কিছুই সে জানত না, কিছুই বুঝত না, এইটুকু শুধু বুঝত যে সেই কাঁচা মেয়েটিকে না হোলে তার চলবে না। চলবে কি করে! তার বাগ অভিমান গৌরাভূমি কে সহ্য করবে সেই মেয়েটি ছাড়া! মেয়েটিই বা সেই ছোকরাটি ছাড়া আর কার ওপর জুলুম চালাবে!

সেই জোরজবরদস্তি—ঝগড়া—গৌরাভূমির দিনগুলো একে একে আকাশের গায়ে উদয় হোতে লাগল। আশ্চর্য হোয়ে গেল প্রহেলিকা, হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই ছবি। কি অদ্ভুত কাণ্ড! একটা কাঁচা ছোকরা আর একটা কাঁচা মেয়ে ঘর সংসার কচ্ছে। কি বা ছিরি সেই ঘর-সংসার করার, দুটোই যেন আন্ত পাগল। খালি খুনছটি, খুঁটি নাটি নিয়ে খিটি-মিটি আর ধামচা-ধামচি লেগেই আছে। অথচ এক দণ্ড একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারে না, এক মুহূর্ত কেউ মুখভার করে থাকতে পারবে না। ছ'জনেই সমান। ছ'জনে ছ'জনকে নিয়ে মশগুল, সময় কোণায় পাবে তারা ভালবাসা নিয়ে আদিখ্যেতা করবার। কোনও দিকে নজর দেবার ক্ষমত পের না কি কেউ—যে ভালবাসাটা আবার কেমন ব্যাপার তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে সেই ছোকরাটি হঠাৎ হারিয়ে গেল এই মাটির ছনিয়ার মাছুরের ভিড়ে। আকাশে ভিড় নেই, আকাশে বহি তার ছ'জন সংসার পাতত, তা'হলে নিশ্চয়ই হারাত না।

আকাশের এক কোণায় ছ'জনে লুকিয়ে থাকতে পারত।

সেই ছোকরাটি এখনও ছোকরাই রয়ে গেছে।

প্রহেলিকা তাকে ঠিক তেমনি অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখতে





পেল। দেখতে পেয়ে কাঁচা মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল। নেই, কোথাও নেই সেই কাঁচা মেয়েটি, অথচ কাঁচা মেয়েটি কিন্তু হারাননি। ঠিক আছে সে, প্রহেলিকা তাকে চেনে। প্রহেলিকা জানে যে সেই কাঁচা মেয়েটি তারপর ভালবাসার কারবার করতে করতে কিতাবে পেকে গেল। ভালবাসার ভেতর যে হৈয়ালি লুকিয়ে আছে, সেই হৈয়ালিটুকু শুলে খেয়ে কিতাবে মেয়েটি নিজেই একটা প্রকাণ্ড হৈয়ালি হোয়ে উঠল, তা' প্রহেলিকা ভাল করেই জানে।

চমকে উঠল হঠাৎ প্রহেলিকা, আকাশের গা থেকে সব ছবি মুছে গেছে। আগাগোড়া সমস্ত আকাশটা জুড়ে একখানা মুখ শুধু ধমধম করছে। মুখখানা কার! চমকে উঠে নজর নামিয়ে আনল আকাশের গা থেকে, ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাঁড়ের মত ঘাড় বেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ও কে! নিরেট বোকা একটা পুরুষ মাছ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একটা ইট পাটকেল তুল্য কিছু। ভালবাসার খার মোটেই ধারে না লোকটা। জন্মে বোধহয় মেয়ে-মাছ দেখেনি কখনও। তাই লোকটা খেপে উঠেছে, বিয়ের পরের রাতে যে বউ পালান সেই বউটার জন্মে এমনই মরিয়া হোয়ে উঠেছে যে—

“চুপ”

চাপা গলায় ধমকানি স্পষ্ট শুনতে পেল প্রহেলিকা। ছুটে গিয়ে উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়ল, বিছানার ওপর। বালিশে মুখ শুঁজে ফুলে ফুলে কানতে লাগল।

দীর্ঘ সময় পার হোয়ে গেছে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হোয়েছে, কেউ আর তাকে ঠকাতে পারবে না। অনেক পেয়েছে সে, অনেক জিতেছে, কিন্তু ভালবাসার নাম-গন্ধ-বিহীন নির্জলা বিশ্বাস পাবার সুগটা হারিয়ে ফেলেছে। ভালবাসা বস্তুটা এখন তার কাছে একটা আর্ট, সাধনা করে শেখা হাজারো রকমের ক্ষুদ্র নকশা কাটার খেলা। ভালবাসা বেচে এখন বাড়ী গাড়ী নাম কেনা যায়,

ভালবাসা বেচে সব রকমের ভাষাশা দেখা যায়। কিন্তু ভালবাসার বদলে বিশ্বাস গৌরৱতমি বেহিসেবা দুরন্তপণা কেনা যায় না।

ঠকঠক আঙুরাজ হোল দরজায়। কে আবার জ্বালাতে এল এই সময়! বলে দিয়েছিল, রাজে কেউ বিবস্ত্র করে না যেন। শুনবে নাকি এরা! বন্দী করে রেখেছে যখন, তখন যা খুশি করবার অধিকার আছে ওদের, কে বাধা দিতে পারে।

জলে উঠল পিঙ্গি। আশ্পাধী কম নয় ত। মনে করেছে কি জলীগুলো। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। চেনে না ত' প্রহেলিকা হৃদয়রীকে, যুগে ঘুরিয়ে ঘোব একেবারে। অর্ধেক রাতে দরজায় যা দেওয়া বার করে দিচ্ছি।

বিছানা থেকে নামল। পরে ছিল একটা ড্রেসিং-গাউন, চক্ষের নিমেষে লেটাকে খুলে ফেললে। ভেতরে সায়া ছিল ব্লাউজ ছিল, কাপড়খানা ছিল না। অত্যন্ত হাতে সাহার দড়ি আলগা করে ফেললে, ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে। তারপর এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সামান্য একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজার পেছনে, আবার সেই রকম আঙুরাজ শোনা গেল ঠক ঠক ঠক। খুবই সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিচ্ছে, যেন অল্প কেউ জানতে না পারে। ওরে আমার রঙ্গের নাগর রে। দাঁড়া, দেখাই মজা। দরজার পিঠে মুখ ঠেকিয়ে খুব চাপা গলায় উচ্চারণ করল—“কে?”

“বাইরে থেকে ঠিক সেই ভাবে জবাব হোল—“তয় নেই আমি।”

আমি। আমিটি কে! আবার বলা হোল—তয় নেই। জাহা কি সোহাগ রে। তয়ে আমনি মরে গেলাম একেবারে। কাকে সাহস দিতে এসেছ, জান না ত' জাহা। তোমার সাহস কতখানি তাই একবার দেখি। মাথাটি-তোমার না চিবিরে খেয়ে—

ব্লাউজটাকে বুকের সংগে এক হাতে চেপে ধরল এমন ভাবে যে বুকের প্রায় কিছুই ঢাকা রইল, না। সায়াটাকে



আর এত হাতে কোমরের নিচে চেপে ধরল। মিনিট
খানেক ঝাড়িয়ে রইল সেই ভাবে। নরনার বাইরে থেকে
আবার ফিসফিস করে বলা হোল—“কি হোল! দেখি
হচ্ছে কেন?”

ইস, — একেবারে — তর সইছে না ! পাখা গজিয়েছে কিনা,
পুড়ে মরবেই ।

ব্লাউজটা ছেড়ে দিয়ে সেই হাতে নিঃশব্দে খুলে দিয়ে
দরজার ছিটকিনিটা, সংগে-সংগে জু'পা পিছিয়ে ঝাঁড়াল।
আবার সেই ভাবে এক হাতে ব্লাউজটা চেপে ধরল
বুকের সংগে। একেবারে ভৈরবী, অর্ধেক রাতে চোরের
মত চুপিচুপি ঘরে ঢোকার মত চেপেছে যার, সে যদি
স্বয়ং শুকদেব গৌসাইও হয় তা'হলেও তার পরিচয়
নেই, পায়ের ভলার লুটিয়ে পড়তে হবেই। আলো নেই
ঘরে,—ডা' হোক। বে আসছে, তার হাতে নিশ্চয়ই
আলো থাকবে। না থাকলেও ক্ষতি নেই, বিনা আলোতে
ষেটুকু সে দেখতে পারে তাই যথেষ্ট।

নেহাত নিরাহ জাতের নির্জলা ভয়ের ছবি চোখে মুখে
 ফুটিয়ে তুলে আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বা আশা
 করেছিল ঠিক তাই হোল। একটু একটু করে একখানা
 কপাট খানিকটা খুলল, সেই ফাঁকে গলে এল লোকটা
 ঘরের মধ্যে। তারপর দরজাটা বন্ধ হোল। তখনও রক্ত
 নিঃশ্বাসে ভাকিয়ে আছে সেই ভাবে। লোকটা যে কে,
 জানবার অঙ্কে সামান্য একটু কোঁতুলে যে আগে
 নি, তা' নয়। কিন্তু অভিনয় হোল অভিনয়, অভিনয়টুকু যদি
 যোলখানা উত্তরে যায়, তা'হলে, ফলটা কি ফলবে, তা
 সঠিক ভাবে হিসেব করা আছে যুগ্ম অভিনেত্রী
 প্রহেলিকার। ফলটা ফললে কোঁতুল চরিতার্থ
 করবার বখেট সময় মিলবে, পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া
 মাছঘটাকে সঁকে পুড়িয়ে ভেজে চেখে চেখে চিনতে
 একটুও কষ্ট হবে না। শুধু একটু খৈঁষ, সঠিক গজন করা
 রাজাজ্ঞানটুকু, শব্দের সংগে সময়ের তার-সংগে ক্রীয়ার
 সংগতিটুকু মিলে বাগ্ম্য চাই।

মিলে গেল সবই। কয়েক মুহূর্ত পরে, তীব্র আলো এক
বলক আছড়ে পড়ল মুখের ওপর। সংগে সংগে অশ্রুট একট

চিৎকার করে উঠল
অভিনেত্রী, চিৎকারটুকু
শেষ হবার আগেই ছ'হাত

তুলে নিজের চোখ মুখ থেকে কেলেলে। অভিনয়ের চরম
লগ্নটি পার হোয়ে গেল। কিন্তু প্রত্যাশিত ফলটুকু ফলল না।
স্বপ্ন করে নিতে গেল আলোটা, গাঢ় স্বচ্ছকারে ডুবে গেল
অভিনেত্রী, বার নাম যবনিকা পড়ল তাই বটে গেল।

কল্পনাভীত ব্যাপার! ভ্যাভাচাখা খেয়ে গেল অতিনৈজী,
আর একবার আলো জলবার আশায় নয় আটকে রইল।
না, আলো আর মোটে জ্বলল না। আলোটাই যেন
পড়ে গেল চরম লজ্জার, মুখ দেখাতে আর সাহস পেল না।

আলোর বদলে অপরোধীরা আড়ষ্ট গলা গুনতে পাওয়া গেল
 একই পরে। অন্ধকার স্বরূপানাই যেন তোতলাতে লাগল—
 “আমি স্ব-স্বশাস্ত-এ তাবে ডেকে তোলা-অ-অ-অস্বায় হোরে
 গেছে স্ব-স্ব-স্বয় গেয়ে গেছেন—”

शुभाष्ट ! हाम्न कर्मान ! .

ଏ ହୋয়ে পাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তত্ত্বরশর ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিলে অংগে জড়িয়ে ফেললে।
 'এ' শব্দটি করার আর সামর্থ্য রইল না।

স্বশাস্তও চূপ, ঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে আঁককারের মতো তাকিয়ে স্থির হোয়ে রইল সে। হাতের চর্চ হাতেই রইল, টেপবার কথাটা মনেই হোল না। কি উদ্বেগ নিয়ে এসেছিল, তাও যেন ভুলে গেল। দরজা খুলে সরে পড়তেও সাহসে কুলল না। সাহসে কুলল না বললে ঠিক বলা হবে 'না, বলা উচিত নড়বার চড়বার ক্ষমতাটুকুই যেন সে হারিয়ে ফেলল। বিদ্যাতের শব্দ লাগলে যেমন হয়, তেমননি অসাড় হোয়ে গেল সর্বশরীর। মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত উদ্ভণ্ট হোয়ে উঠল। অসহ্য বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল শরীরের সমস্ত রক্তটুকু। স্টুডিওতে লক্ষ বাড়ির জলসূঁে ভয়ানক রকম স্পষ্ট তাবে—সব রকমের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত তার চোখ দুটি। আঁককার ঘরে নিরালায় এক লহয়ার আগে এমন কিছু খরা পড়ল সেই চোখে, যার ফলে



হঠাৎ তেঁতাই হয়ে গেল
তার অতি উগ্রভাবে
শানানো বুদ্ধির তলোয়ার।

হুশান্ত নামক আস্ত বস্ত্রটাই যেন বিকল হয়ে গেল রূপ
করে, বেশ অনেকটা সময় একদম কিছু কাজই করল না।

একদম অসহ্য অবস্থা। কর্ণ নীরবতা অঙ্ককারটাকে উৎকর্ষ
রহস্যময় করে তুলল। অনর্থক সময় বয়ে যাচ্ছে, একটা কিছু
বলে ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলতে পারলে সব হাঙ্গামা
মিটে যায়। কিন্তু বলার কিছু খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে
না। এখানে দেবী বসে আছে, ততই গুরুতর হয়ে
ডিয়েছে ব্যাপারটা। সব বুঝেও হুঁশনের একজন এতটুকু
শব্দ পর্যন্ত করতে পারলো না। সব থেকে খারাপ যা, তা'
হোল কেউ কাকেও দেখতে পাচ্ছে না। বুঝতেও পারছে
না, কে কি করছে। শুধু প্রতীক্ষা, অর্থহীন পঙ্খ প্রতীক্ষা,
হুঁশনের মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে জমে উঠতে লাগল।

অনেক দূরে কোথাও এক পালা গাধা মনের আনন্দে গান
জুড়ে দিয়ে। সে গান ধামবার আগেই নিচে জুতোর শব্দ
আর কথাবার্তা শোনা গেল। পাহারা বদল হোল ধামারে,
চং চং করে পেটা ঘটিতে অনেকগুলো বাঁড়ি পড়ল।
তারপর শোনা গেল মোটর গাড়ীর এঞ্জিন চালু করার শব্দ,
পরপর হুঁশানি গাড়ী ছোটবার জ্বলে তৈরী হোল যেন।
একটু পরে গাড়ী হুঁশানা চলল গেল, তাও বেশ বোঝা গেল।
চূপচাপ হয়ে গেল আবার সব, নীরব, অঙ্ককারের বুকে
নিবিড় নিশ্চলতা জেঁকে বসল আবার। হাওয়াও যেন
ফুরিয়ে গেল, দম ফেলাও এক কষ্টকর ব্যাপার। অবশেষে
নীরবতাকে পরাস্ত করল প্রহেলিকা। লম্বা একটা নিঃশ্বাস
ফেলে বলল—“দেশলাই আছে—সংগে ?” আলোটা
জ্বললে হোত।”

হুশান্তও খাস ফেলে বাঁচল। ভয়ানক ক্ষীণ আওয়াজ বের
হোল তার গলা থেকে। বললে—“জালছি। আলোটা
কোথায়।”

অকপট সহজ গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল প্রহেলিকা—

“হাতে ত টর্চ রয়েছে, জেলে দেখে নাও না।”

টর্চ জ্বালল হুশান্ত। টর্চ ঘুরিয়ে দেখে নিল আলোটা
কোথায়। সেই কীকে দেখতে গেল, খাট ঠেগান দিয়ে
ড্রেসিং গাউন জড়ানো একটা মূর্তি। আর খড়মত খেল না
সে, সাবধানে এগিয়ে গিয়ে জ্বালালো আলোটা। আলো
জ্বালতে জ্বালতে বলে ফেলল—“উঃ, কি ভীষণ ভেঙা
পেয়েছে। এ ঘরে জল আছে ?”

অবজাই আছে। সোরাই ভর্তি জল রেখে গেছে খাটের
পাশে টুলের ওপর। প্রহেলিকা এগিয়ে গেল সেদিকে।
বক বক করে শব্দ উঠল জল পড়বার। জল গেলাসটা নিয়ে
এসে দাঁড়াল হুশান্তর সামনে। হুশান্ত চোখ তুলেও
তাকাল না। গেলাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে জলটুকু
নিঃশেষ করে বলে উঠল—“আঃ—বাঁচলাম।”

অট্টহাস্য করে উঠল তৎক্ষণাৎ প্রহেলিকা। গেলাসটা
হুশান্তর হাত থেকে নিয়ে বলল—“ইস, বীর পুরুষ বটে।”

হেসে ফেললে হুশান্তও। বললে—“পেদ্বীর মত ডর
দেখালে কে না ভয় পায়। আর একটু হোলেই টেঁচিয়ে
উঠতাম।” লোকজন জুটে যেত। কি কলেঙ্কারি—না
ঘটত তখন।”

কেলেঙ্কারির পরিমাণটা আশ্চর্য করে খুবই খতমত
খেয়ে গেল প্রহেলিকা। লোকজন জুটে গেলে যে
কেলেঙ্কারি ঘটতে পারত, সে কেলেঙ্কারি নয়। ঘটে
গেছে যে কেলেঙ্কারিটা সেইটের কথা ভেবেই শুধু হোলে
রইল সে। পেদ্বীর মত দেখাচ্ছিল তাকে। কেলেঙ্কারি
আর কাকে বলে।

বেশ কিছুক্ষণ কথা জোঁগাল না হুঁশে। তার নিজস্ব মেজাজ,
যে মেজাজ ধপ্ করে সব রকম পরিস্থিতির সংগে মানিয়ে
চলতে অভ্যস্ত, সেই মেজাজটি যেন হারিয়ে ফেললে। হঠাৎ
মনে পড়ে গেল, নিজের বয়সের কথা। হুশান্তর দিনে
তাকিয়ে দেখলে একবার। অন্ততঃ দশ বার বছর বয়সে
ছোট হবে হুশান্ত, এখনও পুরো মাহুদ হয়নি এ কথাও বলা
চলে। স্টুডিওতে বারো হুশান্তর মত কালকূ লোক, কোনও

কালেই তাদের দিকে নজর দেবার দরকার কবেনি
প্রহেলিকার। নানারকম যন্ত্রপাতি যেমন আছে নুঁড়িওতে,
তেমনি ওরাও আছে। যন্ত্রপাতিগুলোয় সামনে যেমন লক্ষ্য
সরমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তেমনি এদের সামনেও
ওঠে না। যন্ত্রপাতিগুলো যেমন প্রাণহীন বোবা, এরাও
ঠিক তেমনি। হঠাৎ একটা কিছু দরকার হোয়ে পড়লে
হুশান্তদের কাউকে সামনে পেলে যদি করমাস করা যায়,—
তাঁহলে পরম কৃতার্থ হোয়ে তৎক্ষণাৎ সে হুকুম তামিল
করতে ছোট্টে। ব্যস—এই পর্যন্তই। করমাস খাটা সমাপ্ত
হোলে এদের দিকে কিরোও তাকাতে হয় না, এরাও অতটা
আশা করে না। অর্থাৎ এরাও যে মাছধ, বিশেষতঃ পুরুষ
মাছধ, এরাও কথার মত কথা বলতে পারে প্রয়োজন
হোলে, এটা যেন কল্পনাও করা চলে না। কিছু কল্পনাভীত
কাণ্ডই ঘটে গেল। প্রহেলিকার মনে হোল, নতুন করে
দেখছে যেন সে হুশান্তকে। একটা পুরুষ মাছধকেই
দেখছে, বোবন-দুষ্ট পুরুষ অন্যায়সে বলে কেললে তার
অন্তরেব কথা। বুঝিয়ে দিলে, সত্যিকারের বোবনকে
রক্ত মাংসের সস্তা মূল্য কেনা যায় না।

পিছিয়ে গিয়ে গেলাসটা রাখল সোরাইয়ের পাশে। তারপর
দরজার কাছে গিয়ে হুঁখানা কপাট—সম্পূর্ণ খুলে দিলে।
ঠাণ্ডা বাতাস লাগল মুখে চোখে, হাসানুহানার মন্দির গন্ধ
অনেকটা ঢুকে গেল বুকের মধ্যে। অনেকটা হাসকা হোয়ে
উঠল মাথাটা, চোখ বুজি দাঁড়িয়ে রইল দরজার মাঝখানে।
কুড়ি বাইস বছর বয়সের উপযুক্ত শরীরের মধ্যে চল্লিশের
বেলী বয়েসের যে নারী বাস করছে, সে জাগতে লাগল
ধীরে ধীরে। বিভ্রিভ্র করে জিজ্ঞাসা করলে—“কি ব্যাপার
হুশান্ত? এত রাত্তিরে হঠাৎ কি মনে করে?”

ভট্ট হোয়ে হুশান্ত জবাব দিলে—“না, এমন কিছু নয়।
ভারী বিলী লাগছে, থামকা আমরা আটকা পড়ে রইলাম
এখানে। কি যে মতলব করেছে এ ব্যাটারা, তাই
ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হোল, আগনিও বোধ হয় জেগে
আছেন, তাই এলাম।”

অকপট স্বীকারোক্তি, ছিটেফোটা ঘোরপ্যাচ নেই।
ছেলেমাছধ কিনা, বেশ ধাবরে গেছে। বন্ধুর উগকার

করতে এসে ক্যাসাদে
পড়ে গেছে দস্তরমত।

কি করবে! একলা একটা

ঘরে—পড়ে থাকতে থাকতে অভিশ্র হোয়ে ছুটে এসেছে।
আলবেই ত', বয়েসে বড়, জ্ঞান অভিজ্ঞতা সব কিছুতে
যে বড় তেমন একজন যখন সংগে আছে, তখন তার
কাছে না এসে করবে কি বেচারী। বেশ করেছে
এসেছে, একলা একটা ঘরে সারারাত জেগে পড়ে থেকে
আকাশ-পাতাল তেবে মরার চেয়ে এখানেই থাকুক না কেন।
কথাবার্তার রাতটা কেটে বাবে, একটু শান্তিও পাবে।

ঘুরে দাঁড়াল প্রহেলিকা। বললে—“বেশ করেছে এসেছ।
কিন্তু অমন চোরের মত চুপিচুপি দরজার টোকা দিচ্ছিলে
কেন? আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পাব না, এমন
কোনও হুকুম জারি করেছে না কি এরা?”
না, তা অবশ্য করেনি কেউ। আত্মসে ইংগিতে শুধু বুঝিয়ে
দিচ্ছে যে তাদের হুকুম ছাড়া চলে-বাওয়াটা চলবে না।
আর গাড়ীখানা অচল করে রেখেছে। কিন্তু এমন কথা
কখনও বলেনি যে প্রহেলিকার সংগে দেখা করা চলবে না।
বরং এমন ব্যবস্থাই করেছে যাতে সারা রাত তারা দু'জন
একসঙ্গে কাটাতে পারে। পাশাপাশি হুঁখানা ঘরে শুতে
দিচ্ছে বটে, কিন্তু এক প্রাণী দোতলায় পাহারা দিচ্ছে না।

ডবে!

তাঁহলে অমন চোরের মত দরজার টোকা দিড়ে গেল কেন
সে? কেন তার অমন মতিচ্ছন্ন হোল? কি ভাবছে
প্রহেলিকা? নিশ্চয়ই ভাবছে, হুশান্ত লোকটার ঘাড়ে
আর একটা হুঙ গলিয়েছে, তাই স্বযোগ পেয়ে ছাংলাপন।
করতে এসেছে। কি জয়ানক কথা! যা খুঁপি একটা
কিছু সম্বন্ধ করে যদি প্রহেলিকা, তাঁহলে কি করা যাবে।
বোবা হোয়ে রইল হুশান্ত। সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেল
এবার, ভয়ে তার চোখের চাউনি ষোলা হোয়ে উঠল।

প্রহেলিকা তার নিজের কথার জের টেনে বললে—“হা ত-
পেয়েছিলাম আমি। ভাবলাম, কে না কে হবে বুঝি।
ভয়ে একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বিহানা থেকে
উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। কি করে বুঝব যে তুনি





এসে ও তা বে দরজা
ঠেল ছ। যাক্, বোস
এখন। বাকী রাতটা গল্প

করেই কাটান যাক। ঘুম যখন হবেই না, তখন আর—
কি করা যাবে।”

বসল জ্বশান্ত একখানা চেয়ারে, খাটের ধারে পা জুড়িয়ে
বসল প্রহেলিকা। বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল—
“কি অদ্ভুত মানুষ তোমার বন্ধুটি জ্বশান্ত! বন্ধু পাগল
টাগল নয়ত! সামান্য কথায় কি কাণ্ড করে বসল দেখ।
এখন কোথায় গিয়ে কি করছে, তাই বা কে জানে। এদের
কাছ থেকে ছাড়া পেলে আবার তাকে খুঁজতে বেরতে
হবে তোমার। বেশ কাজ জুটেছে বা হোক তোমার,
একবার তার বউকে খোঁজ, একবার তাকে খোঁজ।
ভুতের বেগার খাটা আর কাকে বলে।”

ভিড়বিড়িয়ে উঠল জ্বশান্ত একেবারে—“গোজায় যাক
গোয়ারটা। আমি আর এর মধ্যে নেই বাবা। ঘাট
হোয়েছে আমার এই ব্যাপারে নাক গলিয়ে। আপনাকে
টেনে এনেছি এই বিপদের তেতর, এখন ভালয় ভালয়
আপনাকে কিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।”

“আমাকে কিরিয়ে দিতে হবে।” ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে
গেল প্রহেলিকা। গলায় এসে গেল কৌতূকের হিল্লোল,
খেয়ে খেয়ে বলতে লাগল—“কার কাছে আমাকে কিরিয়ে
দেবে জ্বশান্ত? কার কাছ থেকে নিয়ে এসেছ আমাকে?
কিরিয়ে দিতে না পারলে কে তোমার গলায় গামছা দেবে
তনি? আহা—সেই ভালমানুষটির নামটি আমার বল না
জ্বশান্ত, যার হাতে আমাকে কিরিয়ে দিতে না পারলে
তোমার জেল ফাঁসি হোয়ে যাবে নির্ধাৎ।”

আরও তেতে উঠল জ্বশান্ত। বললে—“বাঃ, তা বলে
আপনাকে কিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না! মানে—এই
বিপদের তেতর—এই সব অসভ্যদের কি বিশ্বাস করতে
আছে—এরা কি করে বুঝবে আপনার দাম—জানোয়ারের
মত যদি কিছু করবার সাহস হয় এদের—”

অসংলগ্ন কথাগুলো নিছের কানেই বোধ হয় বড় বেকী
খাপছাড়া শোনাল। হঠাৎ খেমে গিয়ে একটু পরে যথেষ্ট

জোর দিয়ে বলে উঠল—“আমাকে কি আপনি পুরুষোত্তম
ভেবেছেন? ভেবেছেন বুঝি, আমিও আপনাকে ফেলে
গালাতে পারি?”

গভীর হোয়ে গেল প্রহেলিকা। পিটিপিটি করে তাকাত্তে
লাগল জ্বশান্তর দিকে। খুবই ভালমানুষী গলায় বলল—
“তাই বল। মানে—এখন আমার অভিভাবক হোলে
তুমি। কাজেই তোমার দায়িত্বটুকু তোমাকে পালন
করতেই হবে। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান জ্বশান্ত,
মনে করছি—এখানেই কোথাও ছোট একখানি কুঁড়ে ঘেঁষে
থেকে বাই। হাঁক ছেড়ে বাঁচবার মত জায়গা এটা।
কি নির্জন, কি অন্ধকার, হাওয়াটা পর্যন্ত কি অদ্ভুত মিষ্টি।
আর এখানের আকাশ। অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়েছিলাম
ঐ জানলার আকাশের দিকে তাকিয়ে। রাতের আকাশ
যে অত সুন্দর, জানতাম না। আকাশ যেন হাতছানি
দিয়ে ডাকছে। যেন—”

দাবড়ি দিয়ে উঠল জ্বশান্ত—“থাক, থামুন এবার,
যথেষ্ট হোয়েছে। ফিরে চলুন নিজের বাড়ীতে, তারপর
যত খুশি আকাশ দেখুন ছাতে দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর
কর না হোলেই হল। সমস্ত জাতটাকেই দেখছি কাব্য
ভূতে পেয়ে বসেছে। আরে আমরা হলুম খেটে খাবার
মানুষ। হাজার জনের মন জুগিয়ে আমাদের বাঁচতে হয়।
ঐ সব আকাশ অন্ধকার—নির্জনতা নিয়ে আত্মথোতা করার
জন্তে কি জন্মেছি নাকি আমরা? পড়ে থাকুক এখানে
আকাশ ফাকাশ, এখন কি করে সটকানো যায়, তাই বলুন।
ফিরে গিয়ে আপনার সব কটা ছবিতে আন্ত আন্ত অন্ধকার
আকাশের সৌন্দর্য্য দেবার ব্যবস্থা করব। তখন লখ মিটিয়ে
নির্জনতা নিয়ে আহা উহ করতে পারবেন।”

দাবড়ানিটা যেন শুনেই পেল না প্রহেলিকা। আগের
মত এলিয়ে যাওয়া স্বরে বলতে লাগল—“কেন ফিরব?
কি জন্তে আবার ফিরে যাব? শুধু অভিনয় আর অভিনয়।
অভিনয় ছাড়া যেন আর কিছুই নেই ছিনয়ার। যথেষ্ট
হোয়েছে, যেটুকু সম্বল আছে, তা দিয়ে বাকী জীবনটা
খচ্ছন্দে কেটে যাবে। এত মাঠ, এত গাছপালা, এত
আকাশ, এত আলো, এমন নিবিড় অন্ধকার, এ সমস্ত ছেড়ে

যাব কোথায়? কেন যাব? কি আছে আমার সেখানে? ফিরে না গেলে কে কঁাদবে আমার জন্মে? কার গরজ পড়েছে, আমার জন্মে ঐ পুরুষোত্তমের মত মাথা খুঁড়ে মরবার? না না, আমি আর ফিরব না স্রশাস্ত। তুমি চলে যাও, কেউ জানে না তোমার সংগে এসেছি আমি। কেউ কিছু বলবে না তোমায়, বললেই বা কি গেল এল। আমার ইচ্ছে, আমি ফিরব না। আমার ইচ্ছের কে বাধা দিতে পারে?”

“এই মরছে।” কথাটা ফসকে বেরিয়ে গেল স্রশাস্তর মুখ থেকে। তাত্তাত্তি একটা চৌক সিলে ফেললে সে। তারপর বেশ গভীর ভাবে শুদ্ধিয়ে বলতে লাগল—
“দেখুন, বখেই বয়েস হোয়েছে আপনার, মাথা ধরাপ করা কি মানায় এখন। এদের সামনে আপনি যদি আবার একটা উদ্ভট সৌন্দর্য করে বলেন, তা’হলে সত্যি বলছি, যা তা কাণ্ড করে বসব আমি। একেই ত’লোকে তাবে, আমরা সিনেমার লোকগুলো সব হক ছেঁড়। আমাদের মান ইচ্ছাত বলতে কিছু নেই। আমরা বেহেড বেজিকপনা করতে গেলে আর কিছুই চাই না। এখানে এরা শুনেছে জেনেছে যে আপনি বাঙলা দেশের সব থেকে নামকরা অভিনেত্রী। আপনি যদি এখন বিগড়ে বলেন, এরা মনে করবে কি? এই যে ভয়ে ভয়ে রয়েছে, খাতির সম্মান দেখাচ্ছে, এইটুকুও হরত দেখাবে না। আর একটা কথাই বা তাবছেন না কেন? এরাও মাহব, এদেরও মন বলতে জিনিষ আছে, সখ আছে সেই মনে। তরুটুকু—মানে—চক্ষু লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে এরা না করতে পারে কি? তখন দেখবেন, আপনার—ঐ শরীরের বাঁধনী আপনার সর্বনাশ করে ছাড়বে। কে বাঁচাবে তখন আপনাকে এদের হাত থেকে? কি উদ্দেশ্যে যে আটকে রেখেছে আমাদের, তাই বা কে বলতে পারে! মালিক আসছেন, মালিকের সংগে দেখা না করে যাওয়া চলবে না। মালিকটি এসে কোন আবদার তোলেন আবার দেখুন। জংলী জালোয়ারদের কি বিশ্বাস করতে আছে?”

প্রহেলিকার কথা বলার চক্রে একটুও গালটাল না, অমন বিস্তীর্ণ তর দেখানোটাও একেবারে বুধা হোল। একটা বালিশ

টেনে নিয়ে বুকে চেপে আধ-শোয়া অবস্থায় শরীরখানি এলিয়ে দিয়ে



বলতে লাগল—“তাতেই বা কতি কি হবে স্রশাস্ত? সেই রকম কিছু একটা হোলেও ত বেঁচে যাই। থাকতে যদি দেয় এখানে, তার যদি নেয় আমার কেউ, তা’হলেও বর্তে যাই। এই বয়েসে আর পারছি না হাজার হাজার লোকের মন জোগাতে। না খাটলে এক কড়ি কেউ দেয় না। শরীরে যদি এখনও এমন কিছু পদার্থ থাকে, যার বদলে বগিয়ে যাওয়াতে কেউ রাজী হবে, তা’হলে সে স্রযোগ ছাড়ি কেন। কিন্তু সে নোভাগ্য কি হবে আর স্রশাস্ত! সে দিন পার হোয়ে গেছে। এই ত একটু আগে তুমিই বললে, পেত্রীর মত দেখাচ্ছিল বলে তুমি ভয় পেয়েছিলে। পেত্রীকে দেখে ভয়ই এখন পাবে সকলে স্রশাস্ত, আর কিছুই হবে না।”

হাতাশা আর চুখ উথলে উঠল যেন গলা থেকে, বুক ভাঙা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করল প্রহেলিকা। অন্তরের কথাটা বলে ফেলে অন্তরখানিকে উদ্ধার করে দিয়ে একেবারে যেন নিঃশেষ হোয়ে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ আর কথা ফুটল না স্রশাস্তর মুখ থেকে, হঠাৎ এবথানা পর্দা তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল যেন। পর্দার—আড়ালে যা লুকিয়ে ছিল তা চোখে পড়ে যাওয়ায় দস্তরমত হকচকিয়ে গেল সে। আরে তাইত! দরজার পেছন থেকে লাড়া দিয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ছে স্রশাস্তর, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল—কে? স্রশাস্ত জবাব দিয়েছিল—“আমি—ভয় নেই।” তারপর দরজা খুলে দিয়েছিল। এবং ঐ অবস্থায় দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল কে এসেছে, তখন একেবারে নিরাশ হোয়ে পড়ল। তার মানে! কাকে আশা করেছিল—কার জন্মে জেগে বসেছিল ও তাবে? এর মধ্যেই কি কাণ্ড ঘটিয়ে ছেড়েছে দেখ!”

দগ্ধ করে জলে উঠল একটা লক্ষ্যবাহিত বাস। জলে উঠেই তৎক্ষণাৎ আবার নিড়ে গেল। তারপর সেই নিবিড় অন্ধকারে থিক থিক জলে উঠল লাল আঙন, থিকথিক



পোড়াতে লাগল। জালী-
টুকু মর্মাঙ্কিত ভাবে
অন্তত্ব করা গেল, কিঙ্ক

কোথায় যে কি পুড়ছে ঠিক বোঝা গেল না।

মুখ হেঁট করে বসে জলুনিটুকু সন্ধ্যা করতে লাগল অশান্ত।
কিছুই আর বলবার নেই, করবারও নেই কিছু। একদম
জানা একটা ব্যাপার, এমন ব্যাপার যার ওপর একটুও
আবরণ নেই! কার সাধ্য এই ব্যাপার নিয়ে ষাঁটুঘাটি
করে!

পরস। আছে এখানকার মালিকের, লোকটা যেমনই হোক
না কেন পরস।ওয়ালো লোক। ঐ বড়ো জগৎরাম কোন
কাকে আসল কথাটা বলেছে। শুধু বলাই বা কেন, হয়ত
মোটো হাতে অশ্রিম কিছু দিয়েও দিয়েছে। তাই নির্বিবাদে
অপেক্ষা করছে। উপরি উপার্জন—এ স্বযোগ ছাড়বে
কেন?

আর অশান্ত পাহারা দিচ্ছে। অশান্ত মাথা ঘামিয়ে মরছে,
কি করে ভালয় ভালয় সম্মানে এখান থেকে উদ্ধার করে
নিয়ে বাওয়া যায়। ঐ জগৎরাম, শুধু জগৎরাম কেন,
এখানকার আরও সব কর্মচারীরা কি ভাবছে। কি আবার
ভাববে, সোজা ভাবনাই ভাবছে। ভাবছে, অশান্তর মত দু'
একটা আপদ ত' সংগে থাকবেই অত বড় নাম ডাকওয়ালা
মেয়ে মাহুয়ের। মেয়ে মাহুয়টাই গোখে লোকটাকে।
যার মানে হোল, অশান্ত লোকটা মেয়ে মাহুয়টার মনের
মাহুয়। মেয়েমাহুয়টার কিছু রোজগার হোলে ও লোকটাও
সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। কাজেই ঐ লোকটা কোনও কাজে
বাধা দেবে না। সব জেনে সকলে বাধা দিতে বাবেই
বা কেন?

মানে—বাধা দিতে পারবেও না।

কিসের জোরে বাধা দেবে? অভিনেত্রী প্রেহেলিকা তার
মজি মাজিক চলবে, তাতে বাধা দেবে কে? অশান্তর
মত কীটস্ত কীটের এত বড় স্পর্ধা হবেই বা কেন যে
প্রেহেলিকার ওপর জুকুম চালাতে বাবে?

উঠে দাঁড়াল অশান্ত। ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে চলল
ঘর ছেড়ে।

খুবই হালকা ভাবে বলে ফেললে প্রেহেলিকা—“চললে
কোথায় আবার?”

একটা ছুঁচ বিখল যেন পিঠে। ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।
দাঁতে দাঁত চেপে কোনও রকমে সামলাল নিজেকে, তারপর
আবার চলল। আবার সেই রকম একান্ত তাক্সিলোর অর
শোনা গেল, শুধু তাক্সিল্য নয় তার সংগে যেন খানিকটা
ব্যঙ্গও মেশানো বলে মনে হোল। প্রেহেলিকা বলল—
“ইস, রাগ ত' কম নেই দেখছি কারও! রাগ করে তুমিও
আবার ছেড়ে চললে নাকি?”

আর সন্ধ্যা হোল না, কিংবা দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে
তাক্সিয়ে রইল প্রেহেলিকার দিকে। তারপর হিসহিস করে
জিজ্ঞাসা করল—“পাহারা দেবার আরও দরকার আছে
নাকি?”

“ও মা! সে আবার কি রকম কথা গো!” ভয়ে বিষ্ময়ে
চোখ দুটি যেন কপালে উঠে গেল প্রেহেলিকার। তাক্সিতাক্সি
সোজা হোয়ে উঠে বসল বিছানায়। চোখে মুখে গলায়
ব্যাকুলতা জীবন্ত হোয়ে উঠল। গলা, কাঁপিয়ে বললে—
“তা'হলে কি হবে! এভাবে সবাই যদি ফেলে চলে যায়,
উপায় কি হবে আমার!”

আন্তে আন্তে ঘুরে দাঁড়াল অশান্ত। বতহুর সন্তব ঠাণ্ডা
গলায় বলল—“ঠাট্টা করছেন!”

“ঠাট্টা!” আরও যেন ঘাবড়ে গেল প্রেহেলিকা। রুদ্ধ কণ্ঠে
বলে উঠল—“ঠাট্টা হোল এটা? এখন ঠাট্টা করবার সময়?
এই ঘোর বিপদে টেনে এনে আমাকে ফেলে পালানো একে
একে, আবার বলছ ঠাট্টা—”

চেয়ারে বসে পড়ল গিয়ে আবার অশান্ত। বসে ধীরে স্বস্থে
বলতে লাগল—“দেখুন, ভ্রাতৃলোকের ছেলে আমি, গেটের
দ্বারে এ পথে এসে পড়েছি। আপনারা—যারা অভিনয়
করেন—আপনাদের আমি প্রজ্ঞা করি। প্রজ্ঞা করি কথাটা
বড় বড়ুতা করার মত হোয়ে যাচ্ছে, মানে—প্রজ্ঞা ঠিক
নয়, আপনাদের আমি অজ্ঞ চোখে দেখি বললেই ঠিক বলা
হবে। কত শক্তি আপনাদের, মাহুয়ের স্বপ্ন দুঃখ আনন্দ
ভালবাসা, মাহুয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই নিখুঁত ফুটিয়ে
তুলতে পারেন। জীবন কি জিনিষ, তা' আপনারা যেমন



জানেন, তেমন আর কে জানে। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাদের পূজা করে। ই্যা—পূজা করে বলাই উচিত। সব সময় যখন আপনাদের তুলতে পারে না, তখন পূজা করা নয়ত কি। এ জিনিষটা কত বড়। এত লোক, যার নাম করতে অজ্ঞান, সে মানুষটি কি কম শক্তির অধিকারী। আমি তেমনি একজন আপনার তত্ত্ব। মানে—আপনার অসাধারণ শক্তির জন্তে আমিও আপনাকে পূজা করি। ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজাই কি পূজা শুধু, আমার কথাটা আপনি বুঝে দেখবেন মনে মনে যার ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়ানো হয়, সেটাও পূজা। এই যে মনে মনে মাথা নোয়ানো, এর একটা অর্থও আছে। অর্থ মানে—তত্ত্বও কিছু প্রত্যাশা করে। সেটা হোল এই যে ভক্তের মনের ভাবটা আপনাদের বোকা চাই। কিছু ইতর যে নেই, তা' আমি বলছি না। কিন্তু সবাই ইতর নয়। আপনার মত মানুষের সংগে কাজ করতে পারছি, এটাই মস্ত বড় সৌভাগ্য। হয়ত কোনও দিন কিম্বা লাইনে একটা কেউ বিটু হোয়ে দাঁড়াব। তখনও কিন্তু এ কথা তুলব না যে আপনি বা আপনারা কত সাহায্য করেছেন। তত্ত্বলোকের ছেলে, যদি দাঁড়িয়ে যায়, থাক না। এই ভেবে কাকেও জাহান্নমে নামান নি। সত্যিই তা' আর আমি বা আমার মত যারা আজ এই লাইনে খেটে মরছে, আমরা আপনাদের সমান হোতে পারি না। কি আছে আমাদের? কে চেনে? একমাত্র পেটের দায় ছাড়া অস্ত্র কোনও উদ্বেগ নিয়ে যে আমরা আসিনি, এটা কে না বোকে?"

আবোল-তাবোল কথা। বলতে বলতে কেমন যেন অজমনত্ব হোয়ে পড়ল স্রশাস্ত। তারপর একেবারে থেমেই গেল। থেমে গিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল। তুলেই গেল যেন, ঘরে আর একজন মানুষ রয়েছে।

প্রহেলিকাও যেন কি রকম বোকা বনে গেল। একটি কথাও বলতে পারল না সে, একটু নড়তেও পারল না, শুধু হোয়ে তাকিয়ে রইল মানুষটার দিকে। তারপর আর কি বলে, শোনবার অস্ত্রে কান মন পেতে রইল।

অনেকক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে চেপে ফেলল স্রশাস্ত। মুখ তুলে তাকাল একবার প্রহেলিকার দিকে।

তারপর আবার সেই অদ্ভুত স্বগতোক্তি করে চলল—“ব্যা পা র টা কি জানেন, যাদের জীবনে আশা ভরবা আছে, উন্নতি করতে পারবে, দাঁড়াতে পারবে একদিন, মানুষের মত মানুষ হবে, এই সব যারা তাবে, তারা কিছুতে—যাচ্ছেতাই কিছু করতে পারে না। আর চোঁকুর খেতে খেতে যারা একেবারে জেঙে পড়ে, তারা তাবে—দূর হোক, গে যাক্ যে ক'দিন পারি মজা লুটে নি। জীবনে যখন দাঁড়াতে পারবই না, তখন আর কেন। খামকা শুকিয়ে মরতে যাই কেন। সত্যি কথাটাই আপনাকে বলছি আমি, বেপরোয়া হোতে ইচ্ছে যে করে না তা' নয়। তবে যে বললাম, এখনও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি কি না, তাই বেপরোয়া হোতে গিয়েও হোতে পারি না। ঐ পুরুষোত্তমটার মত স্বপ্ন দেখি কি না এখনও, একটা মেয়েকে একদিন নিজের করে পাব। তাকে নিয়ে নিজস্ব একটু সংসার হবে, টাকাকড়ি বা যোজগার করব সবই তার। নামটাম যদি হয় তাতেও তার ভাগ থাকবে। মানে—আমার নামের জন্তে সে গর্ব অহুতব কররে—এই আর কি। কথা হচ্ছে, সেই মেয়েটাকে যেমন তাবে আমি পেতে চাই, আমাকেও নিশ্চয়ই সে তেমনি তাবে পেতে চাইবে। আগে থাকতে আমি নিজে যদি নষ্ট হোয়ে বলি, তা'হলে যেখানেই আজ থাকুক না কেন সে, তারও নষ্ট হওয়া সম্ভব। জানি, নষ্ট যদি করে সে নিজেকে এখন, তা'হলে রুখছি কেমন করে আমি। ঠিক, কিন্তু নিজে কেন থাটা থাকি না এখন, তা'হলে তার থাটা থাকাটা অন্ততঃ আশা করতে পারব। নয়ত—”

হঠাৎ থেমে গেল স্রশাস্ত। এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হোল, কি বলে চলেছে। ভয়ানক মুষড়ে পড়ল একেবারে, জন্ত চোখে তাকাল প্রহেলিকার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল। হুষ্টিতভাবে বললে—“আমি এখন যাই। শুধু শুধু হাবি-জাবি বকে আপনাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ছি। এ সবই তা' আপনি জানেন, কি তাবে যে আমরা বেঁচে আছি, তা' কি আর আপনি জানেন না।”

ঘোর লেগে গিয়েছিল প্রহেলিকার। হঠাৎ চটকা ভাঙতে



যেমন হয় তেমনি তাবে
সজাগ হোয়ে উঠল সে।
বললে—“বোস, বোস

একটু জুশান্ত। নাই বা গেলে এখনই। কোনও তর নেই
তোমার,—বোস না একটু এখানে। যতই ধারাপ হই না
কেন আমি, কথা দিচ্ছি তোমার, তোমার কোনও অনিষ্ট
করব না।”

“ধারাপ।” গাঢ় স্বরে জুশান্ত বলল—“ধারাপ আপনি নন,
কিছুতেই আপনি ধারাপ নন। আমার মনটা ধারাপ, তাই
ধারাপ ভেবে বসছি। একটা কথা আছে জানেন ত’—
মনের অগোচর পাপ নেই। আমার মনে রয়েছে পাপ,
আমার মন এটা ভাবছে ওটা ভাবছে, তাই গেল গেল শব্দ
করছি। মনে যদি পাপ না থাকত, তা’হলে এত বকেই বা
মরতে বাব কেন।”

বলতে বলতে আবার বসে পড়ল জুশান্ত। প্রাহেলিকাও
সজোরে নিজের মাথায় একটা কঁকানি দিয়ে নিজেকে
আরও সজাগ করে তুলল। তারপর অল্প কথা পেড়ে বসল
একেবারে।

“আচ্ছা জুশান্ত, ধর পুরুষোত্তমবাবু বউটিকে ফিরে গেলেন।
ফিরে গেয়ে তিনি কি জিজ্ঞাসা করবেন তাকে? কোথায়
কাটাল সে এতদিন, কি ভাবে কাটাল, এ সব কিছুই
জানতে চাইবেন না? একটা কিছু সন্দেহও করবে না?
বউটাকে ফিরে গেলেই সব মিটে যাবে?”

অত্যন্ত উৎসাহের সংগে জুশান্ত বলে উঠল—“নিশ্চয়ই,
খামকা সন্দেহ করে মরতে যাবে কেন পুরুষোত্তম।
দেখলেন না, সন্দেহের কথাটা একটু উত্থাপন করতেই কি
রকম খেপে উঠল। উঠবেই, কারণ ও নিজে হোল সঁজা
মানুষ। রুসু করে মল্ল কাউকে ভাবতেই পারে না। আর
সন্দেহ করবার দরকারই যে হবে না ওর। কিছু দিন ঐ
বউ নিয়ে যদি ঘর করত, তারপর যদি বউটা পালাত,
তা’হলে নানা রকম সন্দেহ হোত। মোটে ঘরই করল না,
যেমন বউ তেমনি রইল, যেদিন তাকে ফিরে পাবে সেই
দিনটিকে বিয়ের পর দিন বলে মনে করবে। ব্যস—
হাঙ্গামা চুক যাবে। বিয়ের আগে কি করেছে বউ, তা

নিরে কে মাথা খুঁড়ে মরতে বাচ্ছে। বিয়ের পরের দিন-
গুলো নিয়ে সহজ, সেই দিনগুলো যদি ওর বউ ওর নিজস্ব
হোয়ে থাকে, তা’হলেই হাঙ্গামা চুকে গেল।”

হুঁহুবার হাঙ্গামা চোকার কথাটা বলে সত্যিই যেন হাঙ্গামাটা
চুকিয়ে দিলে জুশান্ত। দিয়ে খুব জলজলে চোখ করে
প্রাহেলিকার দিকে তাকাল। হাঙ্গামাটা কিন্তু ঠিক চুকল
না। প্রাহেলিকা হুঁদিকে মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল—“অতই
সহজ নাকি ব্যাপারটা। কিছুই বুঝতে পারছ না ভূমি
জুশান্ত, কত বড় একটা কালো ছায়া পড়ল যে ওদের জীবনে,
তা’ ভূমি ধারণাই করতে পারছ না। সহজ ভাবে কিছুতেই
আর ওরা চলতে পারবে না। ঘর সংসার করবে হয়ত
শান্তিতে, বাইরে থেকে কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না।
কিন্তু, ঘর—এই রকম নির্জন নিশীথে সহর থেকে অনেক
দূরে কোনও একটা পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে
ঘরে জেগে ওরে আছে হুঁজনে। আকাশ তেজে বৃষ্টি
নেমেছে, ব্যাঙ ডাকছে। সমস্ত জগৎ থেকে আলাদা হোয়ে
গিয়ে হুঁজনে একান্তভাবে কাছে পেয়েছে হুঁজনকে, মনে
মনে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে। তখন সেই কালো ছায়াটা উন্নয়
হবে পুরুষোত্তমবাবুর মনে। বলবার মত করে যে কথাটি
বলতে বাচ্ছিলেন তিনি সেই পরমলগ্নে, সেটি আর বলা
হবে না। “তখন—”

হো হো করে হেসে উঠল জুশান্ত, তাল কেটে বাওয়াতে
চমকে উঠে থেমে গেল প্রাহেলিকা। হাসির ধমকে সামুনে
গেছনে হুঁলতে হুঁলতে জুশান্ত বলতে লাগল—“ঐ রকম
অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা কখনও ঘটবে না ওদের জীবনে।
পাহাড়, পাহাড়ের কোলে কুঁড়ে, নির্জন নিশীথ, ঝড় বৃষ্টি
ব্যাঙের ডাক, এই রকম ছুটিছাড়া বিপদে কেনই বা পড়তে
যাবে ওরা? ঘর সংসার করতে গেলে ঐ সমস্ত হয় নাকি
কখনও? নিজের বউটাকে নিয়ে—পাহাড়ের কোলে কুঁড়ে
ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবে, এ আবার কেমন কথা? পরের
মেয়েকে বার করে পালাতে গেলে ঐ হাল হোতে পারে।
তারপর ধকন, পড়েই যদি কখনও ওরা ঐ রকম অবস্থায়,
তখন বলবার মত করে যে কথাটি বলবে পুরুষোত্তম তা
আমি জানি। বলবে—খবরদার ঠাণ্ডা লাগিয়ে মোর না



বেন আবার। বাড়ী কিরে ডাক্তার বস্তির হাজামায় না
বেন পড়ি। বলে নিজের গায়ে যদি কোনও চাঁদর চাঁদর
কিছু থাকে, সেইটে দিয়ে বউটাকে জড়িয়ে রাখবে।
কিংবা সেই কুঁড়ে ঘরের চাল থেকে বাঁকা বাধারি খুলে নিয়ে
আঙুন করে কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে—ভালয় ভালয়
পরদিন সকালে বাড়ী কিরে আসবে। হাজামা চুকে বাবে।
এইবার সত্যিই হাজামা চুকে গেল। অনেকটা সময় আর
কিছুই বলল না প্রহেলিকা। শেষে একটা হাই তুলে
বললে—“বেশ বেশ। গোলমাল কিছু না হোলোই হোল।
আচ্ছা—এবার তা’হলে তুমি একটু শুয়ে পড়গে স্বশান্ত।
রাত আর বেশী নেই। আমিও একটু গড়িয়ে নি।”
বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে
চলল একেবারে। স্বশান্তকেও উঠে দাঁড়াতে হোল, শেষ
কথাগুলোও সে শুনেতে পেল—“তা’হলে ওঠ এবার তুমি,
দরজাটা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়ি। কাল সকালে এখান
থেকে যাতে তুমি যেতে পার, সে ব্যবস্থা করে দোব।
এরা আমার কথা শুনবে, আমি যদি রাজী হই থাকতে,
তা’হলে নিশ্চয়ই তোমার ছেড়ে দেবে। কাকাকাছি বে
রেল ষ্টেশন আছে, সেখানে তোমার পৌছে দিতে বলব।
তোমার কোনও কষ্ট হবে না। গাড়ী ঠিক হোলে আমি
ফিরব। আমার জন্তে তোমার কেউ কিছু বলবে না।”
কি বেন বলবার জন্তে হই করল স্বশান্ত, হই করেই আবার
বন্ধ করল মুখ। তারপর ষাড় হেঁট করে প্রহেলিকার
পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সংগে সংগে দরজাটা
বন্ধ হোয়ে গেল শব্দ করে। শব্দটার প্রতিধ্বনি উঠল
অতিথিশালার টানা বারান্দায়, শেষে মিলিয়ে গেল বিঁকি
পোকায় একঘেয়ে কান্নার সংগে।

বন্ধ দরজার পেছনে অভিনেত্রী প্রহেলিকার মুখখানি
নিদ্রাক্ষণ বিহীন অস্বাভাবিক রকম কঁটকে উঠল। বিখ-
জোড়া দাম্পত্য জীবনের ছালছাড়ানো স্বরূপটা এমন
চকৎকার ভাবে ফুটিয়ে ছাড়লে স্বশান্ত যে বলবার আর
কিছুই রইল না। প্রেম বিরহ অহরাগ অতিমান, কত

কি রজ্জ্বদার বন্ধ দিয়ে যে
জীবনকে সাজায় প্রহে-
লিকা, সেই জীবনটা প্রেক
বীশ বাধারি জালিয়ে তাতাবার মত সামগ্রী, এটা বেন
তার ধারণার বাইরে ছিল এককাল। কি জন্তে স্বামী জী
পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সোজা জবাব—মেহেতু
হুঁজনে মিলে ঘর সংসার করছে। ঘর সংসার করা কর্মটি
আবার এমন ব্যাপার যে তার মধ্যে নির্জন নিশীথের মন
ছোঁয়াছুয়ির কোনও স্থান নেই। স্পষ্টই বলে গেল স্বশান্ত,
পরের মেয়েকে বার করে নিয়ে পালাতে গেলে যে সব
কাণ্ড হয়, সে সব কাণ্ড স্বামী জীর জীবনে হওয়ার সম্ভাবনা
নেই। যদিও কখনও স্বামী জীর জীবনে এমন একটি মুহূর্তের
আবির্ভাব ঘটে, তখন মনের কথাটি মনের মত করে—
কানে কানে বলা যায়, তখন—সেই একান্ত দুর্লভ মুহূর্তটিতে
স্বামী জীকে বলবে—দেখ, বেন ঠাণ্ডি লাগিয়ে মোর না।
আর জী কি বলবে। বোধ হয় বলবে—তোমার হাঁপানির
ওষুণ্টা হামানদিস্তার কুটে দিতে হবে, হামানদিস্তাটা যে
আনতে তুলে গেছি।

হামানদিস্তার গর্ভে লবঙ্গ এলাচ বা লক্ষা হলুদ যে ভাবে
মহাশান্তিতে একসঙ্গে থেঁতো হয়, তেমনিভাবে একসঙ্গে
থেঁতো হবার দক্ষণ জী একটি চাই। মুখ্য উদ্দেশ্য—নিজেকে
একজনের সংগে জড়িয়ে ছোট্ট একটু গতির মধ্যে চুকে পড়া,
এত বড় দুনিয়াটাকে একেবারে এতটুকু দাঁড় করানো।
আকাশ বাতাস আলো আঁধার আশা আকাঙ্ক্ষা—এমন কি
কোতুহলের পর্বত স্থান নেই সেই গভীর মধ্যে। কোতুহল
থাকলেই সন্দেহ থাকবে, একে অপরকে ভাল করে জানবার
বোঝবার চেষ্টা করাটাও দাম্পত্য জীবনের পক্ষে মহাপাপ।
কখনও গলবে না তাকবে না তোবড়াবে না, এমন জ্বালের
খাঁটী ইম্পাত গড়া একখানা কড়াই বেন দাম্পত্য জীবনটা,
যার মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে স্বামী জী হুঁজনে আনুভূ-
সিদ্ধ হোতে পারে।

এক কড়াই তপ্ত তেলের মধ্যে নিজেই পড়ে গেল বেন
প্রহেলিকা, তিড়কিড়িয়ে ঘরঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল।
চোখের সামনে উপস্থিত হোল জোড়ায় জোড়ায় দাম্পত্য।



চোখ বুজে দেখতে পেল, ঠিক সেই সময় রাতের শেষ প্রহরে ছনিয়ার প্রত্যেকটি ঘরে কেমন নিশ্চিন্তে দাম্পত্যের ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমিয়ে রয়েছে না মরে রয়েছে। শিউরে উঠল প্রহেলিকা, স্পষ্ট অস্বস্তি করল সে, সবাই মরে রয়েছে। নির্ধাৎ মরে রয়েছে, খুব ভারী খুব মোটা চটচটে আলকাতরা মাথানো দাম্পত্য তেরপলের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে সবাই। তেরপলের বাইরে বিশাল বিধে বাই ঘটুক না কেন, এই মরার ঘুম ওদের কিছুতে ভাঙবে না।

হঠাৎ একখানি মুখ সামনে উপস্থিত হোল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রহেলিকা। চিনতে পারল মুখখানি, এই খামারেরই একেবারে ওধারে মস্ত বড় একটা ঘরে এই মুখখানিকে সে দেখে গিয়েছিল। মনে পড়ে গেল, কি বলেছিল সে সেই সময়। এই মুখখানি থেকে কি বেরিয়েছিল মনে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই দেখতে পেল, সেদিনের মত ঠোঁট ছ'খানি কাঁপছে। কি বেন বলতে চাচ্ছে, বলতে পারছে না। নিদারুণ অভিমানে বোবা হোয়ে এই ভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

তারপর বুকের মধ্যে গুনতে পেল কি বলতে চাচ্ছে-মেয়েটি। পরিষ্কার শুনল—“আমায় ধরিয়ে দিতে এসেছ তুমি? মরণ পর্বন্ত যাতে একজনের সংগে সিদ্ধ হোতে পারি দাম্পত্য কড়াইতে চড়ে, তার ব্যবস্থা করতে এসেছ?”

চুপ করে খানিকক্ষণ সেই কোলানো ঠোঁট ছ'খানির দিকে তাকিয়ে রইল প্রহেলিকা। তারপর বুক ফাটা চিৎকার করে উঠল—“না না না, বাধা দোব। যে ভাবে হোক, আমি রুখবই। কিছুতেই তোমার ধরা পড়তে দোব না।” নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানে যেতেই হ'ল ফিরে পেল আবার। থতমত খেয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে। একটা মস্ত বড় জলজলে নক্ষত্র ঘিরে ঘিরে উঠে আসছে, যেখান থেকে উঠে আসছে নক্ষত্রটা, সেখানটা খুবই নিবিড় ভাবে কালি মাখানো। তাইনে বাঁয়ে বতহুয় ছুটি পৌঁছল, ততহুয় কালির রেখাটা দেখা গেল। ওই কালো কালির ভেতর থেকেই অমন একটা জলজলে নক্ষত্র উঠে আসছে।

এই কালোর অন্তরে ও লুকিয়ে ছিল। কি অদ্ভুত কাণ্ড। নক্ষত্রটাকে চোখ দিয়ে অঙ্গসংগ্রহ করতে লাগল প্রহেলিকা। অঙ্গসংগ্রহ করা মানে, কারও পেছন পেছন যাওয়া। অঙ্গসংগ্রহ করতে গেলে ক্রমেই দূরে চলে যেতে হয়। একে একে কিস্তি উলটোটা ঘটল, নক্ষত্রটাকে অঙ্গসংগ্রহ করতে করতে ক্রমেই নিজের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্বন্ত একেবারে জানলার মাথায় এসে উপস্থিত হোল নক্ষত্রটা, তার পর আর দেখা গেল না। প্রহেলিকার মনে হোল, ঠিক তার কপালের ওপর ছুই ভুঙ্ক-মাঝখানে নক্ষত্রটা ঢুকে গেল।

আন্তে আন্তে জানলা ছেড়ে এসে বিছানার ওপর বসে পড়ল। তখনও জলজল করছে নক্ষত্রটা কপালে। স্নিগ্ধ আলোর আলো হোয়ে গেল নিজের ভিতরটা। জুড়িয়ে গেল সব, বিশ্বজোড়া শান্তি—কোথাও কোনও গুণগোল নেই। পুরুষোত্তম নেই, পুরুষোত্তমের বউ নেই, স্রশাস্ত নেই, দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে স্রশাস্তর কিছুতকিমাকার ধারণাও নেই। কারও সংগে কোনও সম্পর্কই নেই প্রহেলিকার। কোনও রকম ধরা হোয়ার ধার ধারে না সে। এমন কি জীবন মৃত্যুর ধারও ধারে না। কণে কণে নবজন্ম নেবার সাধনা তার, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে সে। তার আনন্দ নবজন্ম নেবার আনন্দ, সে আনন্দের মধ্যে মরণের হাহাকার নেই। কারণ অভিনেত্রী মরে না, জন্মান্তর গ্রহণ করে। বিশ্ববিধাতা অভিনেত্রীর বুকে যে সম্পদ দিয়ে দিয়েছেন, সেই সম্পদটির নাম মরণ। নিজের ওপর মরণ নয়, বিশ্ববিধাতার সমগ্র সৃষ্টিটার ওপর মরণ। নিজের ওপর মরণ থাকলে, নিজের সম্বন্ধে খেয়াল থাকলে বিশ্বসৃষ্টিটাকে নিয়ে তুলে থাকা সম্ভব হয় কেমন করে! তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি করে জগৎ দেওয়া যায় এই বিচিত্র সৃষ্টির।

অভিনেত্রী হোল এই শুকতারারটার মত। কালোর ভেতর থেকে উদয় হোল, আলোর ভেতর অন্ত বাবে। কালো থেকে আলোর পৌছবার সময়টুকু সার্থক ওর। রাতার তিম্বুক আর স্বর্ণ-সিংহাসনের সম্রাট, সবাইকে জুড়িয়ে দেবার সাধনা ওর। ওর স্নিগ্ধ-মুষ্টি সবাবের জন্মে, কেউ

তা থেকে বঞ্চিত হয় না।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল প্রহেলিকা।

নক্ষত্রটা তার কপালের মাঝখানে কলকল করে ঝলতেই লাগল।

২২৫

কপাল কপাল করক অনেক।

কোনও কপালে ভোরের শুকতারার স্নিগ্ধ আলো ফুটে ওঠে, কোনও কপালে ছুপূরের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কেউ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কপালের ঝটিনটিতে ফাহুসের মত উড়তে থাকে, কারও ঘুম ভাঙে কপালের ফচকেমির ফলে ক্ষতুর সেক্কে। সেই যে কে একজন মস্ত বড় সেনাপতি বাদশা মশায়ের ফরমান নিয়ে দিল্লী থেকে বাঙলা জয় করতে আসবার সময় বলেছিলেন—আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সংগে—কথাটা নেহাত ফেলনা নয়। ফেলনা যে নয়, তার প্রমাণ পেয়ে গেল পুরুষোত্তম। মোগলসরাই থেকে পাটনা আসতে আসতে তার কপালের ফল ফলতে শুরু করলে। চৌচামেচি খাঙ্কাখাঙ্কির ফলে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন সর্বপ্রথম যে জ্ঞানটুকু সে অর্জন করলে, তা হচ্ছে প্রায় নির্বাণং পরমং স্তম্ভং সদৃশ। অজ-সংলগ্ন সবকটি জেব জিব ভেঙেচে জানিয়ে দিল যখন তাকে, যে তারা আর কোনও কিছুই বহন করবার পর্বোদা করে না, তখন তার মস্ত-ঘুম-ভাঙা ঠাঙা কপালটা তেতে আঙুন হোয়ে উঠল। গাড়ী-ভরতি মাছষের জোড়া জোড়া চোখগুলো থেকে গঙা গঙা তীর ছুটে এসে ফুটে লাগল তার সর্বাংগে। মুখ ভুলে কোনও দিকে তাকাবারও সাধ্য রইল না, মাথা নিচু করে বসে দূরদূর করে ঘামতে লাগল।

টিকিট-দেখনে-ওয়ারা সাহেব সামনের বেকির—ছুঁজন যাত্রীর সংগে রেলের আইন নিয়ে মহামান্নি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন তখন। বিহারের মাছষে অতশত আইনের মারপ্যাচ বোঝে না, টিকিট না করে গাড়ীতে উঠে ধরা পড়লে যে জরিমানা দেওয়া লাগে, এ তারা মানতে প্রস্তুত নয়। বিশেষতঃ টিকিট কিনতে গিয়ে ভিড়ের দরুণ টিকিট

ঘরের কাছে পৌঁছতে

পৌঁছতেই যদি গাড়ী

ছেড়ে যাবার সময় হয়,

আর তখন বাধ্য হোয়ে বিনা টিকিটে গাড়ীতে চড়তে হয়, তখন খামকা জরিমানা দিতে বাবে কোন ছুঁখে। জাযা ভাড়া দিতে রাজী তারা, কিন্তু জরিমানার নাম শুনেতেও রাজী নয়। এ হেন অবস্থায় সংঘর্ষ বাধতে বাধ্য। হোলও তাই, হঠাৎ গাড়ীর এক কোণ খেতে কে একজন আহেলী ছাপরাই হিন্দীতে কি একটা বদখত বাত আওড়ে উঠল, যার সরলার্থ দাঁড়ায় যে টিকিট-দেখনে-ওয়ারা সাহেবটি রেলকোম্পানীর অমুকের অমুক। অতবড় মধুর সংস্কৃতি কিন্তু যথোচিত মধুর কল প্রসব করল না। রেল-আইনের কবচকুণ্ডলধারী কর্ণ বিনা টিকিটের যাত্রী একজনের গায়ে হাত দিয়ে ফেললেন। আর বাবে কোথায়, মুহূর্ত মধ্যে বিহারী-বিক্রম স্বরূপ ধারণ করলে। এক গাড়ী জী পুরুষের কিল চড় ঘুঘি লাগি রেল আইনের কবচকুণ্ডল ছিন্নভিন্ন করে হতভাগ্য কর্ণটিকে ভবপারে পাঠাবার উপক্রম করলে।

অমন সামান্য কারণে একটা মান্নব খুন হয়ে বাবে, এটা অভাবনীয় কাণ্ড। লাকিয়ে উঠে গাড়ী থামাবার চেনটা খুঁজতে লাগল পুরুষোত্তম। কোথায় চেন, যেখানে কোথানে গাড়ী থামাবার ভয়ে রেল কর্ণপক্ষ ও আপদ গুটিয়ে ফেলেছেন। তখন আর দেবী করারও সময় নেই, চেন খোঁজায় ইন্তকা দিয়ে চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরুষোত্তম কিল চড়ের মধ্যে। তারপর যখন আবার চোখ খুলে তাকাবার ফুরসত পেল, তখন গাড়ী থেমে গেছে। গার্ড ষ্টেশন মাষ্টার পুলিশ আরও অনেক লোক উপস্থিত হোয়েছে। টিকিট-ওয়ারা-সাহেবটির শরীরটা রয়েছে পুরুষোত্তমের বকের তলায়, সে বেচারার জ্ঞান নেই। ষেটুকু জ্ঞান বজায় আছে তখনও পুরুষোত্তমের, সেটুকুর সাহায্যে এইটুকুই যে বুঝতে পারল যে তার মাথা মুখ গর্বশরীর—একেবারে খেঁতো হোয়ে গেছে।

রেলওয়ে আদবকারীরা মাকিক—তদন্ত শুরু হোল তারপর। মেয়ে যারা পালিয়ে গেল তাদের চুলের টিকি ছুঁতে পারা



গেল না যখন তখন কিছু
নির্দোষী মানুষকে ধরে
নাকানি চোবানি না

খাওয়ালে নালায়েক গণ্য হন যে কর্তারা। রিক্তর ছক-
কাটা কাগজের ওপর এস্তার নাম খাম ঠিকানা লেখা
হোয়ে গেল। কে কি দেখেছে না দেখেছে, তার হবছ
বিবরণ বখাবিহিত লিপিবদ্ধ হবার পর সর্বশেষে এল
পুরুষোত্তমের পালা। একটু আধটু ওষুধ লাগানো হোয়ে
গেছে তখন তার পায়ের মূখের চোটগুলোর ওপর, খানিকটা
কড়া ওষুধ সেলানোও হোয়েছে। কলে উঠে পাড়াবার
সামর্থ্য হোয়েছে আবার তার। এজাহারের শুরুতেই
লেগে গেল হাঙ্গামা। নামের পরেই খাম, নামটাই বেশ
শাস্তিতে বললে পুরুষোত্তম, খাম জিজ্ঞাসা করতেই রক্ত-মুর্তি
ধারণ করলে। পাগটা প্রস্ন করে বলল—“পাড়ী খামাবার
চেন নাই কেন গাড়ীতে? ঐ যে লোকটা রেলের চাকরি
করতে এসে এক ভুটি গুণ্ডার হাতে প্রাণটা দিতে বসেছিল,
ওর বাঁচবার উপায় কি? চেন টেনে গাড়ী খামাতে পারলে
ওর বাঁচবার উপায় ছিল। চেন বায়া উঠিয়ে দিয়েছে, তারা
ওকে রক্ষা করবার কি ব্যবস্থা করেছে?”

জবাব নেই। সত্যিই জবাব দেবার নেই কিছু। একজন
বাজী নিজের জান বিপন্ন করে একজন রেল কর্মচারীকে—
রক্ষা করেছে। রক্ষা করতে গিয়ে এমন চোট খেয়েছে
নিজে যে দেখলেও কষ্ট হয়। সেই বাজীই এবার জিজ্ঞাসা
করছে অতি ভাব্য প্রশ্ন একটি। গাড়ী খামাবার চেনটা
শুধু যে বাজীদের জীবনের ক্ষেত্র থাকে তা ত’ নয়, রেলের
কর্মচারীর মোক্ষম প্রয়োজনেও লাগতে পারে সেটা। কেন
ঐ অত্যাবশ্যক জিনিষটা উঠিয়ে দেওয়া হোল?

এজাহার দ্বারা গ্রহণ করছিলেন, তাঁরা জবাব দেবেন কি।
প্রত্যেকেই মর্মে মর্মে বুঝছিলেন, সত্যিই ঐ গাড়ী খামাবার
—উপায়টা উঠিয়ে দেওয়া কত বড় অজ্ঞার। ক্ষতরাং সবাই
চুপ করে রইলেন।

পাগটা পরিস্কার করে নিয়ে পুরুষোত্তম বলল—“জানি,
আপনারা কেউ আমাব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না।
কারণ জবাব দেবার কিছু নেই। আপনারা কেউ একলা

ও গাড়ীতে উঠলে ঐ রকম অবস্থাই হোতে পারত। বাক্য
এবার লিখে নিন আমি যা বলছি। বায় হকুমে গাড়ী
খামাবার চেনটা উঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সেই জানোয়ারটা
যদি কখনও আমার সামনে এসে পাড়াবার সাহস পায়—
তবেই আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দোব। নয়ত
আমার মুখ থেকে একটি কথাও আর আপনারা বার করতে
পারবেন না।”

ব্যাপারটা সেখানেই সমাপ্ত হোল তখনকার মত। পাড়
সাহেব বুড়ো মানুষ এবং বাঙালী। তিনি বললেন—
“সর্ব্ব্ব খোয়া গেছে বাবাজী। দেখা যাচ্ছে, কোনও
পকেটে কিছু নেই। জিনিষপত্র কিছু ছিল কি না, তাও
বোকা যাচ্ছে না। থাকলেও খোটারা সব সংগে নিয়ে
গেছে। এখন উপায়। কোথায় যাবেন বাবাজী, সেটা
জানতে পারলেও হোত। আমরা সেখানে পৌঁছবার
ব্যবস্থাটা জরুরি করতে পারতাম।”

প্রস্তাবটা তত্নলোক নেহাতই কৃত্রিম ভাবে পেশ করলেন।
উপস্থিত সবাই এক বাক্যে সমর্থন করে ফেললেন তাঁর
প্রস্তাবটা। তখন মেজাজ নরম হোল পুরুষোত্তমের।
নরম মেজাজে একটু চিন্তা করতেই সে বুঝতে পারলে,
কোথাও পৌঁছতে হোলে এদের সাহায্যটা নেওয়ারই উচিত।
কপর্দক-হীন দশার গাড়ীতে চড়াই বা বাবে কেমন করে!
বাধ্য হোয়ে সে বলল তার গন্তব্য স্থানটা। বলল—“কোন
ষ্টেশনে আমাকে নামতে হবে, তা’ আমিও ঠিক জানি না।
পাটনা পর্যন্ত টিকিট ছিল। পাটনার পৌঁছে পাটনা
তারা ব্রাক লাইনের গাড়ী ধরতাম। পাটনাতেই খোঁজ
নিতাম, বজ্রবাহন বাবুর খামারে যেতে গেলে কোন ষ্টেশনে
নামতে হয়। বজ্রবাহন ঝা খুবই নাম করা লোক, তাঁর
খামার কোথায়, নিশ্চয়ই অনেকে জানে। বহুশ্রম দিয়ে
চাষ হয় গেই খামারে, বৈজ্ঞানিক প্রকার কৃষির প্রবর্তন
করেছেন বাবু বজ্রবাহন ঝা। অত বড় লোক আর তাঁর
অমন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান—নিশ্চয়ই পাটনার গেলে খোঁজ
পেতাম—কোন ষ্টেশনে নামতে হবে। তারপর টিকিট কিনে
গাড়ীতে চড়তাম।”

তখন পাড় সাহেব ষ্টেশন মাটির পুলিশের লোকরা পরস্পরের

চোখের দিকে—তাকালেন। উপস্থিত রাজীদের মধ্যে অনেকে সেখাে টাকা দিতে এগিয়ে এল, যাতে টিকিটের দামটা হয়। কোনও কিছুই লাগল না, রামাছড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত সাজ পোষাক পরা, খার্ড ক্লাশ গাড়ীর গায়ের তিন দাঁড়ি কপালে আঁকা একজন সাধু গোছেব মাহু—ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে খানদানী হিন্দোতে বললেন, বাবুজী যখন বজ্রবাহন বাবুর খামারে যাবেন তখন আর ভাবনা কি। তিনিও সেই খামারেই যাচ্ছেন, বাবুজী যদি কৃপা করে তাঁর সংগে আসেন, তা'হলে এক সংগেই ছ'জনে সেখানে পৌছাতে পারেন।

অতঃপর আর কোনও মুশকিলই রইল না। বৈষ্ণব বাবাজীর সংগে পুরুষোত্তম গাড়ীতে উঠে বসল। পুলিশের লোকেরা তাদের খাতায় বজ্রবাহন বাবুর খামার কথাটি লিখে নিল। প্রয়োজন হোলে ঐ ঠিকানায় সমন পাঠালেই রগচটা লোকটিকে সাক্ষীর কাঠ গড়ায়—হাজির করা যেতে পারবে।

প্রায় ঘণ্টাপানেক সেই ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবার পরে আবার যখন নড়ে উঠল গাড়ী, তখন হঠাৎ ছ'শ হোল পুরুষোত্তমের যে প্রথম শ্রোণীর গদিতে বসে আছে সে। সামনের বেকিতে বসে আছেন সেই বৈষ্ণব বাবাজী, বসে বসে অতি নিপুণ হস্তে তিনি সিগারেট পাকাচ্ছেন। মূল্যবান পাউচ থেকে ছ' আঙুলে টব্যাকো বার করে নিয়ে যে রকম কায়দা করে কাগজে ফেলে পাকিয়ে নিয়ে জিবে ঠেকিয়ে তৈরী করলেন তিনি সিগারেটটা, তা দেখে বেশ আশ্চর্য হোয়ে গেল পুরুষোত্তম। রামাইৎ সাধু খুঁখু দিয়ে সিগারেট পাকিয়ে মহা আরামে ধূমপান করছেন, এ দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ। চুপ করে বসে তাকিয়ে দেখতে লাগল

সাধুটিকে পুরুষোত্তম, অত্যাৎকষ্টে বিদেশী তামাকের স্বগন্ধি ধোঁয়ার



কামরাখানা বোকাই হোয়ে গেল। ধূমানন্দে বিভোর সাধুজী চোচ্চ নিম্নলন করে রইলেন। টানের চোটে সিগারেটের আগুন তাঁর আঙুলের চামড়ায় এসে ঠেকল।

ধূমপান সমাপ্ত করে উঠে দাঁড়ালেন বাবাজীটি। তারপর একে একে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ খুলতে লাগলেন। প্রথমেই মস্তকাবরণী নামালেন। চেপটা বাটির মত ব্যাপার একটা, উবুর করে মাথায় দেওয়া ছিল। সেই বাটির সংগে জোড়া এক টুকরো কাপড় পেছন দিয়ে বাড় পর্বন্ত নেমে গিয়েছিল, তাই দিয়েই ছ'কান ঢাকী ছিল। অর্থাৎ তুরু থেকে পুতনি আর ছ'গালের আখখানা করে দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ, এইবার সারা মুখ মাথা দেখা গেল। গোল মাথা, গোল ভরাট মুখ, মাথা ভরতি সাদা কালোর মেশানো খোকা খোকা চুল, আবার চুলের ঠিক মাঝখানে লম্বা সিঁধি, সবটুকু মিললে তক্ত তক্ত গদগদ ভাবটুকু প্রকাশ পেল না। তারপর তিনি খুলে ফেললেন আলখালা গোছের গাজাবরণটি। প্রকাশ পেল মটকার পাঞ্জাবি বন্ধরের খুতি। সর্বশেষে ছোট একখানি ভোম্বালে দিয়ে কপালের ওপর থেকে ছ'পানে সাদা মাঝখানে হলদে খার্ডক্লাশের ছাপ মুছে ফেললেন যখন, তখন আর তাঁকে খার্ড ক্লাশ বলে মনেই হোল না। মস্ত বড় চামড়ার স্কটেকশ খুলে একটি পার্টিকিলে রঙের জহরকোট বার করে পাঞ্জাবির ওপর চড়িয়ে নিলেন।



The Hallmark of Quality

আমাদের কাছে সর্বদাই পাবেন

এইচ, এম, ভি, কলম্বিয়া এঞ্জেল ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ড, একর্স্টেণ্ডেড প্লে এবং লং প্লেয়িং রেকর্ড।

দি ব্রিটানিয়া টকিং মেশিন কোং (ক্যাল)

১৮-৪, ধর্মভজা স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩



আঁতকে উঠল পুরুষোত্তম—“বলছেন কি আপনি! শুধু শুধু মারামারি করে বেড়াই নাকি আমি! আমি আপনার



উচ্চ শ্রেণীর ঘড়ি, বেডিও
ও গ্রামোফোন, ক্যাম্পা-
গার, ক্ষমতা প্রাপ্ত, বিদ্যেয়া
গ্যারান্টি সহ, মেরামত
করা হয়।



ভারত মিউজিক ওয়ার্চ কোঃ
পি. ৩৬, বাধা বাজার, ট্রিট, কলিকাতা



জেজালি বিচারে শাস্ত্রের
 তনবাহীত অকলিম্যম্ভুচি সুন কবু-
 কামনা করি সকলকর সুখ অম্বুজি-
 মঙ্গলিত শান্তিময় জীবন।

জোন: ৩৪-২৮৭৮
 ১৫৮ মুক্তবাহ বাবু ক্রীতি

শ্রী জেজালি অধ্যাপক
 সচিব

গায়ে হাত—^{১০}

“দেবেন না—। মানে—ছোটো মেয়ে হাত গন্ধ করবেন কেন।” খুবই অমায়িক ভাবে বলতে লাগলেন ভক্ত-লোকটি, “এত, অতি উত্তম কথা। সেই সাহসেই ত’ বলছি, একটিবার দয়া করে ঐ ঘরে গিয়ে আয়নার নিজের মুখখানি দেখুন। তা’হলেই বুঝবেন, কেন মুখ হাত বুয়ে কাপড় জামা পাগলটাতে বলছি। দুঃশাসনের রক্ত পান করবার পরে ভীমসেন মশায়ের এই রকম চেহারা বোধ হয় হোয়েছিল। গাড়ী থামবার পরে লোকগুলো বগন পালাচ্ছিল, তখন তাদের কয়েকজনকেও দেখেছি। একজন ত’ বলেই কেললে যে সাক্ষাৎ এক রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের গাড়ীতে। রাক্ষসটা কয়েকজনের নাক-কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। সেই জন্তেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। সাক্ষাৎ রাক্ষসের দর্শন পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় কিনা।” পুরুষোত্তম হেসে ফেলল। ভক্তলোকের ভালোমাহুবী উক্ত দেখে না হেসে থাকা

যায় না। হাসতে গিয়ে মুখের ওপর নানা জায়গায় টান ধরল। মুখটা বিকৃত করে বলল—“সেই জন্তাই বলছি, রাক্ষসকে কাপড় চোপড় দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে। ওগুলোও হয়ত রাক্ষস খেয়ে ফেলবে। তা’ ছাড়া সেই খামারে বখন আমার কাপড় জামা রয়েছে—”

“আরে মশাই—খামার পর্বস্ত পৌছিতে হবে ত’। যান আর ভয় দেখাবেন না ঐ চেহারা নিয়ে। চাই করে মুখে মাধায় জল দিয়ে সব বদলে আসুন। পাটনার আর দেয়ী নেই।” কথা বলবার কায়দাটাই এমন ভল্লোলকের যে এবার আর, তাঁর কথার ওপর কথা বলা গেল না। পাণ্ডাবি পাঁজামা নিয়ে উঠে গেল পুরুষোত্তম। বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজেকে দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল। কি ভয়ানক কাণ্ড। এই চেহারা নিয়ে পাটনায় সে নামত কেমন করে।

ফিরে এসে বসল আবার, বখন নিজের জায়গায় পুরুষোত্তম, তখনও তার মুখ হাত জলছে। যে সব জায়গা কেটে গেছে,—সেগুলোর ওপর জল সাবান লাগাতে জলুনিটা অস্থ হোয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ করতে লাগল। ইতিমধ্যে ভল্লোলকটি মস্ত এক ঝুড়ি খুলে কয়েকটা বেদানা বার করে লম্বা একখানা ছুরি নিয়ে ছাড়াতে লেগে গেছেন। নিজের কাজের ওপর নজর রেখে বললেন—“নি, এবার আরম্ভ করুন। বিশেষ কিছু আর নেই। আসতে আসতে

সব শেষ করে ফেলেছি।

কাল রাত্রেই পৌছবার

কথা ছিল গয়ায়, এক

বেটার কথায় কানীতে নামতে হোল। চল্লিছগুণে গদাঝান,

তাও আবার বারাগসীতে, এ মওকা নাকি ছাড়তে মেই।

মওকার সন্ধ্যাবহার করতে গিয়ে প্রাণটাই বেতে বসেছিল।

দেশে যে আমার মত পাণী লক্ষ লক্ষ আছে, তা’ জানতাম

না। দেশ হুড়ু পাণীর গ্রহণে গদাঝান করে পাণ বুয়ে

ফেলবার আশায় কানীতে গিয়ে ছুটেছে। গদা পর্বস্ত

পৌছনোই গেল না রাত্রে, সারা রাত টেঁশনে বসে ফলগুলো

সাবড়ে ফেলা হোল। গ্রহণ চুকে যাবার ঘণ্টা ছয়েক পরে

ভোর বেলা কোনও ক্রমে গদায় পৌছে ডুব দিয়ে ফিরে

এই গাড়ীখানাই সামনে পেলাম। তা’ তাই সই, পৌছই ত’

গিয়ে পাটনায়, তারপর দেখা যাবে। ভাগ্যে চড়েছিলাম এই

গাড়ীতে, তাই ত’ আপনার মত মাছুষের দেখা পেলাম।”

কানা উচু পেভলের থালা একখানি পুরুষোত্তমের দিকে

বাড়িয়ে ধরলেন ভল্লোলক। দেখে ভয় পেয়ে গেল

পুরুষোত্তম। হাত না বাড়িয়ে বলল—“আমাকে খেতে হবে

না কি সব। কি আশ্চর্য। সত্যিই আমি রাক্ষস নাকি।”

ভল্লোলক একটুও অশ্রদ্ধত হোলেন না। বললেন—“ধরুন

না, ধরে রাখুন আপনার পাশে। তারপর শুরু করুন।

আমিও আসছি এগুলো শুড়িয়ে রেখে। ফলই ও’ মশাই,

লোহা লকড় ত’ নয়। মুখে ফেলবেন, চিব্ববেন, রসটুকু





গিলে ছিবড়েটা ফেলে
দেবেন। রসগ্রহণ করতে
শিখুন মশাই, ছিবড়ে

পরিভাগ করে রস গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হোন। নরত
টিকবেন কি করে ছুনিয়ায়। ছুনিয়াটার বেশীর ভাগই
যে ছিবড়ে, রস আর কতটুকু পাওয়া যায়। যেটুকু পাওয়া
যায়, সেটুকু কি ছাড়তে আছে। চলতে ফিরতে বেঁচে
থাকতে হবে ত'। শুধু ছিবড়ে নিয়ে খুনোখুনি করে
বেড়ালে কি শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়।

কথা বাড়াল না আর পুরুষোত্তম, কানিখানা নিয়ে পথে
রাখল। দেখে নিল একবার কি কি রয়েছে কানিতে।
সবই মেওয়া, বেদানা আঙুর কিসমিস আখরোট এই
জাতীয় জিনিষ সব। কলা পেপের মত পেট ভরবার ফল
কিছুই নেই। দেখে বুঝতে পারল, রস গ্রহণ করতে
জানেন ভক্তলোক। রসটুকু গ্রহণ করে ছিবড়েটুকু পরিভাগ
করতে জানেন বলেই হুতি পাঞ্জাবির ওপর আলখালা
চাপিয়ে ফোঁটা তেলক কেটে নিজেই ঢেকে রাখেন।

প্রজ্ঞা হোল মাহুঘটির ওপর পুরুষোত্তমের। কিন্তু ইনি
চলেছেন কেন সেই খামারে! সেখানে চলেছে বহুপাতির
কাজ কারবার, তার মধ্যে একে মানায় কি করে। এমন
রসাল লোকটির কি প্রয়োজন থাকতে পারে সেখানে।

কসু করে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল পুরুষোত্তম—“আপনি কেন
যাচ্ছেন সেই খামারে? ওখানে ত' কোন বাঙালীকে

দেখলাম না। চেনা জানা কেউ আছে বুঝি আপনার?”

ঝুড়ি সামলে পুরুষোত্তমের বেকিতে এসে বসে পড়লেন
ভক্তলোক। বললেন—“বলছি, বলছি, সবই বলছি—

এবার। নিন, মুখে পুরে চিবুতে খাঙ্কুন আর শুনুন।

খামারে বাঙালী নেই কেউ, আপনি দেখে এলেন বুঝি!

তা' আপনি ত' বাঙালী, আপনি হঠাৎ ছুটেছিলেন কেন

সেখানে? বাঙালী হোয়ে আপনি যখন যেতে পারেন

সেই খামারে, তখন আমিই বা যেতে পারব না কেন?”

এক ঘুর্তা বেদানা নিয়ে পুরুষোত্তম বলল—“সখ করে কি

গিয়েছিলাম মশাই সেখানে আমি, আমার কথা ছেড়ে দিন।

আমার মত ক্যানাদে পড়ে গেলে যমের বাড়ীও যেতে হয়

লোককে। এই যে আবার ফিরে চলেছি, এও কি সখ

করে যাচ্ছি। না গিয়ে উপায় নেই, বলেই যাচ্ছি। গেলে

যে কি ফল ফলবে, তা ভেনেও যেতে হচ্ছে। যে উদ্বেগ

নিয়ে এলাম, তা' ত' গোদায় গেল। এখন কতদূর গড়াবে

প্রাঙ্ক, তাই তাবছি।”

বেদানান্তলো মুখে পুরে হাউহাউ করে চিবুতে লাগল

পুরুষোত্তম জানলার বাইরে তাকিয়ে, ভক্তলোকটির দিকে

তাকিয়েও দেখল না।

সম্ভরণে দুটি আঙুর তুলে আলগোছে মুখে ফেললেন

ভক্তলোকটি। কয়েকটা বাদাম তুলে নিয়ে নখ দিয়ে খোসা

ছাড়াতে লাগলেন। অন্তমনস্ক হোয়ে পড়লেন যেন ভয়ানক,

অন্তমনস্ক মাহুঘের মত নিজেই যেন বলতে লাগলেন—

“খুবই সাংঘাতিক কথা ত'! খামারের

লোকগুলো একেবারে অংলী জাতের

বোধ হয়। নিশ্চয়ই খুব খারাপ

ব্যবহার করেছে আপনার সংগে।

করবেই ত', মোটের ওপর চাষাই ত'

বটে। বহুপাতি দিয়ে চাষ করলে কি

হবে, আসলে চাষ। চাষ যখন করছে,

তখন চাষা ছাড়া আর কি। চাষারে

বুঝি, ভক্তলোকের সম্মান রাখতে

জানবে কেমন করে।”

বেদানার ছিবড়ে জানলা দিয়ে ফেলে

রূপ ও জৌন্দর্য চর্চায়
দীর্ঘ দিন থেকে
ডে.এন.কুণ্ডু এণ্ড কোং
শ্রীমতী পাউডার, স্নো
দিদিমনি আলতা ও সিকুর
ব্যবহারে গতিবাহারের আনন্দ পেয়ে
আসছি। বলেছেন:—প্রতিমাত্রায় রূপ ও চিত্রশিল্পী
শ্রীমতী সিদ্দিকা

পুরুষোত্তম বললে—“ঠিক উলটো মশাই, একেবারে বিপরীত কাণ্ড। ভদ্রতার অবতার থাকে বলে, তাই হোলেন সেই খামারের লোকেরা। চোস্ত ভদ্রতা, একদম নিরেট পাবাণের মত ভদ্রলোক সবাই। এক একটি বিনয়ের ভালগাছ বিরাজ করছেন সেখানে। মালিক মশাইকে এখনও দেখিনি, তাঁর কর্মচারী মশায়দের দেখেছি। সর্বপ্রধান কর্মচারী মশাইটির সংগে পরিচয়ও হয়েছিল। তিনি হলেন জগৎরাম, রামের মত রাম থাকে বলে। আঃ, কি চমৎকার চোখের জল ফেলতে পারেন ভদ্রলোকটি। দয়ার অবতার সাক্ষাৎ রামচন্দ্র। কিন্তু পাকা বিচ্ছ একটি। অতি বিনিতভাবে জানিয়ে দিলেন যে পালাবার চেষ্টাটি কোর না। বন্দী হোয়ে থাক বতর্কণ না মালিক মশাই আসছেন।”

শুনে শিউরে উঠলেন ভদ্রলোকটি। বললেন—“মাথা ধোয়েছে। বন্দী করে রেখে দিলে! কেন? সেখানেও মারপিট করেছিলেন বুঝি? তারপর পালিয়ে এলেন কেমন করে? মানে—আপনাকে আটকে রাখা অবশ্য সহজ নয়। তা’ আবার কিরে যাচ্ছেন যে? এবার গিয়ে আচ্ছা করে শিক্ষা দেবেন নাকি তাদের। না মশাই, আমি আর যাচ্ছি না সেখানে। হাদামা হুজুতের তেতর বাবার সখ নেই এই বয়েসে। আপনি একলাই বান, পাটনা থেকে টিকিট কিনে দিচ্ছি। মানে মানে আমি পাটনা থেকেই ফিরব।”

অকপট জাস, কার সাধ্য ঠাট্টা বলে সম্বোধন করবে। হা হা শব্দে হেসে উঠল পুরুষোত্তম। ভদ্রলোক হু’ পাশে মাথা নাড়িয়ে বললেন—“হাসছেন হাসুন। আমার মত বয়েস হোলে আর হাসবেন না। এই বয়েসে মারপিটের নাম শুনেলেই প্রাণ কেঁপে ওঠে।”

হালি খামিয়ে পুরুষোত্তম বলল—“খামুকা তর পাচ্ছেন আপনি। মারামারি করতে যাব কেন যেখানে সেখানে। আর মারামারি করে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় আছে নাকি। কত লোক সেই খামারে, পাঁচ সাত শ’ লোকের সংগে কি একলা মারামারি করা যায়।”

“খুব যায়, নিশ্চয়ই যায়।”
খুবই জোর দিয়ে বলতে লাগলেন ভদ্রলোকটি—

“আপনার পক্ষে সব সম্ভব। গাড়ী তরতি মাহুদেয় একলা ঠেঙিয়ে এলেন। আবার বলে এলেন, যার ছকুমে মেল গাড়ীর চেন উঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, তাকে একবার সামনাসামনি দেখতে চান। আচ্ছা মশাই, ধরুন সেই লোকটা এল আপনার সামনে। কি তখন করবেন আপনি? একলা-ত’ আর সে আসবে না, রেলের বড় অফিসার নিশ্চয়ই হবে একজন। পুলিশ ফুলিশ নিয়েই আসবে। তখন করবেন কি আপনি?”

এক মুঠো আধরোট চিবুতে চিবুতে পুরুষোত্তম বলল—
“সর্বপ্রথম তাকে বলব—‘শ্রমোয়ের বাচ্চা হারামজাদা কুতা, বড় চাকরি করছ বলে কি একেবারে রামছাগল বনে গেছ। তুমি দেবার সময় কল্পনা করতে পারনি, গরীব হুডভাগ্য

হাতুড়ে হইতে সারধান!





টি কি টি চেকারগুলোর
কপালে কি ঘটে
পারে।”

ভুললোকটি ধ হোয়ে তাকিয়ে রইলেন। অত্যন্ত চটে গেল
বলেই বোধ হয় পুরুষোত্তম পর পর কয়েক গাল বাদাম পেতা
চিবিয়ে ফেলল। তারপর তার খেরাল হোল, সে একলাই
খাচ্ছে, ভুললোক কিছুই মুখে নিচ্ছেন না। অগ্রসৃত হোয়ে
বলে উঠল—“বাঃ, আপনি যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমিই
সব শেষ করে দিচ্ছি।”

একটা নিঃশ্বাস চেপে ভুললোক বললেন—“এই যে নিচ্ছি,”
বলে আবার কয়েকটা আঙ্গুর নিলেন। ছ’চারটে মুখে
কেলে বললেন—“ওখানে কি যেন বেশ নামটি বলে এলেন
আপনার। পুরুষ—পুরুষ—”

পুরুষোত্তম বললে—“পুরুষোত্তম”

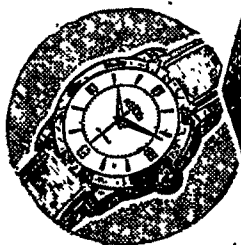
“হাঁ হাঁ, উত্তম নামটি আপনার—। তা’ পুরুষোত্তমবাবু—
সংসারে কে কে আছে আপনার? মানে—আপনার জন্মে
কাঁদবাবু—বাকে বলে—আপনার ভালমন্দর জন্মে চিন্তা
করবার মাহুষ কে কে আছে?” খুবই আলতো ভাবে
জিজ্ঞাসা করলেন ভুললোকটি। কথাটা এমন অদ্ভুত
কারদার বললেন, যা একেবারে মর্মে গিয়ে ঢুকল। একটু
চুপ করে থেকে অন্য দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ
করলেন—“আপনার জন্মে পথ চেয়ে থাকবার মত কেউ
কোথাও নেই বোধ হয়। কোথাও এতটুকু বাধন থাকলে
কি মাহুষ এমন বেপরোয়া হোয়ে উঠতে পারে।”

বাধনের কথা ভাবতে লাগল পুরুষোত্তম। বেশ
কিছুক্ষণ কেউ আর কোনও কথা বলতে পারল না।
তারপর একটি একটি করে আগাগোড়া সমস্ত কথা বলে
গেল সে, কিছুই ঢাকল না। কোথায় কেমন ঘরে জন্মেছে,
লেখাপড়া কতদূর শিখেছে, কোথায় কি চাকরি করত,
কেন চাকরি করত, কেন চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এল, সবই
বলে গেল। বাবু বক্রবাহন ঝায়ের খামারে এসেছিল কেন,
কাদের সংগে এসেছিল, তারপর হঠাৎ কেন বেগে গিয়ে
ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল, আবার কিবেই বা চলছে কেন,
কিছুই বলতে বাকী রাখল না। সব বলা শেষ করে—
উপসংহার টানল এইভাবে—“বেপরোয়া আমি নই মশাই,
বেপরোয়া হোতে পারলে কি এত হাদ্যামা করতে বেরতাম।
যে আহার—ত্যাগ করে চলে গেছে, তাকে ভুলে গিয়ে
শান্তিতে চাকরি ঘর সংসার করতে পারতাম। মুশকিল
হোয়েছে কি জানেন, কি জন্মে সে গেল, মানে—অপরোধটা
কি এমন করলাম আমি, এটুকু না জানা পৰ্ব্বত কিছুতেই
চুপ করে থাকতে—পারছি না যে—তাই ভুতের বেগার
খেটে মরছি।”

বাকে পোনাল নিজের জীবনের অতি কুৎসিত পরাজয়ের
কাহিনীটা তিনি এবার ভাল কিরিয়ে ফেললেন। নেহাত
ভাল মাহুষ ভীত জন্ত বৃদ্ধ লোকটির বয়েস হঠাৎ একেবারে
কুড়ি-থানেক বছর কমে গেল যেন। তড়াক করে লাফিয়ে
উঠে বললেন—“নিম নিম, বেড়ে ফেলুন এখন ও সব বাজে
ভাবনা মন থেকে। যাবে কোথায় সে বউ আপনার—।

চলুন সেই বক্রবাহনের খামারে, ধরে দিচ্ছি তাকে।
পাটনা এসে গেল, বেলা প্রায় চারটে বাজে। ট্রেন
ছ’ বক্ট। লেট, এখানে গাড়ী এসে থাকলে বাচি।
নয়ত সেই সন্তো পৰ্ব্বত বসে থাকতে হবে। সন্ধ্যার
আগে আবার—ওই ব্রাক লাইনের গাড়ী নেই।
টেলিগ্রাম ত’ করে দিচ্ছেলাম যোগল সরাই থেকে,
যদি পৌছে থাকে নিশ্চয়ই গাড়ী এসেছে। নয়ত
এখনও হয়ত পরাতেই গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।”

খতমত থেয়ে গেল পুরুষোত্তম। জিজ্ঞাসা করলে—
গাড়ী আসবে! কোথা থেকে গাড়ী আসবে?”



PELICAN

A SWISS QUALITY WATCH

SHOCK PROOF WATER PROOF
ANTI-MAGNETIC UNDESTRUCTIBLE

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং

১৫৪, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ • ফোন-২২-৩০৬৩

“মেই বক্রবাহন বেটার খামার থেকে, আবার কোথ থেকে।” জবাব দিলেন ভজলোক। দিয়ে জিনিষ পত্র গোছগাঁছ করতে লাগলেন পেছন ফিরে। স্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে রইল পুরুষোত্তম ভজলোকটির দিকে। কে ইনি! ক’র কাছে এতক্ষণ ধরে বলে ফেলল সে নিজেই কাহিনী! করলে কি সে!

উদ্ভট একটা ধারণা উদয় হোল মগজে। সেই খামারের কেউ হবে এ লোকটা। আগাগোড়া তার সংগে সংগে আছে। গয়া থেকে যখন সে মোগলসরাই যায়, তখন থেকেই লক্ষ্য রেখেছে। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করেছিল গয়াতে পাকড়াও করবার। পায়ে নি, মানে—সুবিধে হয়নি। তারপর মোগলসরাই পর্যন্ত সংগে সংগে গিয়ে যখন দেখলে আবার সে পাটনার গাড়ীতে চড়ে বসল, তখন নিশ্চিত হোয়ে পাটনার গাড়ী পাঠাতে বলেছে। অর্থাৎ ধরা তাকে পড়তেই হোল শেষ পর্যন্ত। নিজের ইচ্ছেয় ফিরে যাচ্ছে না সে, জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আচ্ছা—

উঠে দাঁড়াল পুরুষোত্তম। আর দেরি নেই, গাড়ী ঢুকছে ট্রেনে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। ভজলোক তখনও পেছন ফিরে জিনিষ পত্র টানটানি কবছেন।

হঠাৎ মস্ত বড় চামড়ার স্ট্রেকশটার ডালার ওপর নন্দর পড়ে গেল পুরুষোত্তমের। মোটা মোটা অক্ষরে বা লেখা রয়েছে সেখানে, সেটা পড়ে ফেলতে এতটুকু কষ্ট হোল ন। পড়বার সংগে সংগে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরলো তার গলা থেকে। তারপর সে আবার ধপ করে বেকির ওপর বসে পড়ল।

সর্বপ্রথম দরজা খুলে যিনি গাড়ীতে উঠলেন, তিনি হুয়ং জগৎরাম পুরুষোত্তমের দিকে নজর পড়তে হা হোয়ে রইলেন ভজলোক।

বাবু বক্রবাহন বা এখারে ফিরে হিন্দীতে বললেন—“বাকু—তা’হলে এসে পড়েছ—দেখছি জগৎরাম। তারটা তা’হলে পেয়েছিলে। ও কি! ও ভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন আমায়ের দিকে? বাবাজীকেও সংগে নিয়ে এল। আর—হাবে কোথায় সে বেটা! চল চল, চল এখন

সবাই। আগে পৌছই গিয়ে আস্তানায়। তারপর করছি একটা ব্যবস্থা।

আমাকে ক’কি দেওয়া অত সোজা নয়।”



॥ চোদ্দ ॥

ক’কির ক’শি ফকির।

এক গাছা দড়ির নিমকহারামির জন্তে ভেঙে গেল ক’কি দেওয়াটা, আসল ক’শকে ক’কি দেওয়া গেল না। ঠিক এসেছে সংগে সংগে, দড়ি গাছা নিমকহারামি না করলে যেখানে পৌছে যেত এতক্ষণে, সেখানেও ঠিক গিয়ে পৌছত। ওকে ক’কি দেওয়া অত সোজা নয়।

সোজা হোয়ে উঠে বসল বিছানার ওপর সরষুগ্রাসাদ, বসে জানলার ওধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। দলা পাকানো পেঁজা তুলো আটকে আছে আকাশের ডলায়, একটা কালো ফুটকি তুলোর ভেতর চক্কর মারছে। এই দেখা গেল বেরিয়ে আসছে ডান পাশ থেকে, বড় বড় চক্কর মারলে কয়েকটা, তারপর ফস করে ঢুকে পড়ল বা পাশ দিয়ে। ব্যস—একদম উধাও। তুলোর আড়ালে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, কার সাধ্য আন্ডাজ করবে।

বড় ভাল লাগল সরষুগ্রাসাদের, ঐভাবে একটা ফুটকি হোয়ে আকাশের গায়ে যদি চক্কর মারা যেত। তা’হলে আর কে কি করতে পারত তার। কার সাধ্য, ওখানে গিয়ে তাকে পাকড়াও করত। কিন্তু এখানে, এই হুম্মন ছুনিয়ায় যে দুর্বিপাক বেধে বসেছে, তা’ থেকে নিস্তার না গেলে পৌছন যাচ্ছে কি করে ওখানে। কার সাধ্য, এই সংকট থেকে তাকে উদ্ধার করবে।

হাত তিনেক তফাতে একখানা চেয়ারে নিস্তব্ধ হোয়ে বসে নিবিষ্ট চিন্তে সিগারে টান দিচ্ছিলেন ভবেশবারু। সিগারটা মুখ থেকে নামালেন তিনি, নামিয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বা সাদা ছাইটার দিকে তাকিয়ে সংকটের হিসেবটাই করতে লাগলেন। বেশ ভেবে চিন্তে থেমে থেমে বলতে লাগলেন—“একটা ত’ নয়, এক সংগে অনেকগুলো ধারা।



একটা মেয়েকে চুরি করে
আনা, আত্মহত্যার চেষ্টা
করা, মেয়েটাকে আশ্রয়
করা, এগুলো ত' আছেই। উপরন্তু আরও কটা ক'্যাকড়া
বার করে দেখ। আইন হোল অক্টোপাস, একবার ওর
খপ্পরে পড়লে কি আর রক্ষে আছে।”

সরযুপ্রসাদ এ ধারে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল—“দরকারই
বা কি? কি দরকার আমার রক্ষে পাবার? না না,
আর দেরি করা নয়, শিগগির ওকে হাঁসপাতালে দেবার
ব্যবস্থা করুন। আমি বাচ্ছি সোজা আদালতে,
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কবুল করব সব। ও বাঁচুক, ওকে এ
ভাবে বিনা চিকিৎসায় মেরে কেলা যায় না।”

ভবেশবার মুখ তুলে তাকালেন সরযুর পানে। একটুও
উদ্বেজনা ফুটে উঠল না তাঁর স্বরে, চোখে মুখেও একবিন্দু
উষ্মগের ছায়া পড়ল না। সেই রকম চিথিয়ে চিথিয়ে
বলতে লাগলেন—“তার মানে, সব হুজ্ব অজ্ঞত: গোটা
আষ্টেক দশ বছর শ্রমের বাস। ধরলাম না হয়, আদালত
যদি প্রদর্শন করলে। সেখা এসে অপরাধ স্বীকার করছে
একটা ভদ্রলোকের ছেলে, আচ্ছা দাঁও করেকটা বছর
কমিয়ে। কিন্তু তাতেই বা লাভ হবে কতটুকু? জেল
দশ দিন হোলেও বা, দশ বছর হোলেও তাই। একেবারেই
হয়ত খালাস পাওয়া গেল মামলা মকদ্দমা চালিয়ে। কিন্তু
দাগটা ঘুচে কি করে? কেলেকারিগুলো জানতে বাঁকী

থাকবে নাকি কারও? তারপর দশ জনের সামনে মুখ
দেখাতে হবে ত'। এইসব জঘন্ড অপরাধে একটা
ভদ্রলোকের ছেলে—”

“আঃ—” আতর্জনাদ করে উঠল সরযু। ছ'হাত তুলে নিজের
ছ'কান চাপা দিয়ে চোখ বুজে বলতে লাগল—“বামুন,
বামুন। দোহাই আপনার ভবেশবার, বামুন দয়া করে।
ভদ্রলোকের ছেলে—কে বললে আমি ভদ্রলোকের ছেলে?
ভদ্রলোকের ছেলে না ছোটলোকের ছেলে না কার ছেলে,
সে পরিচয় কোথায় লেখা আছে? কে সাক্ষী দিতে
আসবে, কার ঘরে আমি জন্মেছিলাম? সবাই জানে,
সরযু লোকটা নিজের বাপ মায়ের পরিচয় পর্যন্ত জানে না।
পরিচয় হোল, সরযুপ্রসাদ একটা বাড়ীওয়ালার, খানকয়েক
বাড়ী আছে তার। কোথা থেকে পেল বাড়ীগুলো?
কোন শ্রুতে বাড়ীগুলোর মালিক হোল? জবাব দেবার
উপায় নেই। আপনি নিজের জবাব দিতে পারেন নি।
সাবালক হলাম যখন, তখন সমস্ত সম্পত্তি আমার গছিয়ে
দিয়ে আপনি রেহাই পেলেন। কান্নাকাটি করেছে, পায়ে
পর্বন্ত ধরতে গেছি আপনার। বলেছি, সম্পত্তি চাই না,
বাপ মায়ের পরিচয়টা দিন। দিতে পেরেছিলেন আপনি?
কি করে পাচ্ছি সম্পত্তিটা, জানতে চাইলাম। দলিল খুলে
দেখিয়ে দিলেন, কোথাকার কে এক বুড়ী একটা বাচ্চা
কুড়িয়ে পায় গজার খাটে। বাচ্চাটাকে পাবার পরে
বেশী দিন টিকল না বুড়ী। মরবার সময় তার বাড়ী

ক'খানা আর কোম্পানীর কাগজগুলো বাচ্চাটার
নামে লিখে দিয়ে আপনাকে অছি করে গেল।
বাচ্চাটাকে দিয়ে পেল মিশনারি স্কুলে। সেই
বাচ্চা সাবালক হোয়ে বাড়ীওয়ালার হোল।
পরিচয় হোল বাড়ীওয়ালার, শুধু বাড়ীওয়ালার।
ভাড়া নেয়, রসিদ দেয়। ছনিমার সংগে এঁটুকু
সম্বন্ধই আছে, রসিদ দিয়ে ভাড়া নেবার। সেই
রসিদের ওপর—লিখে ত' দিতে হয়নি কখনও,
আমি একটা ভদ্রলোকের ছেলে। রসিদ নিয়ে
বারা ভাড়া দেয়, তাদের মাথা কাটা যাবে নাকি
বাড়ীওয়ালার জেল হোলে! একমাত্র সেই



সিগ্রেটনাথের
হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় কেজা টেল
গুণ, গন্ধ ও মূল্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন

হিমকল্যাণ ওয়াফার প্রাণি
কলিকাতা

তাড়াটেরা ডাড়া আর কার—”

আর তখনে পারলেন না ভবেশবাবু, উঠে গিয়ে হু' হাতে ধরে ফেললেন সরস্বতী মাথাটা, নিজের বুকের সংগে চেপে ধরে চুপি চুপি বলতে লাগলেন—“আমি, আমি—আমার কথাটা তুলে যাচ্ছিস কেমন করে? সেই এতটুকু যখন ঢিলি ভুই, তখন থেকে আমিই তোর সব। কে যেত জ্বলে তোর সংগে দেখা করতে? তোর অস্থির সময় কে গিয়ে বসে থাকত তোর মাথার কাছে? তোর জেল হবে, ভুই ভেলে থাকবি, আর—আমি—” কি যেন আটকে গেল ভবেশবাবুর গলার মধ্যে। সরস্বতী মাথাটা বুকে চেপে ধরে হু'চোং বুকে স্থির হোয়ে রইলেন তিনি, সরস্বতী আর একটি কথা বলতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে মাথা ছেড়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে বসলেন চেয়ারে ভবেশবাবু। সিগারটা কখন খসে পড়েছিল হাত থেকে টের পাননি। মেঝের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন সিগারটাকে, অশ্রুমনস্ক ভাবে বললেন—“তাই ত! আচ্ছা থাক, যেতে দাও।” বলে আর একটা সিগার আর দেশলাই বার করলেন পকেট থেকে। অশ্রুমনস্কভাবে সিগারটা ধরাতে লাগলেন।

খাট থেকে নামল সরস্বতী। ভবেশ বাবুর চেয়ারের পেছনে গিয়ে নিচু হোয়ে আধপোড়া সিগারটা তুলে নিয়ে খাটের ও পাশের ঢানালী গলিয়ে কেলে দিয়ে এল। ভবেশ বাবুর সিগার ধরানো হোয়ে গেছে তখন। এম মুখ ঘোঁরা ছেড়ে বললেন—“থাক, বাঁচা গেল। এত শিগগির উঠতে পারলে, তাবতে পারিনি আমি। এখন একটা পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েটার এখনও জ্ঞানই হোল না যে, এই ত' হোয়েছে বিপদ। নিয়ে যখন এসেছ তুমি, তখন ওকে বাঁচানোও তোমার দায়। হু' হবার প্রাণ বাঁচিয়েছে তোমান, এখন যে করে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে। তারপর দেখা যাবে, ওই মেয়ে যদি না বেগরায়, ও যদি হাতে থাকে আমাদের, তা' হলে আর ভাবনা কি। ও যদি বলে যে নিজে ইচ্ছে করে এসেছে—”

সরস্বতীসদা ঝাঁকিয়ে উঠল—“বলবে না মানে? কে বদেছিল ওকে আসতে? কেন এল ও? এল কেন মরতে?

কোথাকার কে, একটা

চোর ডাকাত না খুঁনে,

অর্ধেক রাতে ঢুকেছে

বাড়ীতে, চাকরবা ধরে ঠেঙাচ্ছে। তাকে বাঁচাবার চেষ্টা মরিচা হোয়ে উঠল একেবারে! অড বড় লোকের মেয়ে, ঐ বয়েস। মোটে মনেই হোল না ওর, কি করেছে ওখের সামনে যাতে মারতে মেয়ে ফেলছে একটা দে বয়ে, পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। কেন—“বাবু! জন্তো অমন বেহেড হোয়ে পড়তে গেল? ইচ্ছে করে আ'নে ন, ত' কি আমি এনেছি? কেন বলবে না সত্যি কথা?”

দরজার কাছ থেকে কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“বদবে সরস্বতী, সত্যি কথাটাই ও বলবে।”

ভবেশবাবু চমকে উঠে ডাকালেন দরজার দিকে, সরস্বতীসদা ফিরে দাঁড়াল। কমলপ্রসাদ এগিয়ে এলেন। তারও বিকে না চেয়ে মুখ নিচু করে বলতে লাগলেন—“দেব না তোর দিকে একবার দাঁশ হোয়েছিল ওর, আমার স্ত্রী ছিলা বাবে! তাকে সব বলেছে। না, ভূমি আননি। নিতের ইচ্ছেই ও এসেছে।”

ভবেশবাবু বলে উঠলেন—হাঙ্গামা ত' চুকেই গেল তা'হলে। এখন বড় ডাক্তার ডেকে দেখানো হোক, মেরে উন্নত, তারপর বিয়ে থা হোলে হু'জনে শাস্তিতে সংসার করবে।”

সরস্বতীসদা হী করল, হী থেকে আঙুর বেরবার আগেই হু'ধারে মাথা নেড়ে কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“নাভবে উঠ না সরস্বতী, কোনও ভয় নেই। তোমাকে বিয়ে করবার জন্তে সে মরতে বেরোয় নি। বিধি সংসারের কাউকে বিয়ে করার মতলব নেই তার মাথায়। ও কল্লুরী খোঁজ করছে, কল্লুরী কোথায় আছে, তাই ও জানতে চাইছে। তোমার মত মস্তক নাকি একদম বিশ্বাস করা উচিত নয়। বড়দার জন্তে আবার হয়ত কোথাও গিয়ে মারধর খেয়ে মরবে তুমি, তার চেয়ে কল্লুরীকে খুঁজে বার করে তার হাতে তোমার সঁপে দিতে পারলেও শাস্তি পেত। মানে—মনবাবু সময় শাস্তিতে মরতে পারত।”

“মরবে! কেন মরবে?” সরস্বতীসদা ডেড়ে উঠল।

ভবেশ বাবু বললেন—“না, না, বড় ডাক্তার ডাকবে।”



কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কমলপ্রসাদবাবু বললেন, “কলকাতায় নিয়ে যাবেন কাকে? কি সর্বনাশ যে ঘটিয়েছে সরস্ব, তা’ যদি জানতে পারতেন, তা’হলে কলকাতায় কথা আর মুখে আনতেন না। কোথাকার কোন ডাকবাঙালোতে গিয়ে জুটেছিল সরস্ব, কোথা থেকে ওই পাণ জুটল ওর সংগে, এগুলোও যদি তখন ভাল করে জিজ্ঞাসা করতাম ওর ড্রাইভারকে। একেবারে বেহুঁশের মত হোয়ে পড়লাম কি না খবরটা পেয়ে। আচমকা এসে বললে, বাবু বউ নিয়ে এসে রাজগীরের কুঠিতে উঠেছেন, বাবু মরমর। তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতেই উঠে বসলাম। সারাটা পথ তলিয়ে রইলাম নিজের ভাবনায়, কে জানে কেমন অবস্থা দেখব গিয়ে। হঠাৎ বউ একটাই বা জোটাল কি করে। মরমরই বা হোল কেন। একশ রকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে গাড়ীতেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলাম না ওর লোক দু’টোর কাছে। তারপর পৌছতে না পৌছতেই এমন কাণ্ড ঘটে গেল যে চোখে অন্ধকার দেখছি তখন থেকে। কোনও দিকে কোনও উপায় করতে না পেয়ে তার করে দিলাম আপনাকে। এখানে থাকলে বিনা চিকিৎসায় মরবে, তার চেয়ে আপনি এসে যদি নিয়ে যান কলকাতায়, সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা অন্ততঃ হবে। ইস্—কি বিপদই না ঘটত! ওই কাল কেউটের বাচ্ছাকে নিয়ে গিয়ে আপনি শুদ্ধ যমের মুখে পড়তেন।”

অবেশবাবু খুবই ঘাবড়ে গেলেন যেন। অল্পট ভাবে তাঁর মুখ থেকে বেরলো—“কায় মেয়ে যে বাবা।” সরস্ব চোখ কুচকে জিজ্ঞাসা করলে—“কতরীকে তা’হলে চেনে ও। তৎক্ষণে বুঝলাম, কেন ও এ কাণ্ড করে বসল।” কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“ছাই বুঝেছ। রাজগীরে যে চৌকিদারটা আছে, তার মেয়ে যদি ওর কানে বিষ না ঢালত, তা’হলে আমরাও ছাই বুঝতাম। হুঁশ হোয়েছে দেখে আমার জী সাহস দেবার অঙ্গে বলতে গিয়েছিল, যে সরস্ব সংগে ওকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কলকাতায় গেলে বড় ডাক্তার দেখিয়ে শিগ্গির সারিয়ে তোলা হবে। শুনে

আঙনের মত অলে উঠল, কেন সে কলকাতায় যাবে, কিছুতে যাবে না। তাড়াতাড়ি আমার জী বললে—‘বেশ ত’ নাই বা গেলে। সরস্ব একলাই যাক। তুমি থাক। এখানে, আমরা তোমার সারিয়ে তুলব।’ যেই না শোনা এই কথা, তৎক্ষণাৎ মাথার ব্যাণ্ডেজের ভেতর আঙুল গুলিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলতে গেল। ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়তে পারলেই রক্ত ছুটবে আর তখনই মরবে। কোনও রকমে হুঁহাত চেপে ধরে থামালে। তখন জুড়ে দিলে কারা। তারপর অনেক করে বুদ্ধিয়ে শান্ত করলে যখন, তখন ও বললে সব কথা। চৌকিদারের মেয়েটা ওকে বলেছে, কুঠির মালিক মেয়ে মাহুষ নিয়ে মাঝে মাঝে কুর্তি করে আসে সেই কুঠিতে, তাকে নিয়েও অনেক কুর্তি করেছে। ওকেও কুঠিতে নিয়ে তোলা হোয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই, গাড়ী গেছে পাটনা থেকে মালিক সাহেবকে আনতে। তিনি এসেই কুর্তি জুড়ে দেবেন। এই সব কথা শুনে ও ঠিক করেছিল, সরস্ব হুঁশ হোলে সরস্বকে নিয়ে পালাবে সেখান থেকে। ঘরে ঢুকেই দেখলে, সরস্ব গলায় দড়ি দিয়েছে। তারপর ত’ বেহুঁশ অবস্থায় পৌছে গেল একেবারে সেই কুঠির মালিক সাহেবের বাড়ীতেই। এখন যদি ওকে একলা ফেলে রেখে সরস্ব চলে যায়, তারপর আর ও বাঁচবে কেন। যে নরপিশাচের কাছে থাকবে, তার পরিচয় ত’ সেই চৌকিদারের মেয়েটাই দিয়ে দিয়েছে।”

টেঁচিয়ে উঠল সরস্ব—“ছি ছি ছি, তোমার মত মাহুষকে এই রকম ভাবলে সে। ছি ছি ছি—”

কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“ওর দোষ কোথায়, চৌকিদারের মেয়েটাই ত’ বলেছে ওকে।”

গর্জন করে উঠল সরস্ব—“সেই হারামজাদীই বা অমন কথা বলতে গেল কেন?”

কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“ঐ বয়েসের মেয়ের মনে বা হয়, তাই বলেছে। আরও পাঁচটা কুঠি আছে সেখানে। সে সব কুঠির চৌকিদারের মেয়েরা মালিকদের সংগে আমোদ আক্লাদ করে বোধ হয়, আমার চৌকিদারের মেয়ে সে সব গল্প শোনে। শোনে আর ভাবে, কি বিল্লী মালিকের কাছেই না তার বাবা চাকরি করে। মালিকের না আছে



সখ, না আছে কোনও গুণ। এমন সময় তুমি ওকে নিয়ে গেলে। চৌকিদারের মেয়ে বোধ হয় আশা করলে, এইবার কুঠিতে আমোদ ফুটি চালা হোল। এই সব গাঁচ বকম তেবেই চলেছে আর কি। বলে কত বড় উপকারটা যে করেছে, সেটাই শোন না, থামকা চটছে কেন। ছুনিয়ার কোনও পুরুষকেই ওই মেয়েটা বিশ্বাস করে না, করে শুধু তোমাকে। কারণ, তুমিই একমাত্র পুরুষ, যে আর একট' মেয়ের জন্তে প্রাণের মারা তুচ্ছ করে যমের মুখে ঢুকেছিলে। তোমার কাছে থাকতে ওর তর নেই। এক মাত্র কস্তুরী ছাড়া আর কোনও মেয়ের দিকে তাকাবার ক্ষমতা নেই কি না তোমার, সেই জন্তে তুমি কোনও অস্ত্রায় করতেই পার না। তাই ও ঠিক করেছে কিছুতে তোমার কাছ ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না কস্তুরীর হাতে তোমার তুলে দিতে পারছে, ততক্ষণ ও তোমার এক পা নড়তে দেবে না।”

সরযু বললে—“আচ্ছা ক্যাসাদ ত’। কিন্তু পাছে কোথায় ও কস্তুরীকে শুনি?”

কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“সেইটেই হোল আসল কথা। আমার জ্যেষ্ঠ সেই কথা জিজ্ঞাসা করছিল। উত্তরে না শুনে গেলো তাপরে আর কিছুই বলার থাকল না। কত বড় সর্বনাশটা যে ঘটতে গিয়েও ঘটতে পেল না, তা’ বুঝতে পারলে এখনই এখান থেকে সেই চৌকিদারের মেয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম ঠুকে ফেলতে।”

তুই চোখ বড় বড় করে ভবেশবাবু বলে উঠলেন—“কস্তুরীর খোঁজ পাওয়া গেল নাকি?”

কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“প্রায়। কস্তুরী কার মেয়ে সেটা অন্ততঃ জানা গেল। সরযুও ত’ কিছুতে জানতে পারে নি এতদিন, কস্তুরীর সত্যিকারের পরিচয় কি। শোন তা’হলে কে কস্তুরীর বাবা। বাবু বজ্রবাহন ঝা, ঝাঁর নেই থামার। সত্যিই তিনি কস্তুরীর বাবা। তিনি শুধু জানেন, কস্তুরী এখন কোথায় আছে। এইটি হোল বজ্রবাহনবাবুর আর একটি মেয়ে। এ পারবে, তাঁর কাছ থেকে কস্তুরীর ঠিকানা বার করতে। বার করে তোমার—কস্তুরীর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হবে।”

ভবেশবাবু বললেন—“তা’ বেশ ত’। খুবই সুখের কথা।

তা’ এতে তর পাবার মত কি আছে। মিছিমিছি ওকে কালকেউটের বাচ্চা

বললেন কেন? মিছিমিছি এতক্ষণ তর দেখাচ্ছিলেন—” কমলপ্রসাদবাবু বললেন—“মিছিমিছি। মিছিমিছি কি সত্যিসত্যি বুঝতে পারবেন আজই। পাটনায়— বত ভাতার ব্যক্তি আছে, সকলের কাছে লোক ছুটিয়েছি। বাবু বজ্রবাহন ঝাঁয়ের মেয়ে আমার বাড়ীতে—পড়ে আছে, মাথাটা ফেটে গেছে মেয়েত, এইটুকু সংবাদ দিতে বলেছি। একজনকেও আসতে বলেনি। দেখুন না কি হয়, একটা ভাতারও এখনই না এসে থাকতে পারবে না। স্বেচ্ছা ঐ নামটির গুণ, বাবু বজ্রবাহন ঝা। এখানকার মাস্তব চিতায় শুয়েও যদি শোনে বজ্রবাহন বাবু তাকছেন, তা’হলে চিতা ছেড়ে উঠে দৌড়বে। কি বলবেন বজ্রবাহন বাবু, শুনে এসে আবার চিতায় চড়ে পুড়বে। ওই মেয়েই বললে, কিছু দিন তিনি নেই তাঁর থামারে। থাকুন না থাকুন, থবর আমাদের পাঠাতেই হবে সেখানে। ভাতাররা আসছেন, কি বলেন শুনে থবর পাঠাব। তখন যা ভাল বুঝবে, তাই করবে বজ্রবাহন বাবুর কর্মচারীরা, আমাদের কোনও দায় দায়িত্ব রইল না।

চাপা নিঃশ্বাসটা ফেলে ভবেশ বাবু বললেন—“থাক, যাঁচা গেল। ওই মেয়েটার দায় থেকে রেহাই পেলেই এখন শান্তি।”

সরযু কিছুই বলল না, আন্তে আন্তে গিয়ে খাঁটের ওপর উঠে শুয়ে পড়ল। একখানা পাতলা চাঁদর পড়েছিল এক পাশে সেখানা টেনে নিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে ফেললে।

কমলপ্রসাদ বাবু বললেন—“ওই বোধ হয় কোনও ভাতার এল, গাড়ীর আগুয়াজ পেলাম যেন।” বলতে বলতে তিনি থর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

ভবেশবাবু আবার দেশলাই জ্বালালেন, সিগারটা নিতে গেছে।

আলো নিতে গেল।

সরযুপ্রসাদ চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে দম বন্ধ করে ডাকিয়ে



রইল অন্ধকারের দিকে।
আলোয়ার আলো নিতে
গেল। নিশ্চিন্ত, বিপথে

টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আলোয়া, রক্ষা পাওয়া গেল, নিশ্চিন্ত।
কস্তুরীকে খুঁজে বার করে কস্তুরীর হাতে সরযুপ্রসাদকে
সঁপে দিতে যতক্ষণ না পারছে বাবু বক্রবাহন ঝায়ের ঐ
আর একটি মেয়ে, ততক্ষণ ওঁর স্বপ্ন নেই। তা' উনি
পারবেনও, নিশ্চয়ই পারবেন। সাংঘাতিক শক্তিসম্পন্ন
বক্রবাহন বা, ষাঁর তাকে মরাও উঠে চলে আসে চিতার
ওপর থেকে, তিনিই হলেন কস্তুরীর বাবা। এবং অতি
আশ্চর্য এক বাবা তিনি। ক্রিস্টান মেয়েদের সংগে মেয়েকে
রেখেছিলেন কেন? কেন মেয়ে কিছুতেই নিজের পরিচয়
দিত না? হঠাৎ মেয়েকে লুকিয়েই বা ফেললেন কেন?
গণ্ডা গণ্ডা অত্যাস্চর্য প্রশ্ন গজাতে পারে। সবকিছু প্রাণের
একটিমাত্র অত্যাস্চর্য অবাবই মিলবে, বাবু বক্রবাহন বা
সাংঘাতিক শক্তি-সম্পন্ন মাহুয। স্তুরাং তাঁর কাছে
একটিও কি কেন চলতে পারে না।
আর ঐ বক্রবাহনের দ্বিতীয় কল্পটি, উনি আবার দয়া করে
হু' হু'বার সরযুপ্রসাদের জীবন-রক্ষা করে ফেলেছেন।
এবং উনি ছুনিয়ার কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করেন না
একমাত্র সরযুকে ছাড়া। তার কারণ, কানপটা খুবই সরল,
উনি যে জানেন সরযু লোকটা হচ্ছ হাঁদা। হাঁদা এবং
একেবারে ছেলেমাহুয। আবার হয়ত কস্তুরীর জন্তে
কোথাও গিয়ে মারধোর খেয়ে মরবে। যে মাহুয—একটা
মেয়ের জন্তে হুঁশ চৈতন্ত হারিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে
পারে, তার ভেতর মাহুয বলতে তা' কোনও পদার্থ থাকতে
পারে না। গাছ পাখরের তুল্য একটা কিছু হোয়ে
পড়ে কিনা তখন মাহুযটা তাই তাকে ভয় করবার কি
আছে। গাছ পাখরের তুল্য একান্ত অল্প পদার্থ
সরযুপ্রসাদকে তাই উনি বিশ্বাস করেন। সেই জন্তে
সরযুর কাছ ছাড়া কিছুতেই কোথাও উনি থাকবেন না,
যতক্ষণ না ওঁর বাবা বক্রবাহন আসছেন, এলে সরযুকে
কস্তুরীর হাতে গছিয়ে দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।

খুবই চমৎকার মতলব, কোনও দিকে 'কোথাও' একটু 'কি' তার চেয়ে 'নিতে' যাওয়াই ভাল। যাক নিতে আলোয়ার

নেই। এতকাল পরে কস্তুরীর খোঁজ মিলবে, কস্তুরীও
হয়ত দয়া করে সরযুপ্রসাদের ভারটা গছে নেবে। আহা,
তা' না নিলে যে হাঁদা লোকটা আবার কোথাও গিয়ে
মারধোর খেয়ে মারা পড়বে।

আর এই দুর্দান্ত দয়াটা দেখাবার জন্তে কস্তুরীকে বাহবা
দেবে না কে।

নাম গোজ পরিচয় দায় নেই, তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দেবে
বক্রবাহন বা মশায়ের মত দুর্দান্ত রকম নামকরা লোকের
মেয়ে কস্তুরী, এ জন্তে ছুনিয়ার কোন লোক না কস্তুরীকে
সাবাস দেবে।

সরযুপ্রসাদের কৃতার্থ হওয়া উচিত। কৃতার্থ যদি না হয়
সরযুপ্রসাদ, তা'হলে লোকটার মত অকৃত্রিম অকৃতজ্ঞ ছুনিয়ার
আর কটি আছে।

দয়া, কল্পনা, ভাব গছে নেওয়া, এই সমস্ত উৎকৃষ্ট কথাগুলো
গজিয়ে উঠল হঠাৎ। কোথায় ছিল এরা এতদিন! বাপ
মায়ের পরিচয় দিতে পারে না সরযু, বাপ মায়ের পরিচয়
দিতে পারে না এমন একটা মেয়ে কস্তুরীকে আপনার করে
পেতে চেয়েছিল। কস্তুরীও ঠিক তাই চেয়েছিল। সত্যিই
কি সে জানত তখন, এমন এক মহামাত্র বাপ আছে তার।
বাপের পরিচয় জেনেও সে লুক্কিল। কেন লুক্কিল।
তার মানে তা' এই দাঁড়ায় যে কস্তুরী সরযুপ্রসাদকে
ঠিকিয়েছে। কেন ঠিকিয়েছে। বোধ হয় তরানক রকম
দয়া আর কল্পনা করেই ঠিকিয়েছে। অসম্ভব নয়, বক্রবাহনের
মেয়েদের প্রাণ নিহত দয়া দিয়ে গড়া। তার প্রমাণ, ঐ
আর এক মেয়ে বক্রবাহনের, কস্তুরীর বোন, ও হু' হু'বার
দয়ার তাত্ত্বিক সরযুপ্রসাদের প্রাণটা রক্ষা করেছে। এবং
শেষ দয়াটা দেখাবে, কস্তুরীর হাতে সরযুপ্রসাদকে
সঁপে দিয়ে। তাই পাশের ঘরে বেহুঁশ হোয়ে শুয়ে
সরযুপ্রসাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে। ইস—একেই
না বলে দয়া।

কি নৃশংস দয়া। একেবারে আত্মগিগিরির অশ্রুদগাির
মত। কি করে এই স্তম্ভিত খাত্ত শ্রোতের মত দয়ার
শ্রোতের মুখে তিষ্ঠান বাবে।

আলো, বিপথে টেনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যুচুক।
অন্ধকার, তাই হোক। অন্ধকারে তলিয়ে থাকলে কোনও
আপদ নেই। কেউ দয়া করবার জন্তে খুঁজে পাবে না।
বাপ মায়ের পরিচয় পৰ্ব্বস্ত যে জানে না, সে জন্মেছেই
অন্ধকারে। অন্ধকারকে তার ভয় কি। কেন সে অন্ধকারকে
পর ভেবে আলোয় আলোর দিকে ছুটতে যাবে।
যাক নিতে আলো। দয়া অন্ততঃ অন্ধ হোক।

তবেশবাবু গিগার টানা বদ্ধ করে আত্মগত ভাবে বলে
উঠলেন—“যাক বাবা, অন্ধের মত আর হাতড়ে মরতে হবে
না। কল্লুরী পরিচরটা পাওয়া গেল এতদিনে। কি
মুশকিলেই যে পড়া গিয়েছিল। মেয়ের বাপের নামটা
পৰ্ব্বস্ত যদি জানা না যায়, সে মেয়ের সংগে বিয়ে হয় কেমন
করে। যে বিয়ে করবে, সে ড° বানের জলে ভেসে আসে
নি যে—

একটানে চাঁদরখানাকে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে তীব্র
দৃষ্টিতে ডাকাল সরযুপ্রসাদ। তবেশবাবু খতমত বেয়ে
গেলেন। এক মিনিট চুপ করে থেকে সরযুপ্রসাদ বললে
—“না, বানের জলে নয়, গঙ্গার জলে। গঙ্গার জলে ভেসে
এসে গঙ্গার ঘাটে লেগেছিল, তারপর সেই বুড়ীটা কুড়িয়ে
জানে। ও একই কথা।”

তবেশবাবু গৌঁ গৌঁ করে উঠলেন—“একই কথা। দেখিয়ে
দিতে পারি এক কথা কিনা। চুপ করে শুনে যাচ্ছি সব,
বাবু বজ্রবাহন ঝাঁ কত বড় লোক কত তার নাম ডাক,
সব মুখ বুজে শুনে যাচ্ছি। বলুক না, বলতে দাও।
বলবার স্বযোগ যদি দেন ভগবান, তখন এমন বলাই বলতে
পারব যে পেটের পিলে চমকে যাবে। দেখা যাবে তখন,
মেয়ের বাবা বজ্রবাহন কোন বাহনে চড়ে আসেন। দেখাই
যাক—”

সরযুপ্রসাদ প্রায় চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল—“কি দেখা
যাবে।”

তবেশ বাবুও চুপিচুপি জবাব দিলেন—“এদের গুণেরটা
কতখানি তাই দেখা যাবে। খবর পাঠিয়েছি কলকাতা

থেকে বেরবার আগে।
এতক্ষণে বোধ হয় ঠিক
জায়গায় পৌঁছল খবরটা।

কমলপ্রসাদের তার পেয়ে বুঝলাম, ব্যাণ্ডার সহজ নয়।
বাধ্য হোয়ে খবর পাঠালাম। দেখাই যাক না কি হয়।
এত বড় বিপদ, মান সম্মান এমন কি জান নিয়ে পৰ্ব্বস্ত
টানাটানি, এসব জেনেও চুপ করে থাকবে। দেখাই যাক—
ঠিক আগের মত চুপিচুপি জিজ্ঞাসা কমল সরযুপ্রসাদ—
“কে চুপ করে থাকবে। কারা চুপ করে থাকবে।”

তবেশবাবু বললেন—“আমিই কি ছাই জানি তা’। জানলে
আর মুশকিল ছিল কোথায়।”

আন্তে আন্তে আবার সোজা হোয়ে উঠে বলল সরযুপ্রসাদ,
চোখ দুটো তার জলছে। সেই জলন্ত চোখ দুটো তবেশ
বাবুর চোখের ওপর রেখে বললেন—“তা’হলে খবর পাঠা’দেন
কেমন করে।”

চমকে উঠলেন তবেশবাবু, এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হোল কার
কাছে কি বলছিলেন। তারের ছায়ার কালো হোয়ে উঠল
তাঁর চোখ দুটি। তব্ব হোয়ে তাকিয়ে রইলেন সরযু
চোখের দিকে।

বিছানা ছেড়ে নেমে তবেশবাবুর সামনে মেঝের বসে পড়ল
সরযু। হু’হাতে জড়িয়ে ধরল তবেশবাবুর হাঁটু দুটো।
ওপর দিকে মুখ তুলে বলতে লাগল—“বলবেন না। এক
মাত্র আত্মীয় আপনি, মা বাপ সবই আপনি। এতকাল
লুকিয়ে রেখেছেন আমার পরিচয়। এখনও লুকিয়ে
রাখবেন? কিছুতে বলবেন না।”

অসম্ভব। সেই বৃক্ষ নিঙড়ানো কথা কটার মোড় সহ
করা সত্যিই অসম্ভব। পাষাণের গায়ে মুখ লাগিয়ে ঠিক
ঐভাবে ঐ কথাগুলো উচ্চারণ করলে পাষাণেও চিড়
খেয়ে যেত।

দম আটকে বসে রইলেন তবেশবাবু সরযুপ্রসাদের মুখের
দিকে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে ফেটে পড়ল তাঁর ক্লান্ত
আবেগ। হু’ চোখ বুজে ধরধর কবে কাঁপতে কাঁপতে
বললেন—“ওরে বিশ্বাস কর, এই শেষবারের মত—বিশ্বাস
কর আমার কথা। সত্যিই আমি তোঁর পরিচয়





জানি না। এই টু কু ই
জানি, তোর পরিচয়
সাঁখা শু নয়। এমনই

ভয়বহ পরিচয় তোর যে সে পরিচয় জানলে তুইও চমকে
উঠবি। কিন্তু এইবার তুই জানবি তোর পরিচয়,
আমিও জানব। আমার ওপর হুকুম ছিল তোর জান
মান নিয়ে যদি টানাটানি পড়ে কখনও, তা'হলে সেই
সংবাদটা তোর জন্মদাতাকে জানাতে হবে। অনেক ঝাঁকা
পথে ঘুরে সংবাদটা পৌছবে ঠিক জায়গায়। যদি পৌছয়,
তা'হলে এতক্ষণে ঘুরে গেছে তোর ভাগ্যের ঢাকা। এই
কমলপ্রসাদ, ঐ বক্রবাহনের মেয়ে, আর সেই কস্তুরী,
সবাই জানতে পারবে পরিচয় কাকে বলে। এই শেষবারের
মত আমার বিশ্বাস কর তুই, আর একটা রাত ঐধ
ধরে থাক।”

হাঁটু ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সরু। বিড় বিড় করে বলতে
লাগল—“শুধু ধাঁধা, শুধু ধোঁকাবাজি। কারা এরা। নিজের
সন্তানের সংগে ধোঁকাবাজি চালায় এরা, এরা কি
মাহুষ। কস্তুরীর বাপ কস্তুরীর সংগে এই ব্যবহার করেছে।
নিশ্চয়ই করেছে। বাপের পরিচয় জানলে কেন তা' লুকবে
কস্তুরী। নিশ্চয়ই জানত না, আজও জানে না হয়ত।
ধোঁকাবাজ বাপ অল্প একটা চাল চেলে সরিয়ে দিয়েছে
হয়ত কস্তুরীকে অল্প কোথাও, সেখান থেকে বেচারী উদ্ধার
পাচ্ছে না। এখানে এই মেয়েটাকে এনে কস্তুরী নাম
দিয়ে চালিয়ে-দিয়েছে নিজের কর্মচারীদের কাছে। কি
অশুভ বড়শয়। নিজের ছেলে মেয়ের সংগে বড়শয় চালাচ্ছে
এরা।” সরুপ্রসাদেরও পরিচয় মিলবে এবার। যেমন
কস্তুরীর পরিচয় মিলেছে। কি অশুভ পরিচয়। এ পরিচয়
না পেলে কি ক্ষতি হবে।”

২ পনেরো

প্রহেলিকার পরিচয় কি। প্রহেলিকার পরিচয় প্রহেলিকা।
বাবু বক্রবাহন ঝাঁয়েব খামারের সব কটি লোক প্রহেলিকার
পরিচয় জেনে ফেলেছে। অনেকেরই নামটা মুগ্ধ ছিল,

অনেকে রূপালী পর্বার গায়ে প্রহেলিকার ছায়াও দেখেছে,
কিন্তু আগল মাহুষটা শশুরীয়ে উপস্থিত হোয়ে অতিথি-
শালার দোতলার ঘরে শুয়ে ঘুমচ্ছে, এ আবার কি ভয়ানক
কথারে বাবা। ভয়ানক কথাটা সত্যিই ভয়ানক ভাবে
সত্যি। হুশান্ত তা' প্রমাণ করলে মুনগী ড্রাইভারকে
ডাকিয়ে তার মুখ থেকে তার মনিব ঠাকুরপের পরিচয়টা
সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে। কিছুদিন আগে এই প্রহেলিকা
পালই উপস্থিত হোয়েছিল খামারে সিনেমাওয়ালাদের
সংগে, বড়ের ছবি তুলে নিয়ে গেছে তারা, সে সময়
অনেকেই ত' তাকে দেখেছে। অনেকেরই মনে পড়ে
গেল, দেখেছে বটে। হী, ঠিকই দেখেছে, কোনও সম্বন্ধ
নেই যে একেই দেখেছে। হু'জন এসেছিলেন সেবার,
তার মধ্যে একজন যে ইনি, ইথে নাহি সন্দ। সেবার
এসেছিলেন ছবি তুলতে, এবার শুধু মজা দেখতে এসেছেন।
যে মেয়েটি ছিল খামারে, তাকে যখন ধরবে তার খামা,
তখন একটা মজার মত মজা হবে। সেই মজার লোভেই
এসেছেন। অত বড় অভিনেজী আর অত পরশা বীর,
তীর কি খেয়ালের অস্ত আছে।

তা' ত' বটেই, তা' ত' বটেই। খেয়ালের যদি অস্ত
থাকত, তা'হলে ত' কারও বউ হোয়েই ঘর সঙ্গার
করতে পারত। হুর্দাস্ত নামডাক হোয়েছে যার অভিনয়
করে, তার যদি হুর্দাস্ত খেয়াল না রইল ত' রইল কি।
হুতরাং—

সম্বন্ধের নিরসন করে—হুতরাং দিয়ে হুশান্ত সকলকে
বুঝিয়ে গেছে যে, যার বউকে ধরবার জন্মে আসা, সেই
লোকটাই যখন সরে পড়ল, তখন বেকরমা তাকে আটকে
রেখে লাভ কি। ওখানে অত্যন্ত জরুরী কাজের অত্যন্ত
ক্ষতি হবে তার। প্রহেলিকা রইলেন, ইচ্ছে করলে উনি
যেখানে খুশী দশ বিশদিন থাকতে পারেন। থাকলেও
যেখানে সেখানে গিয়ে যতদিন ওঁর প্রাণ চায়। অভিনেজী
কি না, প্রাণে যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ সেটা প্রাণকে
করতে না দিলে অভিনয়ে প্রাণ থাকবে কেন। হুতরাং—
হুশান্ত চলে গেছে। বাবার আগে তিনজনের আসল
পরিচয়টা বেশ ভাল করে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

যুম থেকে উঠে মুনসীর মুখ থেকে সংবাদটা শুনল
প্রহেলিকা। শুনে চমকে উঠল না, শুধু একটু আড়ষ্ট
হোয়ে গেল। চমকে কি করে উঠতে হয়, কোন সময়
কি প্রক্রিয়ায় কতটুকু চমকে ওঠা প্রয়োজন, চমকবার
মুহূর্তটি পার হবার পরে চমকে উঠলে দৃশ্যটাই যে ম'টি
হোয়ে যায়, দর্শকদের কতটা আশ্চর্য চমকে দিতে
পারলে দর্শক ধায়ের হোয়ে পড়ে, এ সমস্ত ব্যাপারে
প্রহেলিকা'র চেয়ে—যুধু আর কে আছে। তাই সে
জানত না, অভিনয়ের সময় ছাড়া অন্য সময়েও মাহুয
চমকে ওঠে। বাস্তব জীবনে মাহুয চমকে ওঠে, চমকে
ওঠার কারণটা রহস্য না করেই মাহুয চমকতে পারে, এটা
প্রহেলিকা'র জানত না। তবে হ্যাঁ, আড়ষ্ট হোয়ে পড়তে
পারে বটে। সংবাদের মত সংবাদ পেলে আড়ষ্ট
হবেই। চমকে উঠতে ভুলে গিয়ে শ্রেক আড়ষ্ট হোয়ে
থাকবে।

ডাই হোল, প্রহেলিকা আড়ষ্ট হোয়ে রইল। সংবাদের
মত সংবাদ একটি পেল কি না, তাই আড়ষ্ট হোয়ে
গেল। সংবাদটি সত্যিই অভিনব।

প্রহেলিকার পরিচয়টা স্মৃশাস্ত দিয়ে গেছে।

তার মানে প্রহেলিকার পরিচয়টা স্মৃশাস্ত জেনে ফেলেছে।

তার মানে প্রহেলিকার আসল পরিচয়টা প্রহেলিকা
হারাল এতদিনে।

কোথায় প্রহেলিকা! সহজ সরল সুবোধ্য একটা পরিচয়,
আটপোরে একটা ভূয়ো ডাডামি, বা শুনে শুনে আর
দেখতে দেখতে মাহুযের কান পচে গেছে চোখে ছানি
পড়েছে। ছিটে কোঁটা প্রবন্ধনা নেই প্রহেলিকার মধ্যে,
ভোঁতা ভেংচানি ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না প্রহেলিকার।
হৈয়ালির হিয়া হিম হোয়ে পড়েছে, হিল্লোল নেই। প্রহেলিকা
এখন প্রমত্ত প্রলাপ, একটা পতঙ্গকেও প্রলুপ্ত করতে
পারে না।

স্মৃশাস্ত তাই চলে গেছে। যাবার আগে বেশ করে
সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, প্রহেলিকার আসল পরিচয়-
টুকু। প্রহেলিকার সংগে কোনও সম্পর্ক নেই কারও, এই
খাঁটি তথ্যটুকু সবাই খাঁটি ভাবে স্বদয়ঙ্গম করেছে।

মুনসী বলল—“সন্ধ্যা
নাগাদ আমরাও বেড়ে
পারব। গাড়ী প্রায় ফিট

হোয়ে গেল।” প্রহেলিকা অশ্রমস্বভাবে বললে—“এরা
আটকাবে না।”

মুনসী বলল—“কেন আটকাবে আমাদের? যে বাবুর
বউ তিনি পালিয়েছেন, বাবুর বন্ধুটিও পালাল। আমরা
কোন অপরাধ করেছি যে আমাদের আটকাবে?”

প্রহেলিকা বলল—“তা'হলে সেই মেয়েটার কি হবে মুনসী?
মেয়েটা তা'হলে এখানেই থেকে যাবে? কি অন্যান্য কথা?”

মুনসী বেশী কথা বলে না কখন মনিব ঠাকুরপুত্রের
সামনে, তবু বলতে বাধ্য হোল। বেশ একটু তাপও ফুটে
উঠল যেন তার গলায়। বললে—“তাতে আমাদের কি?
আমরা কেন খামকা জড়াতে যাব এই ফ্যানাদে? আমরা
তার আপনার লোক নই, কি সম্পর্ক আমাদের সংগে?”

প্রহেলিকা ব্যস্ত হোয়ে বলে উঠল—“আহা—সম্পর্কের
লোকরা তাকে বিসর্জন দিল বলে আমরাও তাই করব।
ধর, এই খামাবের কোনও খানে তাকে বন্ড করে রেখেছে
এরা, সে জানতে পারছে যে আমরা এগেছি তাকে উদ্ধার
করতে। আশা করছে, তাকে না নিয়ে আমরা কিছুতে
ফিরব না। তারপর যখন সে জানতে পারবে, তাকে
রেখেই আমরা চলে গেলাম, তখন কি হবে। কি
ভাববে সে?”

মুনসী বলল—“কিন্তু করব কি আমরা? এদের সংগে জড়াই
করে কি সেই মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে?”
মিনিমিন করে প্রহেলিকা বলে ফেলল—“তাও ত'বটে।”

অনেকক্ষণ আর ছ'জনের মুখে রা ফুটল না। প্রভু জড়ায়
নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে রইল। অবশেষে মুনসীই
প্রথম কথা বলল। মনিবের দিকে অল্প একটু এগিয়ে এসে
চাপা গলায় বলতে লাগল—“মেয়েটা কিন্তু নেই এখানে।
অনেকের সংগে আলাপ পরিচয় হোল ত' আমায়, চাকর
বাকর দারোয়ান চৌকিদার, কারখানার যিঙ্গী অফিসের
বেয়ারা, সব রকমের মাহুয এক কথাই বলছে। সবাই যেন
ধরখবর করে কাঁপছে তয়ে। কি যে হবে, কেউ বলতে





পারছে না। আর খামার
তি নি আসছেন।
সাংঘাতিক মামুষ নাকি

তিনি, মেয়ে হারানোর জন্তে কি যে করবেন, কেউ বলতে
পারছে না। এখানে নাকি সাংঘাতিক আইন চালু
আছে। এখানে কারও চাকরি যায় না। কারও কোনও
অভাবও নেই। যা রোজগার হয় এই খামার থেকে,
তার সমস্তটাই এখানে যারা কাম্ব করে তারা পায়।
হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে, এমন কি সিনেমা পর্যন্ত
আছে এদের। কিন্তু এরা মরে বেঁচে আছে। কে যে
কখন যাবে যমের বাড়ী, তা' কেউ বলতেই পারে না।”

এক মনে শুনছিল প্রাহলিকা, মুনসীর শেষ কথাটার হেসে
ফেললে। বললে—“এখানে পারে না, অস্ত্র কোথাও পারে
বুঝি। এমন জায়গা কোথায় আছে মুনসী, যেখানে কে
কখন যমের বাড়ী যাবে, তা' লোকে আগে থাকতেই
টের পায়?”

মুনসী তখন সব ব্যাপারটা খুলে বলল। বাবু বজ্রবাহন ঝা
এমনই সদাশয় ব্যক্তি যে কোনও কর্মচারীর কোনও
অপরাধকেই তিনি অপরাধ বলে মনে করেন না। লোকসান
হোল, যন্ত্রপাতি ভাঙল, কাজে কীকি দিল বা ভুলচুক করল,
এ সমস্ত অপরাধ অপরাধই নয়। কাজ করতে গেলে ভুল
হবেই মামুষের, কীকি দিতে পারলে কীকি না দেয় কে।
তাতে বজ্রবাহন বাবু কোন লোকসানটা হবে। খামারের
রোজগার ফসে গেলে এদেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু নিমক-
হামামি যদি কেউ করে, নিমকহারামি করে চাকরি ছেড়ে
দিয়ে গিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে, তা'হলে আর রক্ষে নেই।
সে ত' মরবেই, তাব ছেলে মেয়ে বউও রেহাই পাবে না।
প্রাহলিকা বললে—“যত গীড়াখুরি গল্প। এ দেশে বুঝি
আইন নেই।”

মুনসী তর্ক করলে না। মাথা নেড়ে বললে—“আইন ত,
আছেই। এখানকার মালিকই এ দেশের আইন সত্তার
সত্য। তার চেয়ে বড় কথা হোল, এ তল্লাটের সবকি
মামুষ খেয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত বেঁচে আছে এখানকার মালিকের
জন্তে। শাসন তিনি করেনই না কাউকে, প্রতিপালন

করেন। কিন্তু যদি কখনও কাউকে শাসন করতে হয়,
তা'হলে ঐ একটি শাসনই করেন। মোজা তাকে যমের
বাড়ী পাঠিয়ে দেন। সেটাই জন্তেই ত' কাপছে সবাই ত'য়।
মেয়ে গেছে, এ খবরটা পেয়েই আসছেন। এসে
ব্যাপারটাকে কেমনভাবে নেবেন, তা কি কেউ বলতে
পারে। তারপর কাকে কাকে দায়ী করবেন, তাও কেউ
জানতে পারবে না। তারপর হঠাৎ শুরু হোয়ে যাবে
যমের বাড়ী পাঠানো। কেউ মরবে গাড়ীর তলায় চাপা
পড়ে, কারও ঘাড়ে ছিঁড়ে পড়বে পঞ্চাশ মন মাটি-মাটি
কাটা কলের চেন ছিঁড়ে, কেউ বা শুধু হারিয়ে যাবে।
কত বকমের ফাঁদ যে পাতা আছে এখানে, তার যে
কোনও একটার ভেতর দিয়ে গলে গেলেই হোস।
আর পালিয়ে যায় যদি কেউ এখান থেকে, তা'হলে ত
আরও সুবিধে। যেখানে যাবে সেখানেই মরবে। খামার
দেকে চলে গিয়ে কে ম'ল কে বাঁচল, তার জন্তে ত' আর
এখানের মালিক দায়ী হোতে পারেন না।”

প্রাহলিকা আর একবার মিনমিন করে উচ্চারণ করল—
“তা কেন হবেন।”

মুনসী বললে—“আমরাও কোনও কিছুই জন্তে দায়ী নই।
এক বাবুর বউ হারিয়েছে, তিনি বউ খুঁজতে এলেন।
আমাদের গাড়ীতে এলেন, কাজেই আমরা এলাম। এবার
চলে যাব। ব্যস—চুকে গেল। সে মেয়ে এখানে
রইল কি রইল, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথা বখা
নেই। ব্যস—”

প্রাহলিকা তৎক্ষণাৎ সাব্ব দিলে—“বটেই ত'। আমবা
কেন মাথা ঘামাতে যাব।”

মুনসী খুবই সন্তুষ্ট হোয়ে উঠল। যাক, রক্ষা পাওয়া গেল।
খামারের মালিক—লোক খুন করতে পারেন, মুনসীর
মালিকটি অস্ত্রটা পারেন না। কিন্তু যেকোনো যদি চাপ
একবার, তা'হলে কি আর রক্ষে আছে। এমনি গলায়
চাকু চালিয়ে না মারতে পারলেও দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্তে দৃষ্ট
রক্ষা করে ছেড়ে দিতে পারেন। মারবার কায়দা কি এক
রকমের। অনেকগুলো ব্যাপার জানেও কি না মুনসী,
যীরে যীরে সইয়ে সইয়ে বহুদিন ধরে কি ভাবে মামুষকে



একেবারে চিবড়ে বাঁধে ছাড়েন তাঁর মনিবটি, তা' আর মুনসীর চেয়ে ভাল করে কে জানে। যাক, বাঁচা গেল। সেই মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে বাবার কোঁকটা ঘে অল্পের ওপর দিয়ে কেটে গেল, এ অল্প মুনসী নিজের নসিবকে ঠুঁকে খন্ডবাদ দিলে। তারপর হস্তদস্ত হোয়ে চলে গেল মনিবের সম্মানে থেকে। বলে 'গেল, গাড়ীখানা যাতে ঝটপট রেডি হয় সেই চেষ্টাই করতে চলল। তবে সন্ধ্যার আগে বোং হয় বেরনো যাবে না। খামারের মালিকও হয়ত এসে পড়বেন এর মধ্যে। তাই হবে, তাঁর কাছ থেকেই বিদেশ নিয়ে চলে যাওয়া যাবে। পালিয়ে বাবার দরকার কি! অজায় ত' করা হয়নি কিছু যে পালিয়ে যেতে হবে।

না, পালাতে হবে না।

পালাবার—প্রশ্নটা ওঠে না, চলে গেলে আটকাচ্ছে কে।

এইটুকুই ত' আসল সুবিধে প্রেহেলিকা হবার, প্রেহেলিকাকে কখনও পালাতে হয় না। প্রেহেলিকার কাছ থেকেই সকলে পালিয়ে যায়। আবার আসেও, প্রেহেলিকার আকর্ষণে বেহাশ হোয়ে চলে আসে। হুঁশ ফিরে পেলেই পালিয়ে যায়। প্রেহেলিকাও কাউকে আটকায় না।

প্রেহেলিকা যখন আটকায় না, বাধা দেয় না কাউকে চলে যাবার সময়, তখন সেখানে পালাবার প্রশ্নটা ওঠে কেন? এইটুকুই হোল আসল প্রেহেলিকা।

যাক গে, হারা পালায় তারা পালিয়ে বাঁচুক। প্রেহেলিকাকে কখনও পালাতে হয় না। কিন্তু এবার বোধ হয় হবে। চলে যেতে চাইলে কেউ বাধা দেবে না, তবুও পালাতে হবে। এটা আবার আর এক রকমের আসল প্রেহেলিকা। তা'হলে বাধাটা দিচ্ছে কে! কার ভয়ে পালাতে হচ্ছে! ভাবতে ভাবতে ওপর থেকে নিচের নামল প্রেহেলিকা, একজন দায়োয়ান তটস্থ হোয়ে ছুটে এল। প্রেহেলিকা জানতে চাইল, জগৎরামবাবু কোথায়। তাঁর সংগে দরকার আছে। তৎক্ষণাৎ ছুটল দায়োয়ানটা আফিসের দিকে। একটু পরে জগৎরামের বদলে আর একজন বাবু এসে সশস্ত্র মনস্কার নিবেদন করলেন। প্রেহেলিকা খুবই দায়ী

হাসি এক কালি উপহার দিলে সেই বাবুটিকে।

দিয়ে বললে, একটিবার

সে সেই ঘরখানায় যেতে চায়। যে ঘরখানায় সেই মেয়েটি থাকত, সেখানে দু'খুঁটা কাটালে কি কোনও ক্ষতি হবে। তারো ভাল লাগে সেই ঘরখানা, যেমন বড় ভেয়ানি নিরিবিলা। আপ'ত্ত বদ না থাকে—

বাস্ত হোয়ে উঠলেন বাবুটি—“কি আশ্চর্য! আপত্তি আবার কিসের! যেখানে খুঁচি যান, যা মন চায় করুন, জিজ্ঞাসা করবার দরকারটা কোথায়।”

প্রেহেলিকা বলল—“যা মন চায় তাই করব। এতটা স্বাধীনতা দেওয়া কি ভাল। চারিদিকে—দামা জিনিষ পত্র যন্ত্রপাতি ছড়ানো রয়েছে, যদি একটা নষ্ট করে ফেলি। যদি একটা নিয়েই—”

বাবুটি বললেন—‘যান নিয়ে, করুন নষ্ট, কেউ বাধা দেবে না। জগৎরামবাবু সেই রকম ছুকুমই দিয়ে গেছেন।’

“কি সর্বনাশ!” চোখ কপালে তুলে প্রেহেলিকা জিজ্ঞাসা করল—“এ রকম দরাস্ত ছুকুম দেবার অর্থ।”

“অর্থ হচ্ছে, সত্যিই কিছু নিয়ে যাবেন না আপনি বা কোনও লোকসানও করবেন না” বাবুটি বেশ জোর দিয়ে অবাধি উচ্চারণ করলেন। তারপর একান্ত করুণ স্বরে বললেন—“কিন্তু লাভ হবে কতখানি আমাদের তা জানেন? যিথো একট সন্দেহের হাত থেকে আমরা বাঁচব।”

সত্যিই এবার আশ্চর্য হোয়ে গেল প্রেহেলিকা। বললেন—“সন্দেহ! সে আবার কি?”

বাবুটির স্বর বেশ একটু ঘেন কানো কানো হোল। নিভাস্ত অসহায়ের মত বলতে লাগলেন—“এতো হ্যা, একেবারে মিথ্যে সন্দেহ। সেই মেয়েকে এই খামারে লুকিয়ে রাখা হোয়েছে, এই রকম সন্দেহ করেছেন আপনারা। নিচের ইচ্ছে চল গেছে মেয়ে, বখাশ করতে পারেন নি। এ গেল বিপদের এক দিক, আর এক দিক হোলেন স্বয়ং মালিক আমাদের। আসছেন তিনি, জগৎরামবাবু গাড়ী নিয়ে গেছেন। এম' কি মূর্তি ধারণ করবেন, তাই বা কে বলবে। নিচের মেয়ে পরিচয় দিয়ে আমাদের হেঁপাওতে



রেখে গিয়েছিলেন থাকে,
তাকে কিরিয়ে দিতে
হবে ত'। মালিক আবার

কি সম্বন্ধ করে বসেন তার ঠিক কি। একদিকে আপনারা,
একদিকে খোদ মালিক আমাদের, এখন আমরা বাই
কোথায়! মেয়ে আপনাদের হোক বা মালিকেরই হোক,
তাতে আমাদের কি গেল এল। আমরা তাকে লুকিয়ে
রাখতে যাবই বা কোন স্বার্থে? আমরা গরীব মানুষ, খেটে
খাই। আমাদের কি গুড়ে মরবার জন্তে পালক গভিয়েছে?"
সত্যের বলে উঠল প্রহেলিকা—"বাক, কাজ নেই আমার
সেই ঘরে বারার। কি মুশকিল দেখ। আমারই বা
কোন দায় পড়েছে যে আপনাদের সম্বন্ধ করতে যাব।
সে মেয়ে আমার কে? তার স্বামী ধরল গিরে আমার,
কোথায় সেই খামার নিয়ে যেতে হবে। কি করি, তাড়িয়ে
দিতে ত' আর পারি না। গাড়ী দিলাম ড্রাইভার দিলাম।
তারপর ভাবলাম, কাজ ত' নেই কিছু, আর একবার বাই
না কেন সেখানে। জায়গাটা এমনই যে চোখে লেগে
জ্বাড়ে।" আপনাদের মধ্যে অনেকের মুখ চেনাও আছে।
তাই আবার এলাম। কি করে জানব যে আপনারা সম্বন্ধ
করে বলবেন, আমি সেই ভুল্ললোকের বউটিকে আপনারদের
কাছ থেকে আদায় করতে এসেছি। আমার কোন স্বার্থ
লিঙ্ক হবে তাতে?"

ভুল্ললোকটি বিশেষ কারু হোরে পড়লেন। ঘাড় চুলকে
শেলেন—"না না, আপনাকে সম্বন্ধ করব কেন আমরা,
আমরা করে এসেছেন, এইটুকুই কি কম ভাগ্য
আমাদের ব্যাপার কি জানেন, এমন বিপদেই পড়ে গেছি
আমরা যে কোন মাথার ঠিক নেই। যিনি নিজেকে সেই
মেয়ের স্বামী বলে পরিচয় দিলেন, তিনি ঠিক। তাঁর
বক্তৃতা আজ সকালে চো-রাড়িয়ে বলে গেলেন, বজুর বউ
পাওয়া গেল না গেল, তাঁর স্বামী বয়েই গেল। যার বউ সে
কোথায় গেল, তার ঠিক নেই, তিনি কেন তাঁর কাজের
ক্ষতি করে বসে থাকবেন। হক কথা, আপনিও বা বলছেন
তাও হক কথা। আবার আমাদের মালিক এসে হরত
আরও একটি হক কথা জুড়বেন। বলবেন, মেয়ে এবং

আমাই দুই বার করে দাও। নরত বাও গোজার দরজায়,
দেখি এখন কে বাঁচার ভোমাদের।"

প্রহেলিকা বলে উঠল—"না না, বুঝিয়ে যদি বলা যায়
তাকে—"

"কে সেটা করতে যাবে?" রাগে ক্ষোভে তেড়ে উঠলেন
ভুল্ললোক—"কার ঘাড়ে কটা মৃগ আছে যে তাঁকে
বোঝাতে যাবে?"

নিচের ঠোঁটখানা দাঁত দিয়ে কামরে বেশ কিছুক্ষণ চূপ করে
রইল প্রহেলিকা। তারপর বলল—"আমি বোঝাব।
যতক্ষণ না বুঝবেন তিনি, আমি এখন থেকে যাচ্ছি না।
আপনারা নিশ্চিত হোন, আমি কথা দিচ্ছি, তাঁকে বুঝিয়ে
তবে যাব। এখন চলুন সেই ঘরে, সেখানে ছপূর বেলাটা
কাটাও আমি। আপনাদের মালিক আহ্নন, তখন দেখা
যাবে।"

কতটা সাহস পেলেন ভুল্ললোকটি প্রহেলিকার কথা শুনে,
ঠিক বোঝা গেল না। তবে হঠাৎ এক কাণ্ড করে ফেললেন
তিনি, নিচু হোরে ধপ্ করে প্রহেলিকার চরণ ছ'খানি
ছুঁয়ে মাথার হাতখানা মুছে ফেললেন। খতমত খেয়ে
গেল প্রহেলিকা, কিছু বলবার অবকাশ পেল না। ছুটে
গিয়ে হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিলেন ভুল্ললোকটি—"গাড়ী সে
আও, জলদি গাড়ী লে আও। আত্তি বড়া বাড়লোমে
যানা পড়ে গাঁ।"

সেই ঘরখানি, প্রথম দিন ঘরখানিতে ঢুকেই মনে হোয়ে-
ছিল জুড়ুড়ে ঘর। ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালে
বুক চিগচিগ করে। কোথায় ঘরের চাল। চালের নিচে
অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। অনেকক্ষণ নজর দিয়ে
দেখলে বোঝা যায়, চালটার গড়ন কেমন। চারদিক
থেকে স্তোকোপা চারখানা চাল উঠে গিয়ে মিলেছে ঠিক
ঘরের মাঝখানে। একটা অন্ধৃত ধরণের টুপির মত
দেখাচ্ছে। টুপিটা হোল এমন এক দানবের, যার মাথাটা
হোল গোটা আষ্টেক হাতের সমান। ঐ টুপির ডলায়
আট আটটা হাতীকে চাপা দেওয়া যায় নির্বাৎ, একবার

চাপা দিতে পারলে বেমালাম গায়েব হোয়ে বাবে তার,
ভুতেরও সাধ্য নেই যে খুঁজে বার করবে।

মেয়েটাও গায়েব হোয়ে গেল।

বলেছিল—এখানে। এই ভুতের বাড়ীতে আমার মৃত
পেত্রী হোয়ে ভুতুড়ে পুখী পাহারা দিতে চাও তোমরা।

খুবই আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিল মেয়েটা, মনে করেছিল
ঠাট্টা। ঐ দানবের টুপির তলার লেখে কেউ বাস করতে
চায় কখনও! ঠাট্টা নয়ত কি!

মেয়েটা কিন্তু এই ঘরেই কাটাতে তার দিন রাতগুলো।
কে বলতে পারে, ঐ চালের তলার অঙ্ককারটা তাই
জমাট বঁধা নিঃশ্বাস কিনা! ঐ অঙ্ককারের ভেতর
নজর গেলে ভাল করে জানা যেত, কেমন ভাবে কাটতে
তার দিন রাতগুলো। নিশ্চয়ই খুব ভয় করত, ভয়
করতে করতে শেষ পর্যন্ত হয়ত এমনই হোয়ে গিয়েছিল
যে ভয়টাকেই যে একমাত্র বন্ধু বলে মনে করত। সে
আর তার ভয়, হুঁজনে চূপচাপ বসে থাকত এই ঘরে।
তাবত, ভাগ্যে ভয়টা রয়েছে, ওটুকু না থাকলে কার
মুখ চেয়ে থাকতাম।

ভয়ের মুখ চেয়ে থাকতে থাকতে ভয়ই তাকে উদ্ধার
করলে। ভয়ের হাত ধরেই সে ভয়াবহ পথে পা বাড়িয়েছে।
আর রক্ষে নেই, ভয় যেখানে নিয়ে গেছে সেখান থেকে
আর ফিরতে হবে না।

ভয়ানক অশ্রম-স্বপ্ন হোয়ে হুঁহাত পেছনে দিয়ে সামনে
খুঁকে ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগল প্রহেলিকা। সত্যিই
কি সাংঘাতিক কথা! অতটুকু একটা মেয়ে এই ভয়ানক ঘরে
একলা থেকেছে এতদিন, সত্যিই কি সাংঘাতিক কাণ্ড।

খুব ধীরে ধীরে খুবই সতর্কপণে আর একটা ঘরের মধ্যে
পৌছে গেল প্রহেলিকা। ঘরখানার মধ্যে উঁকি দিয়ে
দেখতে গেল একটিবার। উঁকি দিতে গিয়ে ভয়ানক
ফ্যাসাদে পড়ে গেল। প্রাণপণে চেষ্টা করলে দরজার
কাছ থেকে ফেরবার, পারলে না। দরজাটা ঠেলে যেই
একটু ফাঁক করেছে, অমনি ভেতর থেকে কারা যেন তাকে
টেনে ছুঁড়িয়ে ফেললে। উঃ—কি ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডায় প্রহেলিকার
বুকখানা জমে পাথর হোয়ে গেল।

ওপর দিকে মুখ তুলে
তাকাল তখন। হাঁ, ঠিক
আছে, ঠিক সেই রকম



খপখপে সাদাই আছে ছাতখানা। ছাতের মাঝখান থেকে
সাদা গামলাখানা ঠিক ঝুলছে। গামলার ভেতর জদছে
আলো। দিবারাজি সমানে জ্বলছে। একনাগাড়ে কুড়ি
ঘণ্টারও বেশী ঐ আলোটার দিকে তাকিয়ে কাটাতে
হোয়েছে তাকে। আলোটাকে সে তুলতে পারে কখনও।
ঐ আলোটা আর ঐ ছাতখানা, শুধু ঐ ছোট জিনিষের
ওপর স্থির লক্ষ ছিল কুড়ি ঘণ্টারও বেশী সময়। ডাইনে
তাকায় নি, বাঁয়ে তাকায় নি, তুলেও নিজের পানে
তাকায় নি। একদম তুলে গিয়েছিল নিজের কথা, যোথায়
আছি, কি ভাবে আছি, সব তুলে গিয়েছিল। তা' যদি
না পারত, একটি বাবের জন্তেও যদি নিজের কথাটা
মনে হোত, তা'হলে তাকিয়ে ফেলতই নিজের দিকে।
তাকালেই শেষ হোয়ে যেত ভয়ংকর। আস্ত একটা
প্রহেলিকার আর জন্ম হোত না।

হাঁ, সেই ঘরেই প্রহেলিকার জন্ম হোয়েছিল। সাদা ছাত
আর সাদা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
জন্মালো প্রহেলিকা। জন্ম মুহূর্তে তার একমাত্র সংগী
ছিল ভয়, ভয় তাকে বাঁচিয়ে দিলে। সেই থেকে ভয়ই
হোল একমাত্র বন্ধু, একমাত্র সংগী, একমাত্র পরামর্শ
দাতা। বড় বিশ্বাসী বন্ধু এই ভয়, কিছুতে ঠকতে দেয়
না, কখনও কোনও বিপদে পড়তে দেয় না। পদে পদে
সাবধান করে, আগলে থাকে। অনবরত কিসফিস করে
বলে কানে—খবরদার, বিশ্বাস কোর না, নির্ভর কোর
না, নিজেকে নিজে বিসর্জন দিও না। মনে আছে ত'
সেই ঘরখানাকে, হিমের মত ঠাণ্ডা ঘর একখানা। চার-
দিকে চারখানা নিখুঁত সাদা দেওয়াল, এক কোণায়
একটা ছোট লোহার দরজা। কোনও দিকে একটি
জানালা নেই, শুধু সেই ছাতের ছোট ছোট বয়েকটা
জাল লাগানো কোকর আছে। মনে পড়ে, কি কষ্টে
নিঃশ্বাস নিয়েছিল। মনে পড়ে নিঃশ্বাসের সংগে কি
রকম স্তবাস পেতে।



আঃ—

দম আটকে গেল প্রহে-
লিকার। কাঠ হোয়ে

দাঁড়িয়ে রইল চোখ বুজে। তৎক্ষণাৎ হ'ল ফিরে পেল।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ, করেছে কি সে। আবার সেই ঘরখানির
ভেতর পৌঁছে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে কিরে গিয়ে বসল চেয়ারে।
ইস, কেন সে মরতে আবার সেই ঘরখানার কথা মনে
করতে গেল। কি সাংঘাতিক কাণ্ড।

কিছুতেই রেহাই নেই। সেই ঘর থেকে যে সংগীটির
হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল, যে সংগীটি সেই ঘরে তাকে
পাহারা দিয়েছিল, যার মুখের পানে এক দৃষ্ট তাকিয়ে
—কুড়ি ঘণ্টারও বেশী কাটিয়ে দিয়েছিল সে।

সেই একান্ত বিশ্বাসী একমাত্র সংগীটি কিছুতেই তাকে
রেহাই দেবে না। তাই প্রহেলিকা হোয়ে বেঁচে থাকতে
হোল। হরদম হাসি হরদম কান্না, অবিরাম ঘর ভাংগা
আর ঘর গড়া, অশান্তি ওয় মুহূর্ত্ত প্রেম বিরহ বিবাহ বৈধব্য
ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। এক মুহূর্ত্ত
ভুলতে দেয় না যে প্রহেলিকা হোল প্রহেলিকা। ভুলতে
দিলেই সর্বনাশ, সটান সেই ঘরখানার মধ্যে পৌঁছে যেতে
হবে। অতি বড় বিশ্বাসী বস্তুটি কিছুতে রেহাই দেবে না।
তবু, বড় নিষ্ঠাবান সংগী। ঐ সংগীটিকে অবলম্বন করে
এই ঘরে বেঁচে ছিল মেয়েটি, সেই সংগীই তাকে এখান থেকে
উদ্ধার করেছে। মরে যেত ত' আপদ যেত; ঐ তরফর
সংগী তরের সংগে পালিয়ে যেতে হোত না। পালিয়ে ত'
গেছে, এখন বাঁচবে কেমন করে। কি জাতের প্রহেলিকা
হোয়ে বেঁচে থাকবে, তাই বা কে জানে।

তা'হলে বাঁচতেই বা বাবে কেন।

সে নিজেই বা বেঁচে আছে কেন।

কই বেঁচে আছে। হাসপাতালের লোকেরা থাকে মরা
মনে করে মরা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে কি বেঁচে আছে।
মোটাই না, একদম নয়। কি করেই বা বাঁচবে। মেয়েটি
জন্মেছিল সজ্জার পরে, বয়সী শুধু হোল বঁটা তিনেক
বাদে, তারপর আর কোনও হ'লই রইল না। হ'ল হোতে

প্রথম টের পেল, তরানক ঠাণ্ডা। বুক পেটের ভেতর
হিহি করে কাঁপছে, হাত পা নাড়বার সামর্থ্য নেই। হাত
বখন নাড়তে পারল, তখন নিজের গায়ে হাত দিয়ে শিউরে
উঠল। একি গায়ে কিছু নেই কেন! বহুকাঁটে চোখ
মেলল। তারপর কখন কি ভাবে যে উঠে বসল, কি করে
নেমে এল সেই মরার গাছা থেকে, কিছুই মনে পড়ে না।
মনে পড়ে শুধু সেই আলোটাকে আর সাদা ছাত্তখানাকে
সাদা আলো আর সাদা ছাত্ত, ব্যগ, আর কিছু নয়।
সাদা আলো আর সাদা ছাত্তের পরে বা নজরে পড়ল, তা'
হচ্ছে একদম কালো। ইস, কি কালো! এক কালো
থেকে আর এক কালোর লাফাতে লাফাতে শেষে আবার
আলো দেখা গেল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আলোর, হাজার
লক্ষ বাতির তেজ এক একটা বাল্বে, ইন্ডির বাল্বে কি
বা তা শক্তি ধরে। ব্যস—আলোর আলো হোয়ে গেল
জীবনটা, ছিটে ফোটা অন্ধকার নেই। অন্ধ হোয়ে টিকে
রইল সেই মরা ঘরের সাদা ছাত্ত আর সাদা আলো, কোনও
মতেই সেই আলোর হাত থেকে নিজের পাওয়া গেল না।
একে কি বেঁচে থাকা বলে।

এই ঘরে যে মেয়েটা থাকত, সেও হরত আর বেঁচে নেই।
এখান থেকে তরকে সংগী করে যে বেরিয়েছে, সে ত'
সেই আগের যেমেটা নয়। তরের সংগী সংগে, এরা থাকে
পাহারা দিয়ে বেড়ায় সে হোল জ্যান্ত অনাছা। কোনও
অবলম্বন নেই তার, কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।
শুধু ছোবলার আর বিশ্ব তালে। ছোবলার অস্ত্র আর
বিশ্ব তালবার অস্ত্রে যে-বেঁচে থাকবে, সে ত' সেই মেয়েটি
নয় যে এই ঘরে একলা বাস করত।

চেয়ার ছেড়ে আবার উঠল প্রহেলিকা, আবার ঘুরতে লাগল
ঘরময়। এবার আর অস্ত্রমন্ডল হোয়ে নয়। তরতর করে
ঘরের প্রতিটি জিনিস দেখতে লাগল। আলমারির সামনে
গিয়ে কপাটের হাতল ধরে টান দিলে। খুলে গেল কপাট-
খানা, চাবি দেওয়া নেই। ঘরে ঘরে সাজানো রয়েছে
জামা কাপড় ওড়না সাদা, রয়েছে নানা জাতের মাখার

ভেল ফিতে আলতা চিরুণী সিম্ধুর সেক্ট, আরও কত কি রয়েছে। কোনটার মোড়ক খোলা হয়নি, কোনটা ব্যবহার করা হয়নি। বাজার থেকে যেমন অবস্থায় এনেছিল, ঠিক তেমনি অবস্থায় রয়েছে। প্রহেলিকাও ছুঁল না সেসব জিনিষ, নিশ্চয়ই কপাট ছুঁখা না চেপে বন্ধ করে দিল। তারপর গেল বিছানার কাছে। পুরু একখানা রঙচঙে চাপার তলায় ঢাকা রয়েছে বিছানাটা। আন্তে আন্তে ঢাকাখানা তুলে ফেললে। একটার ওপর আর একটা, ছুঁটো পাতলা বালিশ রয়েছে একধারে, কিন্তু বালিশ ঢাকা তোয়ালেখানা কই! নিশ্চয়ই ছিল একটা কিছু বালিশের ওপর, নহত বালিশের ওয়াড়ে দাগ পড়ত। নিচু হোয়ে দেখল বালিশগুলো। হাঁ, এই বালিশেই মাথা দিয়ে শুত, ওয়াড়ের ভাঁজ তেঙে গেছে। কিন্তু দাগ পড়েনি। ত'হলে একটা কিছু ছিল বালিশের ওপর, সেটা কোথা গেল! এখার ওখার চেয়ে দেখল, একটা মাজ আলনা দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। গেল সেটার কাছে, একখানা একখানা করে শুণল কাপড় জামাগুলো। তিনখানা মিলের শাড়ী, তিনটে ব্লাউজ আর সারা ছুঁটো। গামছা খানাও রয়েছে একধারে। আর কিছু নেই।

তা'হলে বালিশের ঢাকনাখানা গেল কোথায়!

আবার ফিরে এল বিছানার কাছে, বালিশ ছুঁটো সরিয়ে বিছানার চাঁদরখানা টেনে ভুলল। চাঁদরের চার ধার পৌঁজা ছিল বিছানার তলায়, টেনে বার করবার সময় মাথার দিক থেকে কি একটা বুলে পড়ল যেন।

ওটা কি!

একখানা জরি পাড় বৃত্তি, বৃত্তিখানা পাট করে তার ওপর বালিশের ঢাকনাটা চাপা দেওয়া ছিল। টেনে বিছানার চাঁদর বার করতে গিয়ে বৃত্তিখানা এলোমেলো হয়ে গেল।

তা' আর কি হবে, আবার ঠিক করে রাখলেই হোল।

বৃত্তিখানা তুলে নিলে প্রহেলিকা, পাট করতে গেল। পাট করতে গেলে কাপড়খানা মেলে কেল। দরকার। গেল মেলেতে, ঠক করে একখানা খাম পড়ল পায়ের কাছে।

ওটা আবাম কি!

বৃত্তিখানা রেখে খামখানা তুলে নিল। খামের এক পাশ

ছেঁড়া। টেনে বার করল।

ভাঁজ করা দামী কাগজ

করেখানা, সংগে সংগে

কাগজগুলো মেলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে লেগে গেল। পড়তে পড়তে তলিয়েই গেল সেই চিঠিতে। জানতেও পারলে না, পেছনে এসে কে দাঁড়িয়েছে।

পড়া শেষ করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাঁজ করে ফেললে কাগজগুলো। করে চোকালে খামে। তারপর খামখানা বিছানায় রেখে কাপড়খানা আবার তুলে নিলে।

সেই মহুর্তে কানে গেল—“আমায় দিন, আমি ঠিক করে রাখছি।”

চপ্প করে ঘুরে দাঁড়াল প্রহেলিকা, ছুই চোখে ফুটে উঠেছে সত্যিকারের চমকানি। চমকানি ঠিক আইন মার্কিক নিখুঁত অভিনয়কলা সম্বত নয় হয়ত, কিন্তু পুঁবই জীবন্ত বটে। সেই চমকানির দিকে তাকিয়ে পুরুষোত্তম বলল—“সব হাঙ্গামা মিটিয়ে এলাম একেবারে। সন্ধ্যা নাগাদ তার সঠিক পাতা পাওয়া যাবেই। পালাবে কোথায় এবার! বক্রবাহন বাবুকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।”

প্রহেলিকার মুখ থেকে বেরল—“তা' ত' বটেই।”

পুরুষোত্তম বুঝতে পারল, তার কথাটা প্রহেলিকার কানে চোকেনি। এবার সে গলায় জোর দিয়ে বলল—“অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাকে, এবার শেষ হবে। আপ রাঙেই হয়ত আমরা ফিরে যেতে পারব।”

তারো আশ্চর্য হোয়ে গেল প্রহেলিকা। অম্পট ভাবে উচ্চারণ করলে—“কোথায়?”

পুরুষোত্তম বলল—“বাড়ী ফিরে যাব। কাজ শেষ হোলে বাড়ী ফিরব না ত, কোথায় যাব?”

“বাড়ী।” আর একবার সেই আসল চমকানি চমকে উঠল প্রহেলিকা। তারপর আবার অস্বমনস্ক হোয়ে পড়ল। এমনই অস্বমনস্ক হোয়ে পড়ল যেন উখাও হোয়ে গেল কোথায়। সেই অবস্থায় বিভবিড় করে বললে—“বাড়ী যাবেন! তা' বেশ ত'। যান না বাড়ী। বাড়ী না



গিয়ে ফিরে এলেন কেন
আবার! গেলেই
পারতেন।”

পুরুষোত্তম বলল—“কি মুশকিল! একলা আমি বাব
কেন, আমরা সবাই বাব। আমরা কি এখানে থাকতে
এসেছি নাকি।”

হঠাৎ খুব জোরে মাথাটা ঝাঁকাল করেবাবর প্রহেলিকা।
পুরুষোত্তমের দিকে তাকাল তীব্র হৃষ্টিতে। দাঁতে দাঁতে
পিষে বললেন—“কিরে এলেন যে আবার?”

পুরুষোত্তম বলল—“বাঃ রে—গেলায় কোথায় যে কিরে
এলাম। আপনাকে এখানে কেলে রেখে—”

প্রহেলিকা চিৎকার করে উঠল—“আমার জন্তে কিরে
আসা হয়েছে। সাবধান, মুখ সামলে কথা বল বলছি,
নয়ত—স্বরে স্বর মিলিয়ে দরজার বাইরে থেকে ভারী
গলায় কে বলে উঠল—“হাতে মাথা কেটে ফেলব।”

বলতে বলতে দরজার ভেতর পা দিলেন বক্রবাহন বা।
প্রহেলিকার দিকে না তাকিয়েই বললেন—“ধাক, বখেটে
হয়েছে। ছেলে মাছকে ভয় দেখিয়ে ভারী বাহাহুরি
হচ্ছে।”

এইবার আবার চমকতে তুলে গেল প্রহেলিকা, চমকবার,
পরিবর্তে আবার আড়ষ্ট হোয়ে পড়ল। হুঁচোখ গোল
করে তাকিয়ে রইল বক্রবাহন বাবুর পানে। তিনি
মোটো জ্বাক্কেপও করলেন না। বললেন—“বোস বোস,
স্থির হোয়ে বসে পড় সবাই। কাজটা এখান থেকেই
শুক করি। মেয়ে আমার এই ঘরেই ছিল। সুতরাং
এখান থেকেই ভার খোজ পাওয়া যাবে। হংসরাজ, এই
হংসরাজ, গেল কোথায় বুড়ো হারামজাদা—

জগৎরাম দেখা দিলেন, তাঁর পেছন পেছন আরও পাঁচ
ছ’জন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। বক্রবাহন এক টানে
বলে যেতে লাগলেন—“কই দেখি ভায়ারি। সে রাজে
বারা বারা ভিউটিতে ছিল সবাইকে ভেকেছ ত’ জগৎরাম।”
বক্রবাহন বসে পড়লেন চেয়ারে, জগৎরাম এগিয়ে এসে
একখানা মোটা খাতা টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন।
খাতাখানার ওপর নজর বোলাতে বোলাতে বক্রবাহন

বকেই চললেন—“আচ্ছা এই যে—এই ভিউটি বদল
হোল। তারপর এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়,
আর ওখানে পাঁচ জন। বেশ বেশ, তা’হলে সর্গারি
করার জন্তে কেঁরুইলেন।

এই-এই-এই যে—দশটার এল সহদেও। আচ্ছা—তাক
সহদেওকে, শুনি তার কি বলার আছে। কিন্তু সেই হংসটি
আবার উড়ল না ত’। দেখ ত’ হে কেউ, হংসেখর উড়লেন
কি না। আচ্ছা—এবার সহদেও—”

বক্রবাহন মুখ তুললেন। ছ’জন লোকের পিছন থেকে
সহদেও সামনে এসে দাঁড়াল হাতে একখানি কাগজ নিয়ে।
কাগজখানা টেনে নিলেন তার হাত থেকে বক্রবাহন বাবু।
মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। মুখ কিন্তু তাঁর চলতেই লাগল।
“তা’ হলে—এই যে—রাত প্রায় একটা তখন—আচ্ছা—
কোথায় ধরা পড়ল। এই যে—বড় বাড়লোর চৌকির
মধ্যে। কোনখানে? মুখ তুললেন বক্রবাহন বাবু।

সহদেও বলল—“বাইরের উঠোনে, পশ্চিমদিকের বড়
পেয়ারা গাছটার কাছে।”

বক্রবাহন বললেন—“লিখতে হয় সেটা গরু। তোমার
পেটের ভেতর ঢুকে কি আমি সেটা জানব। আচ্ছা—যাক
—এই যে ধরল এরা তিন জন—বেশ—এদের কথা পরে
শুনছি। ধরবার পরে কি হোল—এই যে—বেশ বেশ—
ঠিক মিলে যাচ্ছে। ছবছ ব্যাপারটা বেশ চোখের সামনে
দেখতে পাচ্ছি। টানতে টানতে আনা হোল দেউড়ির
সামনে। - বেশ—কোনও দুঃখ নেই। তারপর এই যে—
কি বলল।”

সহদেও বলল—“বলল এর নাম। বলল—তিনি আমার
চেনেন। তাঁকে ডেকে আন, দেখলেই আমার চিনবেন।”
বক্রবাহন মুখ না তুলেই বললেন—“অতি উত্তম কথা। চেনে
বলেই যে অর্ধেক রাতে পাঁচিল টপকে কারও বাড়ীতে
চুকবে, তার কোনও হেতু নেই। যাক গে—তারপর কি
হোল—এই যে—যুম তাকিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। দাঁড়াও
দাঁড়াও, এইখানে একটু গুপগোল রয়ে গেল যে। যুম তাড়াত্তে
হোয়েছিল?” বক্রবাহন বাবু মুখ তুলে তাকালেন সহদেওর
মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন—“যুম তাড়াত্তে হোয়েছিল

না জেগে ছিল, তা' ভূমি বুঝলে কেমন করে?" সহদেও নিরুত্তর। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বক্রবাহন বললেন—“আমি গল্প একটি। বাজে কথা লিখতে আছে এই সমস্ত গুরুতর ব্যাপার নিয়ে। শুধু ভেবে নিয়ে যাওয়া হোল। ঘুমচ্ছিস, কে জেগেছিল, কি করছিল ঘরের ভেতর, বাইরে থেকে ভোমরা জানবে কেমন করে। যাক্—” আবার কাগজের ওপর নজর দিলেন বক্রবাহন বাবু। আবার বক্রবক্র করে চললেন—“আচ্ছা—যাও যেতে দাও। গিয়ে কি করল—হুমিনিট তাকিয়ে ওইল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। চিনতে পারে নি। আচ্ছা—তারপর হঠাৎ কি! কি!” বট করে মুখ তুললেন বক্রবাহন, উম্মাদের চাঁউনি ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে। উম্মাদের মত চিংকার করে উঠলেন—“কি বলেছিল? কি নাম বলেছিল সে?”

এক প্রাণীর মুখে রা নেই। সহদেও কয়েক পা পিছিয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে খাড়া হোয়ে—চতুর্দিকে তাকিয়ে আর একবার চিংকার করে উঠলেন বক্রবাহন—“কি নাম বললে সে? কি নাম—”

বিছানার কাছ থেকে এক রকম ছুটে এল সামনে প্রহেলিকা। খামখানা বাড়িয়ে ধরে বলল—“এই চিঠিতে আছে। পড়ে দেখুন—”

বাবু বক্রবাহন ঝা চোখ নামিয়ে তাকিয়ে রইলেন খামখানার পানে। ক্রমে ক্রমে তাঁর চোখ ছুটিতে নিদাক্ষণ আশংকা ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে ধরবেন খামখানা, সে সাহসও যেন হোল না। আশ্বে আশ্বে আশ্রয় বসে পড়লেন চেয়ারে। অনেকক্ষণ পরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন—“কি আছে ওতে? কার চিঠি? কে লেখেছে?”

প্রহেলিকা খুব শান্ত গলায় জবাব দিল—“চিঠি কস্তুরীর, লিখেছে সরস্বতীদাদ। ঐ বিছানার ভোষকের তলায় পেলাম।”

অস্তিম দুহুর্ভে বুকেট খাওয়া বাঘ শেষ কাতরান যে ভাবে কাতরান, ঠিক সেই জাতের একটা শব্দ বার হোল বক্রবাহনের মুখ থেকে। সংগে সংগে তিনি ছ'হাতে নিজের মুখখানা চেপে টেবিলের ওপর উপুর হোয়ে পড়লেন।

সত্যা। অনেকক্ষণ বিদায় নিয়ে গেছে। টেবিলের ওপরের আলোটা জ্বলেনি।

অজ্ঞকারে—তিনটি মাহুষ বসে আছে টেবিলের তিন দিকে, পেছনে বিছানা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন। কেউ এতটুকু নড়ছেও না। আর এক প্রাণী নেই ঘরে, কর্মচারীরা সবাই বিদেয় হোয়েছে।

আলো একটা জ্বলছে বাইরে, উঠোনের ডানধারে একটা মাচার ওপর বসে আছে সেটা। ভরানক ভেজ আলোটার, ঘরের সামনের বারান্দায়—ঘেটুকু পৌছচ্ছে সেই আলোর ভেজ, তাতেই ঘরের ভেতরটা বেশ ফিকে হোয়ে উঠেছে। একেবারে অজ্ঞকার নয়, অথচ অজ্ঞকার, বাঁশ ঝাড়ে ঘেরা পুকুরের মত। পুকুরটা বেশ বোকা ঝাচ্ছে, কিন্তু জলটা ঠিক কতটা নিচে তা' মালুম হচ্ছে না। ঘরেতে মাহুষ রয়েছে চার চারটে, বোকা ঝাচ্ছে। কিন্তু কে কি করছে, বোকাবার উপায় নেই। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, কিংবা ঘরখানাই হয়ত পড়েছে ঘুমিয়ে। পাছে ঘরের ঘুম তেড়ে যায়, এই ভয়ে মাহুষ চারটে কাঠ হোয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে পরে একটা অজ্ঞত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খুব ভাড়া মস্ত বড় এক খণ্ড পাথরের তলায়—চাপা পড়েছে যেন কেউ, সেখান থেকে প্রাণপণে চোঁচাচ্ছে—“হংসরাজ—হংসরাজ—”। পাখাণ চাপা চিংকারটা অনেক তলা থেকে উঠেছে বলেই অড ফ্রীণ শোনাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটুকু আওয়াজও ধামবে এবার, আরও যদি দেরি হয়—হংসরাজের পৌছতে তা'হুদে নিশ্চয়ই পাখাণের তলায় ঐ আওয়াজটুকু একেবারে ঠাণ্ডা হোয়ে ধাবে। কতক্ষণ আর যুববে বেচারী। কতক্ষণ আর হংসরাজের জন্তে প্রাণটুকু ধরে রাখবে।

অবশেষে বাইরে একটু সাড়ান্দা উঠল। ক্রমেই সেটা এগিয়ে এল ঘরের দিকে। তারপর বারান্দার সামনে দেখা গেল কয়েকটা আলো, জুতোর শব্দ উঠল। ঘরের মধ্যে বারান্দা স্থির হোয়ে ছিল, তারা মোটে নড়লই না বারান্দা এল, তারা কি একটা জিনিষ বয়ে নিয়ে এল যেন। বারান্দার কিনারায় নামিয়ে রাখল বোকাটা, খুঃ





সাবধানে আস্তে আস্তে
গুইয়ে দিল। দিবে নিঃশব্দে
সরে গেল তারা সেখান

থেকে, শুধু আলোগুলো সব সেখানেই বসে বইল।
আরও খানিকটা কিকে-হোয়ে গেল ঘরের অন্ধকার।
তখন বেশ চেনা যায় মাস্তবলোকে। মাস্তব বলে মনে
হয় না, মাস্তবের মত পাথরের মূর্তি বলে মনে হয়।
অনেকক্ষণ পরে একজন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, চোরের
মত পা ফেলে ঘরের বাইরে চলে গেল। বেশ খানিকটা
সময় পার করে ফিরে এল সে দরজার সামনে। সেখান
থেকেই চাপা গলায় বললে—“হাতিদের ঘরের ভেতর
তুকে দাঁতাল মেঘলাকে বিরক্ত করছিল হংসরাজ। মেঘলা
গুঁড়ে জড়িয়ে আছড়েছে।”
ঘরের ভেতর কেউ বেন কথাটা শুনতেই গেল না।
দরজার সামনে দ্বির হোয়ে বইল লোকটি, সংবাদটা
আর একবার আঙড়াবারও প্রয়োজন বোধ করলে না।

বাজা শুরু হবে।

তৈরী হোয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই, খামারের সব মাস্তবই
তৈরী। সবাই বাবে, নিশ্চয়ই বাবে সবাই হংসরাজকে
নিয়ে। হংসরাজকে একলা ছেড়ে দিতে পারবে না কেউ,
হংসরাজ একলা যেতে পারবে না।

শতশত আলো জ্বালা হোয়েছে, হাজার হাজার বাতির
শক্তি এক একটি আলোর। খামারের আকাশ আলোর
আলো হোয়ে উঠেছে। হোতেই হবে যে, হংসরাজের
বাবার পথে অন্ধকার থাকবে। এতগুলো মাস্তবের জীবনে
যে আলো ফুটিয়ে তুলেছে, তার বাবার পথে আঁধার
থাকবে। খামার অন্ধ মাস্তব, খামারের দুর্জয় স্বপ্নপাতি
গুলো, খামারের হাতি ঘোড়া গরু ছাগল ভেড়া খামারের
গাছপালা আর মাঠের শয্যাগুলো, সকলের জীবনে আঁধার
বনিয়ে উঠবে যে, যদি হংসরাজের ফেলার পথে এতটুকু
আঁধার লুকিয়ে থাকে।

বিশখানা লরি দাঁড়িয়ে আছে সামবন্দী হোয়ে। সব

থেকে দামী গাড়ী হোল হড্ খোলা বাঁধ এমন একখানা
ডঙ্। চলে যখন, মনে হয় হাওয়ার ভেসে যাচ্ছে।
তখনক মানী কেউ খামারে আসেন যখন, তখন ঐ
গাড়ী বার করা হয়। রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো
হোয়েছে গাড়ীখানাকে, চার কোণে চারটে আলো
বাঁধা হোয়েছে। সেই গাড়ীতে পেছনের আসনের মাঝ-
খানে বসেছে হংসরাজ, মাথাটি এলিয়ে পড়েছে পেছন
দিকে। মহা মূল্যবান সিঁকের পাগড়ি রয়েছে মাথায়,
গলা পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে ফুল। ফুলের ভেতর ডুবে
আছে হংসরাজ, শুধু মূখ্যানা দেখা যাচ্ছে। কালো
কৌকড়ানো মুখের চামড়ার ওপর শ্বেত চন্দনের প্রলেপ
পড়েছে। হংসরাজ আর বুড়ো নেই।

একখানা লরির ওপর শুরু হোয়েছে—স্বপ্নপাতি রাঘব
রাজা রাম। এমনই ঠায়ে চলেছে তখনটি, গাহকরা
এমনই চাপা গলায় গাইছে যে মনে হচ্ছে, কোনও
সুন্দের দেশ থেকে বৃষ্টি ভেসে আসছে স্বরটা। ঐ
স্বরটুকু ছাড়া কোথাও একটু চুপস্ব হুচ্ছে না। অত
মাস্তব অত আলো অত আরোহন সব শুরু হোয়ে আছে।
থাকতেই হবে যে, নিশ্চয়ই থাকতে হবে। নয়ত তারা
বিরক্ত হবে হংসরাজ। অনর্থক হৈ হট্টগোল মোটেই
সে পছন্দ করত না।

বাজা শুরু হবে।

হংসরাজের চন্দন-বাজা শুরু হবে এবার। হংসরাজের
খামারে হংসরাজ আর ফিরবে না।

খামারটা বোবা হোয়ে রয়েছে।

ভাবছে, কি দরকার ছিল। বিহুকুটে জংগল আর খানা
ডোবা ছিল যেখানে, সেখানে কেন তুমি গড়তে গেলে
আমাকে! গড়ে রেখে চলেই যা যাচ্ছে কেন ফেলে! তুমি
ছিলে অন্ধর মহলের অন্ধরে, আমাদের অন্ধরটা পূর্ণ ছিল।
এতগুলো মাস্তব, সারা ভারতের সব জায়গার মাস্তব, সব
ভাবার মাস্তব, তোমাকে ঘিরে ছিল। তাদের ছেলে মেয়ে জী
আত্মীয় স্বজন সবাই ছিল নিশ্চিন্ত। সকলেই জানত, তুমি
আছ তাই ডর নেই। সবায়ের সব রকমের ফুল ত্রুটি
অপরাধ তুমি নিজের বুক পেতে নিয়েছে। তোমার



আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাই রক্ষা পেয়েছে। এখন তাঁদের
বাঁচবে কে!

শুন বুড়ো হংসরাজ তার নিজস্ব প্রথার মাথা নাড়ছে।
সত্যিই নাড়ছে, তবে কেউ তা' দেখতে পাচ্ছে না।
হংসরাজ যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চং চুং চুং টাং আওয়াজ উঠল। ঐ দেখ, আবার কারা
ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে হংসরাজের ঘুম ভাঙাতে।
ঘুম ভাঙলে হংসরাজ আবার বিরক্ত হবে না ত!

ঘণ্টার শব্দ ক্রমশে বাড়তে লাগল। যে দিক থেকে
আসছে আওয়াজটা, সেদিকে তাকিয়ে রইল সবাই।
অবশেষে দেখ গেল। সাক্ষাৎ ঘুম, পাশাড়ের মত
বিরাট বিপুল ঘুম, কালটৈশাখীর মেঘের মত ধীরে ধীরে
এগিয়ে আসছে। হাত দুয়েক করে লম্বা চকচকে সাদা
ছুটো বাকানো ঈশি বেরিয়ে আছে ঘুমের মুখের দু'পাশ
দিয়ে। ঘুম আসছে।

অনেকের বুক কঁপে উঠল, কিন্তু এতটুকু নড়ল না কেউ,
হুঁচোখ মেলে তাকিয়ে রইল ঘুমের দিকে। হঠাৎ
সকলের নজরে পড়ল, ঘুমেরই সেই বাকানো সাদা ঈশি
ছুটোর একটা ধরে কে যেন হাঁটছে। বৃকের থরথরানিও
বন্ধ হোয়ে গেল সকলের। অনেকে চোখও বুজে ফেলল।
এগিয়ে গেল, একে একে এগারটা হাতি ধীরে ধীরে
এগতে লাগল চং চুং টিং টাং ঘণ্টার আওয়াজ চলতেই
লাগল। হংসরাজের ঘুম না ভেঙে যায়।

ডঙ্ক খানার পাশে পৌঁছে দাঁতটা চেড়ে দিগেন বজ্রবাহন,
সেই হাতেই ধরলেন গাড়ীর কপাটখানা। পা দানিতে
একটা পা তুলে দিয়ে অনেকক্ষণ নির্বিষয় নেড়ে তাকিয়ে
রইলেন হংসরাজের মুখের দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে
হাতিটার দিকে তাকিয়ে বললেন—“মেঘলা হংসরাজ চলে
যাচ্ছে।”

মেঘলা মিনিটখানেক শুক্ক হোয়ে রইল। তারপর এক পা
এগিয়ে একেবারে গাড়ীর ওপর মুখ দিয়ে দাঁড়াল। শুঁড়টা
তুলে হংসরাজের মাথার ওপর আলতোভাবে ফেলে রাখল।
বাবু বজ্রবাহন বা উঠে দাঁড়ালো পা দানির ওপর।
কাঁধে ছিল পাট করা চাদর, তার খুঁট দিয়ে হাতিটার

হুঁচোখ মুছিয়ে দিলেন।

সবাই স্পষ্ট শুনতে লাগল

মেঘলাকে কি বলছেন

তিনি। শোক বা দুঃখ বা হাহাকার বা ঐ জাতের কোনও
ছোঁয়াচে মোচড় কিছুই নেই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে, নির্ভেজাল
ইতিহাস তিনি আঙড়াতে লাগলেন হাতিটার কুলোপানা
কানের কাছে, কান নাড়া বন্ধ করে হাতি শুনতে লাগল।

“মেঘলা, তুমি হংসরাজ আর আমি, সকলের আগে
আমরা তিনজন এসেছিলাম এখানে। তুমিই আমাদের
নিয়ে এসেছ। নয়ত আমাদের সাধ্য ছিল না এখানকার
জংগলে ঢোকার। তারপর সেই লুকিয়ে থাকার দিন-
গুলো তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছিলে। তুমি না থাকলে
বাঘ ভাঙ্কুর পেটে চলে যেতাম আমরা। কতবার
মামুষের হাত থেকেও রক্ষা করেছে আমাদের। জংগলের
জিসীমানার মামুষ এলে তুমি আমাদের জানিয়ে দিতে।
আইনের দড়ির কাঁশ কতবার তোমার জেঙ্গে কঁেদ
কিরে গেছে, আমার আর হংসরাজের গলা দুটোর
নাগাল না পেয়ে। তারপর এ দেশের সেই হুঁর্তক,
সেই গর্ভগ্রাসী ক্ষুণা, তুমিই পথ দেখালে কি করে সেই
হাঁ বন্ধ করা যায়। পুরো একটা মালগাড়ীকে লাইনের
ওপর থেকে উলটে ফেললে। উপোসী মামুষের বৃকের
ওপরে লোহার লাইন বসিয়ে লোহার কামরার মধ্যে
মামুষের খাবার জিনিষ পুরে কোথায় যে পাচার করা
হচ্ছিল, কে জানে! চোবের ওপর বাটপারি করে তুমি
বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলে মামুষগুলোকে। বৈ চ
উঠে সবাই লাগল জংগল কাটতে। একা তুমি সবাইয়ের
হোয়ে জংগলটাকে বয়ে বয়ে সাফ করে ফেললে।
তারপর লাগল চলল, বৌজ পড়ল, ঘরে ঘরে উদ্ভন
জগতে লাগল। ক্ষুধাকে দেশ ছাড়া করে চেড়ে তুমি
মেঘলা, এ দেশের মামুষ তোমার বতটা জানে, ততটা অর
কাউকে জানে না।

আর তুমি জানতে হংসরাজকে, হংসরাজ তোমার
ঘাড়ের ওপর আটকে থাকত। অনেকের ধারণাই
হোয়ে গিয়েছিল যে মেঘলা হোল এক অদ্ভুত জীব।



হাতির মত দেখতে একটা
জীবের খাড়ে একটা
মাছের গজায়, তবে তার
নাম মেঘলা হোয়ে যায়। এতদিন পরে মাছটা চলে
খাচ্ছে মেঘলা, পালাচ্ছে। অসংখ্য বার তুমি ওকে নিয়ে
সাক্ষাৎ রমের মুখ থেকে পালিয়েছ তাই এই শেষবার
পালাবার জন্মে ও তোমার কাছেই গেল। তুমি ওকে পায়
করে দিলে। কি করবে বেচারী! না পালিয়ে উপায় ছিল
না বলছি পালাল। ও যে বাধা দিতে পারেনি, একটা কথা
মুখ ফুটে বলতে পারে নি। সে এসেছিল, সে চলে গেল,
হংসরাজ আটকাতে পারেনি না। কি করবে, মুখ যে বন্ধ।
বন্ধ মুখ খোলবার সময় হয় নি যে তখনও, তাই হংসরাজ
পাখরের মত দেখলে সমস্ত। স্বকর্ণে শুনলে তার নামটা।
স্বপ্ন সে নিজের নামটা বললে, তখন হংসরাজের অবস্থাটা
কি রকম হোয়ে উঠেছিল। বুকটা কাটেনি, হংসরাজের
বুক বলছি কাটে নি, কাটবার ক্ষমতাও পায় নি। বা কেউ
কল্পনা করতে পারে না, তাই করে ফেললে আমার মেয়ে।
আমার হৃদয়ে পাওয়া মেয়েটা তার প্রাণটা বাঁচাবার দাম
দিয়ে গেল আমার। আমার একমাত্র ছেলেটাকে ছেঁয়ে
ভুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।”

বেশ কিছুটা সময় থেমে থাকলেন বক্রবাহন, মেঘলাও
ঠিক সেই ভাবে স্থির হোয়ে রইল। কোনও দিকে
কোথাও একটি প্রাণীও নড়ছে না, শুধু সেই ‘স্বপ্নপতি
রাঘব’ ভেসে আসছে ঘুমের ঘোরে থেকে। হঠাৎ মেঘলা
ফেস করে নিঃশ্বাস ফেললে হংসরাজের কপালের ওপর।
অনেকগুলো ফুল সরে গেল হংসরাজের গলার কাছ থেকে।
বাবু বক্রবাহন স্বা মেঘলার শুড়ের ওপর হাত রেখে
বলতে লাগলেন—“ছেড়ে দাও এবার মেঘলা, এবার
হংসরাজকে যেতে দাও। হংসরাজ অপেক্ষা করছিল
আমার জন্মে, আমি কিরে এলেই পালাবে। পালিয়েও
গেল, একটিবার আমার সামনে পৰ্ব্বত এল না।
তোমার কাছে গেল। তুমি ওকে পালাবার পথ
করে দিলে। দাঁও, এবার যেতে দাঁও ওকে মেঘলা।
অনেক সরেছে হংসরাজ, মুখ বন্ধ করে অনেক

সরেছে। পাছে কারও প্রাণের জয়াব দিতে হয়, তাই
কাল সেজে কাটাল শেষ বছর কটা। বাস—আর নয়।
আর ওকে কাল সেজে কাল কাটাতে হবে না। এবার
ওকে বিদেয় দাও।”

মেঘলা শুঁড় নামিয়ে নিলে হংসরাজের কপালের ওপর থেকে,
ছ’পা পিছিয়ে গেল। বক্রবাহন নেমে দাঁড়ালেন পা দানির
ওপর থেকে। একজন লোক উঠে বসল ড্রাইভারের
জায়গায়, মুহূর্তে মধ্যে ডাক জেগে উঠল। চারজন মাছের
গাড়ীর সামনে পেছনে দাঁড়াল চারটে বাতি হাতে নিয়ে।
ওখানে প্রত্যেকখানি লরির ওপর যত জন সম্ভব চড়ে বসল।
বক্রবাহন তাঁর তান হাতখানা ভুলে অল্প একটু নাড়ালেন।
হংসরাজের গাড়ী চলতে শুরু করলে। সার্বস্বদী হাতিগুলো
স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বক্রবাহনের ঠিক পেছনে খাড়া
রইল মেঘলা। হংসরাজের গাড়ী তয়ানক তাঁর দিক চলে
এগিয়ে চলে গেল।

গর্জন করে উঠল বিশখানা লরি এক সংগে, তারপর একটার
পর একটা চলতে শুরু করলে। দেখতে দেখতে শেষ লরি
খানাও নজরের আড়ালে চলে গেল। খামারের সামনের
মূল সড়কের ওপর থেকে সমস্ত গর্জনের মত একটা বোল
উঠল। বার বার একটা কথাই ভেসে আসতে লাগল
খামারের অন্ধকার আকাশে—জয় হংসরাজ বাবা—জয়।”

৷ বোল ৷

দেওয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—
টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। একখানা পাখা ঝুলছে ঘরের মাঝখানে,
সেটা ঐ ঘড়ির শব্দের সংগে তাল রেখে নিঃশ্বাস ফেলছে
হিস্ হিস্ হিস্ হিস্। সবুজ বাল্ব একটা নিঃশব্দে জ্বলছে
এ পাশের দেওয়ালে। ঘড়ি পাখা আলো—তিনটেই রয়েছে
এক লাইনে, ছাত থেকে আশ্রয় হাত দুয়েক নিচে। তার
হাত সাতেক তলার ঘরের এক কোণে একখানি খাটে-
বিছানার সংগে মিশে শুয়ে রয়েছে কে। ওরা তিনজন
ওপর থেকে পাহারা দিচ্ছে তাকে। পাহারা না দিয়ে
উপায়ই বা কি! আর এক প্রাণী যে ঘরে নাই।



অনেকক্ষণ ধরে ঘড়ির ছোট হাতখানা ছুইছুই করছিল বারটার ঘরকে, বড় হাতখানা আশ্বে আশ্বে এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেললে। তারপর বাজনা শুরু হোল, টং টং টং টং। আনিয়ে দিলে ঘড়িটা যে জেগে আছে। পাখাখানা হিস্ হিস্ করে বললে—বেশ বেশ। আলোটা কিছুই বললে না, নির্নিমেধ নেড়ে তাকিয়েই রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন যেন সান্নাটে হোয়ে উঠল তার সবুজ চাউনি, ঘড়িটা আর একটা শব্দ করে উঠল—টং, পাখাটা সভয়ে বলে উঠল—ইস্। ওরা যেন কি দেখতে পেয়েছে! খাটের ওপর যে শুয়েছিল, সে মোটে টেরই পেল না যে কোণের ছোট দরজাটি আশ্বে আশ্বে একটু ফাঁক হোল। মেঝে থেকে হাত চারেক উঁচুতে সেই দরজার ফাঁকে দেখা গেল একটি নাক, নাকের ওপর দুটো জলন্ত চোখও দেখা গেল, এক গোছা চুলও যেন দেখা গেল চোখ দুটোর মাঝখানে। সবুজ আলোর সেই নাক চোখ আর চুল-গুলোকে—কোনও রক্তশোষক জন্তুর নাক চোখ বলে মনে হোল। জন্তুটা ক্ষুধার তাড়নায় হস্তে হোয়ে উঠেছে যেন। কি থাকে। এমন কি আছে ঘরে যা খেলে ওর ক্ষুধিবৃত্তি হবে। ঘড়িটা পাখাকে সাবধান করে দিলে—টিক্ টিক্ টিক্। পাখাটা আলোকে হুঁশিয়ার করল—হিস্ হিস্ হিস্। আলোটা কিছু বলবার আগেই খুঁট করে আর এক জাতের একটু আশুয়া হোল। সংগে সংগে সান্না আলোর ঘরখানা বোঝাই হোয়ে গেল। ওরা তিনজন চমকে উঠে তাকাল ডান পাশের বড় দরজাটার দিকে। গাঢ় বাদামী রঙের ভারী একখানা পর্দা ঝুলছে। পর্দার এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কমলপ্রসাদ, দরজার পাশেই ছয়চ, ছয়চের ওপর তখনও তাঁর হাতখানা রয়েছে। কমলপ্রসাদ হাত টেনে নিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেলেন, পর্দা সরিয়ে ভবেশবাবু ঘরে ঢুকলেন। ঘড়ি পাখা আর সবুজ বালুবাটা দম কেলে বাঁচল, কোণের ছোট দরজায় যে ফাঁকটুকু দেখা গিয়েছিল, সেটুকু আর নেই। দরজাটা চেপে বন্ধ হোয়ে আছে। খাটের ওপর ছয়ে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন দেখলেন কমল প্রসাদ বাবু। তারপর ঘুবে দাঁড়িয়ে বললেন—

“কাল সেই দশটা এগারটা পৰ্ব্ব এই তাবে ঘুমিয়ে থাকবে। অনেকগুলো ইন্ডেক্স দিয়ে গেছে ডাক্তাররা। বলে গেছে, আর তুমি নেই তেমন কিছু, কাল যখন ঘুম ভাঙবে, তখন অনেকটা স্বস্থ বোধ করবে।” ভবেশবাবু বললেন—“নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, অত বড় ব্য ডাক্তাররা যা ব্যবস্থা করে গেছেন, তার ফল কি ভায়া না হোয়ে পারে। বিপদটা এবার কেটে গেল।” কমলপ্রসাদ খাটের পাশ থেকে সরে এসে বললেন—“এখন বস্ত্রবাহনবাবু বা তাঁর লোকজন কেউ এসে গেলেনই হয়। যে লোকটাকে পাঠালাম, সেও ত’ ফিরল না। এত দেরি হবার কথা নয় ত’” ভবেশবাবু বললেন—“গাড়ী নিয়ে গেছে ত’। গাড়ী বোধ হয় কোথাও বিগড়ে বসে আছে।” কমল প্রসাদ বললেন—“তা’ও হোতে পারে। যাক, আপনি শুয়ে পড়ুন গে। আমার জীকেও শুতে বলেছি। রাত দুটো তিনটের সময় তাকে তুলে দিয়ে আনি শোব। এখন ঐ ওখারের ঘরে বসে চিঠি লিখব। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপরটা ভাল করে বুঝিয়ে লিখতে হবে বস্ত্রবাহনবাবুকে। যেখানেই তিনি থাকুন, তাঁর কাছে চিঠিখানা পৌছে দিতে বলব তাঁর কর্মচারীকে। কর্মচারী একজন নিশ্চয়ই আসছে। এতবড় খবরটা পেয়ে কিছুতেই তারা চুপ করে থাকবে না।” ভবেশবাবু বললেন—“কেউ এলেই ত’ বাঁচা যায়। উঁরা যদি তাঁদের মেয়েকে নিয়ে যান, আমদাও চলে যেতে পারি। সরসুও সেই কথা বলছিল।” কমলপ্রসাদ একটু আশ্চর্য হোয়ে পড়লেন যেন। বললেন—“সে কি! কস্তুরীর ঠিকানা পাওয়া যাবে, কস্তুরীর সংগে—” ভবেশবাবু বললেন—“থাক কস্তুরীর কথা। বস্ত্রবাহন বাবুর মত সম্মানী লোকের মেয়ে যে কস্তুরী তাঁর জন্তে পাগল হোয়ে ঘুরছে না সরসু। কস্তুরীর নেশা তার ছুটে গেছে।” কমলপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ সাঁয় দিলেন। বললেন—“বাঁচা গেছে কে জানে বাবা ওদের সত্যিকারের পরিচয়



ময় ব্যাপার ত'। কেমন মেয়ে, মেয়ের মা কোথায়, এ সমস্ত পরিচয় নেবারও উপায় নেই। কে যাচ্ছে, এ সব জিজ্ঞাসা করতে মেয়ের বাপের কাছে। বড় মাহুকের বড় বড় কাণ্ড, ওর ভেতর মাথা গলাতে আছে।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরখানা, সাদা আলোটা নিতে গেছে। বাবার সময় কমল প্রসাদ সেটা নিভিয়ে দিয়ে গেছেন। ঘড়িটা আর একবার আগুয়াজ করল টং। পাখা চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠল ইস্। অর্ধাং-চুপ, একটুও শব্দ কোর না। সবুজ বালুব বাদামী রঙের পর্দাখানার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল। পর্দাখানা একদিকে একটু ফাঁক হোয়েছে, সেই ফাঁকে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ছায়াটা পর্দা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। ভয়ানক ক্লান্ত মাহুকের ছ'খানা হাত বে রকম নেতিয়ে পড়ে থাকে ছ'পাশে, ছ'কাঁধে যেভাবে চালু হোয়ে বৈকে যায়, মাথাটা যেমন সামান্য একটু ঝুঁকে থাকে সামনের দিকে, সেই রকম অবস্থায় বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ছায়াটা। তারপর পা টেনে টেনে শরীরটাকে কোনও রকমে বয়ে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হোল খাটের পাশে। খাটের কিনারায় হাত ছ'খানা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনে। যেন বাঁচল এবার, ছ'হাতের ওপর দেহটার তর রেখে দাঁড়াতে গিয়ে বাঁচল।

হঠাৎ ঘরখানা ফিসফিসিয়ে উঠল, ভয়ানক চেঁচার কলে সামান্য—তিনটি কথা বার হোল কার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে—“আমি চলে যাচ্ছি।”

আর মিনিট খানেক দম বন্ধ করে রইল ঘরখানা। তারপর আবার সেই রকম তিনটি কথা জম্মলাভ করল—“আমায় কমা কোর।”

বিছানার কিনারা ছেড়ে বহু কষ্টে সোজা হোয়ে দাঁড়াল

কি! বজ্রবাহনবাবুর ও-রকম সন্তেরে গণ্ডা মেয়ে আছে হয়ত। সবই রহস্য-

সেই ছায়া মূর্তি, আরও কাঁপ আরও মূঢ়ে যাওয়া কষ্টে শেষ তিনটি কথা উচ্চারণ করলে সে—“আমায় ভুলে যেও।”

তারপর ফিসফল, তারপর পা ঘষে ঘষে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মাথাটা হুয়ে আছে, খুঁচনিটা ঠেকে গেছে বুকের সংগে। অস্তিম চেঁচার দেহটাকে টেনে আনছে।

ঘড়িটা টিক টিক করছে না আর, পাখাখানা ঘুরতে ছুলে গিয়ে স্তব্ধ হোয়ে আছে যেন, সবুজ আলো কালো হোয়ে উঠেছে। ওরা সব রক্ত নিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছে সেই কোণের দরজাটার দিকে। সেটা আস্তে আস্তে খুসছে।

ঘরের মারামারি এসে দাঁড়াল সেই ছায়ামূর্তি, ওপর দিকে মূখ ভুলে বুক ভরে হাওয়া টেনে নিলে। তারপর মূখ নামিয়ে পা টানতে লাগল আবার।

কোণের দরজাটা যেটুকু ফাঁক হোয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল আর একটা ছায়া। অনেকটা চাবুকের মত দেখতে-ছায়াটাকে, চাবুকের গোড়া আর, ভগ্না মূঠোর মধ্যে ধরে প্রস্তুত হোয়ে আছে যেন অদৃষ্ট হাত একখানা, হাতখানা চালানোই চাবুকটা সপাং করে উঠবে।

বাদামী রঙের পর্দাখানা আর মাজ পাঁচ-ছ হাত সামনে। অনেকটা পথ, খাট আর দরজার মাঝখানে ক্ষুদ্র ব্যবধান। অর্ধেকটার বেশী পার হোয়ে এসেছে বেচারী, আর বৃষ্টি পারলে না।

না, আসছে, ঠিক আসছে একটু একটু করে, ঠিকই সরে আসছে।

নিঃশব্দে একটা আগুয়াজ হোল—সপাং, কোণের দরজায় সামনে থেকে চাবুকখানা চালানো হোয়ে গেছে। নিমেষের মধ্যে সেখানে পড়ল এসে-এর পিঠের ওপর। ঘরের আলো-আঁধারি অন্তরটা কেটে চৌচির হোয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড ভারী লোহার জাঁতা আধ পাক ঘুরে খেমে গেল, যেন হঠাৎ লোহার ওপর লোহার ঘর্ষণ লোহার দ্বন্দ্ব চিহ্ন মেরে উঠল।

তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে টেঁচিয়ে উঠল কে—“কি হোল।”

আর একটা অর শোনা গেল সংগে সংগে—“কৈ কোথায়।” পর মুহূর্তেই ঘরটা তেলে গেল আলোর বজ্রায়। পর্দার এধারে কমলপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন।

“ঐ যে—” চিৎকার করে উঠলেন কমলপ্রসাদ, তাঁর গলার আঁগড়াটো মেলাবার, আগেই কোণের সেই ছোট দরজার চৌকাঠ পার হোল যেন কে। ঠিক যেন এক কাপটা কালো হাওয়া ঢুকল ঘরখানার মধ্যে। কমলপ্রসাদও হাওয়ার বেগে ছুটে গেলেন সেই দরজার সামনে। হুঁহাতে দরজার হুঁপাশে ধরে আঁতলাদ করে উঠলেন—“আঃ—আঃ—আঃ—”। তাঁর হাত হঠক সামনে একটা জানলা, জানলার ঠিক নিচেই হাত মুখ ধোওয়া বেসিনটা আটকানো রয়েছে। কমলপ্রসাদ চোখের পাতা ফেলবার অবকাশ পেলেন না, সেই বেসিনের ওপর হুঁহাতের তর দিয়ে হিটকে উঠল একটা মৃতি ডানলার ওপর, সংগে সংগে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

অনেক নিচে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার আগের মূহুর্তে, গাড়ী থেকে এক ব্যক্তি মাথা তুলিয়ে বেরিয়ে সবে মাত্র সোজা হোয়েছে, কি একটা নামল যেন তার মুখ ঘেঁষে। খুব ভারী কি একটা যেন আছড়ে পড়ল হুঁহাত সামনে। গাড়ী থেকে যে নামল তার গলা থেকে একটা ভরাবহ আঁগড়া বার হোল

বাদামী রঙের মোটা পর্দাখানা আড়ষ্ট হোয়ে আছে। মেঝের ওপর সূতিয়ে পড়া একটা দেহকে জড়িয়ে ধরে এক ব্যক্তি উন্মাদের মত তাকিয়ে আছে পর্দাখানার দিকে। সে চাউনিতে শোক নেই, হুঃ নেই, সর্বস্ব খোয়া যাবার দরুণ যে সর্দনাশা ভাবা ফুটে ওঠে মাহুঘের চোখে, সেই জ্বাভের বোবা ব্যকুলতাও ফুটে ওঠেনি সেই দৃষ্টিতে। সে চাউনি নির্ভেজাল অর্ধহীন “নিয়তির সংগে অবিরাম যুঝতে যুঝতে নির্দয় নির্বন্ধের করাল গ্রাসে যখন পড়ে কেউ, তখন বোধ হয় ঐ জ্বাভের নিঃসীম নিঃস্পৃহতা স্থির হোয়ে থাকে তার চাউনিতে। সেই চাউনির সামনে যে পর্দাখানা ঝুলছে, আতঙ্কে সেখানার বর্ষ ছাইয়ের মত হোয়ে উঠেছে। আড়ষ্ট হোয়ে আছে পর্দাখানা, কি জানি কে আবার আসছে পেলন থেকে।

অবশেষে অবসান হোল প্রতীক্ষার, পর্দাখানা চমকে উঠে

এক পাশে সরে গেল।

নিঃশেষে একজনের পরে একজন ঘরে ঢুকতে

লাগল। প্রথমে কমলপ্রসাদ, তাঁর পেছনে বাবু বক্রবাহন বা. প্রহেলিকা, তারপর গুরুবোক্তম, সর্বশেষ অগৎরাম। ঘরে ঢুকেই বক্রবাহন বলে উঠলেন—“কে! ভবেশবাবু না!”

কমলপ্রসাদ নিতান্ত উচ্চারণ করার মত করে উচ্চারণ করলেন—“ভবেশ বাবু, ইনিই বাবু বক্রবাহন বা।”

আরও এক মিনিট সেই একভাবে তাকিয়ে রইলেন ভবেশ বাবু পর্দাখানার পানে। তারপর সরস্বতীসদৃশ ছেড়ে মেঝের হাতের তর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অশ্রুমনস্কের মত বাড়িবাড়ি করে বললেন—“বক্রবাহন বাবু—তা’ বেশ, তা’ বেশ। এসে পড়েছেন তা’হলে—তা’ বেশ তা’ বেশ। বজ্র দেয়ি হোয়ে গেল না! তা’ বেশ তা’ বেশ ত’। এবার আমরা ছুটি পেলাম। এবার আমরা চল যাব।” বলতে বলতে তিনি ঝুকে পড়লেন সরস্বতী ওপর। পাছে কেউ তনতে পায়, পাছে সবাই টের পেয়ে যায়, এই ভয়েই যেন মুখখানা আড়াল করে লুকিয়ে ডাকতে লাগলেন সরস্বতীসদৃশ।

“এই, এই সরস্বতীসদৃশ। ওঠ না, উঠে পড় শিগগির। তাড়াতাড়ি পালাই চল। উনি এসে পড়েছেন। আমরা ছুটি পেয়েছি। আঃ, কি মুশকিল দেখ দিকি! এখন কি পড়ে থেকে সময় নষ্ট করতে আছে।

বাবু বক্রবাহন বা এক পা সামনে এগিয়ে গেলেন। সরস্বতীসদৃশের দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক হেঁচক গলায় বলে উঠলেন—“শুনতে পাবে না। ও আঁঘ আপনার ডাক শুনতে পাবে না ভবেশবাবু, কারও ডাকই আর ওর কানে যাবে না।”

সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তখন বাবু বক্রবাহনের দিকে। ছুনিয়ার সব থেকে ভয়ঙ্কর বাকটা ভয়ঙ্করভাবে উচ্চারণ করলেন—“কেন?”

বক্রবাহন জবাবও দিলেন না, ফিরেও তাকালেন না, এক ভাবে সরস্বতী দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভবেশবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন—“কেন শুনে না? কেন? তোমার হৃদয়ে নাকি? তুমি মন্ত বড়



লোক বলে তোমার হৃদয়
শুনতে হবে ওকে? জান,
কার ছেলের সংগে কথা

বলছ তুমি? জান ওর পরিচয়? সবুর কর তা'হলে, এই
রাতটা সবুর কর। আমি ওর বাবাকে খবর পাঠিয়েছি, সে
খবর এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ঠিক জায়গায়। আসছে ওর
বাপ, নির্ধাৎ এসে পড়বে কাল সকালেই। তখন জানবে
তুমি, ও কার ছেলে। তখন বুঝতে পারবে তুমি, তোমার
মত মাহুষের মেয়ে ওর পায়ের নখ ছোঁবার যোগ্য নয়।

বক্রবাহন মুখ তুলে কি যেন বলতে গেলেন, একখানা হাত
তুলে ভবেশবাবুর হাত ধরতে গেলেন বুঝি। বিদ্যুৎবেগে
একধারে সরে গেলেন ভবেশবাবু, বজ্রাঘাতের মত একটা
আওয়াজ করে উঠলেন—“খবরদার”। আওয়াজটা করার
ফলে তাঁর সমস্ত শক্তিত্বই নিঃশেষ হয়ে গেল। খেঁকী
কুকুরের মত বাঁড় খেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে চোখের কোণ দিয়ে
পাহারা দিতে লাগলেন বক্রবাহনকে। একটু নড়লে চড়লেই
বা একটু আওয়াজ করলেই আবার খেঁক করে উঠবেন।

বক্রবাহন বাবু তাঁর দিকে আর তাকালেন না। সরযুপ্রসাদের
দিকে তাকিয়ে সরযুপ্রসাদকেই বলতে লাগলেন—“দেঁরি
হোয়ে গেলরে। বড় দেঁরি হোয়ে গেল। কি করব।
ভবেশবাবুর সংবাদটা যে অনেক জায়গা ঘুরে গিয়ে পৌঁছল।
কি করব বল। জন্মদাতা বাপ হোয়ে সব চেয়ে বড়
শত্রুতাটা করলাম তোঁর সংগে। তুই তোঁর বাপের পরি-
চয়টাও জেনে যেতে পারলি না।”

ঘরের ভেতরটা হঠাৎ যেন কুঁকড়ে যেতে লাগল। প্রত্যেকটি
প্রাণী দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল বক্রবাহনের দিকে। তিনি
তাঁর ছেলেকেই আশে আশে বোঝাতে লাগলেন—“জন্ম
থেকে শুধু ঠকালি বাবা, ঠকবার জন্মেই জন্মেছিল শুধু
ঠকেই গেলি। জন্মাবার পরেই চোঁরে চুরি কবলে তোকে,
তোঁর মা জানল তুই মরে গেছিস। চার বছর পরে একটা
মেয়ে বিয়েয়ে তোঁর মা যখন ম'ল, তখন তোঁর দয়া করে
তোকে ফিরিয়ে দিলে।”

এতক্ষণ হুঁ চোঁট চেপে কাঁঠের মত দাঁড়িয়েছিল প্রহেলিকা।
হঠাৎ তাঁর মুখ কসকে বেরিয়ে গেল—“কে সে?”

বক্রবাহন ছেলের দিকে তাকিয়েই বলতে লাগলেন—
“আমার কাকা লছমীনারায়ণ। বস্তুর অগবন্ধু মিশ্রীর
মেয়েকে বিয়ে করলে তাঁর ভাইপো, তাই তিনি বেপে
গেলেন। ভাইপো যখন বিষয় সম্পত্তির পরোয়া না করে
সেই বউ নিয়ে সংসার পাতলে তাঁরই বস্তুর ঘর ভাড়া নিয়ে,
তখন তিনি খুবই একটা মামুলী ধরণের আশা নিয়ে বসে
রইলেন। দু'দিন ফুঁটি করছে ভাইপো, কক্ষ না।
সখ মিটে গেলেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে। ভাইপোর
সখ কিন্তু সহজে মিটল না। তারপর ঐ ছেলে জন্মাল।
ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন কাকা, ছেলেটিকে হাসপাতাল
থেকে সরিয়ে ফেললেন। ওর বদলে একটা মরা ছেলে
নিয়ে স্থানে পুঁতে রেখে এলাম আমি। ওর মা কান্দতে
কান্দতে ফিরল। কাকা আমার সাধু মাহুষ ছিলেন, সাধুর
আবার দুর্জয় বংশ মর্যাদা জ্ঞান ছিল। ছেলেটিকে বিনাশ
না করে মিশনারিদের কাছে দিয়ে দিলেন। বস্তুর মেয়ের
পেটে জন্মেছে বটে, কিন্তু বংশধরের বংশধর ত'। একই
রক্ত, কাজেই মারেন কেমন করে। চার বছর পরে
আবার হাসপাতালে গেল ওর মা। সেবার কাকা আরও
পাকা ব্যবস্থা, করে রেখেছিলেন, ওর মাকেই সরিয়ে
ফেললেন হাসপাতাল থেকে। বেলা চারটের সময় দেখে
এলাম, বেশ ভাল আছে। পরদিন আবার সেই চারটের
আগে ত' যেতে পারি না। তোঁর থেকে দু'টো পর্ষন্ত
চাকরি করে তবে ত' যাব। তখন যে দম্বর মত সংসারী
মাহুষ, চাকরি করছি। চারটের সময় গিয়ে শুনলাম,
মরে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যার পরে শেট কেটে
একটা মেয়ে বেশ করেছে। তারপরই, মেয়ের মা-টা
মরে গেছে। তা'হলে দাও মরাটা, পোড়ানো যাক।
মরা একটা দিলে। হ্যাঁ, একটা মেয়ে মাহুষই বটে,
আর ওর মায়ের মতও বটে। দেহটা কেটে কুটে এমন
করে ফেলেছে, যে চেনবার উপায় নেই। তাদের নাকি
সম্মেহ হোয়েছিল, বিষ খাওয়ানো হয়েছে। তা'
তাই সই, সেই মরাকেই পুড়িয়ে এলাম। ইতিমধ্যে
মেয়েটাকেও সরিয়ে ফেলেছেন কাকা। হাসপাতাল-
ওয়ালারা পড়ল ফ্যাসাদে, মেয়ে বেঁচে আছে বলেছে,



র ত' দিতে হয় একটা। দিলে একটা ঘেয়ে।
দপানা মুখ করে সেই সেই মেয়েকেই বাঁচাবার জন্তে
ঠাণ্ডে লাগলাম। তার কিছু দিন পরেই কাকা
গন। মরবার আগে তাইপোটিকে ভেঙে কবুল করলেন
তিনিই আগের ছেলেটিকে সরিয়ে কেলেছেন। ছেলে
নারীদের কাছে মাহুষ হচ্ছে। ছেলের মা যখন
ছে, তখন আর ছেলে আনতে আপত্তি নেই। বস্তীর
র পেট থেকে বেরিয়েছে, এটা না জানলেই ছোল।
শেক সাবধান করে গেলেন কাকা, খবরদার—ছেলে
শিছুতে না জানতে পারে, কার পেট থেকে সে
রিয়েছে, তা'হলে তাঁর বংশ মর্যাদার গায়ে দাগ লাগবে।
তার কিছু একটা খটকা লেগে গেল, তা'হলে বোধ
বউটাও বেঁচে আছে। সম্পত্তি তখন হাতে পেয়েছি।
গা ধরচা করতে লাগলাম। কাকার টাকা খেয়েছিল
'তাদের ভেতর ছ' একজন আমার টাকা খেয়ে
র টাকা'র সঙ্গে নিমকহারামি করলে। তারপর
ম ঐ হংসরাজকে, ও তখন বুধন মাকী ছিল।
নোকোত্তেই পেট কাটা বউটাকে পাচার করা হোয়ে-
। মাহুষের শয়তানির ফিরিস্তা শুনে নোকোথানকে
তুলে রেখে ও আমার সঙ্গে যোগ দিলে।
টাকেও আর একমল মিশনারির হাতে দিয়ে দিলাম।
মেয়ের জন্তে টাকা কড়ির ব্যবস্থাটা পাকা কর-
। ভবেশবাবু-বাবা ছিলেন কাকার উকিল।
বাবু তখন সব পাশ করে বেড়িয়েছেন। ও
ই এমন যে ও বংশে কেউ কখনও বেইমানি
পারবে না। ও'র হাতেই ছেলের টাকাগুলো
গেলাম। কোথা থেকে একটা বাচ্চা কুড়িয়ে
ল এক বুড়ি, সে তার সম্পত্তি সব দিয়ে গেল
াচ্চাকে। ভবেশ বাবু তাই জানলেন, ও'র দসিলেও
লখা আছে। মেয়েটার টাকাগুলো জমা রাখলাম
শস্ত্রারি কাদারের কাছে। মেয়ে সাবালিকা হোলে
তারপর কামরূপবাক্যে ঝাঁপ দিলাম ছেলে
যাকে খুঁজে বার করার কাজে।
ন খামলেন। হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেললেন

তার গল্পের। খেমে গিয়ে
অন্তত তাবে প্রহেলিকার
মুখের দিকে তাকালেন।
প্রহেলিকা সে চাউনি দেখতেও পেল না, সে তখন ভয়ানক
অজ্ঞমনস্ক হোয়ে সরস্ব দিকে তাকিয়ে আছে।
হঠাৎ ভবেশ বাবু কথা বলে উঠলেন। সরস্ব দিকে
তাকিয়ে বিষয় উত্তেজিত কণ্ঠে চাপা চিৎকার করে
উঠলেন—“দেখলি, দেখলি ত' এখন, বলেছিলাম না, তোরা
বাবা যা তা মাহুষ নয়।”
ঘুম থেকে জেগে উঠল যেন প্রহেলিকা। সত্য জেগে
উঠে যে তাবে কথা বলে মাহুষ, সেই তাবে জিজ্ঞাসা
করলে—“তারপর। বউকে পাওয়া গেল?”
সময় লাগল বস্ত্রবাহন বাবুর জবাব দিতে। বেশ
কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিন্তে নিরীক্ষণ করলেন তিনি নিজের
হুঁধানা হাতের দশটা আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলো কয়েকবার
মুড়লেন মেলালেন, এপিঠ ওপিঠ উলটে কি যেন পড়বার
চেষ্টা করলেন আঙ্গুলগুলোর গায়ে। তারপর সজোরে
মাথাটা নাড়ালেন হুঁপাশে কয়েকবার। নাড়িয়ে খুব কেটে
কেটে উচ্চারণ করলেন—“পাগল! যে মরে গেছে তাকে
কি ফেরৎ পাওয়া যায় কখনও—পাগল!”
একটা ঝাঁকানি খেল যেন ভেতর থেকে প্রহেলিকা, ধাক্কা
সামলাবার জন্তেই বোধ হয় সে মুখ নামিয়ে ফেলল।
কমলপ্রসাদ এতক্ষণ পরে খুবই শাস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন
একটি—“বাপের পরিচয়টাও পেল না সরস্ব—কেন?”
বস্ত্রবাহন নিজের হাত হুঁধানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—
“এই হাত হুঁধানার একটা উজ্জট খেয়াল চেপে গেল।
দেখতে হবে, হাসপাতালে যারা কাজ করে, হরদয় মাহুষের
রক্ত নিয়ে ঘাটিঘাটি করে যারা, তাদের রক্ত লাগ সাপ
না কালো পরীক্ষা করে দেখা চাই।
হাসপাতাল থেকে বউটা উধাও হোয়েছিল যে তারিখে,
সেদিন তার আগের দিন তারও আগের কয়েকটা দিন
যারা ডিউটি দিয়েছিল, তাদের নামগুলো যোগাড় করা
গেল। ডাক্তার নাস' কি মেথর কম্পাউণ্ডার মিলি।
সে এক মস্ত ফর্দ। আমি বলেছিলাম—বাতাই করা



হোক। স্বর্গীয় রক্ত চাট-
বার মত লম্বা জিত
বাদের, তাদের বেছে বার

করে জিতগুলো উপড়ে নেওয়া থাক।

বুধন রাজী হোল না। ও মাঝী মাছ, মাঝীর মত
করে বুধলে। বললে—“কোন দায় পড়েছে আমাদের
বেগার খাটবার? আমরা কি সরকারের মাইনে খাচ্ছি?
নৌকোর যখন যাত্রী তুলি, তখন কে ভাল কে মন্দ
বাছতে বাই নাকি? যাত্রী হোল যাত্রী, একধার-ছে
লব পার করতে হবে।

তাই-ই হোল। আর অতগুলো মেয়ে পুরুষকে সেই
রক্তের নদী পার করতে এই হাত ছুঁধানার ছোপ ধরে
গেল। ছোপ ধরা হাত নিয়ে ছেলের সামনে বাই
কেমন করে! ছেলেটা যদি তবু পেয়ে যেত।”

তবেশবাবু খীরে খীরে ছয়ে ডান হাতখানা সরস্ব-
শিঠের ওপর রাখলেন। তারপর সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে
হাতখানা নিজের মুখের সামনে তুলে ধরে বলতে
লাগলেন—“কিন্তু, এও যে লাগ! এও যে রক্ত! এই
ত’ আমার হাতে ছোপ ধরে গেল। কেন ধরল?
সরস্ব রক্ত কেন লাগল আমার হাতে?”

বক্রবাহন বললেন—“এই ভয়টাই করেছিলাম। খুনকা
বদলা খুন—এ কথাটা বলার হক সকলেরই আছে। খুনকা
বদলা খুন,—এই কারবারটি যতই লাভের কারবার
হোক, ওটা আমার একচেটে কারবার নয়। যে পরিমাণ
খুন আমি আদায় করেছি ওর মায়ের মৃত্যু হিসেবে,
তার বদলে যদি আবার খুনের দাবি ওঠে! আমার
খুন ওর শরীরে রয়েছে, এই কথাটা জানতে পেরে যদি
কেউ ওর খুনই নিতে চায়! এই ভয়েই সাবধান
হোয়েছিলাম। নাই বা জানল ছুনিয়া ও কার ছেলে,
না জানতে পারলে আমার খুনের জন্তে ওর খুন কেউ
দাবি করবে না।”

ছম করে বলে বসল পুরুষোত্তম—“তা’ ত’ করেনি।”

বাধ্য হোল সবাই পুরুষোত্তমের দিকে তাকাতো। বাঁ হাতে
নিজের কপালখানা ঘষতে ঘষতে পুরুষোত্তম বললে—

“চিনতে পেরেছি ওকে। ভাগ্যে মুখখানা ওর বৈতে গে.
ভাগ্যে মুখ খুঁড়ে পড়েনি! মুখের দিকে তাকিয়েই সম
উঠলাম, তারপর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ভাল ব
দেখলাম। ঠিক দাগ আছে, চারটে আঙ্গুলই ছুঁড়ে রয়ে
শুকিয়ে মরেই গেছে আঙ্গুলগুলো। মরবেই, একবা
ত’ নয়, পাঁচ সাতবার সেই ভারী শাশীখানা পড়েছিল
লোহার আঙ্গুল হোলেও থাকত না।”

বক্রবাহন ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে পড়লেন। কিসকি
করে ছুঁবার উচ্চারণ করলেন—“আঙ্গুল! আঙ্গুল।” যি
যেন তিনি খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন নিজের মনে
মধ্যে। দম নিয়ে পুরুষোত্তম নিজের বক্তব্য বলে যে
লাগল—“আমায় খুন করার জন্তে এসেছিল ওই ছোকরা
তুল করে ফেলেছে, এই ঘরে—আমারই থাকার কথা
কোনও রকমে জানতে পেরেছিল, এই ঘরে আমার ব
রয়েছে। তাই—”

কমলপ্রসাদ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—“জানতে পারবে
কেন? আজ সকালেই ত’ এসেছিল ও বলাই ভাস্কর-
সংগে। ভাস্করের ব্যাগ বস্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে এল, ব্যাৎ
বাঁধবার সময় জিনিষপত্র ভাস্করের হাতে যুগিয়ে দি-
আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ভাস্করকে, তাঁর
কম্পাউণ্ডটি গেল কোথায়। ভাস্কর বললেন,
মানুষ হরদম ঘুঁতে পারে না তাই ঐ ছোকরাকে নিধেচে
দশ বাম দিন আগে এসেছে কলকাতা থেকে, কামকর্ম
নেবার খুবই আগ্রহ আছে।”

পুরুষোত্তম বললে—“তা’হলে ঠিকই হোয়েছে। অ-
বউকে দেখে ভেবেছে আমিও নিশ্চয়ই আছি এখা
আমার বদলে সরস্বাবু যে থাকবেন এ ঘরে, ধারণা ব
পারেনি। পিঠে ছোঁরা বসিয়েছে, মুখখানাও ভাল
দেখেনি। চিনতে পারবে কেমন করে।”

বক্রবাহনবাবু বা খুঁজছিলেন, তা যেন পেয়ে গেলেন হ’
মুখ তুলে তাকালেন বিছানাটার দিকে। কি যেন
ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে।
সময় তাকিয়ে রইলেন ব্যাণ্ডুজ জড়ানো মুখখানির
তারপর খুঁকে পড়ে চাদরের ভেতর হাত দিয়ে



একখানি হাত বার করে অজুগলো মন দিয়ে
গলেন। যা আশা করেছিলেন, তা' যেন খুঁজে

। সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলেন হাতখানি, ঢেকে

গর টেনে, দিয়ে অজুগলোর চাঁদর—সরিয়ে আর
হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন।

একটা চাপা ছংকার পোনা গেল। ঘর ছুঁ

দৃষ্টে দেখছে ব্যাপারটা। বজ্রবাহন হাতখানিকে

বেধে ফিরে এলেন পুরুষোত্তমের সামনে।

বক শব্দ শুনে বললেন—“ওর আজুলগুলোও—

খঁতলে গিয়েছিল পুরুষোত্তম বাবু। হঠাৎ মনে

গ, এই খঁতলানো আজুলগুলো ছুঁই আমি ওকে

ম। হংসরাজ কি একটা গাছের পাতা বেঁটে

দিয়েছিল। মনে করেছিলাম, গাড়ী থেকে পড়ার

জুলে চোট লেগেছে। হংসরাজ বিশ্বাস করেনি।

চৌরটার চোট লাগল না, শুধু আজুল কটা খঁতলে

‘মারও কেমন সম্বন্ধ হয়েছিল।’

ম বলে উঠল—“কি আশ্চর্য কাণ্ড। ওর আজুলগুলো

লাকে। সেই ছোকরার আজুলগুলো খঁতলেছি

লাতখানা আনলার নিচের খরে কাঁচের শার্শাখানা

র তুলেছি ওপর দিকে আর ছেড়ে দিয়েছি।

ক সন্ত শব্দ ছোকরার, একটিবারও টু শব্দও

কিন্তু ওর আজুলগুলো খঁতলানো কেন।’

বললেন—“আশ্চর্য হবার কিছু নেই পুরুষোত্তম

ই হোল দুনিয়ার নিয়ম। ভারী সৌখিন নিয়ম

ট করে খুঁজে পায়—কার বুকের মধ্যে কোন

বসেয়ে মূল্যবান। খুঁজে পেয়ে সেই জিনিষটিকে

নয়। নয়ত মাছব কাবু হবে কেন? এই

না থাকলে দুনিয়ার কি বিপদ ঘটত তবে

র শক্তি আছে, সে মনের আনন্দে শত শত হাত

ডাঙা। বুধন মাঝীরা হংসরাজ হবার জন্মে

। পরোয়া না করে এক ধারসে ঘাড়ী পার

র আমার কাকার মত মাছব ধারা, ধানের

বংশমর্যাদার বিষে নোল হোয়ে থাকে, তাঁদের

মরিসে মাছবের গলা কামড়ে লাল রক্ত পান

করে তুফা মেটাতেন।

এ মেটেটার হাতখানা যে

কা র থে খে ত লে ছে,

আমার ছেলেটার এই রক্তস্রোত ঠিক সেই কারণেই বইছে।

নিজের বউটির বেহুখানি হাত আছে, তা' কি এর আগে

জানতে পেরেছিলেন আপনি? আমার কি ধারণা ছিল,

আমার ছেলের রক্ত অত লাল।’

থেমে গেলেন বজ্রবাহন বাবু। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে

রইলেন ছেলের দিকে। একটা বক্তের ধারা আশ্বে আশ্বে

এগিয়ে চলেছে মেঝের ওপর দিয়ে। বরকের মত সাদা

মেঝের গাঢ় লাল রক্ত, বড়টা ভারী চমৎকার খুলেছে।

বজ্রবাহন সেই অক্লান্ত লাল রক্তটার দিকে তাকিয়ে থাকতে

থাকতে আত্মগত ভাবে বললেন—“চমৎকার কম্বিটা কিন্তু

বার করেছিলেন মাথা থেকে পুরুষোত্তম বাবু। শার্শা

দিয়ে হাত ছেঁচে দেওয়া, কি চমৎকার বুদ্ধি। এই শার্শার

কল্যাণে এই মেয়েটিকে আমি ছুড়িয়ে পেলাম। ওকে

কাদতে দেখে মুখ ফসকে বেড়িয়ে গেল—কেন না, কারা

সইতে পারি না আমি। তোমার মত মেয়ে ছিল একটা

আমার, মেয়ের নাম ছিল কস্তুরী। সে মেয়েটাও গেল,

আমি কাদিনি। শুনে ও বলে ফেললে—আমার নামও

কস্তুরী। এই কস্তুরী রইল খামারে, আমাকে বেড়িয়ে

পড়তে হোল। সরস্বতীসাদ ছুটে গেল কস্তুরীর খোঁজ

পেয়ে। আসল কস্তুরী যা করত, নকল কস্তুরীও তাই

করলে। সরস্বতীসাদকে বাঁচাবার জন্মে খামার ছেড়ে চলে

এল। সবই ঘটল সেই হাত খঁতলা করার যন্ত্র শার্শাখানার

কল্যাণে। জুখার্ট শার্শা এখান পর্যন্ত তাক করে এসে ধরে

ফেললে। আর এই শার্শার ভেতর দিয়ে নজর কেলে আজ

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার ছেলের রক্ত কত লাল।’

কমলপ্রসাদ বাবু অকস্মাৎ চিংকার করে উঠলেন—“কিন্তু

সেই কস্তুরী। কস্তুরী গেল কোথায়।’

বজ্রবাহন জবাব না দিয়ে এক ভাবে ছেলের দিকে

তাকিয়ে রইলেন।

আর একবার টেঁচিয়ে উঠলেন কমলপ্রসাদ—“কস্তুরীও

নেই তা'হলে।’



এই প্রথম কথা বললেন
জগৎরাম। ঘরে পা দিয়েই
পর্দার সংগে মিশে তিনি

মানবার দরকারও নেই। জগৎরাম নতুন মনিব
নতুন মনিব চলেছেন নিজের জায়গায়।
সব ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ব্যস্ত হোরে উঠে

দাঁড়িয়েছিলেন, এই প্রথম তাঁর বা ফুটল। মনে হোল,
আঙনের হলকা বেরল তাঁর মুখ দিয়ে। বললেন—“নেই।
সরযুপ্রসাদ তাঁর মায়ের ভাই জানতে পেরে গায়ে পেট্রল
ঢেলে আঙন লাগিয়ে দিলে।”

বই করে ঘুরে দাঁড়ালেন বজ্রবাহন, তাঁর দুই চোখ থেকে
পেট্রলের আঙন ছিটকে পড়ল জগৎরামের মুখের ওপর।
জগৎরাম মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আগতোক্তি করলেন—
“বাও—আর আমি তোমার ভয় করিনা।”

ধেগে গিয়ে বজ্রবাহনও বললেন—“করুক গে, বার বা খুশী
হয় করুক। আমাকে আর মানছে কে।”
অভ্যন্তর জগৎরামের ভিতরই বজ্রবাহন রইল। সরযুপ্রসাদকে
তখনই তিনি খামারে নিয়ে যাবেন। খামারের যে ঘরখানায়
গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়েছে বজ্রবাহন, ঠিক সেই ঘরেই সরযু
প্রসাদ পুড়বে। তারপর সেখানে বানানো হবে এক
মন্দির। মন্দিরের কোনও দরজা থাকবে না। চতুর্দিক
একেবারে নিশ্চর হবে মন্দিরটির। খামারের লোক
জানবে, তাদের খামারের মালিক তাঁর বউটিকে নিয়ে ঐ
মন্দিরের বাস করছেন। খামারের সব মানুষ ঐ মন্দিরের
চতুর্দিকে দেওয়ালির রাজে হাজার হাজার দাঁপ জালাবে।
তুনে কমলপ্রসাদবাবু চিংকায় করে উঠলেন—“আলবত্ত,
ঠিক ঐ ভিনিষটি হওয়া চাই। সরযুকে আমি এমন ছেড়ে
দেব না।”

তবেশবাবু নিতান্ত দীন ভিখারীর মত হাউমাউ করে
উঠলেন—“তা’লে। তা’হলে আমি কেন ফিরে বাব।”
জগৎরাম ছুটে এসে তাঁকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—
“কে বলেছে, আপনি ফিরবেন? কে বলেছে আপনাকে,
সরযু আপনার কাছ ছাড়া হোরে থাকবে?”
হাল ছেড়ে দিয়ে বজ্রবাহন বললেন—“করুক গে, বার বা
খুশী হয় করুক। আমার আর মানছে কে।”

ঘড়িটা ময়ে গেছে ঘন, একটু শব্দও শোনা
পাখাখানা বন্ধ করে গেছে কে, আলোগুলোও নি
একটু ক্যাকাশে আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে
পাশের জানালার কাঁক দিয়ে। নিশ্চিন্তে ঘুম
জানতেও পারল না বেচারী যে সরযুপ্রসা
খামারেই ফিরে চলল। খাটের কিনারা
গড়া মূর্তি একটি আলগোছে ঠেকে রয়েছে,
তাকিয়ে আছে জজ্ঞাতার মুখের ওপর। মুখ মা
কিছুই নয়। শুধু দু’খানি টোট, তার ও
তারপর একটু একটু পাতলা চামড়া ঢাকা
চামড়ার তলার খুব কালো খুব ঘন পল্লব।
লেপটে বসে গেছে চোখের কোলে, চোখের
বলে গেছে। বাকী সব সাদা ব্যাঙে
খুঁনির তলা দিয়ে ঘুরে দুই কান দুই
ব্যাঙেটা উঠে গেছে কপালের ওপর, ছুঁক
মাথাটা সাদা ধপধপ করছে। ক্যাকাশে
অজুত দেখাচ্ছে মুখখানি। মনে হচ্ছে, এ
পর্দার গায়ে একটু ছোঁদা উঁকি মেঝে দে
এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে চোখ দুটি বুজে কে
কুয়াশায় গড়া মূর্তিটি একটু চমকে উঠল।
দরজার দিকে তাকাল। দরজার কাছ
হালকা ভাবে উচ্চারিত হোল—“চলি ত
গাড়িতে উঠেছে।”

কুয়াশা ঠিক কুয়াশার মত করে জিজ্ঞাস
“যেহেটার তা’হলে—?”
বাকীটুকু বলতে হোল না, তৎক্ষণাৎ জবা
“তাল আছে। বিয়ে বা হোয়েছে, ঘর-সংসার
কাকার কাছে এক পাগুজী আসতেন বা
কাকা তাঁর হাতে যেহেটারে সঙ্গে দিয়েছিলেন—

সদিন। রাতে এই মেয়েটাকে কুড়িয়ে পেলাম
নের বারে, পর দিনই একটা চিঠি এল। দশ
পর তারিখ পোষ্ট আফিসের ছাপে। একজন
ক দেশের বাড়ীতে পাঠিয়েছি, কাকার কাগজ-
দেখতে। এই চিঠিখানা পেয়ে সে পাঠিয়ে
খাম ছেঁড়া হয়নি। ছিঁড়বে কে, দশ বছরের
—গেই কাকা মারা গিয়েছিলেন, কাজেই খাম
না। পড়ে বুঝলাম আমাদের মেয়ের বিয়ের
। সেই 'ছুটেছিলাম সেখানে, এই ত' ফিরছি।"
পেল নাকি মেয়েটাও।" নিদারুণ আতংকে ফিগ-
ঠল কুহেলিকা।

নাকি আমি। কি যে ভাব আমাদের। মেয়েটাকেও
সব।" বেশ একটু ক্ষুব্ধ অভিমান কাগজে
—দাবটিকে জড়িয়ে। তারপর সব নিথর হয়ে গেল।
কল্পণ পরে কুহেলিকার অন্তর থেকে দীর্ঘশ্বাস

বোঝিয়ে এল—কাকি দিতে
পারলাম না, ঠিক চিনে
ফেললে।" খুব ভাড়াভাড়ি

অনেকগুলো কথা বলা হোল তখন দরকার কাছ থেকে।
কথাগুলো না বললে যেন বড় কতি হোয়ে যাবে।
কাল-সন্ধ্যের অতল তল থেকে ভেসে উঠল কতকগুলো
বুদ্বুদ, বিচিত্র শব্দ করে সেগুলো কাটতে লাগল।

"না, তা' ফেলব কেন। নিজের বউ ছেলে মেয়েকেও
চিনতে পারব না, খেপে গেছি বুকি আমি। যাক—
সাবধানে থেক,—আর এদের ছজনকে একটু দেখ।
এদের অন্তেই ত' সব ফিরে পেলাম। কিন্তু আর নয়,
দেরি হোয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যদি আবার পালায়।
একলা ত' আর ছেলেকে ছেড়ে দিতে পারি না—
একলা যে—"

বাকীটুকু শোনা গেল না।



পহার!



'বাথগেটের'
দেউকত বৎসরের বিখ্যাত
ক্যাণ্ডার অয়েল
খরিদ করিয়া

মৌতনীয়
ধূপহার
মৌতনীয়

(১০০টি উপহার ১০, হইতে ৫০০, পর্যন্ত)

১ম উপহার— ১টি নুতন রেডিও ৫০০, (all wave all transistor)
২য় উপহার— ১টি নুতন সাইকেল ২৫০,
৩য় উপহার— ১টি নুতন সেলাই কল ১৭৫,
এবং আরও ১৭টি মূল্যবান উপহার—

পনি এখনই আপনার নিকটস্থ ষ্টোর বা ফার্মেসী হইতে 'GIFT COUPON INSIDE'
বলবল্ড বাথগেটের ক্যাণ্ডার অয়েল (৪ আঃ শিপি) খরিদ করিয়া 'শাকীকুপনের' এক'
বা অত্যধিক উপহার পাইতে পারেন।

অনুসন্ধান করুন :

মাস বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
১৭-১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১
ফোন : : ২০-১৪০৪

মাস পুরী এণ্ড কোং
সোল ডিস্ট্রিবিউটার, কলিকাতা ও মুম্বাই
৫৬, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৬
ফোন : : ৪৪-৪১৬০

একবিংশতি বর্ষ
শারদীয়া

রূপ-মঞ্চ

— ১৩৬৭ —

সম্পূর্ণ কলেবর—২৯০ পৃঃ

প্রচ্ছদ—৪ :: আর্টস্টেট—

১৮ :: বিশেষ ছবি—৪০ [বিশেষ

রচনা সহ] :: সূচী—৪ : পৃথক

বিজ্ঞাপনী—৮ :: পৃথক রচনা—

৪৮ :: শার্শী (উপন্যাস)—১৬৪।

মোট—২৯০ পৃষ্ঠা



খাটের কিনারায় জমে
ওঠা কুহেলিকা আচমিতে
রক্ত মাংসে পড়া মাহু

হোয়ে দাঁড়াল। ছিটকে উঠে আছড়ে গিয়ে পড়ল কোণের
দরজাটার পায়ে। এক হেঁচকার কপাটখানা খুলে বেলিনের
ওপর ঝাঁপ দিলে। কিন্তু—তারপর আর উপায় নেই।

সামনেই চারখানা কাঁচ আঁটা হাফ জানালা, যেমন
বাথরুমের জানালা হয়। এই সর্বনেশে ফাঁকটা দিয়ে গলে
একজন পড়েছে ফুটপাথের ওপর। কমলপ্রসাদ কাঁচ
আঁটা কপাটখানা বন্ধ করে গিয়েছেন।

টিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী। গাড়ী যে ছেড়ে যায়।
ইস্ ওরা যে গেল।

ছিটকিনিটা কোথায়। ছিটকিনি। হুব হাই—

একখানা ঘোলাটে কাঁচের ওপর লজোরে মারলে ধাক্কা,
কাঁচখানা ফাটল কিন্তু খসল না। তবে রে—! আবার
এক আঘাত; তারপর আবার। ভারী মিষ্টি একটু
আওয়ার হোল, অনেকগুলো টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গেল।

গাড়ীতে মাথা গলিয়ে এক পা পাদানির ওপর তুলেছেন
তখন বক্রবাহন। কি যেন পড়ল তাঁর ঘাড় পিঠে।
মাথা টেনে নিয়ে এবারে ফিরে ওপর দিকে মুখ তুলে
তাকালেন। কমলপ্রসাদ আর পুরুষোত্তম দাঁড়িয়েছিল
পাশে, তারাও মুখ তুলল।

ওপরে, একদম সিঁথে অনেকটা ওপরে, বাথরুমের হাফ
জানালাটা। চারখানা কাঁচ আঁটা শাশী। খুবই বিচিত্র শাশী।
নিচের একখানা কাঁচ ফুঁড়ে কি যেন একটা বেরিয়ে এসেছে।
শাশীর মুখ, মুখখানার হুঁপাশ দিয়ে ঝুঁজিয়ে রক্ত ঝরছে।
শাশীর রক্ত।

বক্রবাহন লাক মেয়ে উঠে পড়লেন গাড়ীতে। ছেলেটা
আবার খেপা, যদি তাঁকে ফেলে পালায়। বিশ্বাস কি।

॥ সমাপ্ত ॥

৩৩২৭

৫৭ বৎসরের পুরা

ভারতের সর্বজন

প্রাচীনতম অমামান নাট্য-প্র

সত্যজ্বর

অপের

৩৭৭। ১বি. আপার চিৎপুর

ফোন : ৫৫—১০৪৩ :: কলিকাতা

ব্রাঞ্চ অফিস : ভূপ্তি বোডির (আস)

স্বাধিকারী : শ্রী গৌরচন্দ্র দাস

বর্তমান বৎসরের শারদীয় নাট্য

ব্রজেনকুমার দে-র 'লোনাই দোঁ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'পুষ্প-চন্দ্র

অজ্ঞান্য সুপ্রভিনীত নাট্যকাবলী

* রাজা লক্ষণ সেন * মাটির

* অগ্নিশরীক্ষা * দেবী অন্নপূর্ণা

প্রস্তুতি পথে :-

ব্রজেন দে-র "মহুয়া" * দেবেনবাবুর "যাজা হ'বে

শিল্প-পরিচিতি :-

সর্বজনাদৃত : গুরুপদ ঘোষ * রূপ-দক্ষ : দিলীপ চ

শক্তিমান নট ভোলা পাল (ছোট), রামহরি

পান্নালাল চক্রবর্তী, অমর ব্যানার্জি এ

কোতুকে : মাখন সমাদ্দার

সংগীতে : সত্য অধিকারী

প্রাচ্য-নৃত্যে : মাঃ বৈজুনাথ পোদ্দার ও সর্বে

কুমারী মীনা ও মঞ্জু দাস।

দ্বী-চরিত্রে ::—সর্বজনাদৃত কুমারী জ্যোৎস্না দত্ত,

কুমারী কল্যাণী (বুলা)। তৎসহ অঞ্জলী দেবী ও

মানোজার : সুবলচন্দ্র অধিকারী

কার্যার্থক : লালমোহন মাজ।

পরিচালক : শ্রীহরিশ্রী পদ বারেন

রূপ-মঞ্চ কাঁথালয় :: ৮-১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হইতে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত ও প্রঃ
ও রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা মুদ্রণালয়ের সহযোগিতায় শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় কতৃক ভায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস, ১৯৫—এইঃ
★ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য প্রতিখণ্ড : ৩/- টাকা। পরিবেশক—রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা।

MENDED
2003